গাঙ্কাজার দূত

সমর ঘোষ

গান্ধীজীর দূত

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা ৯

শান্তি

এবং দুই কন্যা

সুনন্দা ও সুপ্রিয়া-কে

প্রকাশকের নিবেদন

গ্রন্থকার তাঁর এই গ্রন্থখানিকে
দেখে যেতে পারেননি। গ্রন্থের মুদ্রণকর্ম
যখন সমাপ্তপ্রায়, শ্রীসুধীর ঘোষ তখন অকস্মাৎ
এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।
হরফ নির্বাচন, অধ্যায়-বিন্যাস, প্রুফ সংশোধন
ইত্যাদি নানা ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম;
'গান্ধীজীর দূত'-এর প্রকাশ-পর্বের সঙ্গে
নিজেকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রেখেছিলেন।
আমাদের দুঃখ, এর প্রথম কপিটি
তাঁর হাতে তুলে দেওয়া গেল না।

স্বীকৃতি

এই গ্রন্থ রচনায় সাহায্য ও
সহযোগিতার জন্য লেখক নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও
প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন :
দি নবজীবন ট্রাস্‌ট, আমেদাবাদ;
কমনওয়েল্‌থ দপ্তরের সচিব;
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী;
ডেম ইসোবেল ক্রিপ্‌স;
মিঃ উডরো ওয়াট, এম. পি.;
ওরিয়েন্ট লংম্যানস, কলকাতা;
শ্রীমতী ইভামারিয়া ব্রেল্‌সফোর্ড;
রাষ্ট্রদূত শ্রী জি. পার্থসারথি
(রাষ্ট্রপুঞ্জে স্থায়ী ভারতীয় প্রতিনিধি);
শ্রীদয়াভাই প্যাটেল;
দি ইনডিয়ান এক্‌সপ্রেস, নয়াদিল্লি;
দি স্টেট্‌সম্যান, কলকাতা;
মিঃ আর্থার হেজ্‌ সুল্‌জ্‌বার্জার
ও নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স;
মিঃ গার্ডনার কাউল্‌স এবং
মিনিয়াপলিস স্টার ও দে মোয়ানে রেজিস্টার;
শ্রী সি. রাজাগোপালাচারী, মাদ্রাজ;
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী; ও ভারত সরকারের
প্রধান ইনফরমেশন অফিসার।

সূচীপত্র

মহাত্মা গান্ধী, ১৯৪৬

এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু

ভারতবর্ষের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার ব্যাপারে, ১৯৪৫-৪৭ সনে, গান্ধীজী আর ব্রিটিশ শ্রমিক সরকারের মধ্যে ঠিক কী কী কথা হয়েছিল, এবং ঠিক কী কী ঘটনা তখন ঘটেছিল, তা আজও বলা হয়নি। এ-বিষয়ে রাজনৈতিক আর সাংবিধানিক ইতিহাস অবশ্যই লেখা হয়েছে। কিন্তু তেমন কোনও ইতিবৃত্ত রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এখানে কলম ধরিনি। অখণ্ড ভারতবর্ষের হাতে যাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া যায়, তার জন্য ভারত-ব্রিটিশ আলোচনার সংকটকালে ক্রিপস আর পেথিক লরেন্স্ নয়াদিল্লির বড়লাট-ভবনের পিছনের বাগানে কেন গোপনে গান্ধীজীর সংগে কয়েকবার দেখা করেছিলেন, আজ অনেক বছর বাদে আমার মনে হচ্ছে যে, সে এক তৎপর্যময় নাটকীয় কাহিনী। ব্রিটিশ ভাইসরয় আর ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সেই গোপন সাক্ষাতের কথা জানতেন না।

ভারত, ব্রিটেন আর মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে আমার যে-সব বন্ধু আছেন, তাঁরা প্রায়ই আমাকে বলেছেন যে, গান্ধী-কাহিনীর আমি যে-অংশ জানি, তাঁদের জন্যে তা আমার লিপিবন্ধ করা উচিত। নানা সময়ে তাঁরা আমাকে বলেছেন যে, কেউ যদি কখনও কোনও মহামানবের সান্নিধ্যে আসেন, তাহলে স্বজাতির প্রতি কর্তব্য-পালনের জন্যই তার বিবরণ তাঁর লিখে যাওয়া উচিত। আরও আগেই এই বিবরণ আমার লেখা উচিত ছিল। লিখে উঠতে পারিনি, তার একটা কারণ মানসিক অবসাদ। অন্য কারণ দ্বিধা। সেই বছরগুলির ব্যক্তিগত বিবরণ লিখতে আমি কুণ্ঠাবোধ করেছি; আমার আশঙ্কা হয়েছে, একে তো তার বিবরণকে অনেকে আত্মম্ভরী বলে মনে করতে পারেন, তার উপর একে কেন্দ্র করে বিতর্ক দেখা দেওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। লিখবার সপক্ষে যুক্তিটাই অবশ্য বেশী জোরালো। বিস্ময়কর সেই বছরগুলিতে যা যা ঘটেছিল, তার বিবরণ যদি না আমি লিপিবন্ধ করে রাখি, ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তাহলে হারিয়ে যাবে। সেই কথা বিবেচনা করেই শেষপর্যন্ত এই গ্রন্থ রচনায় আমি ব্রতী হয়েছি।

গান্ধীজী তাঁর চারপাশে অনেক লোককে জড় করেছিলেন। তাঁর কাজ তাঁরা করে দিতেন। একই লোকের উপরে সব রকমের কাজের দায়িত্ব তিনি দিতেন না। নানা জনকে দিয়ে নানা ধরনের কাজ করিয়ে নিতেন। এইটেই ছিল তাঁর রীতি। কে কোন্ কাজের যোগ্য, তিনি নিজেই সেটা ঠিক করতেন। নির্বাচনের পদ্ধতি অনেক সময় অন্যের বিস্ময় উদ্রেক করত। এ-সব ব্যাপারে সব সময়ে তিনি যুক্তি মেনে চলতেন না; মনে হত, যুক্তির চাইতে অন্তদৃষ্টির উপরেই তিনি বেশী নির্ভরশীল।

১৯৪৫-৪৭ সনে, ক্ষমতা-হস্তান্তরের ব্যাপারে ব্রিটেনের শ্রমিক সরকারের সংগে আলোচনা চালাবার জন্য, আমাকে তিনি তাঁর তরুণ দূত হিসেবে নির্বাচন করলেন। কেন করলেন, তা একমাত্র তিনিই জানতেন। অন্যেরা এতে আপত্তি জানিয়েছিলেন; তাঁদের আপত্তিতে যে যুক্তি ছিল না তাও নয়। কিন্তু গান্ধীজী তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেননি। ফলত যে-আলোচনার পরিণামে দেশ খণ্ডিত হল এবং দুটি স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল, আমি সেই আলোচনার কেন্দ্রে এসে

দাঁড়ালাম। দেশ-বিভাগের পরিণাম শুভ হয়নি; উপমহাদেশে বিপর্যয় ঘটেছে। নিতান্ত কয়েক দশক নয়, সম্ভবত কয়েক শতাব্দী ধরে সেই বিপর্যয়ের জের চলবে। সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধের বীজও সম্ভবত তারই মধ্যে উপ্ত ছিল। বিশ বছর আগে যে-সব ঘটনা ঘটেছিল, পিছন ফিরে তার দিকে আজ আবার তাকানো দরকার; বোঝা দরকার, সেই ঘটনাগুলি কীভাবে ঘটেছিল।

মানবিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ভরা সেই ভারত-ব্রিটেন নাটকের মূলে চরিত্র চারটি; মহাত্মা গান্ধী, সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। এই চারজনের মধ্যে একজনেরও স্তাবকতায় আমার স্পৃহা নেই। গান্ধীজীকে আমি ভালবাসতুম ঠিকই, কিন্তু আমি তাঁর অন্ধ ভক্ত ছিলুম না। গান্ধীজীর অহিংসা-দর্শন নিয়ে ভাবোচ্ছ্বাসে মত্ত হওয়া, কিংবা তাকে খণ্ডন করা, আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার কাছে তিনি একজন রক্তমাংসের মানুষ; এবং সেই কারণেই, আলাপ-আলাচনার ক্ষেত্রে মানবিক ভ্রান্তির পথে পা বাড়ানো তাঁর পক্ষেও অসম্ভব ছিল না। একই সঙ্গে, অলৌকিক সাহসের অধিকারী একজন মানুষ হিসেবেও তাঁকে আমি জেনেছি। গান্ধীজীর জীবনে সাহসের এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়, মানবিক মাপকাঠিতে যার বিচার চলে না। তাঁর অহিংসা-দর্শন বিশ্বে একটি আশার আলোড়ন তুলেছিল ঠিকই, কিন্তু সেই দর্শনই যে তাঁকে অমর করেছে, তা নয়। তিনি অমর হয়েছেন তাঁর দীপ্তশিখা সাহসের জন্য। এবং সেই সাহসকেই তাঁর উত্তরাধিকার হিসেবে তিনি রেখে গিয়েছেন। স্বধর্মে তিনি ছিলেন অটল; সেখান থেকে তাঁকে বিন্দুমাত্র নড়াবার সাধ্য কারও ছিল না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নিয়ে যখন আলোচনা চলছে, সেই সময়ে, ১৯৪৬ সনের অক্টোবরে, রাজনীতি পরিত্যাগ করে তিনি পূর্ববঙ্গের সুদূর গ্রামাঞ্চলে চলে গেলেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে অসংখ্য নরনারীর নিরাপত্তাবোধ তখন ভূলুণ্ঠিত; আতঙ্কে তারা তখন দিশেহারা। সেই ভয়ত্রস্ত নরনারীদের মাঝখানে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। বিশ্বজগৎ সেদিন প্রকৃত-গান্ধীজীকে দেখতে পেয়েছিল। দেখেছিল নিঃসঙ্গ সেই মানুষটিকে, ৭৭ বছর বয়সে খালি পায়ে নোয়াখালির গ্রামে-গ্রামে যিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর মুখে তখন রবীন্দ্রনাথের সেই নিঃসঙ্গতার গান,

> "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
> তবে একলা চলো রে।
> একলা চলো, একলা চলো,
> একলা চলো রে॥
> যদি আলো না ধরে—
> (ওরে ওরে ও অভাগা!)
> যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
> দুয়ার দেয় ঘরে—
> তবে বজ্রানলে
> আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
> একলা জ্বলো রে॥"

১৯৪৭-এর ১৫ই অগস্ট আমরা যখন স্বাধীনতা দিবসের উদ্‌যাপনে ব্যস্ত, তখন গান্ধীজী বললেন, তাঁর কাছে এটি শোকদিবস।

স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌কে অনেকেই নিতান্ত নিরুত্তাপ একজন বুদ্ধিজীবী বলে মনে করতেন। তবে সত্যিই তাঁকে যাঁরা জানতেন, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর ধর্মবোধ প্রবল, কর্মদক্ষতাও অসামান্য; ব্রিটেনের কাছ থেকে ভারতবর্ষ যা-কিছু ভাল পেয়েছে, সার স্ট্যাফোর্ড ছিলেন তারই মূর্ত প্রতীক। ব্রিটেনে ক্রিপসের মতন কিছু মানুষ ছিলেন বলে, এবং ব্রিটিশ-চরিত্রের যা-কিছু ভাল, তাঁর মতন মানুষদের মাধ্যমে তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল বলেই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পালা শেষ হয়ে যাবার পরেও ভারতবর্ষের চিত্তে ব্রিটিশ জাতি এবং তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অনুরাগের ভাবটা বজায় থাকতে পেরেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবার জন্যে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করেছে ভারতবর্ষ; কিন্তু সেই অনুরাগ তবু ফুরিয়ে যায়নি। ব্রিটিশ জাতির দক্ষতা, বিচক্ষণতা আর কর্মনৈপুণ্য ভারতবর্ষের চিত্তে সাড়া জাগিয়েছে; তার আসন সেখানে স্থায়ী। ব্রিটেনের কাছ থেকে এই পেয়েছি আমরা। ভারতবর্ষের সংহত ব্যক্তিত্বের বিবর্তনে তার অবদান সামান্য নয়।

বিরোধীরা—শুধু বিরোধীরা কেন, দীর্ঘদিন ধরে যাঁদের সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন, পুরনো সেই সহকর্মীদের মধ্যেও অনেকে—নেহরুকে একজন উদ্ধত স্বভাবের অভিজাত মানুষ বলেই জানতেন। পেটে খিদে থাকলে তবেই যেমন খাওয়াটা বেশ জমে, ঠিক তেমনি বিনা-ক্রোধে সম্ভবত উচ্চস্তরের রাজনীতি বিশেষ জমে না। তা সে যাই হোক, তাঁর মেজাজটাই শেষপর্যন্ত প্রধান হয়ে ওঠেনি। বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে যে, মূলত তিনি এ-দেশে ছিলেন বিশ শতকের প্রতীক; তাঁর দেশবাসীকে তিনি বিশ শতকের মানুষ করে তুলতে চেয়েছিলেন। নিজের সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা ছিল, ভারত-আত্মার উপরে তাকেই তিনি প্রসারিত করে দিয়েছিলেন; এই দুই-ই তাঁর কাছে কখনও-কখনও একই বস্তু বলে মনে হয়েছে। তবে সেটাও তাঁর সম্পর্কে প্রধান কথা নয়। সর্বোপরি তিনি ভারতবর্ষকে অতি গভীরভাবে ভালবাসতেন। এত গভীর ভালবাসা খুবই বিরল। প্রতিদানে ভারতবর্ষও তাকে প্রভূত ভালবাসা দিয়েছে। ভারতবর্ষ যে ঐক্যবদ্ধ হতে চেয়েছে, এবং চূড়ান্ত এক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছে,—নেহরুই সেই সংকল্পের প্রতীক। এমন নয় যে, এ-সব ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা জানানোটাই যেহেতু রেওয়াজ, অতএব রীতিরক্ষার খাতিরে আমি এ-সব কথা বলছি। না, তা নয়। পক্ষান্তরে, দেশবিভাগের সময় এবং তার পরে মারাত্মক যে-সব ভুল করেছিলেন নেহরু, তার দ্বারাও আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয় নি। নেহরুর মানবিক ভূমিকার অন্তরঙ্গ বিবরণ যদি দিতে হয়, তবে তাঁর ভুলগুলিরও উল্লেখ করতে হবে বই কী। যে ঘটনাবলীর কথা আমি বলতে চলেছি, আমার বিশ্বাস, তাতে নেহরুর ভূমিকায় কিছু ভুল ছিল। আজ কুড়ি বছর বাদে যখন পিছন ফিরে তাকাই, সেই বিশ্বাস তখন আরও সমর্থিত হয়।

গান্ধীজী আমাদের মুক্তিদাতা; ভারতবর্ষে বিদেশী শাসনের তিনি অবসান ঘটিয়েছিলেন। আর নেহরু ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের স্রষ্টা; এ-দেশে পারলামেনটারী গণতন্ত্রেরও তিনি জনক। বাইশ কোটি মানুষের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠানে এবং সেই নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সত্যিকার পারলামেণ্ট স্থাপন; যে-ভাবে এ-কাজ সম্পন্ন হয়েছে, কোনও রাজনৈতিক দল তা নিয়ে গুরুতর কোনও অভিযোগ পর্যন্ত তুলতে পারেননি। শুধু এইটুকুও তো কম কৃতিত্বের কথা নয়। পররাষ্ট্র-নীতি নিয়ে বিতর্কের সময় বক্তার পর বক্তা যখন

পারলামেনটে উঠে দাঁড়িয়েছেন, এবং গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা আর সহাবস্থান সম্পর্কে মামুলী সব কথার অন্তহীন স্রোত বইয়ে দিয়েছেন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এই মানুষটিকে তখন আমি চুপচাপ বসে থাকতে দেখেছি। লক্ষ্য করেছি, সারাটা দিন বসে তিনি সেই একঘেয়ে বিতর্ক শুনে যাচ্ছেন। পারলামেনটের মহিমা যে কী বিপুল, প্রায়ই তিনি তার উল্লেখ করতেন। একথা বলবার অধিকার তাঁর ছিল। সেই মহিমা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন।

বল্লভভাই প্যাটেলকে অনেকে দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকদের ছাঁচে-ঢালা প্রতিমূর্তি বলে মনে করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, তিনি পুঁজিপতিদের বন্ধু, প্রতিনিধি এবং কার্যোদ্ধারের হাতিয়ার। তাঁর সম্পর্কে এই ধারণা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বাস্তববাদী এক বিরাট রাষ্ট্রনীতিবিদ্। তিনি ছিলেন শক্ত ধাতের মানুষ; শক্তির অপচয়ে তাঁর সায় ছিল না। তাঁর মতন 'রক্ষণশীল' মানুষরাই আসলে জানেন যে, অবস্থা অনুযায়ী কীভাবে সমস্যার সমাধান করে নিতে হয়। তাঁর বাস্তববোধ ছিল প্রবল; সমাজবাদ আর পুঁজিবাদ নিয়ে অকারণ বিতর্কে তাঁর স্পৃহা ছিল না। ক্রিপস ছিলেন সমাজবাদী মানুষ; কিন্তু প্যাটেলের ওই বাস্তববোধের দরুন দুজনের মেজাজে বেশ মিল ঘটেছিল। প্যাটেল ছিলেন কর্মী মানুষ, বিরাট প্রশাসক। ছ'শোরও বেশী দেশীয় রাজ্যকে যেভাবে তিনি ভারত-রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করেছিলেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। এই কর্মী-মানুষটির চরিত্রে কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের কিছুমাত্র প্রভাব ছিল না। একান্তভাবেই তিনি ভারত-মাতার সন্তান।

যে-চারজন মানুষের কথা এখানে বললুম, তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন বিশিষ্ট কয়েকটি মানবিক গুণের প্রতীক। যে কাহিনী আমি বিবৃত করতে বসেছি, তার থেকে এই গুণগুলি আরও স্পষ্ট হবে। আমি নিজেও এই কাহিনীর একটি চরিত্র। এই ঘটনাবলীর মধ্যে আমি নিশ্বাস নিয়েছি, তার থেকে আনন্দ আহরণ করেছি। তার স্মৃতি আজও আমাকে আচ্ছন্ন করে আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস, তার আত্মিক ঐতিহ্যের প্রাণাবেগ, বিভাগ আর বিচ্ছেদের পূর্বাভাস, এবং অক্ষয় এক আভ্যন্তর শক্তি —এক অমোঘ পরিণতির দিকে অগ্রসরমান সেই বছরগুলিতে এই সবকিছুই যেন প্রত্যক্ষ প্রকট হয়ে উঠেছিল।

ভারতবর্ষে এই পারলামেণ্টারী গণতন্ত্র কি টিঁকে থাকবে? নাকি, অদূর ভবিষ্যতে বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার জায়গায় স্বৈরতন্ত্রী সরকার দেখা দেবে? পারলামেণ্টারী গণতন্ত্র যাতে টিঁকে থাকতে পারে, এই ব্যবস্থার মধ্যে তো তেমন কোনও গ্যারাণ্টি নেই। ভারতের একনিষ্ঠ বন্ধু এইচ এন ব্রেলসফোর্ডকে, ১৯৫৮ সনে তাঁর মৃত্যুর সামান্যকাল আগে, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ভারতে কী ঘটবে বলে তাঁর মনে হয়। নোয়েল ব্রেলসফোর্ড জ্ঞানী মানুষ, আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের দিকে অনেক-কাল ধরে তিনি লক্ষ্য রেখেছেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "সুধীর, আমার ধারণা, জওহরলালের পরে ভারতবর্ষ কমিউনিস্ট্ হয়ে যাবে। এর থেকে কোনও পরিত্রাণ আছে বলে তো মনে হয় না।" ব্রেলসফোর্ড কি ঠিক কথা বলেছিলেন?—অনেক সময়েই আমার মনে এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পরে আঠারো বছরের মধ্যেই ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা পঁয়ত্রিশ কোটি থেকে সাতচল্লিশ কোটিতে এসে পৌঁছেছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখন বছরে প্রায় দেড় কোটি। আর মাত্র পাঁচ বছর বাদেই এ-দেশের লোকসংখ্যা পঞ্চান্ন কোটিতে গিয়ে পৌঁছবে। বৃদ্ধির হার যদি এইরকম থাকে, ১৯৮৪ সন নাগাদ ভারতবর্ষের

লোকসংখ্যা তাহলে হবে প্রায় এক শ কোটি। মোটামুটি সন্তোষজনক জীবন-মানের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, প্রশ্ন হচ্ছে, সেই বিপুলসংখ্যক মানুষকে খাদ্য জোগানো ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভব হবে কিনা।

অলডাস হাক্‌সলি তাঁর শেষ বইয়ে লিখেছেন, লেনিন বলতেন যে, ইলেকট্রি-সিটির সঙ্গে সমাজবাদ যোগ করলেই যোগফল দাঁড়ায় সাম্যবাদ। অনগ্রসর দেশ-গুলিতে কিন্তু হিসেবটা অন্য রকম দাঁড়াবে। সেখানে ইলেকট্রিসিটি থেকে ভারী শিল্পকে বিযুক্ত করে তার সঙ্গে, জন্মনিয়ন্ত্রণ যোগ করলে পাওয়া যাবে গণতন্ত্র আর প্রাচুর্য; পক্ষান্তরে ইলেকট্রিসিটির সঙ্গে ভারী শিল্পকে যুক্ত করে জন্মনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে বাদ দিলে তার পরিণাম দাঁড়াবে দারিদ্র্য, একনায়কতন্ত্র এবং—শেষপর্যন্ত—যুদ্ধ। হাক্‌সলি অতঃপর বলেছেন যে, এই শোকাবহ পরিণামের আশঙ্কা আদৌ অমূলক নয়; অথচ অনগ্রসর দেশগুলির যাঁরা নেতা—সমস্ত জেনেও—এই ফাঁদের মধ্যেই তাঁরা পা বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

কৃষি আর শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সমস্যা অতি বিপুল। পারলামেন্টারী-ব্যবস্থার সীমিত পরিধির মধ্যে কি এর সমাধান খুঁজে নেওয়া সম্ভব? নাকি অমীমাংসিত এইসব সমস্যার বিপুলতাই পারলামেন্টারী শাসন-ব্যবস্থার পতন ঘটাবে? নেহরু-পরবর্তী ভারতবর্ষে অবস্থা কী দাঁড়াতে পারে, সে-বিষয়ে নোয়েল ব্রেলসফোর্ড যখন হতাশাব্যঞ্জক মন্তব্য করেছিলেন, তখন এইসব সম্ভাবনার কথাই হয়ত তাঁর মনে জেগেছিল। আমি আশাবাদী মানুষ। গান্ধীজীর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের কারও পক্ষেই এই সত্যটা উপলব্ধি না-করা সম্ভব ছিল না যে, ভারতবর্ষ নিজেই একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। বাইরের যত প্রভাবই ভারতবর্ষের উপরে পড়ে থাকুক, সকল কঠিন প্রশ্নের উত্তর সে তার নিজের মধ্যে থেকেই খুঁজে নেয়।

একজন ভারতবাসী হিসেবে আমিও এ-সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজি। আমি ছিলাম গান্ধীজীর দূত; আমার উপরে তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল, আস্থা ছিল। সেই আস্থার প্রবলতাই আমার জীবনে গতিবেগ সঞ্চার করেছে; এবং তারই দ্বারা চালিত হয়ে বিগত দুই দশক ধরে আমি জনসেবায় ব্রতী আছি। যে-সব ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ তার জটিল সমস্যার উত্তর খুঁজছে, তার প্রতিটিতেই গুরু-দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছি আমি। দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারত-রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করবার ব্যাপারে, বাস্তু-হারাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে, পানজাবের যে ফরিদাবাদ এখন একটি সমৃদ্ধ শিল্প-নগর এবং ভারতবর্ষে সমষ্টি-উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রথম দুটি পরিকল্পনার যা অন্যতম, একেবারে সূচনা থেকে তাকে গড়ে তুলবার ব্যাপারে, এবং ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইস্পাত-শিল্প-উদ্যোগের সৃষ্টিতে আমি কাজ করেছি। আজ আমি পশ্চিমবঙ্গে, আমার আপন জেলা পুরুলিয়ার মাটিতে, কৃষি-সম্ভাবনার পুনরুদ্ধার কার্যে নিরত। ১৯৬২ সনের অক্টোবর-নভেম্বরে কমিউনিস্ট চীন যখন ভারতবর্ষের উপরে আক্রমণ চালায়, তার পরে গান্ধীপন্থী দূত হিসাবে আবার আমি সর্বাধিক শক্তিমান দুই রাষ্ট্রে, রাশিয়া ও আমেরিকায় গিয়েছি। নেহরুর নৈতিক সমর্থন আমি পেয়েছিলাম। ভারতীয় সংসদের সদস্য হিসাবে ১৯৬৩-৬৪ সনে তিনবার আমি মস্কো আর ওয়াশিংটনে গিয়ে আলাপ-আলোচনা চালিয়েছি। চেষ্টা করেছি ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের সম্পর্ক যাতে শান্তিপূর্ণ হয়; খুঁজে দেখতে চেয়েছি, ভারত-চীন বিবাদের ফলে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, বিনাযুদ্ধে কূটনৈতিক পন্থায় তার কোনও সমাধান পাওয়া যায় কিনা। এই সমস্যার তো কোনও সামরিক সমাধান নেই।

এই বছরগুলিতে আমি গান্ধীজীর কাছ থেকে শ্রীঅরবিন্দের কাছে সরে এসেছি। আমার বিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতার সীমা ইতিমধ্যে আরও বেড়েছে। ভারতবর্ষের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অন্যতম গান্ধীজী। ধীরে ধীরে, কিন্তু অনিবার্যভাবে, তাঁর প্রেরণার ভূমি থেকে আমি শ্রীঅরবিন্দের পথে চালিত হয়েছি। নিজের আভ্যন্তর উপলব্ধির ঐশ্বর্যকে জীবনের বহিরঙ্গে প্রকাশ করবার জন্য যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষ যে প্রয়াসে নিরত রয়েছে, শ্রীঅরবিন্দই তার যুক্তিসংগত পরিণতি।

বিখ্যাত একটি ক্রোধের কাহিনী

লর্ড পেথিক লরেন্সের সঙ্গে কাজ করেছেন, হোয়াইট হলের ইনডিয়া অফিসের এমন এক উচ্চপদস্থ অফিসারের কথা জানি; ১৯৪৭ সনের গ্রীষ্মকালে মহাত্মা গান্ধীর একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ কোয়েকার বন্ধুর কাছে তিনি এই তিক্ত মন্তব্য করেছিলেন যে, ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের পদচ্যুতির জন্য আমিই দায়ী। জানি না আমার পক্ষে এটা প্রশংসার কথা কিনা; প্রশংসা হলেও যে তা আমার প্রাপ্য, তাও আমি জানতুম না। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের একটি কাহিনী এর সঙ্গে জড়িত। সেটা খুলে বলি।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস বস্তুত বিভেদ সৃষ্টির সাহায্যে শাসন চালাবার ইতিহাস। সূক্ষ্ম এবং স্থূলে সর্বপ্রকার উপায়ে হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে যেভাবে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছিল, ব্রিটেনের পক্ষে তা আদৌ গৌরবজনক ব্যাপার নয়। তবে একটা কথা অনেকেই জানেন না। সেটা এই যে, ব্রিটেন এই দেশকে দু ভাগ করে দুই সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেনি। গান্ধীজী এবং ব্রিটিশ শ্রমিক সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতীয় নেতারাই ভারত-বিভাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১৯৪৫ সনের গ্রীষ্মকালীন নির্বাচনে শ্রমিক দল বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন; অতঃপর অ্যাটলির নেতৃত্বে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ সহ যে নূতন নেতৃবৃন্দ ব্রিটেনে ক্ষমতাভার গ্রহণ করেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁদের আমলে ব্রিটেন যে ভারতের সঙ্গে কোনও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এমন কথা সত্যিই বলা শক্ত।

ক্ষমতালাভের ছ মাস পরে অ্যাটলি সরকার ব্রিটিশ পারলামেন্টের সর্বদলের সদস্য নিয়ে গঠিত এক প্রতিনিধিদলকে ভারতবর্ষে পাঠান। ওয়েল্‌স্ এম-পি অধ্যাপক রিচার্ডস ছিলেন তাঁদের নেতা। রাজনীতিক হিসাবে অধ্যাপক রিচার্ডসের বিশেষ নামডাক ছিল না বটে, তবে শ্রমিক দলের জনকয়েক তেজী তরুণ সদস্য সেই প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আরথার বটমুলি (পরে তিনি কমনওয়েল্‌থ সচিব হন), এবং উডরো ওয়াটের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রেজিনাল্‌ড সোরেনসেনের (পরে তিনি লর্ড হন; তাঁর মত বিনয়ী মানুষকে এই খেতাব মোটেই মানায়নি) মত জনকয়েক বিশিষ্ট প্রবীণ নেতাও সেই দলের সঙ্গে ভারত সফরে এসেছিলেন। তা ছাড়া ছিলেন রক্ষণশীল দলের তরুণ সদস্য টোবি লো, পরে যিনি লর্ড অলডিংটন হন (খেতাবটা এক্ষেত্রে দিব্যি মানিয়েছিল), এবং আর্ল অব মান্‌স্টার। এই শেষোক্ত ভদ্রলোক ইণ্ডিয়া অফিসে কিছুকালের জন্যে পারলামেন্টারী আনডার-সেক্রেটারির কাজ করেছিলেন। এই পাঁচমিশেলী প্রতিনিধিদলের কাজ ছিল মোটামুটি এই যে, মহাযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষের অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মেজাজ তখন কী-রকম, সেইটে তাঁরা পরীক্ষা করে দেখবেন। তার জন্যে তাঁরা ভারতবর্ষের যেখানে-খুশি যাবেন, এবং সর্বরকম মতাদর্শের ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে প্রধানত ঘরোয়াভাবে আলোচনা চালিয়ে যথাসম্ভব তথ্য সংগ্রহ করবেন।

১৯৪৬ সনের জানুয়ারি মাসে মাদ্রাজে এই প্রতিনিধিদল গান্ধীজীর সঙ্গে

মিলিত হন। ১৯৪৫ সনের ডিসেম্বরে আর ১৯৪৬ সনের জানুয়ারিতে গান্ধীজী বাংলা আর আসাম সফরে গিয়েছিলেন; সেই সফর শেষ করে দক্ষিণ-ভারত হিন্দী প্রচার সভার রজত-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে তিনি কলকাতা থেকে মাদ্রাজে রওনা হন। ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্যে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দী প্রচারের উপরে গান্ধীজী বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। তাই, বাংলা আর আসামের গ্রামাঞ্চলে দু মাস সফরের পর তিনি তখন যদিও খুবই ক্লান্ত, এবং যদিও তখন তাঁর বিশ্রাম নেওয়া উচিত ছিল, তবু কলকাতা থেকে তিনি তাঁর আশ্রম সেবাগ্রামে ফিরলেন না; তার বদলে দক্ষিণ ভারতে হিন্দী-প্রচার-আন্দোলনকে সমর্থন করবার জন্যে তিনি মাদ্রাজ যাত্রা করলেন। পারলামেনটারী প্রতিনিধিদলও, ভাইসরয় তাঁদের যে সফর-সূচী ঠিক করে দিয়েছিলেন, সেই অনুযায়ী তখন মাদ্রাজ সফর করছেন। গুইনডির লাট-প্রাসাদে তাঁরা অবস্থান করছিলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে তাঁদের ঔৎসুক্য খুবই স্বাভাবিক। তার সুযোগও জুটে গেল। একদিন সন্ধ্যায় গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁরা সাক্ষাৎ করলেন। অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হল তাঁদের মধ্যে; ভারতবর্ষের সামগ্রিক অবস্থা নিয়েই তাঁরা আলোচনা করলেন। প্রতিনিধিদলের শ্রমিক-সদস্যরা জানালেন যে, ভাইসরয় তাঁদের জন্য যে সফর-সূচী ঠিক করে দিয়েছেন, তা তাঁদের মনঃপূত নয়। তার কারণ, ভারতবর্ষের রাজনীতির যেটা সাম্প্রদায়িক দিক, এই সূচী তারই গাড্ডায় তাঁদের ঠেলে দিয়েছে। এখন এই গাড্ডা থেকে তাঁরা বেরিয়ে আসতে চান; এবং জনজীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন সব মানুষ কিংবা গোষ্ঠীর সঙ্গে স্বাধীনভাবে দেখা-সাক্ষাৎ করতে চান, ভারতবর্ষের সত্যিকারের অবস্থার আভাস যাঁরা দিতে পারবেন।

বৈঠকের শেষে অতএব শ্রমিক-দলীয় সদস্যরা গান্ধীজীকে একটি অনুরোধ জানালেন। জিজ্ঞেস করলেন, গান্ধীজী কি তাঁদের জন্য এমন একজন গাইডের ব্যবস্থা করতে পারেন, যিনি তাঁদের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে পারবেন, এবং গাড্ডা থেকে উদ্ধার করে তাজা-মনের কিছু মানুষের সঙ্গে তাঁদের দেখা-সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে পারবেন? গান্ধীজী বললেন, গাইডের ব্যবস্থা তিনি অবশ্যই করতে পারেন। অতঃপর আমাকে তিনি সেই ইংরেজ প্রতিনিধিদলের হাতে সমর্পণ করলেন। তাঁদের কাউকে আমি ইতিপূর্বে দেখিনি। কিন্তু, পূর্ব-পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও, পরস্পরের সঙ্গ আমাদের ভাল লেগেছিল; তাঁদের কেউ-কেউ আজও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নানা বিচিত্র চরিত্রের মানুষ ছিলেন সেই দলে। কেউ-কেউ ছিলেন ধীরস্থির স্বভাবের মানুষ। যথা রেজিনালড সোরেনসেন আর লর্ড চোরলে। প্রথম জীবনে সোরেনসেন ছিলেন ধর্মযাজক। লনডনের উপকণ্ঠে লেটনে এই আদর্শবাদী মানুষটি বিনম্রভাবে সমাজসেবার কাজ করতেন। এই লেটনের নির্বাচন-কেন্দ্র থেকেই ৩৩ বছর তিনি পারলামেনটের সদস্য-পদে আসীন ছিলেন। লর্ড চোরলে ছিলেন অধ্যাপক। লনডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ সারা জীবন তিনি কোমপানি ল পড়িয়েছেন। উডরো ওয়াটের মতন ছটফটে মানুষও এই দলে ছিলেন। সর্বদাই তাঁর মাথায় একটা-না-একটা দুষ্টুমি খেলত। তরুণ রক্ষণশীল সদস্য টোবি লো ছিলেন ব্যাংকার। (পরে তিনি বিরাট একজন ব্যাংক-ব্যবসায়ী হন এবং লয়েডস ব্যাংকের চেয়ারম্যান হন।) দলের মধ্যে আরেকজন তরুণ টোরি ছিলেন লর্ড মানস্টার। টোবি লো আর মানস্টার মিলে জুটি বেঁধেছিলেন। দলের তৃতীয় টোরি ছিলেন গডফ্রী নিকলসন (নিকলসন্'স জ্রাই জিনের নাম তো অনেকেই জানেন। সে-বস্তু এঁদেরই।) সর্বদা

তিনি নস্যির একটি বৃহৎ ডিবে সঙ্গে রাখতেন; এবং মাঝে-মাঝেই ডিবে খুলে বড় এক-এক টিপ নস্যি নিতেন। নস্যি না-পেলে তাঁর মেজাজ বিগড়ে যেত। জামসেদপুরে আমরা টাটা স্টীল কোমপানির আতিথ্য নিয়েছিলাম। টাটা কোমপানি থেকে আমাদের জন্যে একটি প্লেনের ব্যবস্থা করা হয়। সেই ছোট্ট প্লেনে করে আমরা যখন জামসেদপুর থেকে বিহারের কয়লাখনি-অঞ্চলের দিকে যাচ্ছি, তখন উডরো ওয়াট আর গডফ্রী নিকলসন বললেন যে, পাইলটের কাছ থেকে ভার নিয়ে তাঁরাই এ-প্লেন চালাতে পারেন। আসলে কিন্তু এর আগে জীবনে কখনও তাঁরা প্লেন চালাননি। প্লেনের পাইলট ছিলেন এক বাঙালী তরুণ। ওয়াট আর নিকলসনের আত্মবিশ্বাস দেখে তাঁর মনে হল, সত্যিই বুঝি তাঁরা দক্ষ পাইলট। প্রথমে তিনি নিকলসনের হাতে প্লেনের ভার ছেড়ে দিলেন; পরে ওয়াটের হাতে। বেশ গম্ভীর-ভাবে তাঁরা কনট্রোলে গিয়ে বসলেন। প্লেন অবশ্য খানিকক্ষণের জন্যে আপনাআপনি চলল, কিন্তু তারপরেই ঢুকল একটা এয়ার-পকেটে। ওয়াটের দুষ্টুমিতে সেদিন আমরা সকলেই প্রায় মরতে চলেছিলাম।

তবে তরুণ দু-চার জন সদস্য যতই দুষ্টুমি আর মজা করুন, পারলামেনটারী প্রতিনিধিদল সত্যিই কিছু কাজের কাজ করেছিলেন। বিভ্রাট বাধিয়েছিলেন শুধু ওয়েল্‌স নেতা অধ্যাপক রিচার্ড্‌স। (তিনি যে কিসের অধ্যাপক, কোথায় অধ্যাপনা করতেন, এবং কবে করতেন, শ্রমিক দলের সদস্যদের কেউ তা জানতেন বলে মনে হল না।) সফরশেষে নয়াদিল্লির এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলে বসলেন যে, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে 'এ মেজার অব ইনডিপেনডেন্‌স'-এর জন্য তাঁরা শ্রমিক সরকারের কাছে সুপারিশ করবেন। শুনে সাংবাদিকরা মোটেই খুশী হলেন না। তাঁরা ভাবলেন, ভারতবর্ষ যে-জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছে, সেই স্বাধীনতার 'এ মেজার' অর্থাৎ 'কিছুটা মাত্র অংশ'-এর জন্য সুপারিশ করা হবে। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। ওয়েলস অধ্যাপক 'এ মেজার' বলতে 'এ লেজিসলেটিভ মেজার' বোঝাতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর বলবার কথা ছিল এই যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য তাঁরা একটা 'আইনগত পদ্ধতি' সুপারিশ করবেন। এর কয়েক মাস বাদে গান্ধীজী আমাকে তাঁর দূত হিসেবে প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির কাছে পাঠান। আমি তখন জানতে পারি যে, প্রতিনিধিদল ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটেনে ফিরে প্রধানমন্ত্রীকে দৃঢ়ভাবে জানিয়েছিলেন, ভারত আর ব্রিটেনের সম্পর্ক তো একেবারেই নষ্ট হয়েছে, এখন ভারতের কিছুটা শুভেচ্ছাও যদি ফিরে পেতে হয়, তাহলে ব্রিটিশ সরকারকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ভারত ত্যাগ করতে হবে; ব্রিটিশ সরকার বলপ্রয়োগ করে হয়ত আরও দশ-পনর বছর ভারতে তাঁদের প্রভুত্ব বজায় রাখতে পারবেন, কিন্তু তারপরে তাঁদের ভারত ছাড়তেই হবে, লাভের মধ্যে ব্রিটেনের প্রতি ভারতবর্ষের শুভেচ্ছার শেষ বিন্দুটুকুও তখন আর অবশিষ্ট থাকবে না।

পারলামেনটারী প্রতিনিধিদলের কাছ থেকে রিপোর্ট পাবার পরে শ্রমিক সরকার ঠিক করলেন যে, ভারতবর্ষে তাঁরা একটি ক্যাবিনেট মিশন পাঠাবেন। তাতে সদস্য হিসেবে থাকবেন ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্‌স, বোর্ড অব ট্রেডের প্রেসিডেনট সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স এবং ফার্স্‌ট লর্ড অব দি অ্যাডমিরালটি মিঃ এ ভি আলেকজানডার। ১৯৪৬ সনের ২৭শে ফেবরুয়ারি তারিখে কমন্‌স সভায় লর্ড পেথিক লরেন্‌স এই মিশনের কথা ঘোষণা করলেন। অতঃপর ১৫ই মার্চ তারিখে কমন্‌স সভায় প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ভারত সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেন। সেই

বিবৃতির ভঙ্গি এবং বিষয়বস্তু—দুই-ই ছিল আশাপ্রদ। ১৯৪৬ সনের ২৩শে মার্চ তারিখে ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যরা করাচীতে এসে পেঁাছলেন। পরদিনই তাঁরা দিল্লি আসেন।

ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যত্রয়ের মধ্যে কারও সঙ্গেই ইতিপূর্বে আমার পরিচয় ছিল না। মিশনের সদস্যরা এসে পেঁাছবার পরদিনই আমি সার্ স্ট্যাফার্ড ক্রিপসের প্রাইভেট সেক্রেটারি জর্জ ব্লেকারের কাছ থেকে একটি চিঠি পাই। তাতে তিনি আমাকে জানান যে, ভারত-সচিব এবং সার্ স্ট্যাফোর্ড আমার সঙ্গে দেখা করতে চান; আমি কি ভাইসরয়-ভবনে তাঁদের দফতরে যেতে পারব? পরে আমি জানতে পারি যে, এই ব্যাপারটার মূলে মিঃ আর জি কেসির (এখন তিনি লর্ড কেসি, অসট্রেলিয়ার গভরনর জেনারেল) হাত ছিল। মিঃ কেসি যখন বাংলাদেশের গভরনর, তখন কলকাতায় তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ভারত-সচিব এবং সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে তিনি একটি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, সুধীর ঘোষ নামক একজন যুবককে তিনি চেনেন; সুধীর ঘোষ গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ মহলের মানুষ, গান্ধীজী তাঁর উপরে অসামান্য আস্থা রাখেন, সুতরাং ক্যাবিনেট মিশন যদি এই যুবকটির সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তবে তাতে তাঁদেরই লাভ হবে।

এর তিন মাস আগে গান্ধীজী আমাকে বলেছিলেন যে, দু মাসের জন্য তিনি বাংলা আর আসাম সফরে যাচ্ছেন, এই সফরে আমাকে তাঁর 'টমাস কুক' হয়ে কাজ করতে হবে। ১৯৪৫ সনের ১লা ডিসেম্বর কলকাতায় পেঁাছেই সর্বপ্রথম তিনি গভরনর কেসির সঙ্গে দেখা করেন। অতঃপর আমার প্রস্তাব অনুযায়ী উপর্যুপরি আটটি সন্ধ্যায় তিনি কেসির সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। সেই বৈঠকগুলিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ধীরেসুস্থে তাঁদের আলাপ-আলোচনা চলত। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের জন্য এবং যুদ্ধের প্রয়াসে সহযোগিতা করতে অসম্মত হওয়ার জন্য ১৯৪২ সনের অবিস্মরণীয় সেই আগস্ট মাসে ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজীকে এবং কংগ্রেস দলের সমস্ত নেতাকে কারারুদ্ধ করেছিলেন; সেই ঘটনার পর ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে গান্ধীজীর এই প্রথম সাক্ষাৎ, এই প্রথম বরফ গলতে শুরু করল। ১৯৪৫ সনের গ্রীষ্মকালে ব্রিটেনের শাসনভার হাতে নিয়ে শ্রমিক সরকার দেখতে পেলেন যে, চার্চিলের কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে ভারতের ভাইসরয় হিসেবে যে মানুষটিকে পাওয়া গিয়েছে, সেই লর্ড ওয়াভেল আসলে সরল বুদ্ধির একজন যোদ্ধা মাত্র। তাঁর সম্মানবোধ গভীর ছিল বটে, তবে তিনি বলিয়ে-কইয়ে রাজনীতিক ছিলেন না। কেসি সেক্ষেত্রে উষ্ণ হৃদয়ের মানুষ; কথাবার্তাও বলতে জানেন। তাছাড়া শুধু অসট্রেলিয়ার রাজনীতি নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কেও তিনি অভিজ্ঞ। বাংলায় আসবার আগে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিনিসটার হিসেবে তিনি কায়রোতে ছিলেন। শ্রমিক দলের নেতৃ-মহলে তাঁর কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বিশেষ করে তাঁর বন্ধুতা ছিল সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গে। নবগঠিত শ্রমিক-সরকার ভারত সম্পর্কে যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ভাবছিলেন, তার সূচনা হিসেবে গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু হবার দরকার ছিল। সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স এ-বিষয়ে চেষ্টা করবার জন্য কেসিকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। আমি ছিলাম কেসি আর গান্ধীজীর যোগসূত্র। কেসি যে সুযোগ খুঁজছিলেন, সেই সুযোগটাই আমি করে দিয়েছিলাম। গান্ধীজীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কী ধরনের, কেসি সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। উপর্যুপরি সেই যে আটটি সন্ধ্যায় কেসি আর গান্ধীজীর আলাপ-আলোচনা

হয়েছিল, আমার আর কেসির মধ্যে তা যেন বিশেষ একটি যোগসূত্র হয়ে রয়েছে। ক্রিপসের কাছে কেসিই আমার কথা বলেছিলেন। এবং প্রথম দর্শনেই ক্রিপ্স আমাকে এমনভাবে আপন করে নিলেন যেন তাঁর সঙ্গে আমার চিরকালের চেনাজানা।

যে-কাজের ভার নিয়ে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে এসেছিলেন, তাকে জট-পাকানো অবস্থায় ফেলে রেখে ১৯৪৬ সনের ২২শে জুন তারিখে তাঁরা লনডন যাত্রা করেন। মারচ, এপরিল, মে আর জুন—এই কটা মাস ভারতে ছিলেন তাঁরা। প্রথমে নয়াদিল্লিতে, তারপর সিমলায়, তারপর আবার নয়াদিল্লিতে। সেই দিনগুলি ছিল অফুরন্ত কাজে ঠাসা। গোটা এপরিল মাস এবং মে মাসেরও অর্ধেকটা ধরে ক্যাবিনেট মিশনের সদস্য তিনজন দিনের পর দিন ছোট-বড় সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে এবং সর্বরকম রাজনৈতিক বিশ্বাসের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন। তা ছাড়া গান্ধীজীর সঙ্গে তো প্রায়ই তাঁরা দেখা করতেন। দিল্লিতে তখন প্রচণ্ড গরম। যেমন বল্লভভাই প্যাটেল তেমনি স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসেরও শারীরিক শক্তি বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না। নেহাতই মানসিক শক্তি এবং বেঁচে থাকবার সুদৃঢ় ইচ্ছা ছিল তাঁদের অবলম্বন। সেটা ছিল বলেই এ-সব মানুষ অমনভাবে কাজ করতে পারতেন। শুধুই শরীর নয়, মনের উপরেও তাঁদের তখন বিপুল চাপ পড়েছে। সে-চাপ দুঃসহ। নয়াদিল্লিতে এসে পোঁছবার আগেই গান্ধীজী স্থির করেছিলেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে আমাকে তিনি তাঁর দূত হিসেবে ব্যবহার করবেন। এ-সিদ্ধান্ত তিনি কেন নিয়েছিলেন, তা একমাত্র তিনিই জানেন। দিনের পর দিন (কখনও কখনও একই দিনে কিংবা একই রাত্রে একাধিকবার) আমি তখন একদিকে গান্ধীজী এবং অন্যদিকে এই তিন ইংরেজ রাজনীতিকের মধ্যে ছুটোছুটি করেছি। দেখেছি, কীভাবে তাঁরা কাজ করেন। যেমন গান্ধীজীর, তেমনি ইংরেজ রাজনীতিক ক্রিপস আর পেথিক লরেনসের মন যেভাবে কাজ করত, তা দেখা এক বিপুল অভিজ্ঞতা। (মিশনের তৃতীয় সদস্য আলেকজানডারকে পাঠানো হয়েছিল মোটামুটি ভারসাম্য রাখবার জন্যে।) দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ভরা সে এক বিরাট মানব-নাট্য। পরে, পৃথকভাবে, তার খুঁটিনাটি বিবরণ দেওয়া যাবে।

ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে ছ সপ্তাহ ধরে ভীষণভাবে যুঝবার পরে ক্যাবিনেট মিশন দেখলেন যে, ব্রিটেনের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করবার ব্যাপারে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলি এমন কোনও ফরমুলা দিতে পারছেন না, প্রধান প্রধান দলগুলির সকলের পক্ষে যা একইসঙ্গে গ্রহণযোগ্য হয়। গান্ধীজী এবং নেহরুর নেতৃত্বে বৃহত্তম রাজনৈতিক দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বক্তব্য ছিল এই যে, ব্রিটিশ শাসকরা সত্যিই যদি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন বলে মনঃস্থির করে থাকেন, তাহলে ভারতীয় জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেসের হাতেই তাঁদের ক্ষমতা তুলে দেওয়া উচিত। অতঃপর সংখ্যালঘুদের প্রধান অংশের প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ জিন্না ও মুসলিম লীগের এবং সংখ্যালঘুদের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা কীভাবে পাওয়া যায়, কংগ্রেসই তা ঠিক করবে। পক্ষান্তরে মিশন যদি চান যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের একটা মীমাংসায় আসতে হবে, তাহলে তেমন মীমাংসা কোনওকালেই সম্ভব হবে না। গোড়া থেকেই ভারত-সচিব এ-কথা স্পষ্ট করে জানালেন যে, ভারতীয় নেতারা বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগ করবেন বলে মনঃস্থির

করেছেন; তবে সত্যিই তাঁরা এ-কথা বিশ্বাস করেন না যে, সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপরেই সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে ন' কোটি মুসলিমের ভাগ্য নির্ধারণের ভার দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের হাতে সামগ্রিক ক্ষমতা তাঁদের পক্ষে তুলে দেওয়া সম্ভব। তাঁরা বললেন, মুসলিমদের তো ঠিক সংখ্যালঘু হিসেবেও দেখা চলে না, ভারতবর্ষে তারাই দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। মিশন এ-কথা জোর দিয়ে জানালেন যে, ব্রিটিশ সরকার ভারত ছাড়বার আগেই মুসলিমরা যাতে ক্ষমতার ব্যাপারে তাদের ন্যায্য অংশ পায়, তার ব্যবস্থা করাই ব্রিটিশ সরকারের কর্তব্য।

প্রথম ছ সপ্তাহ ধরে অবিশ্রান্ত আলাপ-আলোচনা চালাবার পরে (এই সময়ের মধ্যে ক্রিপসের স্বাস্থ্য একাধিকবার ভেঙে পড়েছিল), ১৯৪৬ সনের ১৬ই মে তারিখে মিশন একটি বিবৃতি দিলেন। কীভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে, তার ভিত্তি নির্ধারণের ব্যাপারে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলি একমত হতে না-পারায়, মিশন নিজে এ-ব্যাপারে যে পরিকল্পনার পক্ষপাতী, বিবৃতিতে তা জানানো হল। ১৬ই মে তারিখের সেই রাষ্ট্রীয় দলিলের (যা এখন ভারত-ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ) সারমর্ম এই যে, (ক) ভারতবর্ষকে দু-টুকরো করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য মিঃ জিন্না যে দাবি জানিয়েছিলেন, ব্রিটিশ সরকার তা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করলেন, এবং (খ) প্রস্তাব করা হল যে, পূর্বে বাংলা ও আসাম এবং পশ্চিমে পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, সিন্ধুপ্রদেশ ও বেলুচিস্তান—মুসলিমপ্রধান এই অঞ্চল দুটিতে কার্যত মুসলমানরাই শাসনভার পাবে, এবং অবিভক্ত সার্বভৌম রাষ্ট্র ভারতবর্ষের মধ্যেই এই ব্যবস্থা চালু হবে। নয়াদিল্লিকে রাজধানী করে প্রতিষ্ঠিত হবে একটি ফেডারেল সরকার, এবং (১) প্রতিরক্ষা, (২) পররাষ্ট্র-নীতি এবং (৩) দেশের যোগাযোগ-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ-ভার সেই ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে। আপাতত দশ বছরের জন্য এই ব্যবস্থাকে মেনে নিতে হবে। সার্বভৌম রাষ্ট্র ভারতবর্ষ তারপর যেভাবে খুশি তার সংবিধান পালটে নিতে পারবে।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, পাকিস্তানের প্রবক্তা জিন্নাসাহেব এই ব্রিটিশ প্রস্তাব মেনে নিলেন। (তিনি একে আখ্যা দিয়েছিলেন 'পোকায়-কাটা পাকিস্তান'।) ব্রিটিশ প্রস্তাবের দুটি অংশ ছিল :

(১) বাংলা-আসাম, পানজাব-উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ-সিন্ধু-বেলুচিস্তান এবং অবশিষ্ট ভারত—ভারত-রাষ্ট্রের এই তিন অংশের প্রতিনিধি নিয়ে গণ-পরিষদ গড়া হবে; এই তিন অংশের প্রতিনিধিরা প্রথমে আলাদা-আলাদা-ভাবে তিন দলে মিলিত হবেন, তারপর তাঁরা সকলে একসঙ্গে মিলিত হয়ে স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধান রচনা করবেন।

(২) সংবিধান-প্রণয়নের এই পরিকল্পনা যে-সব রাজনৈতিক দল মেনে নেবেন, তাঁদের যথাসম্ভব প্রতিনিধিত্ব দিয়ে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গড়া হবে।

জিন্না-সাহেব এই ব্রিটিশ প্রস্তাব অল্প সময়ের মধ্যে মেনে নিলেন বটে, কিন্তু কংগ্রেস দল তক্ষুনি একে গ্রহণ করলেন না। পুরো চল্লিশ দিন ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে তাঁরা এটিকে পরীক্ষা করে দেখলেন, এবং ক্যাবিনেট মিশনের কাছে অসংখ্যবার এর বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠালেন। অতঃপর ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের শুধু প্রথমাংশই মেনে নিলেন তাঁরা; অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে রাজী হলেন না। রাজী না-হবার কারণ ছিল। মিঃ জিন্না দাবি করেছিলেন যে, সরকারে যে-সব

মুসলিম সদস্য থাকবেন, তাঁদের প্রত্যেকেই হবেন মুসলিম লীগের মনোনীত প্রতিনিধি। সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের সভাপতি স্বয়ং মৌলানা আজাদের পক্ষেও সরকারের সদস্য হওয়া সম্ভব নয়, কেননা তিনিও একজন মুসলমান। শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য ব্যগ্রতাবশত মিঃ জিন্নার এই দাবির কাছে মিশন নতিস্বীকার করেছিলেন।

যাই হোক, অবস্থা অতঃপর যা দাঁড়াল, তাতে ক্যাবিনেট মিশন সিদ্ধান্ত করলেন যে, তাঁদের পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশ, অর্থাৎ অন্তর্বর্তী সরকার গঠন সংক্রান্ত অংশকে কার্যকর করা সম্ভব নয়। তদুপরি, যেটুকু ক্ষমতা দিয়ে তাঁদের ভারতে পাঠানো হয়েছিল, তার শেষ সীমায় তাঁরা পোঁছে গিয়েছিলেন; ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সম্মতি ছাড়া আর এগোবার উপায় তাঁদের ছিল না। সুতরাং তাঁরা ঠিক করলেন যে, ২২শে জুন তারিখে তাঁরা লনডন যাত্রা করবেন। ব্যাপার দেখে জিন্না-সাহেব রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। ক্রিপসের উপরে দোষ চাপিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, এটা তাঁরই ফন্দি, তিনি বিশ্বাসভঙ্গ করেছেন। মিশনের প্রস্তাবটিকে জিন্নাসাহেব পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন, এবং প্রস্তাবের তিনি যে ব্যাখ্যা করেছিলেন সেই অনুযায়ী তাঁর ধারণা হয়েছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যদি এই প্রস্তাব অনুসারে সরকার গড়তে না পারে, তাহলে তাঁকেই সেক্ষেত্রে সরকার গড়তে দেওয়া হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সম্মতি ছাড়াই সংখ্যালঘু দল সরকার গড়তে পারবে, তাঁর এই বিশ্বাসটি যে অদ্ভুত, সে-কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য। যাই হোক্ মিশন যখন লনডন যাত্রা করলেন অবস্থাটা তখন এই যে, ক্যাবিনেট মিশন যে-ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবার পক্ষপাতী, সেই অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু—এই দুই দলই একটি সংবিধান রচনা করবার জন্য গণ-পরিষদ গঠনের প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন বটে, কিন্তু অন্তর্বর্তীকালের জন্য একটি সরকার গঠনের ভিত্তি তখনও রচনা করা যায়নি।

কংগ্রেসের তাবত নেতা, এমন কী স্বয়ং গান্ধীজীর সন্দেহ ও অসন্তোষ সত্ত্বেও বল্লভভাই প্যাটেলের বাস্তববুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে কংগ্রেস শেষপর্যন্ত কীভাবে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের অর্ধেকাংশ মেনে নিয়েছিল, তাও এক নাটকীয় কাহিনী। পরে তার বিবরণ দেওয়া যাবে। ক্যাবিনেট মিশনের ভারত ত্যাগের পরে মিঃ জিন্না বোমবাইয়ের এক জনসভায় একটি বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি সরাসরি বলে বসলেন যে, ক্রিপস একটি অসাধু মানুষ। বল্লভভাই প্যাটেল আর লর্ড পেথিক লরেন্স মিলে একটি ষড়যন্ত্র এঁটেছেন, এমন সন্দেহও তিনি ব্যক্ত করলেন। বক্তৃতায় সেদিন আমার কথাও উল্লেখ করলেন তিনি। এই বলে জিন্নাসাহেব আমাকে সম্মান জানালেন যে, অল্পবয়সী এই যুবকটিই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া।

নয়াদিল্লি থেকে লনডন যাত্রা করবার আগে ক্রিপস গিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে বললেন, "এই ক মাস ধরে সুধীর ক্রমাগত আপনার আর আমাদের মধ্যে ছোটাছুটি করেছে। আগে আমরা তাকে চিনতুম না। সে আপনারই লোক। তবে যেমন আপনি তেমনি আমরাও তার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি। আপনি কি তাকে মাস দুয়েকের জন্যে লনডনে পাঠাতে পারবেন? আমরা তো লনডনে ফিরে যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে ক্যাবিনেটের অন্যান্য সহকর্মীর সঙ্গে আমরা কথাবার্তা বলব, এবং আপনাদের পরবর্তী কাজ কী হবে সেটা ঠিক করব। সামনের কয়েকটা সপ্তাহের জন্য এমন কাউকে যদি আমরা হাতের কাছে পাই যে কিনা আপনার মনের খবর রাখে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে আমরা যে ভাবনাচিন্তা করব

সে-বিষয়ে আপনার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার একটা আভাস আমাদের দিতে পারে তাহলে কাজের খুবই সুবিধা হয়। আপনার আর আমাদের মধ্যে সে একটা বেসরকারী যোগসূত্রও রক্ষা করতে পারবে।" দিল্লি থেকে পুনা রওনা হবার আগে গান্ধীজী এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। পুনায় পৌঁছে তিনি আমাকে জানালেন যে, তাঁর তরুণ দূত হিসেবে এইভাবে আমাকে লনডনে পাঠাবার প্রস্তাবে তাঁর একজন প্রধান সহকর্মী আপত্তি তুলেছিলেন। রাজকুমারী অমৃত কাউর তখন গান্ধীজীর দুই মুখ্য সচিবের অন্যতমা। তিনি আমাকে জানান, আমাকে লনডনে পাঠাবার প্রস্তাবে নেহরুজী খুবই চটে গিয়েছিলেন। নেহরু বলেছিলেন যে, যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন, অনভিজ্ঞ এক তরুণকে এইভাবে গান্ধীজীর নামে কথা বলবার অধিকার দিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো খুবই ভুল হবে। সদিচ্ছা সত্ত্বেও সে ভুল করে বসতে পারে, তার ফলে একটা জটিল সমস্যার সৃষ্টি হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। নেহরুর যা-যা বলবার ছিল গান্ধীজী তা ধীরস্থিরভাবে সব শুনে গেলেন। তারপর শান্ত গলায় বললেন, "আমার ধারণা, সুধীর এ-কাজের উপযুক্ত। তাকে আমি বেশ ভালই চিনি।" বিতর্কে সেইখানেই ছেদ পড়ল বটে, কিন্তু নেহরুর সঙ্গে অনুরাগে-বিরাগে মিশ্রিত আমার যে সম্পর্ক, তাতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ে দাঁড়াল।

গান্ধীজী যে-সব মানুষকে চিনতেন, তাঁদের সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব একটা ধারণা ছিল। সেই ধারণার মূলে যুক্তি যতটা থাকত, তার চাইতে বেশী থাকত তাঁর অন্তর্দৃষ্টি। তিনি আমাকে বলে দিয়েছিলেন, আমি কার প্রতিনিধি এই প্রশ্ন যদি ওঠে, তাহলে আমি যেন বলি যে, আমি গান্ধীজীর প্রতিনিধি, কংগ্রেসের নই। লনডন-যাত্রার দিনে তাঁকে প্রণাম করে আমি যখন বিদায় নিচ্ছি, গান্ধীজী তখন বললেন, "তুমি এক বিরাট দায়িত্বভার নিয়ে যাচ্ছ। ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন।" এই কথা বলে তিনি আমার হাতে একটি পরিচয়-পত্র তুলে দিলেন। পত্রটি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলিকে লেখা। এখানে সেটি উদ্ধৃত করছি।

পুনা
৩রা জুলাই ১৯৪৬

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

স্বর্গত মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড আপনার সঙ্গে একজন ভারতীয়ের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। সে-কথা আপনার মনে আছে কিনা জানিনে। নিম্নস্বাক্ষরকারীই সেই ভারতীয়। সেদিনকার সেই সামান্য পরিচিতির উপরে নির্ভর করেই আমার তরুণ বন্ধু শ্রীসুধীর ঘোষকে আমি আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। গ্রেট ব্রিটেন আর ভারতবর্ষের মধ্যে তিনি একটি নির্ভরযোগ্য সুদৃঢ় সেতুস্বরূপ। দুটি দেশকেই তিনি গভীরভাবে ভালবাসেন। ব্রিটেনে তাঁর পরিচয়ের পরিধি সুবিস্তৃত। স্বেচ্ছায় তিনি আপনাদের ক্যাবিনেট মিশনের কাজে সাহায্য করেছিলেন। এখন তাঁদেরই কথায় তিনি ইংল্যানডে যাচ্ছেন। যে উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন, আমি তার সাফল্য কামনা করি। ভারতবর্ষের বক্তব্য তিনি যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলবেন। আমার বক্তব্যও তাঁকে বুঝিয়ে বলতে

হবে। তাঁর প্রয়াস ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করুক; ঈশ্বর তাঁর জিহ্বাগ্রে যেন ঠিকমত কথা জোগান।

আপনার দায়িত্বভার বিপুল; আশা করি তা আপনি অক্লেশে বহন করছেন।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম. কে. গান্ধী

দি রাইট অনারেব্‌ল্‌ সি আর অ্যাটলি,
প্রধানমন্ত্রী,
১০ ডাউনিং স্ট্রীট,
লনডন।

১০নং ডাউনিং স্ট্রীটে গিয়ে অ্যাটলির সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর আচরণে বেশ প্রীতি ও স্নেহের পরিচয় পাওয়া গেল। মুখে পাঁইপ, অনেকক্ষণ ধরে তিনি কথা বললেন আমার সঙ্গে। কথা বলতে-বলতেই তিনি তাঁর পারলামেনটারী প্রাইভেট সেকরেটারিকে ডেকে পাঠালেন, এবং তাঁকে বলে দিলেন যে, কমনস সভায় শ্রমিক দলের তরুণ জনাকয়েক সদস্যের সঙ্গে যেন আমার পরিচয় করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের রাজনীতি নিয়ে তো তাঁর সঙ্গে কথা হলই, ব্যক্তিগত খবরাখবরও তিনি নিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, লনডনে আমি কোথায় উঠেছি, সেখানে আরামে আছি কিনা। খাবার মোটামুটি ভাল পাচ্ছি তো? ১৯৪৬ সনের লনডন শহর বসবাসের পক্ষে খুব সুখের জায়গা ছিল না। খাদ্য আর জ্বালানির সমস্যা তখন তীব্র। সরল সৌহার্দ্যময় এই মানুষটির চরিত্র যে এতই মানবিক, এটা দেখে আমার ভাল লাগল। পরে তিনি গান্ধীজীর কাছে একটি চিঠি লিখে জানিয়ে-ছিলেন যে, র‍্যামজে ম্যাকডোনালড নন, জর্জ ল্যানসবেরি তাঁদের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। অ্যাটলির প্রাইভেট সেকরেটারি আমাকে সেই চিঠির একটি নকল দেখান। তারপর বলেন, "মূল চিঠিখানি প্রধানমন্ত্রী নিজের হাতে লিখেছেন।" সেই চিঠি এখানে তুলে দিচ্ছি :

১০ ডাউনিং স্ট্রীট,
হোয়াইটহল,
১৪ অগসট, ১৯৪৬

প্রিয় মিঃ গান্ধী,

মিঃ ঘোষকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আপনি যে চিঠি লিখেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ। তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমার বেশ ভাল লেগেছে। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের দুই দেশের মধ্যে একটি পূর্ণ মীমাংসা সম্ভব হবে।

আমার ধারণা, গতবার আপনার সঙ্গে আমার কমন্‌স সভায় দেখা হয়েছিল; জর্জ ল্যান্‌সবেরি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আশা করি আপনি কুশলে আছেন।

আন্তরিকভাবে আপনার
সি. আর. অ্যাটলি

লনডনে আমি আড়াই মাস ছিলাম। সেই সময় দিন কয়েক অন্তর-অন্তরই ক্রিপস আর পেথিক লরেনসের সংগে আমি দেখা করতাম। ভারতবর্ষের ব্যাপারে ব্রিটিশ মন্ত্রীদের মধ্যে তখন যে আত্মসমীক্ষা চলছিল, খুবই কাছ থেকে আমি তার পরিচয় তখন পেয়েছি। মুসলিমদের সম্পর্কে তাঁদের একটা বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে বলে তাঁরা মনে করতেন, এও আমি বুঝতে পারতুম। এই বিশেষ দায়িত্বের ব্যাপারটা নিয়ে ক্রিপ্‌স আর আরনেস্‌ট বেভিনের মধ্যে অবিরত দ্বন্দ্ব চলত। ব্রিটিশ সরকারের সমস্যা অবশ্য মিঃ জিন্নাই এক হিসেবে মিটিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষে ক্যাবিনেট মিশন তাঁকে সরকার গড়তে দিতে অসম্মত হওয়ায় তিনি এতই ক্রুদ্ধ হন যে, ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁর পূর্ব-সম্মতি তিনি প্রত্যাহার করেন, এবং স্থির করেন যে, মুসলিমদের দাবি আদায়ের জন্যে তিনি 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' শুরু করবেন। ১৯৪৬ সনের ১৬ই অগসটকে তিনি 'মুক্তি দিবস' বলে ঘোষণা করলেন। কলকাতার রাস্তায় সেদিন থেকে রক্তস্নান শুরু হল। সেই হিংসা আর সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ল পূর্ববঙ্গের অভ্যন্তরে। তার চরম রূপ দেখা গেল নোয়াখালি জেলায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় মুসলমানরা সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপরে যে অত্যাচার চালাল তা অবর্ণনীয়। পরে বিহারের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মুসলমানদের উপরে অনুরূপ কিংবা তার চাইতে ভয়াবহ অত্যাচার চালিয়ে হিন্দুরা প্রতিশোধ নিল। ইনডিয়া অফিসের ব্রিটিশ সরকারী কর্মচারীরা ছিলেন মিঃ জিন্নার গোঁড়া সমর্থক। কিন্তু মিঃ জিন্নার 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' আন্দোলন এবং তার রক্তাক্ত পরিণাম দেখে তাঁরাও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এর ফল অবশ্যই মিঃ জিন্নার পক্ষে ভাল হল না। শ্রমিক সরকার এই সুদৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, মিঃ জিন্না আদৌ বিশ্বাসযোগ্য মানুষ নন। ক্রিপসের এই অভিমতই তাঁরা মেনে নিলেন যে, ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের হাতে অবিলম্বে ক্ষমতা তুলে দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই; মুসলিম সম্প্রদায় ও অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সহযোগিতা কীভাবে পাওয়া যাবে, সংখ্যাগরিষ্ঠরাই সেটা ঠিক করে নেবেন; সে-ভার তাঁদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া ভাল। গান্ধীজী আর নেহরুও প্রথমাবধি এই কথাই বলে আসছিলেন।

'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-জনিত সংকট যখন খুবই তীব্র, গান্ধীজী তখন নয়াদিল্লিতে। সেই সময়ে ২৭শে অগসট তারিখে রাত চারটের সময় আমার স্ত্রী শান্তিকে তিনি ডেকে পাঠালেন। গান্ধীজী তার আগের দিন সন্ধ্যায় নেহরুজীকে নিয়ে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সে-রাত্রে তিনি ঘুমোতে পারেননি। এক টুকরো কাগজ নিয়ে তিনি আমার জন্যে একটা খবর লিখে দিলেন। খবরটা এই :

> "Gandhi says Viceroy unnerved owing Bengal tragedy. Please tell friends he should be assisted by abler and legal mind. Otherwise repetition of tragedy a certainty."
>
> ("গান্ধী বলছেন বাংলার শোকাবহ ঘটনায় ভাইসরয় বিমূঢ়।
> বন্ধুদের জানাও তাঁকে সাহায্য করবার জন্য যোগ্যতর এবং আইনজ্ঞ লোক দরকার। অন্যথায় বাংলার ঘটনার পুনরাবৃত্তি অবধারিত।")

চিরকুটটা গান্ধীজী আমার স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "এটা তাকে তার করে পাঠাও।" রাজকুমারী অমৃত কাউর বললেন যে, খবরটা একটু অস্পষ্ট হল,

গান্ধীজী যে এর দ্বারা কী বোঝাতে চান তা হয়ত আমি ধরতে পারব না। উত্তরে গান্ধীজী বললেন, "সে আমাকে ভালই বোঝে।" খবরটাকে তিনি আর বিশদ করে লিখতে রাজী হলেন না। চিরকুটটা নিয়ে আমার স্ত্রী যখন গান্ধীজীর ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন, তখন গান্ধীজী হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কাছে পয়সা-কড়ি আছে তো?" আমার স্ত্রী হেসে বললেন, "অল্প কিছু আছে।" গান্ধীজী বললেন, "ফুরিয়ে গেলে আমাকে জানিও।" এও গান্ধীজীর একটি বৈশিষ্ট্য। দারুণ সংকটকালেও খুঁটিনাটি প্রতিটি ব্যাপারে তাঁর নজর থাকত।

ক্রিপ্স তখন অসুস্থ। ডাক্তারের নির্দেশে সুইজারল্যান্ডে তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তাঁকে আমি একটি চিঠি লিখে দিলাম। তারপর ভারত-সচিব পেথিক লরেনসের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ব্যাপারটা তাঁকে বুঝিয়ে বললাম। ক্রিপসের কাছে যে চিঠি আমি লিখেছিলাম, তা এখানে তুলে দিচ্ছি :

১৮ গ্রভনর প্লেস,
লনডন এস. ডব্লু. ১,
২৮শে অগস্ট, ১৯৪৬

"প্রিয় সার্ স্ট্যাফোর্ড,

বিশ্রাম নেওয়া এখন আপনার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন; এই অবস্থায় আপনাকে উদ্বিগ্ন করবার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। তবু যে এই চিঠি লিখতে হচ্ছে, তার কারণ, গান্ধীজী এবং সর্দার প্যাটেলের কাছ থেকে যে খবর আমি পেয়েছি, তাতে জানতে পারা গেল, ভারতবর্ষের অবস্থা অতি গুরুতর। গত শনিবার সর্দার প্যাটেলের কাছ থেকে টেলিফোন-মারফত আমি একটি খবর পেয়েছি। কলকাতার ভয়াবহ ঘটনায় যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, সেইটেই তাঁর খবরের বিষয়বস্তু। অতঃপর গান্ধীজীর কাছ থেকেও আজ আমি এক তারবার্তা পেয়েছি। তারবার্তায় স্বাক্ষরকারিণী অবশ্য আমার স্ত্রী; কিন্তু বার্তাটি যে গান্ধীজীরই লেখা এবং তিনিই যে সেটি আমার স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। বার্তাটি এই :

"গান্ধী বলছেন বাংলার শোকাবহ ঘটনায় ভাইসরয় বিমূঢ়।

বন্ধুদের জানাও তাঁকে সাহায্য করবার জন্য যোগ্যতর এবং আইনজ্ঞ লোক দরকার। অন্যথায় বাংলার ঘটনার পুনরাবৃত্তি অবধারিত।"

গান্ধীজী এ-কথা 'বন্ধুদের' জানাবার জন্যে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন; তার অর্থ তিনি চান যে, আমি যেন এ-বিষয়ে ভারত-সচিব এবং আপনার সঙ্গে কথা বলি। আপনি যদি এইসময়ে এখানে থাকতেন (এমন আকাঙ্ক্ষা যে অনুচিত, তা আমি জানি), তাহলে আমি আপনার কাছে যেতে পারতুম, এবং এ নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারতুম। আশা করছি, ভারত-সচিবের সঙ্গে কাল আমার দেখা হবে। তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া সহজ নয়; আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেবার ব্যাপারে তাঁর কর্মচারীরা স্বভাবতই খুব সতর্ক। কিন্তু খবরটা পেয়ে আমি খুব দুর্ভাবনায় পড়েছি। গতকাল দিল্লিতে গান্ধীজী ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন; এই তার-বার্তাটি যে সেই সাক্ষাৎকারের পরে তিনি পাঠিয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। নিজে

বিচলিত না হলে এই তার তিনি পাঠাতেন না। এ ব্যাপারে কী যে করব, তা আমি বুঝতে পারছি না। সর্দার প্যাটেলও উদ্বিগ্নভাবে জানতে চাইছেন, সুইজারল্যান্ড থেকে কবে আপনি লন্ডনে ফিরবেন। আগে তো আপনার ৩রা সেপটেম্বর তারিখে ফেরবার কথা ছিল। এখন শুনতে পাচ্ছি, সে-তারিখে ফেরা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না, আপনি সম্ভবত ১০ই নাগাদ ফিরবেন। তাড়াতাড়ি আপনাকে ফিরতে অনুরোধ করা যে আমাদের পক্ষে স্বার্থপরতার কাজ হবে, তা আমি জানি। তবে আমার মনে হয়েছে, ভারতের অবস্থা যে দ্রুত এক সংকটের দিকে এগিয়ে চলেছে, তা আপনাকে জানিয়ে রাখাই আমার কর্তব্য।

আপনি খুব ভালই জানেন যে, বর্তমানে যে অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার মোকাবিলা করবার মতন যোগ্যতা ভাইসরয়ের আছে বলে গান্ধীজী, পণ্ডিতজী কিংবা সর্দার প্যাটেল বিশ্বাস করেন না। এ-ব্যাপারে তাঁর উপরে এঁদের একজনেরও আস্থা নেই। অবস্থা যে শুধুই অস্বস্তিকর তা নয়, বিপজ্জনকও। কলকাতায় যে নারকীয় ঘটনা ঘটেছে, তার পুনরাবৃত্তি আমরা ঘটতে দিতে পারি না। সর্দার প্যাটেল আমাকে টেলিফোনে জানালেন যে, নিহতের সংখ্যা তিন হাজার নয়, দশ হাজারেরও বেশী। আরও অনেক হাজার মানুষ আহত এবং অঙ্গহীন হয়েছে। আমাদের ইতিহাসে নারী ও শিশুর উপরে এই রকমের নৃশংসতা আর কখনও দেখা যায় নি।

সর্দার প্যাটেল আমাকে জানালেন যে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী এখনও প্রকাশ্যে লোক খেপাচ্ছেন। এই লোকটিকে আমি চিনি; জানি যে, তিনি কী ধাতু দিয়ে গড়া। নিজের মতলব হাসিল করবার জন্য যে-কোনও দুষ্কার্য করতে তাঁর দ্বিধা হয় না। মিঃ কেসি একদিন তাঁর সম্পর্কে আমাকে বলেছিলেন, "এই লোকটি যে একটি শয়তান তা আমি জানি। কিন্তু একে ধরবার উপায় আমার নেই; লোকটি অসম্ভব ধূর্ত।"

সুরাবর্দী সম্পর্কে কংগ্রেসের হয়ত আগে থাকতেই একটা খারাপ ধারণা হয়ে রয়েছে, এবং সেই কারণেই কংগ্রেসকর্মীরা হয়ত প্রকৃত ঘটনাকে অনেক বাড়িয়ে বলছেন। কিন্তু কলকাতার 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা তো ভারতে একমাত্র ব্রিটিশ পত্রিকা (কংগ্রেসকর্মীদের বন্ধুও তাঁরা নন); মিঃ জিন্নাকে সরকার গঠন করতে না-দেওয়ায় ব্রিটিশ সরকারের উপরে তাঁরা দোষারোপও করছেন। সেই স্টেটসম্যান পত্রিকাও প্রকাশ্যে সুরাবর্দীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে, তিনি জোড়া-অপরাধে অপরাধী। তিনি যে শুধুই শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন তা নয়, শান্তিভঙ্গের অপরাধের সঙ্গেও তাঁর যোগসাজশ রয়েছে। আইনকে রক্ষা করবার ভার যাঁর হাতে, তিনিই যখন আইন ভাঙেন, অবস্থা তখন দুঃসহ হয়ে দাঁড়ায়। সর্দার প্যাটেল স্বভাবতই বলছেন যে, একইসঙ্গে এই দু-তরফা ভূমিকাকে চলতে দেওয়া হবে না। প্রশাসন-ব্যবস্থাকে চালু রাখবার দায়িত্ব যারা নিয়েছে, হয় তারা সেই ব্যবস্থা চালু রাখুক এবং আইনের সম্মান রক্ষা করুক, আর নয়ত দায়িত্ব পরিহার করে তার ফল ভোগ করুক। আইনের সম্মান রাখার ইচ্ছা যদি কারও না থাকে (এবং প্রকাশ্যে সে-কথা বলতে যদি তার দ্বিধা না হয়), তবে একটিমাত্র ব্যবস্থাই তার সম্পর্কে অবলম্বন করা যেতে পারে; ঘাড়ে ধরে তাকে তখন ক্ষমতার আসন থেকে বার করে দেওয়া উচিত। কিন্তু দিল্লিতে ভাইসরয় এবং এখানকার মানুষরাও যেন ভারতের অবস্থা আদৌ বুঝে উঠতে পারছেন না। তাঁদের মনে যেন এই

ধরনের একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, রাজনৈতিক ব্যাপারে যে-সব মানুষের চিত্তে কিছু ক্ষোভ রয়েছে, তারা নরহত্যা করলেও তাতে কিছু আসে-যায় না, হত্যাও তখন একটা পবিত্র ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। হত্যাকারীকে কিছু বলতেও যেন তাঁরা রাজী নন; কেননা রাজনৈতিক বিরোধের ব্যাপারে সে যে ক্ষুব্ধ হয়ে আছে! পণ্ডিত নেহরুই ঠিক কথা বলেছেন। ভারতে যা ঘটেছে, তাকে আর এখন ঠিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলা যায় না। মানবচিত্তের যাবতীয় অনুভূতির উপরে এ এক বীভৎস বলাৎকার।

আপনি জানেন, শব্দ-প্রয়োগে গান্ধীজী খুবই সতর্ক। তিনি যখন বলছেন, ভাইসরয় বিমূঢ় এবং অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, যোগ্যতর একজন লোকের এসে ভাইসরয়কে সাহায্য করা দরকার, তখন গান্ধীজীর কথার উপরে অবশ্যই গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

যে-বিশ্রাম আপনার দরকার ছিল, সুইজারল্যানডে এই ক সপ্তাহ কাটিয়ে আশা করি তা আপনি পেয়েছেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

লেডি ক্রিপস ও আপনাকে আমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাই।

আপনাদের
সুধীর

দি রাইট অনারেব্‌ল সার্‌ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স,
৪৮ কেলটেন স্ট্রাস,
জুরিখ,
সুইজারল্যান্‌ড।

স্বাস্থ্য ভাল না-থাকা সত্ত্বেও জুরিখে তাঁর নারসিং হোম থেকে ক্রিপ্‌স আমাকে কয়েক লাইন লিখেছিলেন। তাঁর চিঠি এখানে তুলে দিচ্ছি :

৪৮ কেলটেন স্ট্রাস,
জুরিখ,
৭-৯-৪৬

"প্রিয় সুধীর,

তোমার চিঠি পেয়ে খুশী হয়েছিলাম, তবে তা পড়ে দুঃখিত হয়েছি। এ নিয়ে এখন আমি আলোচনা করব না। ১০ই তারিখে আমি লন্‌ডনে ফিরব। তখন তুমি আমার দফ্‌তরে ফোন কোরো, এবং আমি একটু অবসর পাবামাত্র এসে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। আশা করি ভারত-সচিবের সঙ্গে তুমি দেখা করতে পেরেছ এবং ভারতবর্ষের অবস্থা এখন কিছুটা ভাল।

আমাদের শুভেচ্ছা জানাই।

স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস"

মিঃ জিন্নার 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এ ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়ল। অতঃপর ব্রিটিশ সরকার এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সাংবিধানিক পরিবর্তনের জন্য আর অপেক্ষা করা উচিত হবে না; সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে শ্রীনেহরুকে অবিলম্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের আমন্ত্রণ
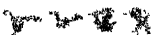
জানাতে হবে। আইনের আক্ষরিক ব্যাখ্যা যাই হোক, ভাইসরয়কে জানানো হল যে, ইংল্যান্ডে রাজার যে মর্যাদা, ভারতবর্ষে ভাইসরয়ও যেন নিজেকে সেই একই মর্যাদার অধিকারী বলে মনে করেন। শ্রীনেহরুকে বলা হবে ভাইসরয়ের শাসন-পরিষদের সহ-সভাপতি; কার্যত তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন। এই ব্যবস্থার ভিত্তিতে ১৯৪৬ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীনেহরু কংগ্রেস দলের কয়েকজন প্রতিনিধি, দুজন খৃীষ্টান এবং লীগ-বহির্ভূত দুজন মুসলিম সদস্য নিয়ে তাঁর সরকার গঠন করলেন। খৃীষ্টান সদস্য দুজন হচ্ছেন ডঃ জন মাথাই ও রাজকুমারী অমৃত কাউর, এবং মুসলিম সদস্য দুজন হচ্ছেন সার্ সাফাত আমেদ খান ও শ্রীআলি জহীর। প্রধান সংখ্যালঘু-অংশের প্রতিনিধি মুসলিম লীগ এই সরকারে যোগ দিল না।

সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, মন্ত্রিসভা বেশ সুসংবদ্ধ হয়ে উঠেছেন। মাসের পর মাস যে অনিশ্চয়তা আর শৃঙ্খলাহীনতা চলছিল, তার অবসানে সারা দেশ এবারে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। আমার মনে আছে, নূতন সরকার যেদিন কার্যভার গ্রহণ করেন, সেইদিনই আমি লনডন থেকে টেলিফোন করে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তাঁর কথার মধ্যে আশাবাদ যেন উপছে পড়ছিল। তিনি তাঁর এই নিশ্চিত বিশ্বাসের কথা জানালেন যে, আরও দিনকয়েক আলোচনা করে এবং আরও কিছু দর-কষাকষি করে মুসলিম লীগও এই সরকারে যোগ দেবে, এবং দেশে যদি একবার কার্যকর একটি প্রশাসন-ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় এবং শান্তি যদি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তা-হলে ভারতবর্ষের সর্বপ্রকার দলমতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি সংবিধান রচনা করতে কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না।

কিন্তু দিল্লিতে এমন একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী ছিলেন, ঘটনার এই নতুন গতিপ্রবাহে যাঁরা আদৌ সুখী হননি। তাঁরা হচ্ছেন উচ্চপদস্থ একদল ব্রিটিশ সরকারী কর্মচারী। ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার তাঁরাই ছিলেন 'ইস্পাত-কাঠামো'। তাঁরা দেখলেন যে, প্রকৃত ক্ষমতা কংগ্রেস দলের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। শ্রমিক সরকারের এই কাজে তাঁরা চটে গেলেন। প্রশাসন-যন্ত্রের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ছিল এ'দেরই হাতে। এ'রাই গিয়ে লর্ড ওয়াভেলের কানে নানান মন্ত্রণা দিতে লাগলেন, এবং তাঁর মনে এই ধারণার সৃষ্টি করলেন যে, সরকার থেকে মুসলিমদের বাদ দেওয়া খুবই বিপজ্জনক হবে। মুসলিমদের ঢুকিয়ে অসম্পূর্ণ সরকারকে সম্পূর্ণ করে তুলবার জন্যে লর্ড ওয়াভেলও প্রায় রোজই শ্রীনেহরুর উপর চাপ দিতে লাগলেন। ফলে ভাইসরয় এবং তাঁর কার্যত প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মধ্যে একটা অস্বাভাবিক সম্পর্কের সৃষ্টি হল। আমি তখনও লনডনে। সেইখান থেকেই ঘটনার এই গতিপ্রবাহ আমি লক্ষ্য করে যাচ্ছিলাম। ২৩শে সেপ্টেম্বর সকালে টাইম্স পত্রিকায় একটি খবর দেখে আমি বিস্ময় বোধ করলাম। খবরটা বেশ ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে, মুসলিম লীগের প্রতিনিধিরা যাতে সরকারে যোগদান করেন, তার জন্য ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল মিঃ জিন্নার সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন। খবরটা পড়ে আমি মিলব্যাংকে বোর্ড অব ট্রেডের দফতরে (আগে এটি ছিল আই-সি-আই ভবন) গিয়ে হাজির হলাম এবং জানালাম যে, আমি সার্ স্ট্যাফোর্ডের সঙ্গে দেখা করতে চাই। খুবই উত্তেজিতভাবে তাঁকে আমি বললাম যে, এ-যাবৎ তিনি যা-কিছু করেছেন, ভাইসরয়ের এই কাজের ফলে তা পণ্ড হবে। শ্রীনেহরু যদি তাঁর সঙ্গে কাজ করবার জন্য মুসলিম লীগকে অনুরোধ করতেন এবং তার ফলে যদি মুসলিম লীগ সরকারে যোগ দিত, তাহলে সেটা এক ব্যাপার হত;

সেক্ষেত্রে ভাইসরয়ের সঙ্গে আলোচনার ফলে মুসলিম লীগ যদি সরকারে যোগ দেয়, তাহলে সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার হবে। সার স্ট্যাফোর্ড কি এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছেন না? ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে, তাতে তৃতীয় পক্ষের নেতৃত্বাধীনে সম্পূর্ণ পৃথক দুটি পক্ষকে নিয়ে সরকার গঠিত হবে, এবং সেই পক্ষ দুটি সারাক্ষণ পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করবে। শুনে সার্ স্ট্যাফোর্ড বললেন, "শোন বাবা, তোমার মতই আমিও আজই সকালে পত্রিকায় এই খবর পড়লুম। সরকারীভাবে ভাইসরয়ের কাছ থেকে এখনও আমরা কোনও খবর পাইনি। পত্রিকায় খবরটা দেখেই আমি ভারত-সচিবকে ফোন করেছিলাম; তিনিও এ-বিষয়ে কিছু শোনেননি। তবে একটা বিষয় তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। লোক হিসেবে ওয়াভেল খুবই সম্মানের যোগ্য। তিনি সরল মনের একজন যোদ্ধা হতে পারেন, কিন্তু সৎ লোক। সরকার থেকে তাঁকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া আছে, নেহরুকে তিনি যেন প্রকৃত প্রধানমন্ত্রী বলে মনে করেন এবং তাঁর প্রতি সেইমত আচরণ করেন। তাঁকে এ-কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, মুসলিম লীগকে সরকারের মধ্যে নিয়ে আসবার দায়িত্ব নেহরুর। ওয়াভেল যদি লীগের সঙ্গে এই আলোচনা শুরু করে থাকেন, তাহলে তুমি ধরেই নিতে পারো যে, নেহরুর সম্মতি এবং অনুমোদন নিয়েই তিনি তা করেছেন।"

তখুনি আমি ঠিক করলুম যে, এবারে আমি ভারতে ফিরে যাব। ভারত-সচিবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসবার জন্যে আমি ইন্ডিয়া অফিসে গেলুম। সহৃদয় বৃদ্ধ মানুষটি খুবই সৌহার্দ্যময়ভাবে আমার সঙ্গে কথা বললেন। বললেন যে, আমি যা করতে চেয়েছিলুম তা করেছি। অতঃপর তিনিও স্বীকার করলেন যে, এবারে আমার গান্ধীজীর কাছে ফিরে যাওয়া উচিত। গান্ধীজীর নামে একটি চিঠি লিখে সেটি তিনি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "তাঁকে আমার ভালবাসা জানিও।" তাঁর চিঠিখানি এখানে তুলে দিচ্ছি :

ইনডিয়া অফিস,
হোয়াইটহল,
২৫শে সেপটেমবর, ১৯৪৬

একান্ত ও ব্যক্তিগত

"প্রিয় গান্ধীজী,

আপনার জন্মদিন উপলক্ষে ইতিপূর্বেই আপনার কাছে আমি শুভেচ্ছা-বাণী পাঠিয়েছি। এখন সুধীর ঘোষের কাছে শুনলাম যে, শিগগিরই সে ভারতবর্ষে ফিরবে। তাই তার মারফতে আরও-একবার আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মাঝে-মাঝেই তার সঙ্গে আমার দেখা হত, এবং তার সাক্ষাৎ পেয়ে আমি খুশী হতুম। মনে পড়ত আমাদের সেই আলাপ-আলোচনার কথা, যখন নয়াদিল্লিতে উইলিংডন ক্রেসেন্টে সে আপনার সঙ্গে আমাদের কাছে আসত। যে কাজের জন্য সে এখানে এসেছিল তার অনেক সুযোগ সে এখানে পেয়েছে, এবং সেইসব কাজ যে সে তার স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বস্ততা আর বিচক্ষণতার সঙ্গেই সম্পাদন করেছে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

আন্তরিকভাবে আপনার
পেথিক-লরেন্স"

২রা অকটোবর আমি দিল্লি পেঁছিই। বিমানবন্দর থেকে সোজা আমি গান্ধীজীর কাছে চলে গেলুম। গান্ধীজী তখন ভাঙ্গী কলোনিতে থাকতেন। সেখানে গিয়ে দেখলুম, শ্রীসোয়াইব কুরেশির সঙ্গে তিনি আলোচনায় ব্যস্ত। কুরেশি ছিলেন ভূপালের নবাবের একজন সহকর্মী। মুসলিম লীগের সরকারে যোগদানের ব্যাপার নিয়ে তখন জোর আলোচনা চলছিল, এবং তিনি এ-ব্যাপারে কংগ্রেস শিবির আর মুসলিম লীগ শিবিরের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করছিলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে যাঁরা দেখা করতে এসেছিলেন, তাঁরা বিদায় নেবার পরে আমি ভিতরে ঢুকলাম, এবং ৪৮ ঘণ্টা আগে লনডনে ক্রিপ্‌স আমাকে যা বলেছিলেন, গান্ধীজীকে তা জানালাম। বললাম যে, ক্রিপ্‌স আমাকে জানিয়েছেন, লর্ড ওয়াভেল যদি মুসলিম লীগের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে থাকেন তাহলে নেহরুর সম্মতি আর অনুমোদন নিয়েই তা তিনি করেছেন, এবং ভাইসরয়কে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে যে, এ-ব্যাপারে শ্রীনেহরুর দায়িত্বে তিনি যেন হস্তক্ষেপ না করেন। গান্ধীজী বললেন, "কথাটা শুনে আমি অবাক হচ্ছি। মুসলিম লীগের সঙ্গে এইভাবে আলোচনা শুরু করায় ভাইসরয়ের উপরে জওহরলাল খুবই রেগে গিয়েছে। তুমি এখান থেকে সোজা জওহরলালের বাড়িতে যাও, এবং আমাকে যা বলেছ তার প্রতিটি কথা তাকে গিয়ে বলো।" শ্রীনেহরু তখন ১৭ নং ইয়র্ক রোডে ছোট একটি বাড়িতে থাকতেন। চটপট আমি সেখানে চলে গেলাম। অল্প দু-এক কথায় শুভেচ্ছা জানিয়ে অতঃপর সব তাঁকে খুলে বললাম। দুদিন আগে লনডনে ক্রিপসের দফতরে তাঁর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে যে-কথাগুলি আমার বুকের মধ্যে একটা বোঝা হয়ে ছিল, এবারে সেগুলিকে বলে ফেলে হালকা হওয়া গেল। সব কথা শুনে নেহরু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে একেবারে ফেটে পড়লেন, এবং বললেন, "অসম্পূর্ণ সরকারের মধ্যে মুসলিম লীগকে নিয়ে আসবার জন্যে এই লোকটি (অর্থাৎ ভাইসরয়) আমাকে দিনের পর দিন জ্বালাতন করে মারছেন, আর জিন্নার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করবার জন্যে আমার উপর চাপ দিচ্ছেন। দিন কয়েক আগে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে করতে শেষপর্যন্ত একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে আমি বলে দিলাম যে, জিন্নার সঙ্গে আমি কথা বলব না; তবে তাঁর যদি জিন্নার সঙ্গে কথা বলবার খুব গরজ হয়ে থাকে, তবে তিনিই গিয়ে বরং জিন্নার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। বাস্, পরদিন সকালেই তিনি জিন্নার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করে দিলেন।"

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স আর লর্ড পেথিক লরেন্‌স আমাকে যা-যা বলেছিলেন, নেহরুজীকে তা বুঝিয়ে বললাম আমি। বললাম, শ্রমিক সরকার ভাইসরয়কে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে, মুসলিম লীগের সহযোগিতা লাভের দায়িত্ব পুরোপুরি নেহরুজীর, ভাইসরয় যেন এ-ব্যাপারে কোনও রকমেই হস্তক্ষেপ না করেন। নেহরুজীকে আমি বললাম, "এ যা হল, এর ফলে যে আপনার সঙ্গে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে আপনার সঙ্গে কাজ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলিম লীগ সরকারে যোগ দিচ্ছে না, বরং তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে আপনার বিরুদ্ধে কাজ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা সরকারে যোগ দিচ্ছে, তা কি আপনি বুঝতে পারছেন না? ভাইসরয়কে আপনি জানিয়ে দেননি কেন যে, আপনার দায়িত্বে তিনি যদি হস্তক্ষেপ করেন তাহলে আপনি পদত্যাগ করবেন? লন্ডনের সরকার এ-ব্যাপারে আপনাকেই সমর্থন করতেন।" নেহরুজী বললেন, "এ-ব্যাপারে আমি যা জানি, তা

তোমাকে বলেছি।" তাঁর মুখের চেহারা দেখে মনে হোলো তিনি পরিশ্রান্ত, উদ্বিগ্ন, অসুখী। ইতিহাসের যে তরঙ্গ-তত্ত্ব (ওয়েভ থিয়োরি) বিশ্লেষণ করেছেন অধ্যাপক টয়েনবি, সেইদিন থেকেই তাতে আমি আস্থা হারিয়েছি। তার কারণ, আমি বুঝতে পেরেছি যে, জাতির ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব যাঁদের হাতে, ইতিহাসের সন্ধিলগ্নে তাঁদের ধৈর্যচ্যুতিই ইতিহাসের গতিপথ পালটে দিতে পারে।

সরলচিত্ত ভাইসরয় সত্যিই ভেবেছিলেন যে, নবাবজাদা লিয়াকত আলি খানের নেতৃত্বে মুসলিমরা যে মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন, এ তাঁর একটা বিরাট কৃতিত্ব। ব্রিটিশ আমলারাই আসলে তাঁকে ভুল বুঝিয়েছিলেন। এইভাবে তাঁরা নেহরুর উপরে টেক্কা দিলেন। মন্ত্রিসভার দপ্তর আবার নতুন করে বাঁটা হল। অর্থ, বাণিজ্য ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দপ্তর তুলে দেওয়া হল মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের হাতে। কিন্তু সরকারে যোগ দিয়েই তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, কংগ্রেস-নেতারাই সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করে মুসলিম-স্বার্থের প্রচণ্ড ক্ষতিসাধন করছিলেন, এবং ক্ষমতার এই অপব্যবহার রোধ করে মুসলিমদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেই তাঁরা এবারে সরকারে যোগ দিলেন। সরকারও তৎক্ষণাৎ দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। সরকারী কর্মচারীরাও যে-যার আনুগত্য অনুযায়ী পক্ষাবলম্বন করলেন। মুসলিম সরকারী কর্মচারীরা যোগ দিলেন মুসলিম মন্ত্রীদের পক্ষে; হিন্দু ও অন্যান্য কর্মচারীরা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সমর্থন করতে লাগলেন। সশস্ত্র বাহিনীর উপরেও এই বিভক্ত আনুগত্যের চাপ পড়ল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হিংসা ও শৃঙ্খলাহীনতা তখন ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে। বাংলা আর বিহারে তখন প্রবল অশান্তি; অথচ নয়াদিল্লিতে কোনও কার্যকর সরকারের অস্তিত্ব নেই। গান্ধীজীও তখন দিল্লি থেকে দূরে। প্রথমে তিনি বাংলায় গিয়েছিলেন; সেখান থেকে এলেন বিহারে। ভাইয়ের রক্তে ভাইয়ের হাত সেখানে রঞ্জিত। দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গান্ধীজীর সহকর্মীদের তখন দিল্লিতে বসে গুরুত্বপূর্ণ নানা সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। গান্ধীজী যাতে দিল্লি যান, নেহরু আর বল্লভভাই প্যাটেল তার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন; কিন্তু গান্ধীজী তবু দিল্লি যেতে রাজী হলেন না। ১৯৪৬ সনের অকটোবর, নভেমবর আর ডিসেমবর মাস নেহরু আর তাঁর মন্ত্রিসভার অন্যান্য সহকর্মীদের পক্ষে হতাশা তিক্ততা আর বেদনার মাস। সেই বিপুল হতাশা আর তিক্ততাবশতই কংগ্রেস দলের নেতারা এই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হলেন যে, এর চেয়ে বরং দেশবিভাগও শ্রেয়। সেক্ষেত্রে দেশের অন্তত একটা অংশে শান্তিতে থাকা যাবে, এবং পারলামেন্টারী গণতন্ত্র গঠন আর দারিদ্র্য দূরীকরণের যে-কাজে তাঁরা হাত দিয়েছেন, নির্বিঘ্নে সে-কাজ চালিয়ে যাওয়া যাবে। অখণ্ড ভারতবর্ষে একসঙ্গে থাকার নামে চিরকাল শুধুই ঘৃণা আর অবিশ্বাসের মধ্যে বসবাস করার চাইতে বরং সেও ভাল। ভারত বিভাগের এই হল ইতিহাস।

সেপটেমবরের শেষে লন্ডন থেকে ভারতে ফিরে আমার কাজ হল পত্র লেখা। কংগ্রেস-নেতাদের বক্তব্য কী, বেসরকারীভাবে আমি তা তখন সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স আর লর্ড পেথিক-লরেন্সকে বুঝিয়ে বলতুম, এবং ভারতবর্ষের ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁদের ওয়াকিবহাল রাখতুম। লন্ডন থেকে যেদিন আমি দেশে রওনা হই, সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স সেদিন আমাকে বলেছিলেন, "কী ঘটছে তা যাতে আমরা ঠিকমত বুঝতে পারি, তার জন্য সবিস্তারে সব লিখো।" সার স্ট্যাফোর্ড আর লর্ড পেথিক

লরেনসের কাছে সেই সময়ে আমি দীর্ঘ অনেকগুলি চিঠি লিখেছিলাম। তার একটি নমুনা এখানে তুলে দিচ্ছি। আমার চিঠি পেয়ে তাঁদের মনে যে প্রতিক্রিয়া হত, তার নমুনাও এখানে দেওয়া হল।

২৪ বারাখাম্বা রোড, নয়াদিল্লি,
১০ই নভেমবর, ১৯৪৬

"প্রিয় লর্ড পেথিক লরেন্স,

এই চিঠির সঙ্গে, বিহারের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে, একটি নোট্* আপনাকে পাঠাচ্ছি। দেখেই বুঝতে পারবেন যে, এই নোট্‌টি এমন একজন মানুষের লেখা, নির্ভুল তথ্য এবং অপক্ষপাত বিচারের উপরে যিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। এ-বিষয়ে অন্যান্য মহল থেকে আপনি নিশ্চয়ই মস্ত-মস্ত রিপোরট পেয়েছেন; কিন্তু বিহারে কী ঘটেছিল, এই নোট্ পড়লে তা আপনি আরও ভাল বুঝতে পারবেন।

খবরের কাগজের একটি ক্লিপিংও এইসঙ্গে পাঠালাম। পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলের অবস্থা সম্পর্কে মুরিয়েল লেস্টারের বিবরণ এতে পাবেন; সেখানে এখনও সন্ত্রাসের অবসান হয়নি। মুরিয়েল লেস্টারের এই বিবরণ সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন। তাঁকে আপনি চেনেন। বিবরণটি অবশ্য বিস্তারিত নয়; তবে, দেশের সেই অঞ্চলে আতঙ্কিত নরনারী যে আজ কী-ধরনের জীবন যাপন করছে, এর থেকেই তার আভাস আপনি পাবেন।

আজকের স্টেটসম্যান পত্রিকার একটি ক্লিপিংও এইসঙ্গে পাঠাচ্ছি। তাতে দেখবেন, মিঃ জিন্না ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তাঁর দলের পাঁচজনকে সরকারে যোগ দিতে দিয়েছেন বটে, কিন্তু যে-ভিত্তিতে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পরিকল্পনা করেন, মুসলিম লীগ তাতে কদাচ সম্মতি দেয়নি। আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন যে, এই ঘোষণা অস্বস্তিজনক। এর থেকে একটা কথা স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছে। সেটা এই যে, সরকারে যোগ দেবার আগে মুসলিম লীগের পক্ষে যে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা মেনে নেওয়া দরকার, ভাইসরয়ের তা মনে হয়নি।

যে কোনও উপায়ে মুসলিম লীগকে খুশী করবার জন্য এই যে অস্বাভাবিক ব্যগ্রতা, ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এ এক অভিশাপ। মুসলিম লীগকে এইভাবে সরকারের মধ্যে নিয়ে আসাটা কোনও কৃতিত্বের ব্যাপার নয়, এবং এই পথে আমরা কোথাও পৌঁছতে পারব না। জটিল অবস্থা এর ফলে আরও অনেক জটিল হয়ে দাঁড়ায়।

কংগ্রেস আর লীগের মধ্যে কবে মীমাংসা হবে, তার জন্যে বসে না থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের (এবং আর যাঁরা তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী) হাতে সরকার গঠনের দায়িত্ব তুলে দেবার যুক্তিসঙ্গত ও সাহসিক সিদ্ধান্ত নেবার পরে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা স্বভাবতই চাইছিলেন যে, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মুসলিমদের যেন সরকারে নিয়ে আসা হয়। তা আমি জানি। এ-ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের ব্যগ্রতার হেতু অবশ্যই বুঝতে পারা যায়। সৎ ও বিবেচক প্রতিটি ভারতবাসীই তা বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে কোনও প্রকারের বোঝাপড়া ছাড়াই দুটি দলকে

* নোট্‌টি শ্রীনেহরুর লেখা

যদি সরকারের মধ্যে এনে হাজির করা হয়, তো শুধু তার দ্বারা তো কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয় না। গান্ধীজী এ-কথা বারবার আপনাদের বলেছেন। কিন্তু আপনাদের যাঁরা প্রতিনিধি, তাঁরা সম্ভবত মনে করেন যে, তাঁরাই আরও ভাল বোঝেন। তাঁদের কাজ দেখে তো সেইরকমই আমার মনে হয়।

যুদ্ধের সময়ে আপৎকালীন অবস্থায় আপনাদের দেশেও তো একটি কোয়ালিশন সরকার গড়া হয়েছিল। সেক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই ছিল সেই সরকারের ভিত্তি, সরকারের নেতৃত্ব ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই সংখ্যালঘু দলগুলিকে তাঁর সরকারে যোগ দিতে রাজী করিয়েছিলেন। তারা যাতে যোগ দেয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে সেজন্য অবশ্য তাদের কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে হয়েছিল। কিন্তু কথা এই যে, কোয়ালিশন সরকারের গঠনের সেইটেই হচ্ছে একমাত্র পথ। আপনারা যখন ঠিক করলেন যে, কংগ্রেসের হাতে সরকার গঠনের ভার ছেড়ে দেওয়া হবে এবং মুসলিম লীগকে কীভাবে সরকারের মধ্যে আনা যায় কংগ্রেসই তা স্থির করবে, তখন ভারতবর্ষেও নিশ্চয় সেই একই উপায়ে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হবে—এইটেই আপনারা চেয়েছিলেন। তাই না? বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ ভাইসরয়ের তত্ত্বাবধানে আমাদের প্রতিনিধিরা এ-কাজ সম্পন্ন করবেন, এইটেই ছিল প্রত্যাশিত। তা হোক, তাতেও কিছু ক্ষতি ছিল না। শুধু, ব্রিটিশ ভাইসরয় যদি আরও উদার হতেন, এবং স্বেচ্ছায় সানন্দে নিজেকে একটু দূরে সরিয়ে রাখতেন, তাহলেই আমাদের প্রতিনিধিরা এ-কাজ সম্পন্ন করতে পারতেন।

আমার ইংরেজ বন্ধুদের অনেকেই এ সম্পর্কে কী বলবেন, তা আমি জানি। তাঁরা বলবেন, মুসলিমদের সরকারে নিয়ে আসবার জন্যে কংগ্রেস-নেতারা তো বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন না, তাই ভাইসরয়ের পক্ষে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। স্বীকার করছি, কংগ্রেসের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছেন, লীগপন্থীদের সরকারে নিয়ে আসার ব্যাপারে যাঁরা খুব বেশী উৎসাহী ছিলেন না; লীগপন্থীদের ছাড়াই কাজ চালিয়ে যেতে তাঁদের আপত্তি নেই। কিন্তু পণ্ডিত নেহরুকে তো আপনি ভালই চেনেন। সরকারে যোগ দেবার জন্য মুসলিমদের রাজী করাতে পণ্ডিত নেহরুর চাইতেও ভাইসরয় বেশী ব্যগ্র, এও কি সম্ভব? ভাইসরয়ের চাইতে পণ্ডিত নেহরু নিশ্চয় এ-কথা আরও ভাল জানতেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের বিপজ্জনক পর্যায়ে দেশে যদি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয়, এবং যে-আবহাওয়ায় ৪০ কোটি নরনারীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি সংবিধান রচনা করা সম্ভব সেই আবহাওয়া যদি সৃষ্টি করতে হয়, তবে মুসলিমদের তাঁর সরকারে যোগ দিতে রাজী করানোই হচ্ছে তার একমাত্র পথ। আমার এ-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে, আপনাদের প্রতিনিধিরা যদি বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেন এবং পণ্ডিত নেহরুর হাতে ব্যাপারটা ছেড়ে দিতেন, তাহলে সরকারের চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ না-করেও পণ্ডিত নেহরু মুসলিমদের সহযোগিতা পাবার ব্যবস্থা করতে পারতেন।

তাড়াহুড়ো করে যে-ব্যবস্থা করা হল, স্পষ্টতই সেটা টিকবে না। অবস্থা শিগগিরই চরমে এসে পৌঁছবে, এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে, মুসলিমদের কাছে যতটা অপ্রিয় হলে চলত, তার চাইতেও আপনাদের বেশী অপ্রিয় হবার দরকার হচ্ছে। কেননা, যে-ভিত্তিতে ক্যাবিনেট মিশন অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন, তা-ই যদি তাঁরা মেনে না নিয়ে থাকেন, তাহলে মন্ত্রিসভার লীগ-সদস্যদের বরখাস্ত করা ছাড়া আর গত্যন্তর কী?

কাগজে খবর দেখলাম যে, মিঃ চারচিল ভারত সম্পর্কে বিতর্কের জন্য দাবি তুলবেন, এবং এ-দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় শৃঙ্খলাহীনতা ও রক্তপাত সম্পর্কে তিনি এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছেন। ইংল্যান্ডের লোকদের ধারণা সম্ভবত এই যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে তুলে দিয়েছেন, এবং এই যে এখানে হাঙ্গামার সূত্রপাত হল, এর দ্বারাই প্রমাণিত হবে, দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা অন্তর্বর্তী সরকারের আছে কিনা। এই রক্তপাতের জন্য মিঃ চারচিল কিংবা ব্রিটিশ জাতি যতটা চিন্তিত, পণ্ডিত নেহরুর চিন্তা তার চাইতে অনেক বেশী। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এর প্রতিকার কী? এই হাঙ্গামা যে কীভাবে শুরু হয়েছিল, তা আপনি জানেন। মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম' দিবসে, অর্থাৎ ১৬ই অগস্ট তারিখে, কলকাতায় এর সূত্রপাত। রাজনৈতিক মতলব হাসিল করবার জন্য এই হাঙ্গামা বাধানো হয়েছিল। কলকাতার রাস্তায়-রাস্তায় প্রকাশ্য দিবালোকে মুসলমানরা নরহত্যা, অগ্নিসংযোগ আর লুণ্ঠনের তাণ্ডব চালাতে থাকে। প্রাদেশিক সরকারের হয় এই হাঙ্গামা থামাবার ইচ্ছা ছিল না, আর নয়তো যোগ্যতা ছিল না। জনসাধারণ দেখল, তাদের রক্ষা করবার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো অর্থহীন। অতঃপর তারা স্বহস্তে আইন তুলে নিল। মুসলমানের হাতে নিহত প্রতিটি হিন্দুর জন্য হিন্দুরা অন্তত দুটি করে মুসলমানের প্রাণ নিতে লাগল। তারাও ঠিক মুসলমানদের মতই বর্বর হয়ে উঠল। অতঃপর, কিছুদিনের জন্য, এই হাঙ্গামার বিরতি ঘটে। তখনই গান্ধীজী আপনাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, মুসলিম লীগের প্রতি আচরণে ভাইসরয় যদি না দৃঢ়তার পরিচয় দেন, তাহলে এই শোকাবহ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে বাধ্য। আপনার সহকর্মীদের মন তখন আমি যেটুকু বুঝেছিলাম, তাতে আমার ধারণা হয়েছিল, মুসলমানদের অসন্তোষই এই হাঙ্গামার জন্য দায়ী বলে আপনারা বিশ্বাস করেন, এবং আপনারা মনে করেন যে, এই অবস্থার প্রতিকার করতে হলে চেষ্টা করে মুসলিমদের অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে, এবং তা যদি একবার নিয়ে আসা যায়, তাহলেই আর হাঙ্গামাও বাধবে না, নরহত্যাও হবে না। মুসলিমদের সরকারে নিয়ে আসবার জন্য যে-রকম ব্যগ্র চেষ্টা চালানো হয়েছিল, আমার ধারণা এইটেই তার হেতু। মুসলিমদের সরকারে নিয়ে আসা হল, কিন্তু দাঙ্গা থামল না। দাঙ্গা এবারে বাংলাদেশের এমন এক জায়গায় বাধানো হল, যেখানে অল্প-কিছু হিন্দুর বসবাস। গোটা ব্যাপারটাই সুপরিকল্পিত। আইন-ভঙ্গকারীরা এইসব সুদূর গ্রামে কীভাবে রেশনের পেট্রোল আর স্টিরাপ পাম্প নিয়ে এসেছিল, মুরিয়েল লেসটার তার উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিবরণীতেই তা আপনি দেখতে পাবেন। সংখ্যাল্প হিন্দুদের ওপর নৃশংস নিগ্রহ চালানো হল; হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ, নারীহরণ আর বলাৎকার অবাধে চলতে লাগল। গভরনর এর যে রিপোরট দিলেন, কমন্স সভায় মিঃ হেনডারসন তা পড়ে শুনিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটাকে এই রিপোরটে ছোট করে দেখানো হয়েছে, মানুষ এতে বিভ্রান্ত হবে। গভরনর যে তাঁর রিপোরটে ইচ্ছে করে এই ব্যাপারটাকে ছোট করে দেখিয়েছেন, তা নয়; প্রকৃত ঘটনার মাত্র ওইটুকুই তাঁকে জানতে দেওয়া হয়েছিল। মুসলিমদের এই অত্যাচারের ফলে, বিশেষ করে তাদের হাতে হিন্দুনারীদের সম্মাননাশে, সারা দেশ জুড়ে হিন্দু-চেতনায় আগুন জ্বলে ওঠে, এবং পার্শ্ববর্তী প্রদেশ বিহারে—মুসলমানরা যেখানে সংখ্যায় অনেক কম—হিন্দুরা খুবই কাপুরুষোচিতভাবে বহু মুসলমান পুরুষ, নারী ও

শিশুকে হত্যা করে। পূর্ববঙ্গে যত হিন্দু নিহত হয়েছে, বিহারে নিহত মুসলমানদের সংখ্যা সম্ভবত তার চতুর্গুণ। এদেশের হিন্দুরা এখন জেনে গিয়েছে যে, মুসলমানরা যদি একজন হিন্দুকে হত্যা করে, তবে তার বদলা হিসাবে চারজন মুসলমানের প্রাণ নিতে হবে; তারপর হাঙ্গামা থামবে। 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' যে লাভজনক নয়, মুসলিমরা তা যতদিন না বুঝতে পারছে, উভয়পক্ষের এই হানাহানিরও ততদিন বিরাম নেই।

অন্তর্বর্তী সরকারের অবস্থা সত্যিই অদ্ভুত। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষরা মনে করেন যে, যা নিয়ে এত হৈ-চৈ, সেই সরকার কোনও কাজের নন। এ-কথা মনে করবার কারণ এই যে, এই সরকার তাঁদের রক্ষা করতে পারছেন না। তার উপরে আবার বিদেশে রয়েছেন জেনারেল স্মাট্‌সের মতন লোকেরা। ভারতবর্ষে আমাদের এই দুঃখদায়ক অবস্থার তাঁরা পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছেন। জেনারেল স্মাট্‌স রাষ্ট্রপুঞ্জে বক্তৃতা দিলেন। তাতে বললেন যে, ভারতবাসীরা তো দক্ষিণ আফ্রিকার জাতি-বৈষম্য নিয়ে দুনিয়ার কাছে অভিযোগ করে, অথচ তাদের নিজেদের দেশেই তারা জাতিগত বিদ্বেষবশত হাজারে হাজারে নরহত্যা করছে। কথাটা যে নেহরু আর তাঁর সহকর্মীদের খোঁচা দিয়ে বলা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। টাইম্‌স পত্রিকায় লেখা হয়েছে, ভারতবর্ষে এমন একটি সরকার চাই শাসন চালাতে যাঁরা ভয় পান না। প্রতিটি ভারতবাসীও এ-দেশে তেমন সরকারই চান। আসলে কিন্তু ব্রিটিশ ভাইসরয়ই শাসন করতে ভয় পান; অথচ শাসনের দায়িত্ব তাঁরই হাতে। মুসলিম লীগের প্রতি বর্তমানে (সম্ভবত আপনাদের অনুমোদন নিয়ে) যে-নীতি তিনি অনুসরণ করছেন, তাতেই তাঁর ভয়ের প্রমাণ মেলে। অবস্থা এখন এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে যে, আপনাদের মনঃস্থির করতে হবে। হয় আপনারা ভাইসরয়কে এই নির্দেশ দিন যে, তাঁকে শক্ত হাতে শাসন করতে হবে; আর নয়তো শাসনের দায়িত্ব নেহরুর হাতে ছেড়ে দিন। দুদিকই আপনারা বজায় রাখবেন, তা হয় না। যে দুটি পথের কথা বলা হয়েছে, তার একটি আপনাদের নিতে হবে। যেটাই নিন, মুসলিম লীগ সম্পর্কে আপনাদের নীতি আমূল পালটাবার দরকার হবে। এখনকার এই তোষণ-নীতি আর চলবে না।

বিহারে হিন্দুরা খুবই নির্মমভাবে মুসলমানদের হত্যা করেছে; ভারতবর্ষের অবস্থা এখন আবার অল্প কিছুদিনের জন্য শান্ত থাকবে বলে মনে হয়। হিসাব-নিকাশের এই সময়। মিঃ জিন্না নিয়ম মেনে খেলতে রাজী আছেন কিনা, স্পষ্ট ভাষায় সেটা কি তাঁকে জিজ্ঞেস করা যায় না? ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ই মে তারিখের ঘোষণাকে তিনি সামগ্রিকভাবে মেনে নিচ্ছেন, এমন কথা যদি তিনি বলতে রাজী না হন, তাহলে কি তাঁকে জানিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় যে, সেক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের মূল ভিত্তিকে যাঁরা মেনে নিয়েছেন, তাঁদের হাতে, অর্থাৎ কংগ্রেস ও ক্ষুদ্রতর সংখ্যালঘু-গোষ্ঠীগুলির হাতেই শাসন-ভার ছেড়ে দেওয়া হবে? তবে কথা এই যে, মিঃ জিন্না অতি চালাক লোক। তিনি আপনাদের বলবেন যে, ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাব তিনি মেনে নিচ্ছেন না, তবে গণ-পরিষদে তিনি যোগ দেবেন। ব্রিটিশ সরকারের দুর্বলতা কোথায়, মিঃ জিন্না তা জানেন। তিনি জানেন, ব্রিটিশ সরকার দুনিয়াকে এই কথাটা বলতে খুবই ব্যগ্র যে, ভারতবর্ষে তাঁরা একটা বিরাট সাফল্য অর্জন করেছেন। (পররাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে একমাত্র এ ছাড়া তো সম্ভবত আর কিছু তাঁদের গর্ব করে বলবার নেই।) আর তারই জন্য, যেমন করেই হোক,

সরকারের মধ্যে মুসলিমদের তাঁদের রাখতেই হবে। মিঃ জিন্নাও ব্রিটিশ সরকারের এই দুর্বলতার সুযোগ পুরো মাত্রায় নেবেন। পক্ষান্তরে যদি দৃঢ়তা দেখানো যায় এবং মিঃ জিন্নাকে যদি বলে দেওয়া যায় যে তাঁকে নিয়ম মেনে খেলতে হবে, তা নইলে সরকারের দায়িত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হবে এবং ক্ষমতা-হস্তান্তরকালে দেশে শৃঙ্খলা বজায় রাখবার ও দেশের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি সংবিধান রচনা করবার দায়িত্বও সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতেই ন্যস্ত হবে, তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন যে, ভারতবর্ষে আপনাদের সাফল্যটা খাঁটি হবে,—যে সাফল্যের কথা গর্ব করে আপনারা বিশ্ববাসীকে শোনাচ্ছেন, তার মত সেটা নকল হবে না।

এই চিঠির ভাষা যদি রূঢ় হয়ে থাকে, তবে তার জন্য আমি দুঃখিত। এখানকার অবস্থা এখন এতই গুরুতর যে, নিজেকে যিনি ব্রিটেনের একজন প্রকৃত বন্ধু বলে মনে করেন, খানিকটা রূঢ়তার ঝুঁকি তাঁকে নিতেই হবে। এই সংকটকালে ব্রিটিশ সরকার কী ভূমিকা নেবেন, তারই উপরে নির্ভর করছে ব্রিটিশ জাতি ও ভারত-বাসীদের ভবিষ্যৎ-সম্পর্ক। তারই দ্বারা সেই সম্পর্কের রূপ নির্ধারিত হবে। অবস্থার ক্রমেই অবনতি হচ্ছে; এই অবনতি যদি চলতেই থাকে, তাহলে আমার আশঙ্কা, চিরকালের জন্যই এ-দেশ ব্রিটেন সম্পর্কে বিমুখ হবে।

শ্রদ্ধাসহ

আন্তরিকভাবে আপনার
সুধীর ঘোষ”

দি রাইট অনারেবল্
লর্ড পেথিক-লরেন্স
সেক্রেটারি অব স্টেট,
ইনডিয়া অফিস,
হোয়াইটহল,
লন্ডন, এস. ডব্লু. ১।

৬ নভেমবর, ১৯৪৬

গোপনীয়

*বিহারের সাম্প্রতিক ঘটনা ও হাঙ্গামা সম্পর্কে নোট

বিহারের কৃষকরা পরিশ্রমী, কিন্তু খুবই দরিদ্র। লোক হিসেবে তারা ভাল। সহজেই তাদের চালানো যায়; মাঝে-মাঝে তারা বিপথেও চালিত হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের তুলনায় এদের মধ্যে একযোগে কাজ করবার ঝোঁক একটু বেশী। জনতা-মনস্তত্ত্ব এদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। একবার যদি একটা চিন্তা এদের মাথায় ঢোকে, তাহলে তার জন্যে এরা সবাই মিলে কাজ করতে প্রস্তুত।

* ১৯৪৬ সনের ৬ই নবেম্বর তারিখে পাটনার সার্কিট হাউসে শ্রীনেহরু কর্তৃক লিখিত।

এই কারণেই বিহারে প্রবল কৃষক-আন্দোলন, এবং মাঝে-মাঝে—সাম্প্রদায়িক অথবা অন্য রকমের—আলোড়ন সম্ভব হয়েছে।

২। ১৯১৭ সনে মহাত্মা গান্ধী চম্পারণ জেলায় ভূম্যধিকারীদের (প্রধানত ইউরোপীয়) বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করেন। সেই আন্দোলন সফল হয়। তখন থেকেই এই প্রদেশের জনসাধারণ তাঁকে প্রবলভাবে ভালবাসে। বিহারের কৃষক-সমাজ তখন থেকেই কংগ্রেসেরও অনুরাগী হয়েছে, এবং কংগ্রেসও এখানে তখন থেকেই কৃষকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে লড়াই করছে। বিহার কংগ্রেসের মধ্যেই অতঃপর শক্তিশালী একটি বামপন্থী দলের সৃষ্টি হয়। কৃষকদের দাবি-দাওয়ার সমর্থনে তাঁরা আরও এগিয়ে যান। কংগ্রেস সম্প্রতি সমগ্র ভারত জুড়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, জমিদারী প্রথার অবসান ঘটাতে হবে। এ-ব্যাপারে এই বামপন্থী পরিকল্পনাই এইভাবে কংগ্রেসের ঘোষিত পরিকল্পনা হয়ে উঠল। পরিকল্পনাকে কার্যকর করবার ব্যাপারে অবশ্য বেশ-কিছুটা দেরি হয়েছে। ফলে অসন্তোষ দেখা দেয়। বাঁটাই প্রথা নিয়ে কৃষকদের মধ্যে সম্প্রতি বিশেষ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এই বাঁটাই প্রথার ভিত্তিতেই ফসলের ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে থাকে। আইন অনুযায়ী যেখানে ফসল কাটবার অধিকার নেই, সেখানেও কেউ-কেউ প্রজাদের বলেছেন যে, তারা যেন ফসল কেটে নেয়। অন্য দিকে জমিদারী প্রথার অবসান ঘটাবার জন্য বিহার সরকার যে প্রস্তাব করেছেন, জমিদাররা তাতে খুবই অসন্তুষ্ট।

৩। অতীতেও বিহারে কয়েকবার বড় রকমের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটেছে। ১৯১৭ সনে সাহাবাদে যে হাঙ্গামা ঘটে, তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু কৃষকরা সেখানে বহুসংখ্যক মুসলমানকে হত্যা করে। বিহারের হিন্দু আর মুসলমান সম্প্রদায় অবশ্য সাধারণত শান্তিতেই বসবাস করেছে; সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সাধারণত ওঠে না। বিরোধ সচরাচর প্রজা আর জমিদারের মধ্যে বাধে। তবে গো-হত্যার মতন ব্যাপারকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় প্রশ্নও উঠে পড়ে; এই ধরনের ঘটনা নিয়ে অতীতে হিন্দুদের মধ্যে নানা সময়ে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। ১৯১৯ সন থেকে কংগ্রেস যে আন্দোলন চালায় সাম্প্রদায়িক সম্পর্কও তার ফলে অনেক উন্নত হয়েছিল। বিহারের যাঁরা বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা তাঁদের মধ্যে অনেকেই মুসলিম আর হিন্দুদের কাছে সমান শ্রদ্ধা ভালবাসা পেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলিম লীগ যে নতুন নীতি নিয়েছে, তার ফলে, গত কয়েক বছরে এই অবস্থার ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে থাকে। ১৯১৭ সনের সাধারণ নির্বাচনেও মুসলিম লীগ দারুণভাবে পর্যুদস্ত হয়। স্বতন্ত্র বহু মুসলিম প্রার্থী নির্বাচনে জয়লাভ করেন। লীগ থেকে এ'রা দূরে থাকতেন, এবং কংগ্রেসের সঙ্গে এ'দের সম্পর্ক মোটামুটি সৌহার্দ্যময় ছিল। কংগ্রেস থেকে যে-সব মুসলিম প্রার্থী দাঁড় করানো হয়েছিল, তাঁদের মধ্যেও অনেকে নির্বাচনে জিতে আইনসভার সদস্য হয়েছিলেন।

৪। মুসলিম লীগ পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠাকে তাদের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করায়, এবং তারও আগে থেকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, ও সাধারণভাবে সমগ্র হিন্দু-সমাজের বিরুদ্ধে, ঘৃণা ও তিক্ত বিদ্বেষের ভিত্তিতে আন্দোলন শুরু করায় তার প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে, এবং হিন্দু মহাসভা ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলি তার সুযোগ নেয়। রাজনৈতিক প্রশ্ন যেখানে জড়িত, সেখানে এর ফলে হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেসের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হয়নি ঠিকই; তবে এর ফলে সাম্প্রদায়িক

সংকীর্ণতার সৃষ্টি হয়, এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এই বলে কংগ্রেসকে সমালোচনা করবার একটা ঝোঁক দেখা দেয় যে, মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস হিন্দু স্বার্থকে সমর্থন করছে না।

৫। গত সাত বছরে সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক ঘটনা যে-পথে এগিয়েছে, তাতে, মুসলিম লীগের ভূমিকা সম্পর্কে হিন্দুরা ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠতে থাকে। তারা মনে করে যে, এই ভূমিকা দেশাত্মবোধের বিরোধী ও অত্যন্তই আপত্তিজনক। লীগের নেতারা হিন্দুদের এবং কংগ্রেসকেও জঘন্যভাবে আক্রমণ করে যে-সব কথা বলেন, জোর করে পাকিস্তান আদায় করবার যে-সব হুমকি দেন, কাগজে তার বিবরণ প্রতিনিয়ত হিন্দুদের চোখে পড়তে থাকে। মুসলিমদের একটি স্লোগান হচ্ছে "পাকিস্তান খুনসে লেঙ্গে" (অর্থাৎ "রক্ত বইয়ে দিয়ে আমরা পাকিস্তান আদায় করব")। হিন্দু ধর্ম ও আচার সম্পর্কেও আক্রমণ ও গালিগালাজ চলতে থাকে। এই যে বিদ্বেষ, বিহারের হিন্দুদের মধ্যেও খানিকটা পরিমাণে এর জের গিয়ে পৌঁছয়। বিহারের কৃষকরা কোনওদিনই বিশেষ ঠান্ডা মেজাজের মানুষ নয়; লীগের কাজের প্রতিক্রিয়ায় তারা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কংগ্রেসের নেতারাই তখন তাদের শান্ত করে রাখেন। মুসলিম-সমাজেও মোমিন অর্থাৎ তন্তুবায়-শ্রেণীর মধ্যে বেশ প্রবল একটা আন্দোলন দেখা দেয়। লীগের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে তারা অসম্মত হয়। পক্ষান্তরে কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক মোটামুটি সৌহার্দ্যময় থেকেছে, এবং কংগ্রেসের সঙ্গে তারা সহযোগিতাও করেছে। পাকিস্তান-দাবিকে তারা অগ্রাহ্য করে।

৬। ১৯৪২ সনে ও তার পরে যে-সব ঘটনা ঘটে, যেমন অন্যত্র, তেমনি বিহারেও হিন্দু-সমাজ তার ফলে এ-বিষয়ে নিঃসংশয় হয় যে, মুসলিম লীগ যে শুধুই দেশের স্বাধীনতার পথে বিঘ্নস্বরূপ তা নয়, জনসাধারণের সামাজিক দাবি আদায়ের পথেও তারা একটি প্রবল বিঘ্ন। মুসলিম লীগের নেতাদের মধ্যে অনেকেই সামাজিক বিচারে ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল; তাঁরা জমিদার-শ্রেণীর লোক। মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে যে-ভাবে বিদ্বেষবুদ্ধি জাগিয়ে তোলা হয়, তার ফলে হিন্দুদের মধ্যেও অনুরূপ মনোভাব দেখা দেয়।

৭। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর এই হচ্ছে পটভূমিকা। কলকাতায় ১৬ই অগস্ট ও তার পরবর্তী দিনগুলির হাঙ্গামায় বহুসংখ্যক বিহারীও নিহত হয়েছিল। কলকাতায় তাদের বহু দোকানও লুণ্ঠিত হয়। সেখানকার বহু গোয়ালা, ঠেলাওয়ালা, রিকশওয়ালা আর দরোয়ান বিহারী। তা ছাড়া বিহার প্রদেশেও বহু বাঙালী হিন্দুর বসবাস। কলকাতার হত্যাকাণ্ডের সংবাদ বিহারীদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কলকাতায় যে-সব বিহারী নিহত হয়েছিল, তাদের আত্মীয়স্বজন বিহারে ফিরে আসে। সেইসঙ্গে আসে অন্যান্য শরণার্থীর দল। বিহারের গ্রামাঞ্চলে তারা ছড়িয়ে পড়ে, এবং কলকাতায় যা ঘটেছিল তার কাহিনীও এইভাবে ছড়িয়ে যায়। ফলে গোটা প্রদেশ জুড়ে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়।

৮। এর পরে আসতে থাকে নোয়াখালি আর পূর্ববঙ্গের খবর। বহুসংখ্যক মানুষকে জোর করে সেখানে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে, হিন্দু নারীদের হরণ করা হয়েছে এবং তাদের উপর বলাৎকার চলেছে,—এই ধরনের সংবাদের কথাই এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এমন খবর পেলে যে-কোনও জায়গায় যে-কোনও সমাজের পক্ষেই ক্রোধে জ্বলে ওঠা স্বাভাবিক। আর তা ছাড়া, নারীহরণ, বলাৎকার ও

বলপূর্বক ধর্মান্তরের অত্যাচারটা বিশেষ করে হিন্দুদের বিরুদ্ধেই বেশী মাত্রায় ঘটতে দেখা যায়। বিহারীরা এইসব খবর পেয়ে দারুণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বিহারের বাঙালীদের মধ্যে উত্তেজনাটা আরও বেশী পরিমাণে দেখা দেয়।

৯। নোয়াখালির ঘটনার পরে হিন্দুমহাসভা ও অন্যান্য হিন্দু-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কিছু প্রচার চলেছিল। পূর্ববঙ্গের ঘটনার প্রতিশোধ নেবার জন্য ডাক দিয়ে বেনামা অনেক ইস্তাহারও ছড়ানো হয়। জনসাধারণের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করে বলা হয় যে, পূর্ববঙ্গের ঘটনায় তাঁরা হস্তক্ষেপ করেননি, অত্যাচারকে তাঁরা সেখানে অবাধে চলতে দিয়েছেন। নোয়াখালিতে যখন ভয়ংকর সব ঘটনা ঘটছে, আপাতদৃষ্টিতে অন্তর্বর্তী সরকার তখনও নিষ্ক্রিয় থাকায় বিশেষ করে তাঁরা সমালোচনার লক্ষ্য হয়ে ওঠেন। এই রকমের একটা ধারণার সৃষ্টি হয় যে, বাংলার প্রাদেশিক সরকার যখন সুপরিকল্পিতভাবে হয় হত্যা করে কিংবা বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করে পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুধর্মকে উচ্ছেদ করবার নীতি অনুসরণ করে চলছেন, তখন পূর্ববঙ্গের অসহায় হিন্দুদের কেউই সাহায্য করছেন না। কথাটা কতখানি সত্য, এই প্রসঙ্গে তা অবান্তর। জরুরী সত্যটা এই যে, এই রকমের একটা প্রবল ধারণা গড়ে ওঠে, এবং অন্তর্বর্তী সরকার সম্পর্কে লোকের আস্থাও তার ফলে অনেকখানি কমে যায়।

ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে, বিশেষ করে বিহারে, ব্যাপকভাবে একটা ইস্তাহার ছড়ানো হয়েছিল। জানানো হয়েছিল, এটা মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে প্রচারিত। তাতে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দুদের হত্যা করবার, তাদের সম্পত্তি লুঠ করবার, এবং খুবই আপত্তিকর আরও নানা কাজ করবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এ-ইস্তাহার কারা প্রচার করেছিল, তা কেউ জানে না। তবে মনে হয়, এটা বাংলা থেকে এসেছিল। মুসলিম লীগের তরফ থেকে কারও পক্ষে এই ধরনের ইস্তাহার প্রচার করা সম্ভব বলে মনে হয় না। তা সে যাই হোক, হিন্দুদের মধ্যে যারা এ-ইস্তাহার পড়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করল যে, এটা মুসলিম লীগের দ্বারাই প্রচারিত হয়েছে। বিশ্বাস করবার হেতু এই যে, মুসলিম লীগের পক্ষে কোনও কিছুই অসাধ্য বলে তারা মনে করে না। তাদের মনে এই অনড় ধারণার সৃষ্টি হল যে, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নীতি অনুযায়ী জঘন্যতম সব কাজ করবার জন্য মুসলিম লীগ বদ্ধপরিকর। তাদের মনে হল, যে-কোনও প্রকারেই হোক, মুসলিম লীগের এই কাজে বাধা দিতে হবে; বিপক্ষ যখন বিবেকবুদ্ধিকে এতটাই গলা টিপে মারতে চলেছে, হিন্দুদেরও তখন আর বিবেকবুদ্ধিকে আঁকড়ে থাকা চলে না।

১০। সেপটেম্বরের শেষ দিকে পাটনা জেলার বেনিবাদে একটি ঘটনা ঘটে। জনৈক মুসলমান জমিদার সম্পর্কে সেখানকার হিন্দুদের এই সন্দেহ হয় যে, কলকাতা থেকে একটি হিন্দু মেয়েকে সে হরণ করে এনেছে। দাবি তোলা হয়, মেয়েটিকে বার করে আনা হোক। মুসলমান জমিদারটি শেষ পর্যন্ত এই প্রতিশ্রুতিও দেয় যে, দু-তিন দিন বাদে মেয়েটিকে সে ফিরিয়ে দেবে। নির্দিষ্ট দিনে জনতা তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু তারা দেখতে পায় যে, মেয়েটিকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং জমিদারটিও উধাও। জনতাকে অতঃপর আর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। বাড়িটির উপরে আক্রমণ চালিয়ে তারা সেটিকে ধ্বংস করে, এবং কয়েকজন মুসলিম নিহত হয়। এই ব্যাপারে বহুসংখ্যক মানুষকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।

তারা এখন বিচারাধীন। স্থানীয় সরকার এই জমিদারের পরিবারকে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন। মোট চল্লিশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। কুড়ি হাজার টাকা দান হিসেবে, এবং কুড়ি হাজার টাকা ঋণ হিসাবে। ঋণের টাকার জন্য সুদ দিতে হবে না।

১১। পঁচিশে অকটোবর কি তার কাছাকাছি কোনও তারিখে বিহারের বিভিন্ন স্থানে 'নোয়াখালি দিবস' পালিত হয়। পাটনায় এই উপলক্ষে এক বিরাট মিছিল বার করা হয়েছিল এবং বিরাট এক সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে যে-সব ধ্বনি সেখানে তোলা হয় ও যেসব বক্তৃতা দেওয়া হয়, তা মোটামুটি সংযত ছিল। তবে, নোয়াখালির বদ্‌লা নিতে হবে, এই মর্মে অনেক ধ্বনিও সেখানে শোনা গিয়েছে। কয়েকটি বক্তৃতাও সংযত ছিল না।

১২। ছাব্বিশে অকটোবর কি তার কাছাকাছি কোনও তারিখে ছাপরা শহরে ও ছাপরা জেলার নানাস্থানে হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। দু-এক দিনের মধ্যেই অবশ্য অবস্থা আয়ত্তে আসে, এবং তারপরে আর বিশেষ কিছু ঘটেনি। ছাপরায় হাঙ্গামা বাধার পর অল্পকালের মধ্যেই ভাগলপুর শহরেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যায়। কিন্তু তা দ্রুত দমন করা হয়।

১৩। প্রকৃত হাঙ্গামা বাধে পাটনা জেলায়, ৩১শে অকটোবর তারিখে। ব্যাপারটা অতর্কিতে ঘটে, এবং বেশ বড় আকারে দেখা দেয়। দিনে-দিনে এর পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে। জেলার একটা বৃহৎ অংশকে গ্রাস করে অতঃপর এই হাঙ্গামা গয়া আর মুঙ্গের জেলাতেও ছড়িয়ে যায়। এক হিসাবে একে জন-অভ্যুত্থানও বলা চলে। উপদ্রুত কয়েকটি অঞ্চলে কৃষকরা এই হাঙ্গামায় ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল। মুসলমানদের বাড়িঘর তারা আক্রমণ করে, সেগুলি পুড়িয়ে দেয়। মুসলমানদের তারা হত্যা করে, এবং তাদের সম্পত্তি লুঠ করে।

১৪। নোয়াখালি-সংক্রান্ত নানা খবর শুনে মানুষ উত্তেজিত হয়ে ওঠে; তা ছাড়া মুসলিম লীগের নীতি ও হুমকির ফলেও মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ছিল। এই যে হাঙ্গামায় এত লোক ক্ষতিগ্রস্ত হল, এইটেই স্পষ্টত তার কারণ। তা ছাড়া ছোটখাট এমন আরও-কিছু কারণও থাকতে পারে, শৃঙ্খলাহীনতার যা দ্রুত প্রসার ঘটিয়েছে। কৃষক-সমাজের মধ্যে কিছুদিন যাবৎ যে আন্দোলন চলছিল, বৃহত্তর অশান্তিতে তা আরও ইন্ধন জোগায়। মুসলিম জমিদারদের হিন্দু প্রজারা জমিদারদের উপরে আক্রমণ চালাবার অছিলা সহজেই খুঁজে পেয়েছে। একটা বিচিত্র ব্যাপার এই যে, জনাকয়েক হিন্দু জমিদার, এবং হয়ত কিছু মুসলমান জমিদারও এই হাঙ্গামার সুযোগ নিয়ে কৃষি-সংক্রান্ত দাবি-দাওয়া থেকে কৃষকদের নজর অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিল। তা ছাড়া প্রাদেশিক সরকার জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত করবার নীতি গ্রহণ করায় সরকারের বিরুদ্ধে জমিদার শ্রেণীর মনে সাধারণভাবেই একটা অসন্তোষ ছিল। চোরাকারবারীরাও—বিশেষ করে ছাপরায়—সরকারের উপরে মোটেই খুশী ছিল না। তা ছাড়া স্থানীয় এবং ছোটখাটো কিছু অসন্তোষও ছিল। বৃহত্তর অসন্তোষের হেতু যদিও স্থানীয় সরকার ছিলেন না, তবু এই সমস্ত কিছুই সেই অসন্তোষে ইন্ধন জুগিয়েছে।

১৫। স্থানীয় নেতারা ছাড়া, এই ব্যাপক হাঙ্গামার অন্য কোনও নেতা ছিল কিনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রমাণ মিলেছে যে, সাইকেলে করে কিছু লোক ঘুরে বেড়িয়েছিল এবং আরও নানাভাবে ইস্তাহার ছড়িয়েছিল। সেইসব ইস্তাহারে

জনসাধারণকে উত্তেজিত করা হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে এই হাঙ্গামা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা দিয়েছিল, এবং মূলত কৃষকরাই এতে যোগ দিয়েছিল। বিখ্যাত কেউ এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে অন্তত এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। প্রাথমিক পর্যায়ে অবশ্য কয়েকটি অঞ্চলে এমন কিছু লোক হাঙ্গামায় নেতৃত্ব করেছিল, সমাজবিরোধী লোক বলে যারা পরিচিত। এটাও জানা গেছে যে, কুখ্যাত কয়েকটি ডাকাত এতে অংশ নিচ্ছে। তাদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার করা হয়েছে। এই ডাকাতদের কাছে কিছু আগ্নেয়াস্ত্র আছে বলে মনে হয়। সেগুলি তারা ব্যবহার করছে। কৃষকদের অবশ্য লাঠিই ছিল প্রধান হাতিয়ার। ইতস্তত তারা বর্শা এবং অন্যান্য সব বিচিত্র অস্ত্রও ব্যবহার করেছে।

১৬। মূল হাঙ্গামার যখন সূত্রপাত হয়, সরকার তখন ঘটনাস্থল থেকে দূরে, রাঁচীতে। বিহারের গভর্নর সেই সময়ে বোমবাই যান। এই কারণে, এবং এই রকমের আরও নানা কারণে, হাঙ্গামা দমনের ব্যাপারে ঈষৎ বিলম্ব ঘটে। কী যে ঘটতে চলেছে, সেটাও সম্ভবত তম্মুহূর্তেই বুঝে উঠতে পারা যায়নি। ছাপরায় হাঙ্গামা বাধবার পরে বিহারের প্রধানমন্ত্রী দ্রুত সেখানে যান। ৩১শে অকক্টোবর তারিখে তিনি সৈন্য দেবার জন্য ভারপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারকে অনুরোধ করেন। তবে ব্রিগেডিয়ারের ধারণা হয় যে, সৈন্য তলব করবার মতন অবস্থা তখনও দেখা দেয়নি। তিনি বলেন যে, ১৯৪২ সনে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, এখনকার অবস্থা তার চাইতে অনেক ভাল। যাই হোক, সৈন্যদের দিয়ে কিছু-কিছু টহল দেওয়ানো হতে থাকে। তবে তাতেও বিশেষ কাজ হয়নি। তার কারণ, হাঙ্গামা ঘটত ভিতর-এলাকায়; আর সৈন্যরা সেক্ষেত্রে শুধুই বড়রাস্তায় টহল দিয়ে ফিরত; তার বেশী তারা যেত না।

১৭। প্রথম দু-তিন দিন মনে হয়েছিল যে, সরকার যত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারতেন, তা করেননি। তার একটা কারণ এই যে, মন্ত্রীদের মধ্যে অনেকেই এবং গভরনরও তখন ঘটনাস্থল থেকে দূরে ছিলেন। আর-একটা কারণ : হাঙ্গামা অতর্কিতে বেধেছিল। তা ছাড়া স্থায়ী অফিসারদের আত্মসন্তোষও কিছু পরিমাণে এই বিলম্বের জন্য দায়ী বলে মনে হয়। কথাটা অমূলক হতে পারে, তবে নানা মহলের লোক এ-কথা জোর দিয়ে বলছে যে, প্রাদেশিক সরকার এই যে একটা নতুন ঝঞ্ঝাটে পড়লেন, স্থায়ী অফিসারদের মধ্যে কেউ-কেউ এতে খুব অসুখী হননি। বস্তুত নানান রকমের বিচিত্র লোক চাইছিল যে, এমন কিছু ঘটুক, মন্ত্রিসভার সুনাম যাতে ক্ষুণ্ণ হয়। হাঙ্গামার প্রথম দুদিনের মধ্যে যে-সব ঘটনা ঘটে, তার একটির উল্লেখ করছি। কোনও এক রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এক হিন্দু জনতার হাতে পঁচিশ তিরিশ জন মুসলমানের মৃত্যু ঘটে। তারপর দুদিন ধরে সেই মৃতদেহগুলি প্ল্যাটফর্মের উপরেই পড়ে ছিল; কেউ সেগুলি সরাবার পর্যন্ত ব্যবস্থা করেনি। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনে যে প্রশাসন যন্ত্রের দেরি হয়েছিল, এটা তারই একটা দৃষ্টান্ত। অতঃপর একজন মন্ত্রী সেখানে যান, স্বচক্ষে সেই লাশগুলি দেখেন, এবং তখন তাঁর জরুরী নির্দেশে সেগুলি সরিয়ে দেওয়া হয়।

১৮। ৩১শে অকটোবর থেকে পাটনা জেলায় এবং মুঙ্গের জেলারও একাংশে হাঙ্গামা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম বস্তিগুলি ভস্মীভূত ও লুণ্ঠিত হয়, এবং বহুসংখ্যক মুসলমানের মৃত্যু ঘটে। ব্যাপারটা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি অমানবিক। এমন কী, নারী ও শিশুরাও রেহাই পায়নি। দলে-দলে শরণার্থী এসে পাটনায়, এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যে-সব সাহায্য-শিবির খুলেছিলেন

সেখানে আশ্রয় নেয়। শরণার্থীদের অনেকের অবস্থাই শোকাবহ; স্বভাবতই তারা তখন ভয়তাড়িত, উত্তেজিত। আপনাপন এলাকায় যে কী ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তারা তার খবর রটাত। অনিবার্যভাবেই তাদের বর্ণনা হত অতিরঞ্জিত। চেনাশোনা লোকদের মধ্যে যারা তাদের সঙ্গে আসেনি, ধরেই নেওয়া হত যে, তারা মারা গিয়েছে। কিন্তু অতিরঞ্জনের কথা বাদ দিয়েও বলতে হবে যে, যা ঘটেছে তা ভয়াবহ। অনেক ঘটনাই নিদারুণ নিষ্ঠুরতা ও নির্বুদ্ধিতার দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

১৯। অন্যদিকে, অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে, হিন্দু গ্রামবাসীরা মুসলমানদের আশ্রয় দিয়েছে। একটি ক্ষেত্রে এক গ্রামের হিন্দুরা তাদের মুসলিম প্রতিবেশীদের রক্ষা করবার জন্য এক জায়গায় এনে জড় করে, এবং এক হিন্দু জনতা তাদের আক্রমণ করতে এলে প্রবলভাবে বাধা দেয়। হিন্দুরা এক্ষেত্রে তাদের মুসলিম প্রতিবেশীদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। তা ছাড়া মুসলিমদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে বহু হিন্দু সাহায্য করেছে; হিন্দুরা তাদের মালপত্র বয়ে দেয় এবং অন্যান্য সর্বপ্রকারে তাদের সাহায্য করে। বহু মুসলমানের কথা থেকে জানা গেল যে, তারা তাদের গ্রামের হিন্দুদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে।

২০। কয়েকটি ক্ষেত্রে জানা যাচ্ছে যে, হিন্দু জনতা আক্রমণ করতে এলে মুসলিমরা আগ্নেয়াস্ত্র অথবা অন্যান্য হাতিয়ার ব্যবহার করে তাদের ঠেকিয়েছিল। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, আক্রমণকারীরা সংখ্যায় ছিল অনেক বেশী, বিশেষ বাধা তারা পায়নি।

২১। অবস্থাটা ছিল খুবই অসুবিধাজনক। হাঙ্গামা যে-সব জায়গায় ঘটেছে, সেগুলি খুব দূরবর্তী নয় বটে, কিন্তু সহজে সেখানে পৌঁছবার উপায় ছিল না। অধিকাংশ ঘটনাই ঘটেছে গ্রামাঞ্চলে; সেখানে যাবার রাস্তাঘাট খুবই খারাপ; তা ছাড়া বন্যার জলে সে-সব জায়গা পরিবেষ্টিত। সশস্ত্র-পুলিস বাহিনী কিংবা টহলরত সৈন্যদল জনতার দিকে এগোবামাত্র দেখা গিয়েছে যে, জনতা দ্রুত ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, এবং মাঠের মধ্যে অদৃশ্য হয়। সাধারণত এই রকমই ঘটেছে। পুলিস কিংবা সৈন্যদলকে সাধারণত তারা প্রতিরোধ করেনি। কয়েকটি ক্ষেত্রে অবশ্য বাধা পাওয়া গিয়েছিল। বাধা যারা দিয়েছে, তারা খাঁটি পেশাদার ডাকাত; তাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল।

২২। পাটনা এবং অন্যান্য নানা অঞ্চলে মুসলিম শরণার্থীদের আশ্রয় দেবার জন্য বড়-বড় শরণার্থী শিবির গড়ে তোলা হয়েছে। তাদের খাওয়ানো, পরানো এবং নতুন হামলার হাত থেকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা একটা জরুরী সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, এ-ব্যাপারে যে কাজ হয়েছে, তা সন্তোষজনক। একটি ক্ষেত্রে অবশ্য পুলিস-পাহারায় একদল শরণার্থীদের নিয়ে আসবার সময় জনতা তাদের উপর আক্রমণ চালায়। তাদের মধ্যে অধিকাংশই নিহত হয়; কয়েকজন পুলিসও এক্ষেত্রে মারা গিয়েছে।

২৩। তেসরা নভেমবর অপরাহ্নে জওহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল, মিঃ লিয়াকত আলি ও মিঃ আবদুর রব নিশতার পাটনায় আসেন। যে-খবর তাঁরা পান, তা এতই গুরুতর যে, স্থির হয়, তাঁদের মধ্যে দুজন—নেহরু আর নিশতার—পাটনাতেই থেকে যাবেন। ৪ঠা নভেমবর এই দুজন কয়েকটি উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করতে যান। বিহারের একজন মন্ত্রী এবং স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা পাটনা জেলার বিহারশরিফে যান। পথের মধ্যে নানা স্থানে তাঁরা

থামেন এবং জনসভায় বক্তৃতা দেন। মুঙ্গের জেলার জাহানাবাদেও তাঁরা গিয়েছিলেন; এবং এক্ষেত্রেও পথিমধ্যে বৃহৎ কয়েকটি জনসভায় তাঁরা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। মুঙ্গের জেলার যে-সব জায়গায় বড়-রকমের হাঙ্গামা হয়েছিল, পরদিন, অর্থাৎ ৫ই নভেমবর তারিখে, তাঁরা সেইসব জায়গা পরিদর্শন করেন। ভাগলপুরেও তাঁরা গিয়েছিলেন। ৪ঠা নভেমবর তারিখে পাটনা শহরেও এক জনসভায় তাঁরা বক্তৃতা দেন।

২৪। উপদ্রুত অঞ্চলগুলিতে যে-সব সভার আয়োজন করা হয়, বহুসংখ্যক কৃষক তাতে যোগ দিয়েছিল। স্পষ্টতই এতে কাজ হয়েছে। নেহরু খুব জোরালো ভাষায় বক্তৃতা দেন, এবং প্রতিটি সভার শেষে শ্রোতৃবর্গকে হাত উঁচু করে এই সংকল্প উচ্চারণ করতে বলেন যে, তারা কখনও অন্যায় কাজ করবে না। পরে খবর পাওয়া যায়, যে-সব কৃষক এইভাবে সংকল্প নিয়েছে, সংকল্পের গুরুত্বও তারা বুঝেছে; বস্তুত অন্যদের কাছে তারা বলে যে, একবার যখন তারা অন্যায় করবে না বলে কথা দিয়েছে, তখন সেই কথার মর্যাদা তাদের রাখতেই হবে। অবস্থার কিছুটা উন্নতি অতএব দেখা যাচ্ছে, তবে অনেক অঞ্চলেই বিশেষ করে দূর গ্রামাঞ্চলে এ-সব সভার প্রভাব গিয়ে পেঁছয়নি। তা ছাড়া, হাঙ্গামাবাজ এমন কিছু লোকও আছে, এমনিতেও যাদের উপরে এ-সব সভার প্রভাব পড়বার কথা নয়। ফলে, কয়েকটি অঞ্চলে কিছুটা উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু তার কাছাকাছি অন্যান্য অঞ্চলে হাঙ্গামার প্রসার ঘটেছে।

২৫। ৫ই নভেমবর সন্ধ্যায় এক বৈঠকের অনুষ্ঠান হয়। ঈসটার্ন কমান্ডের জি-ও-সি জেনারেল বুচার ও জেনারেল একিন সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিহারের প্রধানমন্ত্রী, অন্যতম মন্ত্রী অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ, নেহরু, রাজেন্দ্র প্রসাদ ও আবদুর নিশতারের নাম করতে পারি। তা ছাড়া বিহার সরকারের চীফ সেক্রেটারি এবং পুলিসের আই-জিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নানা ব্যবস্থার কথা এই বৈঠকে আলোচিত হয়। জেনারল বুচার জানান, কীভাবে তিনি তাঁর সৈন্যদের কাজে লাগাবার পক্ষপাতী। তিনি বলেন, আরও সৈন্য আসছে; এবং উপদ্রুত এলাকাগুলি তিনি পরিদর্শন করবেন। তা ছাড়া সেখানকার প্রতিটি জায়গায় তিনি টহল দিতে চান। ইতিপূর্বে প্রাদেশিক সরকারের হাতে যে বাহিনী ছিল, তাদের সংখ্যা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় কম, সরকার তাই অবস্থাকে আয়ত্তে আনতে খুবই বেগ পাচ্ছিলেন। সরকারী বাহিনীর সঙ্গে জনতার কোনও সংঘর্ষই বস্তুত হয়নি। জনতার মোকাবিলাই তারা করতে পারত না। আগে থাকতেই জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত, এবং অন্যত্র গিয়ে উপদ্রব শুরু করত। এই সর্বপ্রথম কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনের একটা উপায় হল। যাদের রক্ষা করা দরকার তাদের রক্ষা করবার জন্য, এবং উপদ্রব-সৃষ্টিকারীদের দমন করবার জন্য উপদ্রুত প্রতিটি অঞ্চলে এবারে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাবে। বৈঠকে আরও কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় এবং সেগুলি গৃহীত হয়। কয়েকটি গ্রামাঞ্চলে ১৪৪ ধারা ও সান্ধ্য আইন জারী তার অন্যতম। তা-ছাড়া ঠিক হল যে, টহল দেবার জন্য কিছু প্রাইভেট গাড়িও রিকুইজিশন করা হবে।

২৬। প্রচুর মুসলিম শরণার্থী পাটনায় এসে উপস্থিত হওয়ায় পাটনার হিন্দুরা কিছুটা ভয় পেয়ে যায়। তাদের আশঙ্কা হয়, মুসলমানরা সেখানে হয়ত আক্রমণ চালাবে। সারা রাত ধরে নানান রকমের স্লোগান শোনা যেত। দুই পক্ষেরই উত্তেজনা ও আতঙ্ক তাতে বৃদ্ধি পায়। উত্তেজনার ভাব এখনও রয়েছে। তবে পাটনায় কিছু

ঘটেনি। কিছু ঘটবে বলেও মনে হয় না। কয়েকটি শহরেই এই রকমের একটা পারস্পরিক ভয়ের ভাব বিদ্যমান রয়েছে।

২৭। ৬ই সকালে নেহরু আর রাজেন্দ্র প্রসাদ দানাপুরে আর পাটনার দুই সুবৃহৎ জনসভায় বক্তৃতা দেন। পাটনার সভায় কৃপালনীও বক্তৃতা দিয়েছেন। এই সভানুষ্ঠানের ফলে প্রচুর সুফল মিলেছে, এবং উত্তেজনার ভাবটাও কিছু-পরিমাণে কেটেছে। বিকেলে বিমানযোগে বুচারের সঙ্গে নেহরু গয়ায় যান। সেখানে এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হয়। পরে স্থানীয় অফিসারদের সঙ্গে এক বৈঠকের ব্যবস্থাও হয়েছিল। অনুগ্রহনারায়ণ সিংহও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গয়া জেলার উপদ্রুত অঞ্চলগুলিতে কার্যকর কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, বৈঠকে তা ঠিক হয়।

২৮। ৬ই অপরাহ্নে রাজেন্দ্র প্রসাদ আর কৃপালনী বিহারশরিফে গিয়েছেন। ৭ই তাঁদের ফিরবার কথা। কথা আছে, ৭ই সকালে নেহরু, বুচার আর অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ বিমানযোগে আকাশ থেকে উপদ্রুত অঞ্চলগুলি দেখবেন। মাটি থেকে বিমান বেশী উঁচুতে উড়বে না।

২৯। গত দু-তিন দিনে সৈন্য ও পুলিশ-বাহিনী মারমুখী হিন্দু জনতার উপরে উপর্যুপরি গুলি চালিয়েছে। হতাহতের সংখ্যা এখনও জানা যায়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হতাহতের সংখ্যা বেশী নয়। তবে একটি ক্ষেত্রে নাকি শ খানেক মানুষ হতাহত হয়েছে।

৩০। ৬ই নভেমবর রাত্রে এখন অবস্থা মোটামুটি এই দাঁড়িয়েছে যে, বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি জায়গায় হাঙ্গামা লেগে আছে বটে, তবে সব মিলিয়ে পরিবেশ আবার ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে। সরকারী সহায়তায় দূর গ্রামাঞ্চল থেকে পাটনা এবং অন্যান্য জায়গার শরণার্থী-শিবিরে বহু মুসলিম শরণার্থীকে নিয়ে আসা হচ্ছে। তাদের খাদ্য ও কম্বল দেওয়া হচ্ছে। তা ছাড়া চিকিৎসার ব্যবস্থাও হয়েছে। জেনারেল বুচার জানিয়েছেন, তিনি ওষুধপত্র ও ডাক্তার দেবার ব্যবস্থা করবেন।

৩১। বিভিন্ন জায়গায় যে-সব সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে, তাদের অধিকাংশই ভারতীয়। এক রেজিমেন্ট ব্রিটিশ সৈন্যও অবশ্য আছে। জেনারেল বুচার সর্বপ্রকারে অসামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন, এবং তাঁর সৈন্যদলকে বুঝিয়ে বলেছেন যে, জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কটা ভাল রাখা দরকার। জনসাধারণকেও বলা হয়েছে যে, সৈন্যদল তাদের সাহায্য করতেই এসেছে, সুতরাং সৈন্যদল যেন তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে। সব মিলিয়ে বলা যায়, যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, তা সহযোগিতামূলক; এবং খুবই আশা করা যাচ্ছে যে, দু-এক দিনের মধ্যেই অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্তে এসে যাবে।

৩২। অন্যান্য অঞ্চলে হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়তে পারে এমন একটা আশঙ্কা অবশ্য রয়েছে। আরা জেলায় যদি হাঙ্গামা বাধে, তাহলে সেখানে গিয়ে হাঙ্গামা থামানো খুব শক্ত ব্যাপার হবে। তবে, উত্তেজনার ভাব থাকলেও, সৌভাগ্যবশত এখনও পর্যন্ত সেখানে কিছু ঘটেনি। আরা কিংবা অন্যত্র যাতে হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়তে না পারে, তার জন্য উপদ্রুত এলাকাগুলিতে বর্তমান অশান্তির দ্রুত অবসান ঘটানো দরকার।

৩৩। আপাতত আমরা প্রধানত হাঙ্গামা আর শৃঙ্খলাহীনতার অবসান ঘটাবার এবং শরণার্থী আর স্থানত্যাগীদের রক্ষা করবার কাজেই নিরত রয়েছি। খুব শিগগিরই এদের পুনর্বাসিত করবার সমস্যাও দেখা দেবে। সমস্যাটা দুরূহ, তবে

প্রাদেশিক সরকার তার সুষ্ঠ সমাধানের জন্য খুবই আগ্রহশীল।

৩৪। উপদ্রুত এলাকাগুলি পরিদর্শনের ব্যাপারে কয়েকটি এরোপ্লেনকেও পুরোপুরি কাজে লাগানো হয়েছে। দু-একটি ক্ষেত্রে মারমুখী জনতার উপরে এরোপ্লেন থেকে কাঁদানে গ্যাসের বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল। কিন্তু জনতা তাতে ভয় পেয়েছে বলে মনে হয়নি।

৩৫। নেহরু আপাতত পাটনায় আছেন। যতদিন তাঁর থাকা দরকার বলে তাঁর মনে হবে, ততদিন তিনি পাটনাতেই থাকবেন।

ভারত-সচিব এর উত্তরে লেখেন :

ইনডিয়া অফিস,
হোয়াইটহল,
২১শে নভেমবর, ১৯৪৬

"প্রিয় সুধীর,

তোমার ১০ই নভেমবরের চিঠি, এবং সেইসঙ্গে অন্য যে-সব কাগজপত্র তুমি পাঠিয়েছ, তা পেয়েছি। এ সম্পর্কে আমার কাছ থেকে কোনও মন্তব্য তুমি নিশ্চয়ই আশা কর না। এখানে শুধু এইটুকুই জানাচ্ছি যে, বাংলা আর বিহারের ঘটনাবলীতে আমি গভীর দুঃখ পেয়েছি।

ব্যক্তিগত শুভেচ্ছাসহ—

আন্তরিকভাবে তোমার
পেথিক লরেনস।"

সুধীর ঘোষ, এস্‌কোয়্যার।

ব্রিটিশ সরকার অতঃপর কী করতে চলেছেন, ভারত-সচিব সবিস্তারে তা আমাকে জানাবেন, এমনটা স্বভাবতই আমি আশা করিনি। ডিসেমবর নাগাদই অবশ্য লনডনে শ্রমিক সরকারের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নয়াদিল্লিতে সরকার এক অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন। ডিসেমবরের প্রথম দিকেই তাই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবার জন্য ব্রিটিশ সরকার ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল, শ্রীনেহরু, মিঃ জিন্না ও শিখ সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকারের তৎকালীন প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী সর্দার বলদেব সিংকে লনডনে আমন্ত্রণ জানালেন। ভারত সম্পর্কে শ্রমিক সরকার যা-কিছু করছিলেন, তার নেপথ্য-নায়ক ছিলেন ক্রিপ্‌স; প্রধানত তাঁরই পরামর্শে সব হচ্ছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, নেহরুর পক্ষে ওয়াভেলের সঙ্গে কাজ করা আর সম্ভব নয়, দুজনের মধ্যে কিছুমাত্র মিল নেই। এইবারকার লনডন সফরের সময় তিনি নেহরু আর ভাইকাউন্ট মাউন্টব্যাটেনকে তাঁর বাড়িতে এক ডিনারে একত্র করেছিলেন। (ভাইকাউন্ট মাউন্টব্যাটেন রাজ-পরিবারের আত্মীয়; মিত্রপক্ষের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কমান্‌ডের সর্বাধিনায়ক হিসাবে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন) নেহরুকে

ক্রিপস বললেন যে, তাঁর যদি মনে হয় তিনি মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে পারবেন, তাহলে তিনি (ক্রিপ্‌স) ওয়াভেলের জায়গায় মাউন্টব্যাটেনকে ভাইসরয় পদে নিয়োগের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

বস্তুত, ক্রিপ্‌স একসময় এমন কথাও ভেবেছিলেন যে, যে-পরিকল্পনার তিনিই প্রকৃত জনক, সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্ষমতা-হস্তান্তরের পর্বটা তার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে সমাধা করবার জন্যে তিনি নিজেই ভাইসরয় হিসেবে নিযুক্ত হয়ে ভারতে আসবার চেষ্টা করবেন। লেডি ক্রিপ্‌সের মারফতে তিনি তাঁর এই ইচ্ছার কথা আমাকে জানান। চীনের 'শিশুরক্ষা তহবিল'-এ লেডি ক্রিপ্‌স বহু লক্ষ পাউন্ড তুলে দিয়েছিলেন; তাঁর এই মহৎ কাজের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশে চিয়াং কাইশেক সরকার ও চীনের কমিউনিস্ট নেতারা (চীনের একাংশ তখন কমিউনিস্টদের দখলে) লেডি ক্রিপ্‌সকে চীনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেই উপলক্ষে তিনি চীনে যান। সেখান থেকে ১৯৪৬ সনের ডিসেমবর মাসে নয়াদিল্লির পথে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সেই সময়েই লেডি ক্রিপ্‌সের কাছ থেকে তাঁর স্বামীর ইচ্ছার কথাটা আমি জানতে পারি। চীন থেকে, ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারির মারফতে, লেডি ক্রিপ্‌স আমাকে একটি বার্তা পাঠান। তাতে তিনি জানান যে, ৫ই ডিসেমবর থেকে ১৬ই ডিসেমবর পর্যন্ত তিনি নয়াদিল্লিতে থাকবেন। ভাইসরয়ের অতিথি হিসাবেই তাঁর নয়াদিল্লিতে থাকবার কথা। কিন্তু আমি গিয়ে শ্রীনেহরুকে জানালাম যে, তিনি যেন তাঁর অতিথি হিসাবে থাকবার জন্য লেডি ক্রিপ্‌সকে অনুরোধ করেন। শ্রীনেহরু আমার পরামর্শ গ্রহণ করলেন, এবং সেই অনুযায়ী লেডি ক্রিপ্‌সকে আমন্ত্রণ জানালেন। অনেক জটিল পথ ঘুরে সেই আমন্ত্রণের এই উত্তর এল :

"প্রেরক : ব্রিটিশ কনসাল জেনারেল, সাংহাই।
প্রাপক : ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি, নয়াদিল্লি।
ইসাবেল ক্রিপ্‌স নিম্নোক্ত বার্তা সুধীর ঘোষকে পাঠাচ্ছেন।
স্ট্যাফোর্ডের মারফত জওহরলালের সদয় আমন্ত্রণ পেলাম।
সানন্দে গ্রহণ করছি। ৫ই ডিসেমবর নয়াদিল্লি পৌঁছব।"

দিল্লিতে পৌঁছে লেডি ক্রিপ্‌স আমাকে বললেন, সার্ স্ট্যাফোর্ড এ-দেশে ভাইসরয় হয়ে এলে ভারতীয় নেতারা খুশী হবেন কিনা, তাঁর (সার্ স্ট্যাফোর্ডের) ইচ্ছে, আমি যেন সেটা ভারতীয় নেতাদের কাছ থেকে গোপনে জেনে নিই। গান্ধীজী তখন শোকাতুর; নোয়াখালীর সুদূর গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এ-বিষয় তখন তাই তাঁর পরামর্শ নেবার উপায় ছিল না। শ্রীনেহরুর সঙ্গেও এ-সম্পর্কে আমি কথা বললুম না। তার কারণ আমি জানতুম, ক্রিপ্‌স সম্পর্কে তাঁর মনে বিশ্বাসের অভাব ছিল। নিঃশব্দে আমি শ্রীরাজাগোপালাচারীর কাছে চলে গেলুম। তিনি তখন শিল্প-মন্ত্রী; ১ নং ক্লাইভ রোডে থাকতেন। রাজাজী তীক্ষ্ণবুদ্ধির মানুষ। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন, ক্রিপ্‌সকে যেন আমি জানাই যে, ভাইসরয় হয়ে তাঁর না-আসাই ভাল। কেননা, তিনি যদি ভাইসরয় হয়ে আসেন, তাহলে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের সহযোগিতা লাভের উদ্দেশে ১৯৪২ সনে চার্চিলের দূত হয়ে ভারতবর্ষে এসে তিনি যেমন ব্যর্থমনোরথ হয়েছিলেন, এবারেও তেমনি তাঁর ব্যর্থকাম হবার আশঙ্কা রয়েছে। সার্ স্ট্যাফোর্ডকে একখানি চিঠিতে আমি এ-কথা জানিয়ে দিলুম; চিঠিখানি

লেডি ক্রিপ্‌সই লনডনে নিয়ে গেলেন। সার্ স্ট্যাফোর্ডও সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিলেন। নিজে ভাইসরয় না-হয়ে মাউন্টব্যাটেনের দিকে চোখ ফেরালেন তিনি। লনডনের এক ঘরোয়া ডিনারে তিনি নেহরু আর মাউন্টব্যাটেনকে মিলিয়ে দিলেন। প্রথম পরিচয়েই পরস্পরকে তাঁদের ভাল লাগল।

সরকারের সেই বিপর্যয়ের সময়ে ক্রিপ্‌সকে আমি যে-সব চিঠি লিখেছিলাম, ভারত-সচিবকে লেখা আমার চিঠিগুলির চাইতে সেগুলি আরও অন্তরঙ্গ। এখানে তার একটি নমুনা দিচ্ছি :

৯ উইন্‌ড্‌সর প্লেস, নয়াদিল্লি,
১৫ ডিসেমবর, ১৯৪৬

"প্রিয় সার্ স্ট্যাফোর্ড,

লেডি ক্রিপ্‌সের সঙ্গে পণ্ডিত নেহরু, সর্দার প্যাটেল, রাজেনবাবু আর রাজাজীর কথা হয়েছে। এখানকার অবস্থা সম্পর্কে যা-কিছু বলবার, তা তিনি আপনাকে বলতে পারবেন। তবু তিনিই আমাকে বললেন যে, আপনার কাছে একটি চিঠি লিখে এখানকার অবস্থা সম্পর্কে আমার ধারণার কথা যেন আপনাকে জানাই। সেইজন্যই এই চিঠি লিখছি। এখানে এখন ক্ষোভের ভাবটাই প্রবল। এইরকমের একটা ধারণা দেখা দিয়েছে যে পণ্ডিত নেহরু লনডনে যেতে রাজী না-হলেই ভাল করতেন। আমার ধারণা, তিনিও মনে করেন যে, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা তাঁকে বিশ্রীভাবে ডুবিয়ে দিয়েছেন। নেতাদের যখন আপনারা লনডনে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানান, তখনই অনেকে আঁচ করেছিলেন যে, কী আপনাদের উদ্দেশ্য। ঠিক তা-ই আপনারা করেছেন। এই যদি আপনাদের ইচ্ছে ছিল, তাহলে কংগ্রেসকে এর মধ্যে না-জড়িয়ে এ-কাজ করলেই আপনারা ভাল করতেন। কংগ্রেস এর দায় বহন করতে চায়নি; কংগ্রেসের নেতারা তাই যেতে অসম্মত হয়েছিলেন। তাঁরা আপনাদের স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে, স্টেট পেপারের ১৯ (৫) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা নিয়ে যে বিরোধ বেধেছে, তার নিষ্পত্তি করাই যদি লনডন-বৈঠকের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সে-বৈঠকে তাঁদের যোগ দেওয়া অর্থহীন। তাঁদের নীতি তো পরিষ্কার ছিল; তাঁদের পক্ষেই যাক আর বিপক্ষেই যাক, ফেডারেল কোর্টের সিদ্ধান্তকেই তাঁরা মেনে নিতে রাজী ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত নেহরুর কাছে প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে একটি আবেদন জানালেন। আপনারা জানেন যে, পণ্ডিত নেহরু একজন খাঁটি ভদ্রলোক; প্রধানমন্ত্রীর আবেদনকে পত্রপাঠ নাকচ করে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং, তাঁর বন্ধুদের মধ্যে অনেকের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি লনডনে গেলেন। তিনি যেতে রাজী হওয়ায় অল্প যে-কজন লোক খুবই খুশী হয়েছিল, আমি তাদেরই একজন। আমার মনে হয়েছিল, পণ্ডিত নেহরু, আপনি, ভারত-সচিব আর মিঃ অ্যাটলির মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে খোলাখুলি আলোচনার সুযোগ ঘটলে সমস্যা অনেকটা কেটে যাবে, এবং তাতে সুফল ফলবে। আমি আশা করেছিলাম, আপনারা তাঁকে এ-ব্যাপারে নিঃসংশয় করতে পারবেন যে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে যা করা উচিত তাই করবার জন্য

আপনারা দৃঢ়সংকল্প, তবে কিনা আপনারা কতকগুলি অসুবিধার জন্য তা করে উঠতে পারছেন না, এবং এও তাঁকে বলবেন যে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে আপনাদের নীতির সঙ্গে এখানে আপনাদের প্রতিনিধির প্রয়োগবিধির অনেক ফারাক রয়েছে। কিন্তু সে-সব কিছুই আপনারা করলেন না। তাঁর ধারণা হয়েছে যে, তাঁর লনডনে যাওয়াটাকে যেভাবে আপনারা কাজে লাগালেন সেটা উচিত হয়নি। তিনি যে যেতে রাজী হয়েছিলেন, তার জন্য আমিও এখন অত্যন্ত দুঃখিত। বিশ্বপৃথিবীর মনে আপনারা এখন এই ধারণা সৃষ্টি করেছেন যে, কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের বিরোধ মেটাবার জন্য ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা বিরোধ মিটিয়ে নিতে পারল না, এবং ভারতবর্ষে হয়ত দীর্ঘকাল ধরে নৈরাজ্য আর গৃহযুদ্ধ চলবে, এবং তাই যদি ঘটে তবে ভারতীয় নেতৃবৃন্দই তার জন্য দায়ী।— কিন্তু এ-সবই ভুল কথা।

বিষয়টি আসলে খুবই সরল। আপনারা ঘোষণা করেছিলেন যে, ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাব যারা মেনে নেবে, তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে আপনারা একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করবেন। আপনারা স্বীকার করেছিলেন, যে, কংগ্রেস সেই প্রস্তাবকে সামগ্রিকভাবে মেনে নিয়েছে। সরকার গঠনের জন্য কংগ্রেসকে আপনারা আমন্ত্রণ জানালেন। অতঃপর, পণ্ডিত নেহরুর আপত্তি সত্ত্বেও, ভাইসরয় মুসলিম লীগকে সরকারে নিয়ে আসবার দায়িত্ব ঘাড়ে নিলেন। পণ্ডিত নেহরুকে তিনি আশ্বাস দিলেন যে, ১৬ই মের প্রস্তাবটিকে মুসলিম লীগ মেনে নিয়েছে, এবং সেইরকমের বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই লীগের পাঁচজন প্রতিনিধি সরকারে যোগ দিলেন। কিন্তু মুসলীম লীগ যে ১৬ই মের প্রস্তাবকে মেনে নিয়েছে, সরকারে যোগ দেবার পরে লীগ সে-কথা অস্বীকার করল, এবং গণ-পরিষদে যোগ দিতে রাজী হল না। আপনার সহকর্মীদের উপরে তখন মুসলিম লীগকে এ-কথা জানিয়ে দেবার অপ্রিয় দায়িত্ব বর্তাল যে, হয় তাদের গণ-পরিষদে যোগ দিতে হবে, আর নয়ত সরকার থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। আপনারা অসুবিধায় পড়লেন। অতঃপর নেতাদের আপনারা যখন লনডনে আমন্ত্রণ জানালেন তখন সবাই এখানে ভাবল যে, এ আর কিছুই নয়, মনঃস্থির করতে যাতে সুবিধে হয় তার জন্যে আপনারা কংগ্রেস আর লীগের নেতাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনার একটা সুযোগ চান। আসলে কিন্তু ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা তাঁদের অপ্রিয় দায়িত্বটিকে স্বীকার করলেন না; যে-অসুবিধার মধ্যে তাঁরা পড়েছিলেন, তার থেকে তাঁরা পিছলে বেরিয়ে গেলেন।

প্রদেশ-গোষ্ঠী সংক্রান্ত অনুচ্ছেদটির ব্যাখ্যা নিয়ে এই যে এখন এত কথা হচ্ছে, আমাদের বিশ্বাস, এটা একটা নতুন ব্যাপার, আগে এ-রকম ভাবা হয়নি। চালাক মানুষ মিঃ জিন্নার এটা একটা সাফল্য বটে, কিন্তু আপনাদের পক্ষে এ একটা মস্ত পরাজয়। আপনারা এখন বলছেন, ক্যাবিনেট মিশন বরাবরই এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন যে, এক-একটা অংশের সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হবে সেই অংশের প্রতিনিধিদের সিম্‌প্‌ল মেজরিটি ভোটের ভিত্তিতে। কথাটা শুনে আমি দুঃখবোধ করেছি। তার কারণ, আমি যখন লনডনে ছিলাম, তখন ভারত-সচিব আমাকে একাধিকবার স্পষ্ট বলেছিলেন যে, এমন কোনও মত তিনি পোষণ করেন না। জুলাই মাসে বোম্বাইয়ের এক সাংবাদিক বৈঠকে পণ্ডিত নেহরু বলেছিলেন যে, প্রদেশ-গোষ্ঠী গড়া হবে বলে তিনি মনে করেন না। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, তাঁর এই মন্তব্যে আপনারা সকলেই বেশ বিচলিত হয়েছিলেন। ১৬ই মের প্রস্তাব সম্পর্কে লীগের

স্বীকৃতিকে মিঃ জিন্না অতঃপর প্রত্যাহার করলেন। সেই সময়ে ভারত-সচিবের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল, এবং পণ্ডিত নেহরুর মন্তব্যের জন্য তিনি খুবই দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, মিঃ জিন্না যে-ছুতো খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, এই মন্তব্যই সেই ছুতোটি তাঁকে জুগিয়ে দিল। ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ারকিং কমিটীর বৈঠকের ঠিক আগে ভারত-সচিব আবার আমাকে ডেকে পাঠান, এবং আমাকে দিয়ে গান্ধীজীর কাছে সুদীর্ঘ এক গোপনবার্তা পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। তাতে তিনি গান্ধীজীকে অনুরোধ করেছিলেন, কংগ্রেস যাতে এই মর্মে ঘোষণা করে যে, ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাবকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পুরোপুরি মেনে নেওয়া হল, এবং গণ-পরিষদের বিভিন্ন অংশে প্রদেশগুলির পৃথক অধিবেশনে কংগ্রেসের আপত্তি নেই, তার জন্য গান্ধীজী যেন কংগ্রেসকে পরামর্শ দেন। ভারত-সচিব তখন স্পষ্ট ভাষায় আমাকে জানিয়েছিলেন যে, প্রদেশগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ঢোকাবার ব্যবস্থায় কংগ্রেস রাজী হবে বলে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা আশা করেন না; এবং আসাম কিংবা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের প্রতিনিধিদের যদি আপত্তি হয়, তবে সেই আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে এই দুটি প্রদেশের উপরে জোর করে একটি প্রাদেশিক সংবিধান চাপিয়ে দেবার কোনও কথাই উঠতে পারে না। ভারত-সচিব অনুযোগ করলেন যে, তখনও পর্যন্ত যে-সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, সেটা নেওয়া হবে বলে পণ্ডিত নেহরুর ধারণা হয়েছে, এবং সেই বিষয়ে তিনি প্রকাশ্যে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। ফলে মিঃ জিন্না একটি ছুতো পেয়ে গেলেন। ভারত-সচিব চাইছিলেন যে, পণ্ডিত নেহরুর মন্তব্যে যে ক্ষতি হয়েছে, তার নিরাকরণ হোক। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে-ধরনের ঘোষণা তিনি চাইছিলেন, ওয়ার্কিং কমিটী ঠিক সেই ধরনের ঘোষণাই করলেন। ভারত-সচিবের তখন মনে হল যে, ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে এবারে সরকার গঠনের জন্যে পণ্ডিত নেহরুকে আহ্বান জানাবার পথ উন্মুক্ত হল। এখন আপনারা যা বলছেন এবং ভারত-সচিব তখন আমাকে যা বলেছিলেন, তা পরস্পরবিরোধী। এই কারণেই আমার মনে হয় না যে, আপনারা উচিত-কাজ করেছেন।

আপনাদের নীতিস্বীকার করতে হয়েছে। আপনাদের অসুবিধাগুলি আমাদের বিচারে অবাঞ্ছিত; তা হোক, অসুবিধা যে আছে, তা আমরা জানি। তবে আপনারা যদি ভেবে থাকেন যে, মুসলিম লীগ সম্পর্কে আপনাদের বর্তমান নীতিই আপনাদের তরিয়ে দেবে, তো আপনারা ভুল করছেন। আপনারা চান, উত্তর-পূর্বে ও উত্তর-পশ্চিমে প্রদেশগুলির বাধ্যতামূলক গোষ্ঠী-বিন্যাস কংগ্রেস মেনে নিক; আপনারা চান যে, তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও আসাম যাতে গোষ্ঠীর বাইরে থাকতে না পারে, তার জন্য, বাঙালীদের দ্বারা আসামের প্রাদেশিক সংবিধান রচিত হবে, এই ব্যবস্থায় কংগ্রেস সম্মতি দিক। কিন্তু, এই সমস্ত কিছুই কংগ্রেস যদি মেনে নেয়, তাতেও পাকিস্তানের জন্য মিঃ জিন্নার রণহুংকার বন্ধ হবে না। ১৬ই মে-র প্রস্তাবে পাকিস্তান-দাবি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য হয়েছে, এবং শক্তিমান একটি কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীনে অখণ্ড ভারতবর্ষের কথা বলা হয়েছে। এই প্রস্তাবকে হত্যা করতে মিঃ জিন্না বদ্ধপরিকর। সর্বশক্তি নিয়োগ করে, সুকৌশলে তিনি তারই জন্য কাজ করে যাচ্ছেন; এবং সেই লক্ষ্যের দিকে তিনি ইতিমধ্যেই বেশ-কিছুটা এগিয়েছেন।

মিঃ জিন্নার সহিংস রাজনীতি এবং হাঙ্গামার হুমকিতে স্পষ্টতই বেশ-কিছুটা কাজও হয়েছে। ১৬ই অগস্ট তার খেলা শুরু হল। মুসলিম লীগ এই দিনটিতে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ঘোষণা করে; এবং কলকাতায় এক অবর্ণনীয় নারকীয় বীভৎসতার

সৃষ্টি হয়। পূর্ববঙ্গে অতঃপর পাইকারী হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হল। তার সঙ্গে চলল বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করবার কাজ, নারীহরণ, বলাৎকার। বিহারের হিন্দু জনতা উত্তেজিত হয়ে তার বদলা নেয়। বর্বরতায় তারা বাংলার মুসলমানদের চাইতে কিছু কম যায়নি। গান্ধীজী মন্তব্য করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের এই শোকাবহ ঘটনায় আপনারা ভয় পেয়ে গেছেন। আপনারা গর্বিত জাতি; তাই গান্ধীজীর মন্তব্যটা আপনাদের ভাল ঠেকেনি। কিন্তু কথাটা তিনি ঠিকই বলেছিলেন। মিঃ জিন্নার ফন্দিটা খেটে গিয়েছে। তিনি আপনাদের ভয় পাইয়ে দিতে পেরেছেন, এবং আপনাদের নতিস্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু আপনারা নতিস্বীকার করেছেন বলেই যে তিনি অতঃপর নিয়ম মেনে চলবেন, তা নয়। এমন একটা সময়ে আপনারা নতি-স্বীকার করে বসলেন, সাহসে ভর করে এগোলেই যখন সত্যিকারের কাজ হত। পণ্ডিত নেহরুকে সরকার গঠনের জন্য অনুরোধ জানিয়ে অতঃপর দিনকয়েক বাদেই যখন সে-অনুরোধ আপনারা প্রত্যাহার করলেন, তখনই আপনাদের হার হল। তবে, আমি তো আগেই বলেছি, আপনাদের অসুবিধার কথা আমরা বুঝতে পারি। বিভিন্ন শক্তিশালী গোষ্ঠীর মধ্যে কীভাবে টানাপোড়েন চলছে দিল্লিতে বসেও তা বুঝতে পারা যায়।

যাই হোক্, আমি একটা ছোট্ট প্রস্তাব রাখছি। দেরি হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া আপনাদের পক্ষে সম্ভব। এখনও যদি মেনে নেন, তাতে প্রভূত উপকার হবে। কংগ্রেসকে, আমি যতদূর বুঝতে পারছি, প্রাদেশিক গোষ্ঠীভুক্তির বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা মেনে নিতে হবে। কংগ্রেসনেতারা এ-ব্যাপারে সম্ভবত ফেডারেল কোরটের সিদ্ধান্ত জানতে চাইবেন; কিন্তু তাতে কোনও লাভ হবে বলে মনে হয় না। আপনারা তো বিবৃতিই দিয়েছেন যে, এ-ব্যাপারে আপনারা আইনজ্ঞের পরামর্শ নিয়েছেন, এবং আইনজ্ঞের সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ও আপনাদের অনুকূলে গিয়েছে। আপনাদের এই বিবৃতির ফলে প্রশ্নটা সম্পর্কে একটা পূর্ব-ধারণার সৃষ্টি করে দেওয়া হল। ফলে এখন ধরেই নেওয়া যায় যে, ফেডারেল কোরটের রায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যাবে, এবং কংগ্রেসকে সেই রায় মেনে নিতে হবে। উত্তর-পূর্বে ও উত্তর-পশ্চিমে দুটি প্রদেশ-গোষ্ঠী অগত্যা গড়তেই হবে; গণ-পরিষদের পৃথক অংশ দ্বারা প্রদেশ-গোষ্ঠীর সংবিধান রচিত হবে; এবং কোন্ প্রদেশের কী সংবিধান হবে, সেটাও তাঁরাই স্থির করবেন। তবে এখনও এ-কথা আপনারা অক্লেশে বলতে পারেন যে, পৃথক অংশের দ্বারা যে প্রাদেশিক সংবিধান রচিত হবে, একমাত্র সেই বিশেষ প্রদেশের প্রতিনিধিদের দ্বারা অনুমোদিত হলে তবেই তা কার্যকর হতে পারবে। আপনারা তো ঘোষণাই করেছিলেন যে, দেশের কোনও অংশের যদি আপত্তি থাকে, তবে জোর করে তার উপরে একটা সংবিধান চাপিয়ে দেবার ইচ্ছে আপনাদের নেই। আমার প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সেই ঘোষণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে। প্রস্তাবটা পেশ করলাম, তার কারণ, ৬ই ডিসেম্বর তারিখে আপনারা যে বিবৃতি দিয়েছেন, কোনও প্রদেশের পক্ষে গোষ্ঠীতে যোগ না-দেওয়া তার ফলে অবাস্তব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। এখন আপনারা যদি এই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করেন, এবং বলেন যে, স্টেট পেপারের ব্রিটিশ ব্যাখ্যা কংগ্রেস মেনে নিলে মিঃ জিন্নারও সরকারে যোগ দেওয়া উচিত, তাহলে তাতে প্রভূত উপকার হবে। দেরি হয়েছে হোক্, কিন্তু এখনও কি এটা আপনারা করতে পারেন না?

আশা করি, সত্যিই আপনি আগের চাইতে এখন সুস্থ আছেন। লেডি ক্রিপ্স

তো এখন লনডনে থাকবেন। এতে আমি খুশী। তিনি লনডনে থাকলে ঠিকমত আপনার যত্ন হবে।

ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাই।

সুধীর"

পুনশ্চ : পড়লেই বুঝতে পারবেন, এই চিঠিতে যা বলা হল, তা বস্তুত কংগ্রেস-নেতাদেরই কথা।

বোর্ড অব ট্রেড,
মিলব্যাংক,
লনডন এস. ডব্লু. ১
২৭-১-৪৭

"প্রিয় সুধীর,

তোমার চিঠি পেলাম। তুমি যে-সব যুক্তি দেখিয়েছ, তা অকাট্য।

আপাতত কিছুদিন যাবৎ আমরা ব্রহ্মদেশ-সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসা নিয়েই পুরাপুরি কাজে ডুবে আছি। ব্যাপারটা খুব সম্প্রতি যেখানে এসে পৌঁছেছে, সেটা একটা সন্তোষজনক সমাধান হয়ে উঠবে বলেই আমার মনে হয়। অং সানকে আমাদের সকলেরই খুব ভাল লেগেছে।

খুব শিগগিরই আমরা আবার ভারতবর্ষের অবস্থা পর্যালোচনা করতে বসব। জওহরলালের কাছে যে দুটি প্রস্তাব আমি দিয়েছিলাম, এখনও তা আমার মন থেকে বিদায় নেয়নি, এবং আমি আশা করছি যে, অচিরেই তা বাস্তব রূপ নেবে। রাজাজীর প্রস্তাব আমরা অবশ্যই বিবেচনা করে দেখব। রাজাজী কাজেকর্মে সাহায্য করতে উৎসুক; সুতরাং তাঁর সব কথাই আমাদের সর্বদা বিবেচনা করে দেখা কর্তব্য। এ-বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো যে, তাঁর কথাগুলি যাতে পুরো মনোযোগ দিয়ে বিবেচনা করা হয়, তার ব্যবস্থা আমি করব। যে-প্রস্তাব তিনি পাঠিয়েছেন, তার জন্য তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানিও।

ইসাবেল গিয়ে যে তোমাদের কাজে কিছু সাহায্য করতে পেরেছিল, এ-কথা জেনে খুব খুশী হয়েছি। তুমি জানো, তার সম্পর্কে আমার ধারণা খুবই উঁচু। তার সাহায্য আর পরামর্শ ছাড়া আমার পক্ষে কাজ করা খুবই শক্ত হত।

২৯শে তারিখে জিন্নার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হয়, তা জানবার জন্য আমরা উৎসুক হয়ে থাকব। তবে সেইটাই যে তাঁর চূড়ান্ত পদক্ষেপ হবে, তা আমি মনে করি না। যাই হোক্, অতঃপর আমাদের কী করা উচিত, সে-বিষয়েও তখন আমাদের মনঃস্থির করতে হবে।

শুভেচ্ছা জানাই।

স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স

পুনশ্চ : জওহরলাল, বল্লভভাই, রাজাজী, রাজেন্দ্র প্রসাদ, বুদ্ধ মানুষটি এবং আর-সবাইকে আমার শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এস. সি."

ক্রিপ্‌সের কাছ থেকে এই চিঠি পাবামাত্র চিঠিখানি নিয়ে আমি শ্রীনেহরুর কাছে যাই। বারকয়েক তিনি চিঠিখানি পড়লেন; তারপর বললেন, "এ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা।" সেখান থেকে রাস্তা পার হয়ে আমি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের বাড়িতে গেলাম, এবং চিঠিখানি তাঁকে দেখালাম। তিনি খুব মন দিয়ে চিঠিখানা পড়ে গম্ভীরভাবে বললেন, "এ খুবই গুরুত্বপূর্ণ চিঠি।" সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স তাঁর চিঠিতে যে "দুটি প্রস্তাব"-এর উল্লেখ করেছিলেন, তা হচ্ছে নেহরুকে প্রদত্ত তাঁর দুটি প্রতিশ্রুতি। প্রথম প্রতিশ্রুতি : ভাইসরয়ের পদ থেকে ওয়াভেলকে সরাবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি : ওয়াভেলের জায়গায় মাউন্টব্যাটেনকে যাতে ভাইসরয়-পদে নিয়োগ করা হয়, তার ব্যবস্থা তিনি করবেন। লনডন থেকে এই প্রথম জানা গেল যে, ব্রিটিশ সরকার ওয়াভেলকে সরিয়ে দেবার কথা ভাবছেন। স্বয়ং লর্ড ওয়াভেলও এ-সম্পর্কে সেইসময়ে কিছুই জানতেন না। পরে যখন এ-সম্পর্কে তিনি উপরকার নির্দেশ পান, তখন তিনি সত্যিই খুব বিস্মিত হয়েছিলেন। বিস্ময়ের আঘাতটা তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি জর্জ-এর আরও বেশী করে লেগেছিল। ক্রিপ্‌স এ-দেশে প্রকৃত ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতেই তুলে দিয়েছিলেন, এবং সংখ্যালঘু দলকে সরকারে নিয়ে আসবার দায়িত্বও তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতেই ছেড়ে দেন। কিন্তু ব্রিটিশ অফিসার-চক্রের কারসাজিতে ক্রিপ্‌সের সেই ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যায়।

লর্ড ওয়াভেলকে যে সরিয়ে দেওয়া হল, বস্তুত এটা পদচ্যুতির ব্যাপার। যিনি কোনও অন্যায় করেননি, এমন একজন ভাইসরয়কে অপসারিত করা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে খুবই গুরুতর একটি ঘটনা। ওয়াভেলের একমাত্র ত্রুটি এই যে, ভারতের জটিল সমস্ত রাজনৈতিক ও মানবিক সমস্যাবলীর মোকাবিলা করবেন, সৈনিকজনোচিত গুণের অধিকারী এই মানুষটির এমন যোগ্যতা ছিল না।

ইনডিয়া অফিসের যে উচ্চপদস্থ অফিসারটি বলেছিলেন, ভাইসরয়ের পদচ্যুতির জন্য আমিই দায়ী, আসলে তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, ক্রিপ্‌স আর পেথিক-লরেন্‌স আমাকে বিশ্বাস করতেন, এবং ১৯৪৬ সনের অকটোবর, নভেমবর আর ডিসেমবরে তাঁদের কাছে আমি যে সুদীর্ঘ পত্রাবলী লিখেছিলাম, তাতেই তাঁরা বুঝতে পারেন যে, লর্ড ওয়াভেল তাঁর দায়িত্ব আর ঠিকমত পালন করতে পারছেন না।

সেই আখ্যানের সারাংশ এখানে জানালাম।

গান্ধীজী ও বীজ-আলু

১৯৪৩ সনের মন্বন্তরে বাংলা দেশে প্রায় পনর লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটেছিল। গান্ধীজী তখন পুনার আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী। ম্যালিগনানট ম্যালেরিয়া রোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত হওয়ায় ১৯৪৪ সনের ৫ই মে তারিখে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি পাবার পরেই তিনি ঠিক করেন যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তিনি বাংলা দেশে যাবেন। কিন্তু তখনও যুদ্ধ চলছে। জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের বিপুল সামরিক উদ্যোগের সদর ঘাটি তখন কলকাতা। বাংলা আর আসাম তখন বস্তুত সামরিক দখলভুক্ত এলাকা। অসামরিক মানুষদের গতিবিধি—বিশেষত পূর্ববঙ্গে—তখন কড়া নিয়ন্ত্রণের অধীনে। গান্ধীজী মুক্তি পাবার পর সস্ত্রীক আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। আমাদের সঙ্গে ছিলেন ডেভনের ডার্টিংটন হল্-এর লেনার্ড এল্‌মহার্স্ট। ইমারজেনসি সারভিসের সূত্রে বাংলা দেশের গভরনর কেসির কাছে কিছুকাল কাটিয়ে তিনি তখন ইংল্যান্ডে ফিরছিলেন। এল্‌মহার্স্ট ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। তা ছাড়া শিক্ষাবিদ্ হিসেবেও তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি। ভারতবন্ধু এই মানুষটি সারা জীবনই এ-দেশের সেবা করেছেন। শান্তিনিকেতনের পল্লী-উন্নয়ন-কেন্দ্র শ্রীনিকেতনের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। ভারতের গ্রামগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করবার যে আন্দোলন, তিনি তার অন্যতম পথিকৃৎ। বাংলা দেশের চেহারা পালটে দেবার জন্য তার নদীজলসম্পদকে কাজে লাগানো দরকার; গভরনর কেসি তার জন্য এই কৃষি-অর্থনীতিবিদকে (এল্‌মহার্স্ট এখন কৃষি-অর্থনীতিবিদদের আন্তর্জাতিক ইন্‌সটিটিউটের চেয়ারম্যান) একটি উন্নয়ন-প্রকল্প রচনা করতে বলেছিলেন। সেই কাজ শেষ করে এল্‌মহার্স্ট তখন ইংল্যানডে ফিরছিলেন। আমার তখন মনে হল যে, গান্ধীজীর সঙ্গে যদি তিনি দেখা করেন, এবং ব্রিটিশ সরকারে তাঁর যে-সব বন্ধু আছেন (যথা সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স), দেশে ফিরে গিয়ে তিনি যদি তাঁদের কাছে গান্ধীজীর চিন্তার একটা আভাস দেন, এবং গান্ধীজীর সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের একটা বোঝাপড়ার সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন, তাহলে মন্দ হয় না। এল্‌মহার্স্ট আর আমি গান্ধীজীর সঙ্গে দু বার সাক্ষাৎ করলাম। কথাবার্তাও হল। কিন্তু গান্ধীজীর রাজনৈতিক পদক্ষেপ অতঃপর কী হতে পারে, তার বিশেষ আন্দাজ পাওয়া গেল না। প্রায় সারাক্ষণই তিনি শুধু বাংলা দেশের কথাই বললেন। বললেন সেই পনর লক্ষ মানুষের কথা, অনাহারে যারা মারা গিয়েছে। বললেন যে, সেই নিদারুণ দুঃসময়ে তিনি বাংলাদেশে যেতে পারেননি, সেখানকার মানুষকে সাহায্য করতে পারেননি, এই দুঃখ তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না।

গান্ধীজীর শরীর তখন খুবই দুর্বল। ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু বাংলা দেশের কথা তখনও তিনি নিমেষের জন্যে ভুলতে পারেননি। তাঁর সম্ভাব্য সফর এবং তার বাধাবিঘ্ন সম্পর্কে পরবর্তী কয়েক মাস তাঁর সঙ্গে আমার পত্রবিনিময় হয়েছে। গান্ধীজীর বাংলা-সফরের বিষয়ে তখন আমি গভরনর কেসির সঙ্গেও কথা বলি। কেসি অস্ট্রেলিয়ার মানুষ; আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধি ছিল সুবিস্তৃত। ভারতবর্ষে সাধারণত যে-সব গোঁড়া

ব্রিটিশ গভরনর দেখা যেত, এই কারণেই কেসির সঙ্গে তাঁদের কোনও মিল ছিল না। তিনি একেবারে আলাদা ধাঁচের মানুষ। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে, বাংলা দেশে আসবার জন্য গান্ধীজী উৎসুক; কিন্তু তাঁর গতিবিধিকে যদি এতটুকুও নিয়ন্ত্রিত করা হয়, তাহলে তিনি আসবেন না। স্বদেশের কোটি কোটি নরনারীর চিত্তে গান্ধীজীর প্রভাব যে কী অসামান্য, কেসি তা জানতেন; ভারতবর্ষের এই মুকুটহীন রাজার সঙ্গে তিনিও একটা যোগসূত্র স্থাপন করতে চাইছিলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে ভাইসরয়ের অবশ্য আপত্তি ছিল। কিন্তু তাতে কোনও অসুবিধে হল না। ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে শ্রমিক সরকার ক্ষমতা পেতেই সুযোগ এসে গেল। ইতিপূর্বে মিঃ চার্চিলের নির্দেশে লর্ড ওয়াভেল সিমলায় ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দলের এক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। গান্ধীজীও তাতে যোগ দেন। এ হল জুন মাসের কথা। সেই সম্মেলনের সূত্রে গান্ধীজী তখন সিমলায় ছিলেন। সম্মেলন শুরু হয়েছিল ২৫শে জুন তারিখে। তার পরদিনই সিমলা থেকে গান্ধীজী আমাকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিখানি এখানে তুলে দিচ্ছি :

ম্যানরভিল্,
সিমলা
২৬-৬-৪৫

"ভাই সুধীর,

তুম্হারে এগারো জুনকে খত্‌কা উত্তর আজ্‌হি দে সক্‌তা হুঁ। ম্যয় ক্যা কর্ রহা হুঁ সো তো জান্‌তে হো। যানে কো ম্যয় তো বহুত উৎসুক হুঁ লেকিন সব জাগা যানা হোগা।

শান্তি কো ঔর তুমকো বাপুকা আশীর্বাদ।"

অর্থাৎ :

"ভাই সুধীর,

তোমার এগারোই জুনের চিঠির উত্তর আজই দিতে পারছি। আমি যে এখানে কী করছি, তা তো তুমি জানো। বাংলায় যাবার জন্য আমি তো খুবই উৎসুক, তবে সেখানে সব জায়গাতেই যেতে হবে।

শান্তি আর তোমার জন্য বাপুর আশীর্বাদ রইল।"

এই ছোট্ট চিঠিখানি হাতে নিয়ে আমি গিয়ে গভরনর কেসির সঙ্গে দেখা করলুম। তিনি বললেন, সিমলায় গিয়ে আমি গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে পারি, এবং তাঁকে আশ্বাস দিতে পারি যে, তিনি যাতে বাংলা দেশে যেখানে-খুশি যেতে পারেন এবং যাঁর-সঙ্গে-খুশি দেখা করতে পারেন, গভরনর তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। আমি যখন সিমলায় গিয়ে রাজকুমারী অমৃত কাউরের বাড়িতে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলুম, তিনি তখন হেসে আমাকে বললেন, "কেসির চিত্ত কীভাবে জয় করলে বলো।" কেসি সম্পর্কে আমি তাঁকে যা বললুম, তাতে তিনি খুশী হলেন। আলোচনার শেষে—একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে—তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তখনই কলকাতায় না ফিরে তাঁর সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর স্পেশ্যাল

ট্রেনে (একটি বগি, একটি ইন্‌জিন ও একটি গার্ডস ভ্যান সংবলিত এইরকমের স্পেশ্যাল ট্রেন সেই সর্বপ্রথম তিনি ব্যবহার করলেন) আমি সিমলা থেকে সেবাগ্রাম যেতে রাজী আছি কিনা। সম্মতি জানিয়ে আমি বললুম, কালকা থেকে আমি তাঁর ট্রেনে উঠব। ট্রেন ছাড়বার খানিক বাদেই তিনি আমাকে তাঁর কাছে গিয়ে বসতে বললেন। বললেন, "তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। তুমি কি আমার সঙ্গে কিছু কাজ করতে রাজী আছ?" তাঁর এই কথাগুলিতে যেন জাদু ছিল। ইতিপূর্বে, কোনও বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার এমন বুঝলে তবেই আমি তাঁর কাছে গিয়েছি। এখন আমি তাঁর ষোল-আনা একজন 'সাকরেদ' হয়ে উঠলুম। বাইবেলের ভাষা ধার করে বলতে পারি, গান্ধীজী ছিলেন মানুষ ধরবার ধীবর।

ওয়ার্ধা থেকে সেবাগ্রাম পর্যন্ত একটি কাঁচা রাস্তা চলে গিয়েছে। এই রাস্তার উপরেই এক জায়গায় কলকাতা-বোমবাই রেলপথ অতিক্রম করতে হয়। তৃতীয় শ্রেণীর ছোট্ট স্পেশ্যাল ট্রেনটি, বিশেষ করে আমাদেরই জন্য, সেখানে থামল। এক-এক করে গান্ধীজী আমাদের সবাইকে ট্রেন থেকে নামতে বললেন। তিনি নামলেন সর্বশেষে। সেই ধূলিধূসর রাস্তায় দু মাইল হাঁটবার পর কয়েকটি মাটির বাড়ি দেখতে পাওয়া গেল। সেই তাঁর বিখ্যাত সেবাগ্রাম আশ্রম। সেবাগ্রাম আশ্রমে সে-যাত্রায় আমি কয়েকটা দিন ছিলুম। তার মধ্যে কলকাতায় রওনা হবার আগের দিন রাত্রে গান্ধীজীর সঙ্গে যে-কথা হয়েছিল, বিশেষ করে তারই স্মৃতি আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। মেল ট্রেন ধরে আমার কলকাতায় রওনা হবার কথা। বোমবাই-কলকাতা ট্রেন খুব সকালে ওয়ার্ধা থেকে ছাড়ে। সেই ট্রেন ধরতে হলে ভোর চারটে নাগাদ আশ্রম থেকে যাত্রা করতে হবে, এবং কর্দমাক্ত রাস্তায় (তখন বর্ষাকাল) পায়ে হেঁটে মাইল চার-পাঁচ পাড়ি দিয়ে রেল-স্টেশনে পোঁছতে হবে। আগের দিন রাত্রে শয্যাগ্রহণের পূর্বে গান্ধীজী তার জন্য তিন-চার জন লোকের একটা রীতিমত বৈঠকই বসিয়ে দিলেন। ভোর চারটেয় কে আমাকে ঘুম থেকে তুলে দেবে, কে আমার সুটকেশ বহন করে স্টেশন পর্যন্ত আমার সঙ্গে যাবে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের একেবারে পাকা ব্যবস্থা না-করে তিনি শান্তি পাচ্ছিলেন না। এও তিনি বলে দিলেন যে, আমার ঘরে একটা কেরোসিন লণ্ঠন থাকা চাই। শেষ রাত্তিরে অন্ধকারে চার-পাঁচ মাইল হাঁটা চলবে না; লণ্ঠনটি হাতে ঝুলিয়ে আমাকে হাঁটতে হবে। প্রতিটি ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে তবে তিনি শুতে গেলেন। খুটিনাটি যাবতীয় বিষয়ে তিনি লক্ষ্য রাখতেন।

কলকাতায় ফিরে আমি মিঃ কেসির উপরে আবার হানা দিতে শুরু করলাম। তখন জুলাই মাস। ইংল্যানডে শ্রমিক সরকার ইতিমধ্যে ক্ষমতার আসনে শক্ত হয়ে বসেছেন। ফলে কেসিরও তাঁর আপন ইচ্ছামত চলবার আরও সুবিধা হল। গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা শুরু করবার প্রশ্ন নিয়ে ভাইসরয়ের সঙ্গে তাঁর যে টানাপোড়েন চলছিল, শ্রমিক সরকারের সমর্থন পাওয়ায় কেসিই তাতে জিতলেন।

গান্ধীজীর বাংলা-সফর যে লর্ড ওয়াভেলের মনঃপূত নয়, গান্ধীজীকে একখানি চিঠিতে তা আমি জানিয়েছিলাম। তবে ওয়াভেলের স্বপক্ষে তাতে আমি এও বলেছিলাম যে, গোঁড়া হলেও তিনি আন্তরিক। গান্ধীজীর কাছ থেকে পত্রপাঠ এই চিঠির জবাব পাওয়া গেল। তাতে আন্তরিকতার সংজ্ঞাটা তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। চিঠিখানি এখানে তুলে দিচ্ছি :

সেবাগ্রাম
২৮-৭-৪৫

"প্রিয় সুধীর,

তোমার সুন্দর চিঠিখানি পেলাম।

কোনও মানুষকে এই অর্থে আমরা আন্তরিক বলি যে, তিনি জ্ঞানত অসৎ নন। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তথ্যগুলিকে ঠিকমত বিচার করবার কষ্ট স্বীকার না করে তিনি যদি তাড়াহুড়ো করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন, তাহলে বলতেই হবে যে, তিনি নিজে সে-কথা না-জানলেও, বস্তুত তিনি মিথ্যাচারী। ভারতবর্ষের অসংখ্য মানুষ সম্পর্কেও সম্ভবত এ-কথা প্রযোজ্য। আন্তরিকভাবে তারা বিশ্বাস করে যে, অস্পৃশ্যতা একটা দৈব বিধান। বস্তুত তারা মিথ্যাকেই আঁকড়ে আছে। এটা যে মিথ্যা, তা প্রমাণ করা যায়।

বর্ষা একটু ধরলেই আমি বাংলায় যেতে চাই। যাওয়া সম্ভব হলে সর্বাগ্রে মিঃ কেসির সঙ্গেই আমি দেখা করব।

পুস্তিকাগুলি পেয়েছি।

তোমাদের দুজনকেই আমার আশীর্বাদ জানাই।

বাপু"

অতঃপর গান্ধীজীকে এই সুসংবাদ দেবার জন্যে আমি ওয়ার্ধায় গেলাম যে, তাঁর বাংলায় যাবার পথ এবারে পরিষ্কার হয়েছে। শুনে তিনি গভরনর কেসিকে একটি চিঠি লিখলেন। কেসির কাছে সেই তাঁর প্রথম চিঠি। চিঠিখানি এখানে তুলে দেওয়া হল :

সেবাগ্রাম
২রা অগস্ট, ১৯৪৫

"প্রিয় বন্ধু,

শ্রীসুধীর ঘোষের অনুগ্রহে আপনার দুটি বক্তৃতার কপি আমি পেয়েছি। গতকাল আমার দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে খানিকটা সময় ছিনিয়ে নিয়ে তার একটা আমি পড়লাম।

আপাতত দুটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই চিঠি লিখছি। নিখিল ভারত কাটুনি সঙ্ঘ যে নীতি নির্ধারণ করেছেন, তা অনুসরণ করেই অবিলম্বে আপনি বস্ত্রের ঘাটতি মেটাতে পারেন। বাংলা দেশেও এই প্রতিষ্ঠানটির শাখা রয়েছে। প্রতিটি পরিবারকে নিজের সুতো নিজে কাটতে, এবং প্রতিটি গ্রামকে নিজের কাপড় নিজে বুনে নিতে অনুরোধ করা—এক কথায় এই হচ্ছে এঁদের পরিকল্পনা। পৃথিবীতে এর চাইতে বড় সমবায়-উদ্যোগের কথা ভাবা যায় না।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি গো-সম্পদের। এ-ব্যাপারে আপনি খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের সঙ্গে কথা বললে ভাল হয়। তবে তিনি অসুস্থ; এখুনি

হয়ত তাঁকে পাওয়া না-যেতে পারে। গো-সম্পদের সমস্যা সম্পর্কে খুব সম্প্রতি তাঁর বিরাট একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীসুধীর ঘোষ আমার বাংলা-সফরের ব্যাপারে আপনার বক্তব্য আমাকে জানিয়েছেন। আপনার বার্তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। বাংলা দেশে বর্ষা একটু ধরলেই আমি সেখানে যেতে উৎসুক। যখন যাব, তখন আমার প্রথম কাজই হবে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম. কে. গান্ধী"

হিজ্ এক্সেলেন্সি দি গভরনর অব বেংগল,
কলকাতা।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ১লা ডিসেমবরের আগে গান্ধীজীর পক্ষে বাংলায় যাওয়া সম্ভব হয়নি। ১৯৪২ সনের অগস্ট মাসে কংগ্রেসের তাবৎ প্রথম সারির নেতাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। ফলে কংগ্রেস-সংগঠনও ছত্রখান হয়ে যায়। এখন মুক্তি পেয়ে কংগ্রেস-নেতারা সংগঠনে আবার শৃংখলা ফিরিয়ে আনবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। গান্ধীজীরও রাজনৈতিক কাজের বোঝা ভীষণভাবে বাড়ল। কংগ্রেসের মধ্যে কীভাবে আবার নতুন করে প্রাণশক্তি ও কর্মোদ্যোগ সঞ্চার করতে হবে, তা নিয়ে সহকর্মীদের উপদেশ-পরামর্শ দিতে হত। সেও বিরাট কাজ। সেই বিপুল দায়িত্ব থেকে ছুটি নিয়ে তাঁর পক্ষে বাংলায় আসা তখন সহজ ছিল না। তাঁর স্বাস্থ্যও তখন ভাল যাচ্ছিল না; সেদিকেও লক্ষ্য রাখবার দরকার ছিল। বর্ষার পরে সেবাগ্রাম থেকে তিনি পুনায় এলেন। অতঃপর বাংলা-সফর সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করবার জন্য আমাকে তিনি পুনায় ডেকে পাঠান। তাঁর তখন মনে হচ্ছিল যে, দু মাসের জন্য তিনি বাংলা-সফরে যেতে পারবেন, এবং ১লা নভেম্বর তাঁর পক্ষে পুনা থেকে যাত্রা করা হয়ত সম্ভব হবে।

১৯৪৫ সনে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ছিলেন বাংলাদেশের অগ্রগণ্য রাজনৈতিক নেতা। তিনি একজন বিশিষ্ট গান্ধীবাদী মানুষ; কংগ্রেস হাইকমান্ডেরও তিনি তখন একজন সদস্য। পরে তিনি বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী হন। এখন যাঁরা বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতা, তখন তাঁরা বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। (শুধু বাংলাদেশ বলে কথা কী, কংগ্রেস হাইকমান্ডের যাঁরা এখন সদস্য, তাঁদেরও অধিকাংশই তখন অখ্যাত ছিলেন।) ডঃ বিধানচন্দ্র রায় যে বাংলার রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, সেটা এর পরবর্তী-কালের ঘটনা। এ যখনকার কথা বলছি, ডঃ রায় তখন প্রতিষ্ঠার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছেন মাত্র। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ছাড়া বাংলাদেশে আর-একজন যে বিখ্যাত গান্ধীবাদী সমাজ-কর্মীর প্রতিষ্ঠা ছিল, তিনি খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। বাংলাদেশে তাঁকে 'ছোট গান্ধী' বলা হত। এই দুজন নেতাকে কেন্দ্র করে দুটি জনসেবক-গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। আপনাপন পন্থায় দুজনেই এ'রা সাধু-প্রকৃতির মানুষ; গান্ধীজীর খাঁটি শিষ্য। দুজনেই এ'রা গান্ধীজীর সমান ঘনিষ্ঠ ছিলেন; গান্ধীজী এ'দের দুজনকেই খুব গভীরভাবে স্নেহ করতেন। তবে এ'দের ঘিরে যে দুটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, পরস্পর সম্পর্কে যে সেই গোষ্ঠী দুটির চিত্তে বিশেষ গান্ধীভক্তোচিত ভালবাসা ছিল, তা নয়। প্রতিটি গোষ্ঠীই

চাইছিলেন যে, গান্ধীজীর বাংলা-সফরের ব্যবস্থাপনা-ভার তাঁদেরই উপরে অর্পিত হোক। তার কারণ, গান্ধীজীর সফর-সংক্রান্ত দায়িত্বভার যে-গোষ্ঠীর উপরে ন্যস্ত হবে, তাঁদের সম্মানও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে। গান্ধীজীর আস্থাভাজন হওয়া, —এর চাইতে বড় আর কোন্ সম্মান তখন ভারতবর্ষে পাওয়া সম্ভব?

গান্ধীজী মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক কলহ-বিবাদে জড়িয়ে পড়বার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে আমরা বাঙালীরা খুবই ভাল লোক; কিন্তু পরস্পরের প্রতি আমরা সর্বদা ভাল থাকতে পারি না। এই সমস্যাটি আলোচনা করবার জন্য গান্ধীজী আমাকে পুনায় ডেকে পাঠালেন। তিনি জানতেন যে, উপদলীয় কোঁদলে আমার আগ্রহ নেই। সারাটা জীবনই আমার মধ্যস্থতা করে কাটল; এই মধ্যস্থতার ভূমিকাতেই আমাকে বিশেষজ্ঞ বলা যায়। কিন্তু তাতে লাভ হয়েছে এই যে, রাজনীতিতে আমার বিশেষ উন্নতি হয়নি। যাই হোক, উপদলীয় কোঁদলে আমার আগ্রহ ছিল না বলেই গান্ধীজী আমাকে ভালবাসতেন। খবরের কাগজের জন্য ইতিমধ্যে আমি একটি বিবৃতি তৈরী করে রেখেছিলাম। শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত তাতে সম্মতি দিয়েছিলেন এবং ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সেটিকে অল্প-একটু বদলে দিয়েছিলেন। সেটি সঙ্গে নিয়ে আমি পুনা রওনা হলাম। বিবৃতিটি এই :

"নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে গান্ধীজী বাংলাদেশে আসছেন। এখানে এসে প্রথম দিন-দশেক তিনি সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠান আশ্রমে থাকবেন। তারপর তিনি বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় সফর করতে যাবেন। স্থির হয়েছে যে, মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও তমলুক মহকুমা এবং ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমা তিনি সফর করবেন। তারপর যাবেন শান্তিনিকেতনে।

আসাম ও উত্তরবঙ্গ সফরের জন্য গান্ধীজী খুবই উৎসুক, কিন্তু সেখানে তিনি যেতে পারবেন কিনা এখনি তা বলা সম্ভব নয়। ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থার উপরে নির্ভর করছে। আসাম ও উত্তরবঙ্গে যাওয়া যদি গান্ধীজীর পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে সেখানকার বন্ধুরা নিশ্চয়ই তার কারণ বুঝবেন।

১৯৪৩ সনে এই প্রদেশের পনর লক্ষাধিক নরনারী অনাহারে মারা গিয়েছেন। এখানে এসে সাহায্য করা তখন গান্ধীজীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেই দুঃখ তিনি ভুলতে পারেননি। দুর্ভিক্ষের জের এখনও চলছে; দ্বিতীয়বার দুর্ভিক্ষ ঘটবে বলেও আশংকা করা হচ্ছে। এই প্রদেশে দুর্নীতি, মুনাফাবাজি, চোরাকারবারি এবং অন্যান্যবিধ সমাজবিরোধী কাজ এখন অবাধে চলছে, এবং তার চাপে বাংলাদেশের কোটি কোটি মূক নরনারী আজ আর্তনাদ করছে। গান্ধীজী এখানে এসে তাদের মধ্যে থাকতে চান, তাদের দুঃখ দেখতে চান, তাদের বেদনার অংশ নিতে চান, তাদের সাহায্য করতে চান।"

পুরো ব্যাপারটা আমার সঙ্গে আলোচনা করে গান্ধীজী এই বিবৃতির খসড়ার উপরে তাঁর নিজের হাতে একটা বার্তা লিখে দিলেন, এবং আমাকে বললেন যে, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্তকে আমি এই বার্তাটি যেন তার করে পাঠাই। বার্তাটি এই :

"বাংলা সফর কয়েকটা দিনের জন্য পিছিয়ে দিতে হল। তার জন্য দুঃখিত। কবে পৌঁছব, সঠিক বলা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব বেশী জায়গায় যেতে ব্যগ্র; তবে স্বাস্থ্যের কারণে যথাসম্ভব কম জায়গায় হয়ত যেতে পারব। যতটা পারি অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং দুঃখের অংশ নেওয়াটাই আসল কথা। কলকাতায় পৌঁছে

চূড়ান্ত কার্যসূচী স্থির করবার পক্ষপাতী।”

গান্ধীজী অতঃপর ডঃ ঘোষের কাছে হিন্দীতে একটি দীর্ঘ চিঠির ডিকটেশন দিলেন; আমাকে বললেন, আমি যেন তা বাংলাদেশের দুই নেতার কাছে নিয়ে যাই। অবস্থা যেখানে অস্বস্তিজনক, সেখানেও গান্ধীজী খোলাখুলি সব জানাবার পক্ষপাতী ছিলেন। এই চিঠিখানিতেও সেই ষোল-আনা অকপটতার প্রমাণ মিলবে। চিঠিখানিকে এখানে বাংলায় তর্জমা করে দিচ্ছি :

১৮-১০-৪৫
পুনা

“ভাই প্রফুল্ল,

জওহরলালজী সম্পর্কে তোমার চিঠি ও তার পেয়েছি। ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি।

সুধীর গতকাল এখানে এসে পৌঁছেছে। কাল আর আজ তার সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হল। আমার সিদ্ধান্তটা টেলিগ্রাম করে জানানো সম্ভব হয়নি; টেলিগ্রাম খুব দীর্ঘ হয়ে পড়ত। তাই এই চিঠি পাঠাচ্ছি। সুধীর নিশ্চয়ই ছোট একটা তারবার্তা তোমাকে পাঠিয়েছে।

সব কথা বিবেচনা করে আমার মনে হচ্ছে, আপাতত শুধু এইটুকুই তোমরা জানিয়ে দাও যে, “অনিবার্য কারণবশত ২রা নভেম্বর তারিখে গান্ধীজী কলকাতায় আসতে পারবেন না। তাঁর আসবার সঠিক তারিখ নির্ধারিত হলেই সেটা ঘোষণা করা হবে। সম্ভবত তিনি নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ নাগাদ আসবেন। সংবাদপত্রে তাঁর যে সফরসূচী প্রকাশ করা হয়েছে, সেটা বাতিল করে দেওয়া হল। তবে যেখানেই তাঁর যাবার সম্ভাবনা আছে, সেখানকার সংগঠকদের আগে থাকতেই জানানো হবে, যাতে তাঁরা সফরের কিছু ব্যবস্থা করে রাখতে পারেন। এই সূত্রে এখনই যেন কেউ টাকাপয়সা খরচ করে না বসেন; সেটা ঠিক হবে না। যেখানেই তিনি যান, যাতায়াতের ভাড়া মিটিয়ে দিতে হবে; কিন্তু সে-সব ব্যবস্থা একমাত্র তখনই করা সম্ভব। গান্ধীজী স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, যে-সব জায়গায় তাঁর যাবার ইচ্ছা ছিল, স্বাস্থ্য ভাল থাকলে তার সবগুলিই তিনি সফর করবেন। তবে তাঁর বয়স ও স্বাস্থ্যের কথা মনে রাখলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, যদিও তিনি যথাসম্ভব বেশী জায়গায় যেতে ইচ্ছুক, তবু কার্যত তিনি হয়ত তার কয়েকটিতেই মাত্র যেতে পারবেন।”

এইটুকুই প্রকাশ করতে পারো। এবারে বলি, আমার ইচ্ছা কী। সম্ভব হলে আমি মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম, ঢাকা, বরকামতা, শান্তিনিকেতন আর আসাম যেতে চাই। অন্য কোনও জায়গা যদি বাদ পড়ে গিয়ে থাকে—যথা ফেনী—তবে সেখানেও আমার যাবার ইচ্ছে। তোমরা সবাই মিলে আমার কার্যসূচী স্থির করবে; স্থানীয় সংগঠকদের সেই কার্যসূচীর কথা জানিয়ে দিতে পারো। যানবাহনের ব্যবস্থাও করে রাখতে হবে। সংবাদপত্রে এ-সব খবর এখনই জানিয়ো না। সফরসূচী চূড়ান্তভাবে স্থির হবার পরে সেটা জানানো যাবে। প্রাথমিক ব্যবস্থাদি করে রাখতে সময় লাগে। সেইজন্যই এ-সব প্রস্তাব করেছি। অন্য আর কোথায় কোথায় সহজে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব, সেটা ঠিক করতে পারো।

আমার সঙ্গে কে-কে থাকবেন, এক্ষুনি সেটা তোমাকে জানানো দরকার বলে আমি মনে করি না। তবে এ-বিষয়ে যদি কোনও পরামর্শ দেবার থাকে, দিতে পারো।

ইতিমধ্যেই যাঁরা আমার কাছে এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আমি দেখা করতে ইচ্ছুক। আমার সঙ্গে যদি তা-ছাড়াও আরও কিছু লোকের দেখা করিয়ে দিতে চাও, তাহলে তাঁদের ডাকতে পারো। মৌলানা সাহেব বর্তমানে কলকাতায় আছেন। তাঁকে বিরক্ত কোরো না। তবে তাঁর যদি কিছু পরামর্শ দেবার থাকে, তাহলে তাঁর কাছে গিয়ে জেনে নিয়ো।

স্বাগত-ভাষণের জালে আমি জড়িয়ে পড়তে চাই না। তবে নিজের হাতে অথবা বন্ধুদের হাতে কাটা সুতো যাঁরা দিতে চান, তাঁরা যত খুশি দিতে পারেন। সেই সুতোর থেকে খাদিবস্ত্র বানিয়ে যথাসম্ভব শস্তা দামে সেখানে বিতরণ করাই আমার উদ্দেশ্য। কেউ যদি দান হিসেবে টাকাকড়ি দিতে চান, দিতে পারেন; কিন্তু বিশেষ করে যেন টাকা তুলবার চেষ্টা করা না হয়। এটা স্বেচ্ছার দান হওয়া চাই। তবে মনে রেখো, সুতো কিংবা টাকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই সফরের ব্যবস্থা করা হয়নি।

মিঃ কেসির সঙ্গে আমি দেখা করব, সে-কথা বলাই বাহুল্য। জনসাধারণের জন্য তাঁর কাছ থেকে যতটা সাহায্য পাওয়া যায়, নেব। পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, আমি যেখানেই গিয়ে ঘাটি গেড়ে বসি, আমার উপস্থিতি সেখানেই দীনদরিদ্র মানুষদের চিত্তে একটা স্বস্তির ভাব এনে দেয়। শুধু সেইটুকুও যদি সম্ভব হয়, আমি সুখী হব।

বাংলার রাজনীতিতে আমি জড়িয়ে পড়তে চাই না। একে তো তেমন ইচ্ছেই আমার নেই; তার উপরে আমি এ-সম্পর্কে বিশেষ খবরও রাখি না।

এ-ব্যাপারে তোমরা যে-সিদ্ধান্তই নাও না কেন, সেটা যেন নেহাত সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত না হয়; সিদ্ধান্তটা সর্ববাদিসম্মত হওয়া চাই। সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইচ্ছা অনুযায়ী এ-সব ব্যাপারে মীমাংসা হওয়া ঠিক নয়। আমার প্রস্তাবিত সফরে যাঁরা আগ্রহশীল, কোনও একটা বিশেষ কাজ সম্পর্কে তাঁদের কোনও-একজনের যদি মনে হয় যে, সেটা করা ঠিক হবে না, তাহলে সে-কাজ আমি করতে চাই না। আমার সফর নিয়ে কিছুতেই যেন ঝগড়া না বাধে। ঝগড়া মেটানোই আমার ধর্ম। এই চিঠিখানি, কিংবা এর একটি নকল, সতীশবাবুকে দিও। তোমাদের শরীর আলাদা বটে, কিন্তু আমি গিয়ে পৌঁছবার আগে তোমরা একমন হও, এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। তোমরা দুজনেই একই গুরুর খ্যাতিমান শিষ্য; এবং সেই গুরু হচ্ছেন পি. সি. রায়ের মতন মহান মানুষ। তোমাদের হৃদয় সত্যিকারের ঐক্যবন্ধনে বাঁধা পড়েছে. এইটেই আমি দেখতে চাই। তোমরা দুজনেই তো আমারই কাজ করছ। তাহলে তোমাদের মধ্যে বিরোধ থাকবে কেন? যাই হোক্, এই সবকিছুর মধ্যেই ঈশ্বরের করুণা রয়েছে, সেইটেই বড় কথা।

বাপুর আশীর্বাদ নাও।"

১৯৪৫ সনের ১লা ডিসেম্বর বিকেলবেলা গান্ধীজী কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। গভরনর কেসি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে গান্ধীজীর জন্যে আমার হাতে ছোট্ট একটি স্বাগত-লিপি তুলে দেন, এবং বলেন যে, দু-এক দিনের মধ্যে আমি তঁদের সাক্ষাৎ করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়। কেসির স্বাগত-লিপিটি এখানে উদ্ধৃত করছি :

গভর্নমেন্ট হাউস,
কলকাতা,
১লা ডিসেম্বর, ১৯৪৫

"প্রিয় মিঃ গান্ধী,

সুধীরের হাতে আমি আপনাকে এই চিঠি পাঠাচ্ছি। আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমি খুবই উৎসুক। যখন আপনার ইচ্ছে হয়, তখনই দেখা হতে পারবে। কাল (রবিবার) কিংবা সোমবারও তার ব্যবস্থা হতে পারে।

মনে হয়, দীর্ঘপথ ভ্রমণের পর আপনি এখন ঈষৎ ক্লান্ত। ভ্রমণ আশা করি যথাসম্ভব আরামদায়ক হয়েছিল, পথে বিশেষ কষ্ট হয়নি।

আন্তরিকভাবে আপনার
আর. জি. কেসি"

গান্ধীজী বললেন, দু-এক দিনও তিনি অপেক্ষা করতে রাজী নন, সেইদিনই সন্ধ্যায় তিনি গভরনরের সঙ্গে দেখা করবেন। সুতরাং গভরনরকে আমি ফোন করে জানিয়ে দিলাম যে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গান্ধীজী সেখানে পৌঁছচ্ছেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের যিনি পয়লা নম্বর শত্রু, ব্রিটিশ রাজের একজন প্রতিনিধির প্রতি তাঁর আচরণে যে এত গভীর সৌজন্যের পরিচয় পাওয়া যাবে, কেসি সে-কথা ভাবতেও পারেননি। এদিকে গান্ধীজীও একজন ব্রিটিশ শাসকের আচরণে এতটা আগ্রহের পরিচয় পেয়ে খুশী হলেন। সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত্রি সাড়ে নটা পর্যন্ত সেদিন তাঁদের আলোচনা চলেছিল। কথা হচ্ছিল নানান বিষয় নিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর জীবন নিয়ে, টলস্টয় খামারের বাসিন্দাদের নিয়ে, জেনারেল স্মাট্‌সের সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে,—এককথায় যাবতীয় বিষয় নিয়ে তাঁরা গল্প করছিলেন। রাত যখন সাড়ে নটা বাজে তখন আমি আলোচনায় বাধা দিয়ে বললাম, "বাপু, এবারে আমাদের ওঠা দরকার। গভরনরের নিশ্চয়ই এখনও খাওয়া হয়নি।" তাঁরই জন্যে যে গভরনর আটকা পড়ে গেছেন, ডিনার খেতে পারেননি, এই কথাটা জানতে পেরে গান্ধীজী বড়ই কষ্ট পেলেন। গান্ধীজী তাঁর খাওয়ার পাট সূর্যাস্তের আগেই চুকিয়ে দিতেন। কিন্তু ব্রিটিশ গভরনররা যে সূর্যাস্তের আগে ডিনার খেতে অভ্যস্ত নন, গান্ধীজীর তা মনে ছিল না।

বিরাট লাট-প্রাসাদের (ভারতবর্ষের রাজধানী ১৯১১ সনে কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হবার আগে ব্রিটিশ বড়লাটরা এই বাড়িতেই থাকতেন) দোতলায় গভরনরের পাঠকক্ষ। গান্ধীজীর সঙ্গে সেইখানেই তাঁর কথাবার্তা হচ্ছিল। বিদায় নিয়ে আমরা যখন উঠে পড়লাম, সৌজন্যবশত কেসিও তখন আমাদের সঙ্গে নীচে নেমে এলেন, এবং পর্চ পর্যন্ত এগিয়ে এসে গান্ধীজীকে গাড়িতে তুলে দিলেন। পর্চ পর্যন্ত আসতে হলে একতলার বিরাট হলঘরটিকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অতিক্রম করে আসতে হয়। গান্ধীজীর সঙ্গে সেই হল অতিক্রম করে আসতে আসতে যে-দৃশ্য কেসির চোখে পড়ল, তার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। অবাক হয়ে তিনি দেখলেন যে, লাট-প্রাসাদের পরিচারকদের প্রত্যেকে সেই হল্-এ এসে

হাজির হয়েছে। মালী, পাচক, ঝাড়ুদার, দফতরী—সংখ্যায় তারা প্রায় দুশো। সেই বিরাট পরিচারক-বাহিনী হল্-এর দু ধারে করজোড়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের অনেকেরই আদুড় গা; আবার অনেকেরই এমন জামা-কাপড়, গভরনরের সামনে যা পরে হাজির হওয়া চলে না। আসলে ব্যাপারটা এই যে, গান্ধীজীর আগমন-বার্তাটা হঠাৎ তারা শুনতে পেয়েছিল। লাট-প্রাসাদের পরিচারক-মহলে অকস্মাৎ এই খবর ছড়িয়ে গিয়েছিল যে, মহাত্মাজী 'লাট-সাহেব'-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। শুনে তাদের মনে হয়েছিল, মহাত্মাকে দর্শন করবার এই মস্ত সুযোগ। খবর পেয়েই তারা ছুটে আসে। কিন্তু 'লাট-সাহেব'ও যে মহাত্মাজীকে বিদায় জানাবার জন্যে উপর থেকে নীচে নেমে আসবেন, তা তারা ভাবতে পারেনি। কী করে ভাববে। এমনটা তো এর আগে কোনও 'লাট-সাহেব' কখনও করেননি। যাই হোক্, গভরনরকে দেখে তারা একটু ঘাবড়ে গেছে বলে মনে হল। ব্যাপার দেখে কেসিও কিছু কম বিস্মিত হননি। সমবেত পরিচারকদের দিকে হাত তুলে গান্ধীজীকে তিনি বললেন, "দেখুন একবার ব্যাপারটা। বিশ্বাস করুন, আমি ওদের ডাকিনি।" পরের দিন আমি কেসির সঙ্গে আবার দেখা করতে এসেছিলাম। কেসি তখন আমাকে বললেন, "জানো, এমন দৃশ্য দেখব, এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি। গভর্নমেন্ট হাউসের এই পরিচারকদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান! এ-দেশের মুসলমানদের হৃদয়েও যে গান্ধীর এমন প্রতিষ্ঠা, তা আমি জানতুম না।"

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় গান্ধীজীর সফর-সংক্রান্ত খুঁটিনাটি নানা ব্যাপার নিয়ে গভরনর আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন। তারপর গান্ধীজীকে বলতে বললেন যে, বাংলাদেশের জনসাধারণ যে গান্ধীজীর জন্যে সমস্ত কিছুই করতে প্রস্তুত, তা তিনি জানেন; তবু গভরনর হিসেবে তিনিও কিছু করতে চান। এই মহান মানুষটির সফরে তো অনেক যানবাহনের দরকার হবে; তাঁকে অতিথি হিসেবে গণ্য করে গভরনর সেই যানবাহনের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিতে ইচ্ছুক। তা কি তাঁকে করতে দেওয়া হবে? এ সম্পর্কে বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারি কেতামাফিক যে নোট প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, গভরনর সেটি আমার হাতে তুলে দিলেন। নোটটি হচ্ছে এই :

"(১) শান্তিনিকেতন ও রামপুরহাট সফর

ইস্ট ইনডিয়ান রেলওয়েকে এ-বিষয়ে জানানো হয়েছে, এবং মিঃ গান্ধী ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য তাঁরা পৃথক একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরার ব্যবস্থা করতে রাজী হয়েছেন। সাধারণ ট্রেনের সঙ্গেই এই কামরাখানি জুড়ে দেওয়া হবে।

(২) তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় সফর

সরকারী একটি স্টীম লন্চ তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের কলকাতা থেকে উড়িষ্যা খালের মুখে গেঁওখালি (তমলুক মহকুমা) পর্যন্ত পেঁছে দেবে। বন-বিভাগের একটি মোটর বোট (তাতে ৬ থেকে ৮ জন পর্যন্ত লোক দাঁড়িয়ে যেতে পারেন কিংবা ২ জন লোক শুয়ে যেতে পারেন) সেখান থেকে তাঁকে গ্রামাঞ্চলে নিয়ে যাবে। যেখানে যেখানে দরকার, জেলা ম্যাজিসট্রেট সেখানে-সেখানে সরকারী গাড়ির ব্যবস্থা করবেন।

(৩) পূর্ববঙ্গ সফর

যে-ট্রেন গোয়ালন্দ পর্যন্ত যাবে ও যে-ট্রেন চাঁদপুর থেকে ছাড়বে, তাতে তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য বি. এ. রেলওয়ে একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা জুড়ে দেবেন। গোয়ালন্দ থেকে সাধারণ সারভিস স্টীমারে তাঁরা মুনশীগঞ্জ পর্যন্ত যাবেন (তাতে তাঁদের জায়গার ব্যবস্থা থাকবে)। মুনশীগঞ্জে মিঃ গান্ধীর ব্যবহারের জন্য একটি সরকারী স্টীম লন্‌চ তৈরী রাখা হবে। সাধারণ স্টীমারে তিনি চাঁদপুরে যাবেন (জায়গার ব্যবস্থা আমরা করব)। দরকার হলে চট্টগ্রাম একটি লন্‌চ কিংবা কয়েকটি মোটরগাড়ির ব্যবস্থা করবে।

আগে থাকতেই যে-সব কথা জানিয়ে রাখা দরকার, তা এই :

(১) তাঁর দলের মোট সদস্যসংখ্যা (গে'ওখালিতে দ্বিতীয় একটি মোটরবোটের ব্যবস্থা রাখবার দরকার হতে পারে; যদি হয়, তবে এক সপ্তাহেরও আগে সে-কথা জানানো প্রয়োজন)।

(২) একটি পাকা সফর-সূচী

আমি যে সফর-সূচী পেয়েছি, মনে হয়, সেটা পাকা নয়, তার অদল-বদল ঘটতে পারে। একেবারে শেষ মুহূর্তে যদি হঠাৎ যানবাহনের ব্যবস্থা করবার জন্য অনুরোধ করা হয়, তবে সেই ব্যবস্থা করতে অসুবিধে হবে।

(৩) সম্ভবত মিঃ গান্ধীকে এ-কথা বুঝিয়ে বলা যেতে পারে যে, শুধু তাঁর ও তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্যই সরকারী যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে যে-পথ দিয়ে ঈশ্বর প্রেরিত এই মানুষটি একদা হেঁটে গিয়েছিলেন, আমাদের উত্তরপুরুষরা হয়ত একদিন সেই পথ দিয়ে হাঁটতে ও তাঁর চরণের স্পর্শে পবিত্র সেই পথের ধূলিরাশি চুম্বন করতে চাইবে। গান্ধীজীর সম্পর্কে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন, "ভবিষ্যৎ কালের নরনারীদের পক্ষে এ-কথা বিশ্বাস করা শক্ত হবে যে, পৃথিবীর পথের উপর দিয়ে সত্যিই এমন একজন মানুষ একদা হেঁটে গিয়েছেন।" আমাদের উত্তর-পুরুষরা জানতে চাইবে, আইনস্টাইন যে এমন কথা বলেছিলেন, এর কারণ কী।

গান্ধীজী এই সফরসূচীর কিছু পরিবর্তন করেন। তিনি দেখলেন যে, মেদিনীপুর জেলার যত জায়গায় তাঁর যাবার ব্যবস্থা হয়েছে, তত জায়গায় তিনি যেতে পারবেন না। তাই তমলুক মহকুমার সুতাহাটাকে (বাসুদেবপুর) তিনি তাঁর সফর-সূচী থেকে বাদ দিয়ে দিলেন। ঢাকা আর চট্টগ্রামেও তিনি যেতে পারেননি। তার পরিবর্তে, মেদিনীপুর সফর শেষ হবার পর, কলকাতা থেকে তিনি আসামের গৌহাটী ও ধুবড়িতে যান। কলকাতা থেকে গান্ধীজী প্রথম যান ডায়মণ্ডহারবারে; সেখান থেকে যান মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে। মহিষাদল থেকে, সরকারের বন-বিভাগের একটি ছোট লন্‌চে করে, তিনি কাঁথি যান। খালপথে কুড়ি মাইল; লন্‌চে এই পথ পাড়ি দিতে আমাদের পুরো একটি সকাল লেগে গেল। খালের দুই ধারে, সারাটা পথ, শুধুই আবালবৃদ্ধবনিতার ভিড়। লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। কাঁথিতে যেতে গান্ধীজীর বিশেষ আগ্রহ ছিল। সেখানে কয়েকটা দিন কাটালেন। ১৯৪২ সনের অকটোবরে

মেদিনীপুরের এই এলাকাটিই সাইক্লোন আর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ভীষণভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল। পৃথিবীর এই অঞ্চলে ইতিপূর্বে আর কখনও এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্বিপাক ঘটেনি। সেইদিক থেকে এই তাণ্ডব সম্পূর্ণই অস্বাভাবিক। সাইক্লোনের প্রলয়ের মধ্যেই হঠাৎ একদিন রাত্রে সমুদ্র থেকে ২০ ফুট উঁচু এক জলোচ্ছ্বাস এসে জেলার মধ্যে ঢুকে পড়ে। এবং তার ফলে কয়েক শত গ্রামের সলিল-সমাধি ঘটে। বেশ কিছুদিনের জন্য সেই গ্রামগুলি ২০ ফুট জলের তলায় ডুবে ছিল। পরে একসময়ে সমুদ্রের জল আবার সরে গেল বটে; কিন্তু সেইসব গ্রামের যাবতীয় জলাশয়কে একেবারে লোনা করে রেখে দিয়ে গেল। মানুষ আর গো-মহিষের তৃষ্ণা মেটাবার মতন একফোঁটা পানীয় জল সেখানে ছিল না। গোটা এলাকার শস্যও একেবারে নষ্ট হয়েছিল। দেশের যানবাহনকে তখন যুদ্ধায়োজনের অগ্রাধিকারের দাবি মেটাতে হচ্ছে; ফলে দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে যে দ্রুত সেখানে খাদ্যশস্য পাঠানো হবে, তারও উপায় ছিল না। এইভাবেই শুরু হল বাংলা দেশের সেই ভয়ংকর মন্বন্তর।

যুক্তরাজ্য আর মারকিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে ফ্রেন্ড্স অ্যামবুলেন্স ইউনিট পাঠানো হয়েছিল, তাদের উদ্যোগে মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমায় দুর্ভিক্ষত্রাণের কাজ চলতে থাকে। গোটা ১৯৪৩ সন জুড়ে সেই ত্রাণকার্যেই আমি নিয়োজিত ছিলাম। যাঁদের সঙ্গে তখন কাজ করেছি, তাঁরা ব্রিটেন আর আমেরিকার আদর্শনিষ্ঠ শান্তিবাদী একদল তরুণতরুণী। যুদ্ধে যাবার পরিবর্তে স্বেচ্ছায় এঁরা দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ-কার্যের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। গান্ধীজীর বিশিষ্ট কোয়েকার বন্ধু হোরেস আলেকজানডারের অনুরোধে আমি ভারতবর্ষে ফ্রেনডস অ্যামবুলেন্স ইউনিটে যোগদান করেছিলাম। অতঃপর দুর্ভিক্ষ ও তার পরবর্তী কালে বাংলা দেশের এই অংশে আমি তাঁদের সঙ্গে কাজ করেছি। ১৯৪৩ সনের ফেরবুয়ারি মাসে আমি কাঁথিতে গিয়ে সেবার কাজ শুরু করি। কাঁথি মহকুমার লোকসংখ্যা তখন প্রায় সাত লক্ষ। আর এক বছর বাদে যখন আমি সেখান থেকে চলে আসি, কাঁথির লোকসংখ্যা তখন হ্রাস পেয়ে পাঁচ লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। চলে আসবার সময় স্থানীয় একদল যুবক আমার সম্মানার্থে এক বিদায়-সংবর্ধনার আয়োজন করেছিল। সভাস্থলে আমার ব্রিটিশ আর মারকিন সহকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের যাতে বুঝতে সুবিধে হয়, তার জন্য স্থানীয় জনৈক যুবক স্থির করে যে, সে বাংলার পরিবর্তে ইংরেজীতে বক্তৃতা দেবে। বক্তৃতায় সে বলল যে, আমি অতি চমৎকার লোক, কাঁথির লোকেদের আমার কাছে কৃতজ্ঞতার অবধি নেই। অতঃপর গম্ভীরভাবে যে-কথা জানাল, বাংলা তর্জমা না-করে সেটা একেবারে ইংরেজীতেই উদ্ধৃত করছি। ছেলেটি বলল, মিঃ ঘোষ হ্যাড 'অরগানাইজড্ দি ফেমিন' ভেরি এফিসিয়েন্ট্লি! তা এক বছরের মধ্যে লোকসংখ্যা যেখানে সাত লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষে নেমে আসে, সেখানে দুর্ভিক্ষকে যে অতি দক্ষভাবে অরগানাইজ করা হয়েছিল, তাতে আর সন্দেহ কী!

সফরকালে গান্ধীজীর প্রধান কাজ ছিল প্রার্থনা-সভার অনুষ্ঠান। প্রতিদিন সন্ধ্যা পাঁচটায় তিনি একটা খোলা জায়গায় প্রার্থনায় বসতেন, এবং আমরা সবাই তাঁর প্রিয় ভক্তিমূলক গান গাইতুম। সভাস্থলে প্রায় দু-তিন লক্ষ লোকের সমাবেশ হত। আমাদের গানের শেষে গান্ধীজী সেই সমবেত জনতাকে তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে রামধুন গাইতে বলতেন। রামই তাঁর ঈশ্বর। গান্ধীজীর সেই প্রার্থনা-সভার দৃশ্য বস্তুত অবিস্মরণীয়। দূর গ্রামাঞ্চলের নরনারীরাও দলে দলে তাঁর সভায় আসত।

সকালে তারা তাদের গ্রাম থেকে (অনেকেই বাচ্চা কোলে নিয়ে) রওনা হত, এবং সন্ধ্যা পাঁচটায় গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভায় এসে যোগ দিত। খাবার-দাবার তাদের সঙ্গেই থাকত। পথেই তারা খেয়ে নিত। বিশ্রাম নিত গাছতলায়। গ্রামাঞ্চলের শান্ত পরিবেশে, অস্তসূর্যের লাল আভা যখন সারা আকাশে ছড়িয়ে গেছে, তখন, লক্ষ মানুষের সেই জনতা একযোগে হাতে তালি দিয়ে, তাল রেখে, এই বিশ্বজগতের নিয়ন্তা রামের নামে গান গাইত। গান্ধীজীর পাশে বসে, হৃদয়কে-নাড়া-দেওয়া এই ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করতুম, এবং ভাবতুম, কেমন করে এটা সম্ভব হয়; লক্ষ লক্ষ সরল গ্রামবাসীর ওই জনতা,—এই নামগানের মধ্যে থেকে কোন্ শান্তি ওরা আহরণ করছে। এই অস্বাভাবিক পরিবেশের সান্নিধ্যে এসে কিছু-একটা প্রেরণা যে তারা পেত, তাতে সন্দেহ নেই।

মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় ফিরে এসে গান্ধীজী আরও কয়েকবার গভরনর কেসির সঙ্গে দেখা করেন। গান্ধীজীর প্রধান সেক্রেটারি শ্রীপ্যারেলাল তাঁর 'দি লাস্ট ফেজ' (শেষ অধ্যায়) গ্রন্থে সেই সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিয়েছেন। শ্রীপ্যারেলালের মতে, "ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার পর থেকে দীর্ঘকাল ধরে ব্রিটিশ শাসক-মহলের সঙ্গে কংগ্রেসের যে বিরোধ চলছিল, সেই বিরোধের মরুভূমিতে এই প্রথম একটি মরুদ্যানের দেখা পাওয়া গেল।" দিল্লির আমলাদের অবশ্য তখনও জঙ্গীভাব। বাংলা দেশের অস্ট্রেলীয় গভরনর যে তারই মধ্যে গান্ধীজীকে এতটা সৌজন্য দেখালেন, এটা তাঁদের আদপেই ভাল লাগেনি। গান্ধী-কেসি বৈঠকগুলিকেও তাঁরা সুনজরে দেখেননি। তাঁদের অসন্তোষ অচিরেই প্রকট হয়ে উঠল। এ যখনকার কথা বলছি, ভারতের ব্রিটিশ বণিক-সভার (অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্স) বার্ষিক সভায় বক্তৃতা দেবার জন্য ভাইসরয়রা তখন প্রতি বছর ডিসেমবর মাসে কলকাতায় আসতেন। ক্ষমতাবান ইংরেজদের এই বার্ষিক সভা তখন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হত, এবং এই অনুষ্ঠানকে এতটাই গুরুত্ব দেওয়া হত যে, উপর্যুপরি কয়েকজন ভাইসরয় সেখানে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতি ইতিপূর্বে ঘোষণা করেছিলেন। যাই হোক্, সেবারকার অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য ভাইসরয় দিল্লি থেকে রওনা হবার আগে কেসি তাঁর কাছে প্রস্তাব করেন যে, কলকাতায় এসে তিনি যদি গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তো বেশ হয়। বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে কেসি এই প্রস্তাব করেননি। তিনি ভেবেছিলেন, তাঁর সঙ্গে যেমন মাঝে-মাঝেই গান্ধীজীর বন্ধুত্বপূর্ণ কথাবার্তা হচ্ছে, তেমনি লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গেও যদি হয়, তো মন্দ কী, তাতে ভালই হবে।

ব্রিটিশ বণিক-সভার অনুষ্ঠানে ভাইসরয় যে বক্তৃতা দিলেন, তাতে কিন্তু অন্য রকমের সুরের ছোঁয়া লাগল। তিনি সেখানে বললেন: "'ভারত ছাড়ো' ধ্বনিটা 'চিচিং ফাঁক'-এর মতন এমন কোনও জাদুমন্ত্র নয়, আলিবাবার রত্নগুহা যা খুলে দিতে পারে। মীমাংসা নির্ভর করছে অনেকগুলি পক্ষের উপরে। কংগ্রেস আছে, সংখ্যালঘুরা আছে, মুসলিমরা আছে, দেশীয় রাজন্যরা আছেন, ব্রিটিশ সরকার আছে। এদের সকলের মধ্যে, যেমন করেই হোক, কিছুটা অন্তত মতৈক্য হওয়া চাই।"

যে-মনোভাবের ভিত্তিতে গান্ধী-কেসি সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়েছিল, ভাইসরয়ের এই মনোভাবের সঙ্গে তার দুস্তর পার্থক্য। আসলে গান্ধীজী আর কেসির মধ্যে মাঝে-মাঝেই যেভাবে আলোচনা হচ্ছিল, ভাইসরয় আর তাঁর আমলারা তাতে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি জর্জ অ্যাবেল এই সময়ে আমার

হাতে একটি প্রেস-স্টেটমেনটের খসড়া তুলে দেন, এবং বলেন যে, কাগজে এটা ছাপতে দেবার আগে এবং গান্ধীজীর সঙ্গে ভাইসরয়ের সাক্ষাৎ হবার আগে খসড়াটা আমি যেন একবার গান্ধীজীকে দেখাই। খসড়াটা হচ্ছে এই :

"বাংলার গভরনর ও মিঃ গান্ধীর মধ্যে যে-সব সাক্ষাৎকার হয়েছে এবং ভাইসরয় ও মিঃ গান্ধীর যে সাক্ষাৎকার হবে, তা নিয়ে অনেক জল্পনা চলছে। এইসব জল্পনার ফলে ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে বলে, এবং কোনও একটি বিশেষ দলের সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা হচ্ছে কিংবা হতে পারে এই সন্দেহ দেখা দিতে পারে বলে, এর বিরুদ্ধে সরকারীভাবে একটা বিবৃতি দেওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। অবস্থার এই পর্যায়ে কোনও দলের সঙ্গেই আলোচনা করবার কোনও ইচ্ছা সরকারের নেই। মুখ্য দলগুলির নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে, তাঁদের মতামত শুনতে এবং তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রাখতে ভাইসরয় সর্বদাই প্রস্তুত; তবে নির্বাচনের আগে আলোচনা হবার কোনও সম্ভাবনা নেই।"

কিন্তু গান্ধীজী তো ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করেননি; গভরনর কেসিই বন্ধুভাবে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। প্রেস স্টেটমেনটের খসড়া পড়ে গান্ধীজী তাই মোটেই খুসী হলেন না। নম্রভাবে তিনি প্রস্তাব করলেন যে, আরও দুটি বাক্য যেন এই স্টেটমেনটের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। আমাকে সেই বাক্য দুটি তিনি ডিকটেশনও দিলেন। বাক্য দুটি হচ্ছে :

"তবে মিঃ গান্ধীর ক্ষেত্রে ভাইসরয় যেহেতু জানতে পারেন যে, ভাইসরয়ের কলকাতা সফরের সময় মিঃ গান্ধীও এখানে থাকবেন, তাই মিঃ গান্ধীর সঙ্গে তিনি দেখা করতে চান, এবং যে-সব বিষয়ে ভাইসরয়ের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ চলছিল তা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভাইসরয়ের এই ইচ্ছায় মিঃ গান্ধী খুশী হয়েছেন, এবং সোমবার তাঁদের সাক্ষাৎ হবে।"

ভাইসরয় ও জর্জ অ্যাবেল কিন্তু এই বাক্য দুটিকে প্রেস স্টেটমেনটের সঙ্গে জুড়ে দিতে অসম্মত হন। ফলে গভরনর কেসি খুবই অস্বস্তিতে পড়েন। নেহাতই সামান্য একটা ব্যাপার। কিন্তু তাকে কেন্দ্র করেও যে বিদ্বেষ ফেনিয়ে উঠল, সেই বিদ্বেষই সে-আমলে ইঙ্গ-ভারত সম্পর্ককে অভিশপ্ত করে রেখেছিল।

গান্ধীজীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। ভাইসরয় কিংবা আর-কারও সঙ্গে রাজনীতি আলোচনার ইচ্ছাই তখন ছিল না তাঁর। দেড় মাসের এই বাংলা-আসাম সফরে তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল এই যে, তিনি গ্রামের মানুষদের মধ্যে গিয়ে থাকবেন। তাতে যদি তারা কিছুটা স্বস্তি আর সান্ত্বনা পায় তো সেইটুকুই লাভ। গান্ধীজী যখন কলকাতার উত্তরে সোদপুর আশ্রমে থাকতেন, তখন গ্রামাঞ্চল থেকে দলে-দলে মানুষ তাঁকে রোজ দেখতে আসত। মাঠে লাঙ্গল দেওয়া, বীজ বোনা আর চারা বসানো, সেচ, ফসলহানি ইত্যাদি নানান সব সমস্যার কথা তারা বলত; ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান্ধীজী সে-সব শুনতেন। আশ্রমের প্রাঙ্গণে একটা জায়গা ঘিরে দেওয়া হয়েছিল; সেখানেই, স্নানের আগে, গান্ধীজী একটা তক্তাপোষে শুয়ে থাকতেন, আর তাঁর শরীরে তৈল মর্দন করা হত। ডিসেমবরের এক উজ্জ্বল সকালে তিনি হঠাৎ সেখানে আমাকে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখি, বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া সেই জায়গাটিতে তক্তাপোষের উপরে গান্ধীজী শুয়ে আছেন, আর তাঁর পৌত্র কানু গান্ধী তাঁকে তেল মাখাচ্ছেন। সারাটা দিনই তো গান্ধীজীকে হাজার কাজে ব্যস্ত থাকতে হত; সকালে এই সময়টাতেই তিনি খানিকটা নিরিবিলি চিন্তা করবার

অবকাশ পেতেন। চোখ বুজে গান্ধীজী শুয়ে ছিলেন। আমি যেতে তিনি চোখ খুলে বললেন যে, হুগলি থেকে একদল আলু-চাষী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, তাদের সমস্যার কথা শুনে তিনি খুব কষ্ট পেয়েছেন। এই গরিব চাষীরা বছরের এই সময়টাতে আলুর চাষ করে। এবারে বীজ-আলু বসাবার সময় তো পার হতে চলল, কিন্তু পোস্তার আলু-বাজার থেকে বীজ-আলু কেনা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর মাত্র দিন-কয়েকের মধ্যে যদি তারা বীজ-আলু না পায়, তাহলে এবারে আর আলুর চাষ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না, ফলে ছেলেপুলে নিয়ে তাদের অনাহারে থাকতে হবে।

"তোমাকে এর একটা বিহিত করতে হবে,—এবং আজই করতে হবে।" রীতিমত জোর দিয়ে গান্ধীজী আমাকে এই নির্দেশ দিলেন। তারপর বললেন, "তুমি তো বলো যে, এই গভরনরটি লোক ভাল। তা তিনি এই গ্রামবাসীদের জন্যে বীজ-আলু জোগাড় করে দিন না। দিলে তবে বুঝব যে, তিনি সত্যিই ভাল লোক।"

শুধু নির্দেশ দিয়েই গান্ধীজী ক্ষান্ত হলেন না। তেল মাখা আর স্নান শেষ করেই তিনি বীজ-আলুর ব্যাপারটা নিয়ে গভরনর মিঃ কেসিকে চিঠি লিখতে বসলেন। চিঠিখানি এই :

খাদি প্রতিষ্ঠান
সোদপুর,
৮ই ডিসেমবর, ১৯৪৫

"প্রিয় বন্ধু,

মনের মধ্যে প্রবল দ্বিধা নিয়ে এই চিঠি লিখছি। যত দেখছি-শুনছি, বাংলা দেশের ঘটনায় আমার বেদনা ততই বাড়ছে। সমস্যার একটা নমুনা এখানে তুলে ধরছি। এর আশু প্রতিকার প্রয়োজন।

সতীশবাবুর কাছে শুনলাম, আলু-চাষীরা বীজ-আলু পাচ্ছে না, এদিকে আর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই বীজ-আলু বসাবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। বাজারে সরকারী কনট্রোলের বীজ-আলু অবশ্য আছে। কিন্তু চাষীরা তা পাচ্ছে না।

সতীশবাবুর খবর যদি সত্যি হয়, তবে তো বুঝতেই হবে, এ-ব্যাপারে কোথাও একটা মারাত্মক গলদ রয়েছে। জানি না, আপনি এর কিছু বিহিত করতে পারেন কিনা। এই ধরনের কাজকর্ম আপনি যাঁকে দিয়ে করান, সেই মিঃ দে-র কথা আমি আপনার কাছে শুনেছি। আপনিই বলছিলেন যে, মানুষটি বেশ চালাক-চতুর। এই জরুরী সমস্যার যাতে একটা বিহিত হয়, তার জন্যে কি তাঁকে কিংবা অন্য-কোনও অফিসারকে আমার কাছে পাঠাতে পারবেন?

এই চিঠি যাতে এখুনি আপনার হাতে পেঁছয়, তার ব্যবস্থা করছি। বাংলা দেশের বিরাট পটভূমিকায় এই সমস্যাটাকে হয়ত খুবই ছোট দেখাচ্ছে, কিন্তু দরিদ্র চাষীদের জীবনে এইটেই এখন সবচাইতে জরুরী সমস্যা। তাদের জীবিকায় টান পড়েছে।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম. কে. গান্ধী"

হিজ একসেলেন্সি দি গভরনর অব বেংগল,
ক্যালকাটা

চিঠি হাতে উর্ধশ্বাসে আমি লাট-ভবনে পেীছলাম। জানালাম, লাট-সাহেবের সঙ্গে এখুনি আমাকে দেখা করতে হবে। গভরনরদের সেকালে অতিবৃহৎ ব্যক্তি বলে গণ্য করা হত। বলা নেই কওয়া নেই, অল্পবয়সী এক যুবক এসে দুম করে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির অফিসে ঢুকে পড়ে বলবে যে, তখুনি তার লাটসাহেবের সঙ্গে মোলাকাত করা চাই, এমন কথা সে-আমলে স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারত না। এমনভাবে দেখা-সাক্ষাতের রেওয়াজই ছিল না তখন; মনে করা হত যে, এ-সব নেহাতই কেতাবিরুদ্ধ কান্ড। তদুপরি গভরনরের সেক্রেটারি তখন জে. ডি. টাইসন। ঝানু সিভিল সারভ্যান্ট; নিয়মের ব্যতিক্রম তিনি বরদাস্ত করতেন না। যাই হোক, আমাকে জিজ্ঞেস করা হল, "আপনার আলোচনার বিষয়টা কি খুব জরুরী? তাঁকে আপনি কী বলতে চান?" উত্তরে বললুম, "গভরনরকে আমি বীজ-আলুর কথা বলব।"

শুনে টাইসন তো স্তম্ভিত। "বীজ-আলু? কী বলছেন মশায়? বীজ-আলুর সঙ্গে বাংলা দেশের গভরনরের কী সম্পর্ক? আপনি কি পাগল হয়েছেন?"

কথা না-বাড়িয়ে আমি মহাত্মা গান্ধীর চিঠিখানি এগিয়ে দিলুম। গান্ধীজীর আপন-হাতে লেখা চিঠি; উপরে লেখা 'জরুরী'।

টাইসন জব্দ। পাশেই গভরনরের অফিস-ঘর। সেখানে গিয়ে টাইসন তাঁকে জানালেন যে, বীজ-আলুর ব্যাপারে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। মুহূর্তকাল বাদেই গভরনরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন টাইসন; আমাকে বললেন, গভরনর আমার সঙ্গে দেখা করবেন। অতঃপর আমি গিয়ে গভরনরের ঘরে প্রবেশ করলুম।

আমাকে ঢুকতে দেখেই লাট-সাহেব বললেন, "ব্যাপার কী সুধীর? বীজ-আলুর আবার কী হল? সব খুলে বলো তো।"

গভরনরের হাতে গান্ধীজীর চিঠিখানি আমি তুলে দিলাম। তারপর, বীজ-আলু নিয়ে হুগলীর চাষীরা কী সমস্যায় পড়েছে এবং গান্ধীজীর কাছে এসে কীভাবে তাদের দুঃখের কথা জানিয়েছে, সব খুলে বললাম। শুনে গভরনর বললেন, অসট্রেলিয়া আর ব্রিটেনের রাজনীতির হাড়হদ্দ তিনি জানেন, কিন্তু তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে ইতিপূর্বে আর কেউ কখনও তাঁকে বীজ-আলু খুঁজতে বলেননি। "যাই হোক, আমার যেটুকু সাধ্য, তা করছি।" বলে তিনি মিঃ টাইসনকে ফোন করে ডেকে আনালেন; এবং গম্ভীর গলায় তাঁকে বললেন, "দ্যাখো টাইসন, বাংলা দেশে অনেক বছর তুমি ম্যাজিসট্রেটগিরি করেছ। সুতরাং বীজ-আলু সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যও তোমার জানবার কথা। বেশ, তাহলে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, চটপট কাজে লেগে যাও, এবং যেখান থেকে পারো বীজ-আলু জোগাড় করো। কাজটা আজই করা চাই। তার কারণ, বীজ-আলুর জন্যে মিঃ গান্ধী খুবই অস্থির হয়ে উঠেছেন।"

মাথা চুলকে টাইসন বললেন, কৃষি-দপ্তরের সেক্রেটারি সুবিমল দত্তকে বরং ডেকে আনা যাক, তিনিই এর যা-হয় বিহিত করতে পারবেন।

সুতরাং সুবিমল দত্তকে (পরে তিনি পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারি এবং মস্কোতে আমাদের রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন) ডাকা হল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই তিনি এসে উপস্থিত হলেন। মুখে উদ্বেগের ছাপ। সেটা স্বাভাবিক। সেকালে লাট-প্রাসাদে এমনভাবে সাধারণত ডাক পড়ত না। সুতরাং উদ্বেগ হতেই পারে। যাই হোক, গভরনরের ঘরে অতঃপর বীজ-আলু সম্পর্কে রীতিমত একটা বৈঠক বসে গেল, এবং

তাতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, মিঃ দত্ত আর আমি সেখান থেকে নিমতলায় পোস্তার আলু-পট্টিতে যাব। সেখানে শ্রীদত্ত বাংলা সরকারের একজন সেক্রেটারি হিসেবে, জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগ করে, বীজ-আলুর গোটা স্টক আটক করবেন, এবং ন্যায্য দরে সেই বীজ-আলু গ্রামবাসীদের মধ্যে বণ্টন করবার ব্যবস্থা করবেন। আড়তদাররা আসলে কারসাজি করে বীজ-আলুর কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করেছিল। যে-দাম দেওয়া আলু-চাষীদের সাধ্যাতীত, সেই চড়া দাম তারা হেঁকে বসত। গরিব চাষীদের সর্বনাশ করে এইভাবে তারা প্রচুর মুনাফা লুটছিল। সরকারের একজন সেক্রেটারির পিছনে বেশ-কিছু পুলিস আর লালপট্টি-কুর্তা পরা চাপরাশী এসে আলুর আড়তে হাজির হয়েছে, এই দেখেই তো আড়তদাররা ঘাবড়ে গেল। মাননীয় সেক্রেটারি মহাশয় আলুপট্টির মাঝখানে একটা কেরাসিন-কাঠের বাক্সের উপরে উঠে দাঁড়ালেন, এবং তাড়াতাড়ি করে একটা চিলতে কাগজে তিনি যা লিখেছিলেন, সেটা সবাইকে পড়ে শোনালেন :

"ভারতরক্ষা বিধিবলে বাংলা দেশের গভরনর বাহাদুরের উপরে যে ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে, সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমি, সুবিমল দত্ত, বাংলা সরকারের সেক্রেটারি, এতদ্দ্বারা এই বাজারের যাবতীয় বীজ-আলু আটক করছি, এবং এই আদেশনামার উপরে আমার সীলমোহর লাগিয়ে দিচ্ছি।"

সেক্রেটারি মহোদয় কিন্তু তাঁর সিলটিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার জন্যে তিনি হতোদ্যম হলেন না। সেই চিলতে কাগজের উপরে চটপট তিনি একটা বৃত্ত এঁকে ফেললেন, এবং সিল-মোহরের কথাগুলিকে সেই বৃত্তের মধ্যে হাতে লিখে দিয়ে তার তলায় নিজের নাম সই করে দিলেন।

লালপট্টি-কুর্তা পরা চাপরাশিরা সেই চিলতে কাগজটিকে সেখানে একটি দেওয়ালের গায়ে সেঁটে দিল। মুহূর্তের জন্য আমার মনে এই ভয় দেখা দিয়েছিল যে, আড়তদাররা হয়ত এই চিলতে কাগজের বিজ্ঞপ্তিকে গ্রাহ্যই করবে না। কিন্তু চিলতে-কাগজেই নিমেষে ফলোদয় হল, সেক্রেটারি মহোদয় দেখতে বিশেষ জবরদস্ত নন, রোগাপানা নিরীহ চেহারার একজন বাঙালী ভদ্রলোক। কিন্তু চাপরাশীরা তো আর তা নয়। তাদের দেখেই আড়তদারদের মধ্যে সম্ভবত আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছিল। তারা আর কথা বাড়াল না। সুবোধ বালকের মতন তাদের যাবতীয় স্টক তারা ন্যায্যদামে ছেড়ে দিল। সারাটা দিন সেই বাজারের মধ্যে আমরা (সেই যে ছেলেটি পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য জ্বলন্ত জাহাজের ডেকের উপরে দাঁড়িয়ে ছিল, তার মত) ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম, এবং সানন্দে দেখতে লাগলাম যে, গ্রামবাসীরা এসে ঠেলাগাড়ি বোঝাই করে বীজ-আলু নিয়ে যাচ্ছে। অতঃপর সারাটা দিন ভাল-ভাল সব কাজ করে বয় স্কাউটরা যেভাবে তার ফিরিস্তি দেয়, সেইভাবে সন্ধ্যাবেলায় আমরা গভরনর আর মহাত্মা গান্ধীকে গিয়ে জানালাম যে, সেই একটি দিনেই আলু-চাষীদের মধ্যে মোট ২৫০ মণ (প্রায় পাঁচ হাজার কিলোগ্রাম) বীজ-আলু বণ্টিত হয়েছে। শুনে মহাত্মাজীর আনন্দের আর সীমা রইল না। আমার কাজের নমুনা দেখে তিনি বেশ গর্ববোধ করছিলেন। অতঃপর সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে যে-সব বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, মহাত্মার কাছে প্রথমেই তাঁদের প্রত্যেককে শুনতে হয়েছে বীজ-আলুর গল্প। স্বয়ং নেহরুও রেহাই পাননি।

গান্ধীজী ও নিঃসঙ্গ ভালবাসা

১৯৪৫ সনের ১লা ডিসেমবর থেকে ১৯৪৬ সনের জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত গান্ধীজী কলকাতার উপকণ্ঠে সোদপুরের খাদি প্রতিষ্ঠানে ছিলেন। ফলে সেই ছোট্ট আশ্রমটিই তখন ভারতীয় রাজনীতির পীঠস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সোদপুর আশ্রম থেকেই তিনি বাংলা আর আসামের গ্রামাঞ্চল সফর করতে গিয়েছিলেন। সেই আশ্রমই ছিল তাঁর সফর-সূচীর কেন্দ্রবিন্দু। যাই হোক্, গান্ধীজীর উপস্থিতির জন্যই ভারতবর্ষের তাবৎ অঞ্চল থেকে রাজনৈতিক নেতারা কলকাতায় আসতে আরম্ভ করেন। প্রত্যহ তাঁরা সোদপুরে গিয়ে হানা দিতেন। সেখানে রোজ সন্ধ্যায় প্রার্থনা-সভার অনুষ্ঠান হত; হাজার হাজার মানুষ তাতে যোগ দিতেন। জনতার সে এক বিরাট উৎসব।

বাংলা দেশে বিস্তর কাজ থাকা সত্ত্বেও তারই মধ্যে সময় করে নিয়ে গান্ধীজী কয়েকদিনের জন্য আসামে গিয়েছিলেন। আসামের সফর-সূচীকে সংক্ষিপ্ত না-করে উপায় ছিল না। গৌহাটীতে গান্ধীজী শ্রীমতী অমলপ্রভা দাসের শরণীয়া আশ্রমের আতিথ্য নিয়েছিলেন। আমরাও অর্থাৎ যারা গান্ধীজীর সঙ্গে আসামে গিয়েছিলাম, সেই আশ্রমে উঠি। শ্রীমতী অমলপ্রভা দাস সেবাগ্রাম আশ্রমের প্রাক্তন বাসিন্দা। গৌহাটীতে শহরের ঠিক বাইরেই তাঁর আশ্রম। গান্ধীজীর পুত্র মণিলাল গান্ধীও তখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন। মণিলাল দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতেন; সেইখানে থেকে তাঁর পিতার আরব্ধ কাজই তিনি করে যাচ্ছিলেন। স্বদেশ থেকে দীর্ঘকাল বাইরে থাকবার পরে সদ্য তখন তিনি ভারতবর্ষে এসেছেন। মানুষ হিসাবে মণিলাল খুবই সহজ-সরল। বাবার কাছে প্রায়ই তিনি অনুযোগ করতেন যে, নিজের সংসারকে তিনি অবহেলা করেছেন। মুশকিল এই যে, ‘সংসার’ বলতে আর-পাঁচজন যা বোঝে, গান্ধীজী তা বুঝতেন না। তাঁর সংসার তো নিজের পুত্রকন্যাকে নিয়ে গড়া নয়; যাঁরা তাঁর সঙ্গে থাকতেন, তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন এবং তাঁর সুখ-দুঃখের অংশ নিতেন, তাঁদের নিয়েই গান্ধীজীর সংসার গড়ে উঠেছিল। এ নিয়ে তাঁর পুত্রের কিছু ক্ষোভ ছিল। গান্ধীজীর সঙ্গী-দলে একটি মেয়ে সেইসময়ে একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ে। সামান্য জ্বর, গুরুতর কিছু নয়। কিন্তু তাতে কী, কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক ডঃ বিধানচন্দ্র রায় তৎক্ষণাৎ তাকে পরীক্ষা করতে এবং তার চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করতে ছুটে এলেন। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। আমরা তো গান্ধীজীর ‘সংসার’-এর লোক; তাই আমাদের কারও কিছু হলেই অমনি সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠতেন; সকলেই চেষ্টা করতেন যথাসাধ্য আমাদের যত্ন করতে। গান্ধীজীর ‘সংসার’-এর প্রত্যেকের সুখ-সুবিধের দিকে বিখ্যাত সব ব্যক্তিদেরও এত প্রখর নজর দেখে মণিলাল আর থাকতে পারলেন না; বাবাকে তিনি একদিন একটা লম্বা লেকচার শুনিয়ে দিলেন। লেকচারের বিষয়বস্তু এই যে, গান্ধীজী তাঁর নিজের সত্যিকারের সংসারের দিকে কখনও ফিরেও তাকাননি। বেশ তিক্তকণ্ঠেই মণিলাল সেদিন মন্তব্য করেছিলেন যে, বাপুর কাছে থাকাটা বেশ আরামদায়ক ব্যাপার, এতটুকু ঝঞ্ঝাট কাউকে পোহাতে হয় না। শান্তভাবে গান্ধীজী সব শুনে গেলেন।

তারপর নম্র গলায় বললেন, "মণিলাল, আমার কাছে থাকাটা যদি সত্যিই খুব আরামের ব্যাপার হত, তাহলে আমার ছেলেরা আমাকে ছেড়ে যেত না।"

মণিলাল ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর গান্ধীজী আমাকে বললেন, "বেচারা মণিলাল! ও কিচ্ছু বুঝতে পারে না। কাল তুমি বরং ওকে নিয়ে শিলং বেড়াতে যাও। শিলং তো চমৎকার জায়গা। যাও, মণিলালকে সঙ্গে নিয়ে একদিনের জন্য শিলং থেকে বেড়িয়ে এসো। একটা দিন একটু ফুর্তিতে কাটালে ভালই লাগবে। এখানে এই যে আমার মতন বুড়োমানুষের কাছে তোমাদের সময় কাটছে, এ তো তোমাদের ভাল লাগবার কথা নয়। তোমাদের তো হাঁফিয়ে উঠবার কথা।"

মণিলালকে একটু আনন্দ দেবার জন্যই অতএব গৌহাটীর এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে একটা গাড়ি জোগাড় করলুম; তারপর গাড়ি চালিয়ে, পার্বত্য পথে ষাট মাইল পাড়ি দিয়ে, পৌঁছলুম শৈল-শহর শিলংয়ে। তখন দুপুর, বেশ ক্ষিধেও পেয়েছিল। গাড়ি হাঁকিয়ে আমরা পাইনউড হোটেলে গিয়ে হাজির হলুম। শিলংয়ের এটি বিখ্যাত হোটেল। ডাইনিং রুমে ঢুকে একজন ওয়েটারকে ডাকলুম মধ্যাহ্নভোজের ফরমাশ দিতে। কিন্তু ওয়েটাররা দেখলুম নিজেদের মধ্যেই মুখ-চাওয়া-চাউয়ি করছে, মধ্যাহ্নভোজের ফরমাশটা আর কেউ নিচ্ছে না। অগত্যা কী আর করা যায়, চুপচাপ খানিক সময় বসে থেকে আমরা ম্যানেজারকে ডেকে পাঠালুম। ম্যানেজারটি ভারতীয়। তিনি আমাদের কাছে এসে নম্রভাবেই জানালেন যে, পাইনউড হোটেলে একমাত্র ইউরোপীয়দের ছাড়া আর-কাউকে খাবার পরিবেষণ করা হয় না। এ হল ১৯৪৬ সনের কথা। সেদিন সন্ধ্যায় গৌহাটীতে ফিরে মণিলাল বেশ রাগতভাবেই তাঁর বাবাকে জানালেন যে, বর্ণ-বৈষম্যের ব্যাপারে এমন কী দক্ষিণ আফ্রিকাও সম্ভবত আসামের চাইতে আর-একটু উদার জায়গা। ঘটনার বিবরণ শুনে গান্ধীজী কিন্তু এতটুকু উত্তেজিত হলেন না। ক্ষোভ নেই, তিক্ততা নেই,—শুধু মুখের উপরে করুণ একটি বেদনার ছায়া পড়ল। একটা দিন একটু আনন্দে কাটাবার জন্যে তিনি আমাদের শিলংয়ে পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু এক হোটেলের ম্যানেজার সেই আনন্দ মাটি করে দিয়েছে। তার জন্যেও তিনি কিছুটা দুঃখ পেয়ে থাকবেন।

গান্ধীজী যখন কলকাতায় আসেন, কলকাতায় এবং তার কাছাকাছি কয়েকটি জেলে রাজবন্দীদের সংখ্যা তখনও কয়েক শ। কলকাতা থেকে আসাম রওনা হবার আগে গান্ধীজী তাঁদের বিষয়ে গভর্নর কেসিকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠি-খানি এখানে উদ্ধৃত হল :

খাদি প্রতিষ্ঠান,
সোদপুর,
৫ই জানুয়ারি, ১৯৪৬

"প্রিয় বন্ধু,

আমার মেদিনীপুর-যাত্রা এবং সেখানে থাকার ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীরা যে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেনটের কাছ থেকে আমি একটি চিঠি পেয়েছি। তাতে তিনি জানাচ্ছেন যে, শ্রী এস. বক্সী আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অতএব আমি বাধ্য। তবে আসাম থেকে ফিরে এসে তবেই আমি দেখা করতে পারব। সেখানকার অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গেও সেই একই সময়ে আমি দেখা করতে ইচ্ছুক। তার কি কোনও ব্যবস্থা হতে পারে?

শ্রীসুধীর ঘোষ আমাকে জানাচ্ছেন যে, আগামী মঙ্গলবার আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আনন্দ পেতে চাই।

ইলেকট্রিক করপোরেশনের কর্মীদের জন্য যে সাহায্যের ব্যবস্থা হয়েছে, তার জন্যও আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম. কে. গান্ধী"

হিজ একসেলেনসি দি গভরনর অব বেঙ্গল, ক্যালকাটা।

গান্ধীজী যখন দমদম সেনট্রাল জেল, আলিপুর সেনট্রাল জেল আর প্রেসিডেন্সি জেলে যান, তখন আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। প্রতিটি জেলেই তিনি রাজবন্দীদের সঙ্গে, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করেছেন। বন্দীদের অনেকেই গান্ধীজীর অহিংস নীতিতে আস্থাশীল ছিলেন না। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না-করে সে-কথা তাঁরা স্পষ্ট জানাতেন। কিন্তু মতের যতই পার্থক্য থাক, গান্ধীজী তাঁদের চোখে ছিলেন স্নেহশীল পিতার মত। অহিংস নীতিতে তাঁদের বিশ্বাস থাক আর না-ই থাক, গান্ধীজী যে তাঁদের সকলের কথাই ভাবেন, তা তাঁরা জানতেন।

নিরাপত্তা-বন্দীদের সকলেই যতক্ষণ না মুক্তি পাচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের মুক্তির জন্য গভরনর কেসিকে ক্রমাগত জ্বালাতন করাই ছিল আমার কাজ। মিঃ কেসি তখন বাংলা দেশে তাঁর পাট তুলে দিয়ে অসট্রেলিয়ার রাজনীতিতে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তা লোকজনকে এ-সব ক্ষেত্রে ক্রমাগত জ্বালাতন করতে আমি খুবই দক্ষ; গভরনরকেও আমি অতিষ্ঠ করে তুলেছিলাম। কলকাতা থেকে গান্ধীজী মাদ্রাজে যাওয়ার দিন-পনর বাদে আমার চেষ্টা ফলবতী হল। ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে গান্ধীজীকে মিঃ কেসি এই চিঠি লিখলেন:

গভর্‌ন্‌মেন্‌ট হাউস,
কলকাতা
১লা ফেবরুয়ারি, ১৯৪৬

"প্রিয় মিঃ গান্ধী,

উপর্যুপরি আপনাকে পত্রাঘাত করছি, তার জন্য আমি দুঃখিত। যে-সব বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে, তার বর্তমান অবস্থার আভাস দেবার জন্যেই, এখানকার কাজের পাট চুকিয়ে দিতে-দিতে, আপনাকে এই চিঠি লিখছি।

জানুয়ারি মাসে মোট ৪১ জন নিরাপত্তা-বন্দীকে মুক্তি দেবার নির্দেশ আমি দিয়েছিলাম। ফেবরুয়ারি মাসে তাঁদের আরও ৫০ জন মুক্তি পাবেন। অতঃপর, তাঁদের মধ্যে আর যাঁদের-যাঁদের মুক্তি দেওয়া নিরাপদ, তাঁদের মুক্তিদানের কাজ চলতেই থাকবে।

দিন কয়েক আগে অসট্রেলিয়া থেকে ২৫ পাউন্‌ড পশম এসে পোঁছেছে। চমৎকার পরিষ্কার পশম। তাকে আমি আরও ভাল করে প্যাক করে সরাসরি সিমলায় রাজকুমারী অমৃত কাউরের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছি।

ভারতীয় রেডক্রসের বাংলা শাখার জন্য অসট্রেলিয়া আমাকে ২০০ বেল পশম দিয়েছে (এর দাম প্রায় এক লক্ষ টাকা)। এই পশম এখন অসট্রেলিয়া থেকে সমুদ্রপথে এখানে আসছে। যে-দাম নিলে খরচাটা উঠে যায়, নিতান্ত সেই দামে এই পশম বিক্রি করা হবে, এবং যথাসম্ভব এই প্রদেশের কাটুনী ও তাঁতীদের মধ্যেই এটা বণ্টন করা হবে। বিক্রয়লব্ধ টাকাটা যাবে ভারতীয় রেডক্রসে। ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রায় সর্বাংশে (এবং ১৯৪৬ সনের জুন মাসের পরে সর্বাংশে) শুধু বাংলা দেশের অসামরিক অধিবাসীদের ত্রাণকার্যের বিরাট দায়িত্ব পালনেই ব্যস্ত থাকবে।

এই সূত্রে গতকাল রাত্রে আমি বেতারে একটি ছোট্ট বক্তৃতা দিয়েছি। তার একটি নকল এইসঙ্গে পাঠালুম।

শুভেচ্ছাসহ

আন্তরিকভাবে আপনার
আর. জি. কেসি"

এম. কে. গান্ধী, এস্‌কোয়্যার.
হিন্দুস্থানী নগর.
মাদ্রাজ।

বাংলাদেশ থেকে গান্ধীজী যেভাবে মাদ্রাজ গিয়েছিলেন, সে এক বিচিত্র কাহিনী। স্বাভাবিকভাবে যদি তিনি সোদপুর থেকে মাদ্রাজ যেতেন, তো তাঁকে একটি গাড়িতে উঠে, মাইল পনর পাড়ি দিয়ে, নদী পার হয়ে হাওড়া স্টেশনে পোঁছতে হত, এবং স্টেশনে পোঁছে মাদ্রাজের ট্রেনে উঠে বসতে হত। গভরনর কেসি বলেছিলেন, হাওড়া থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত তিনি একটি স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

সৌজন্যবশতই গান্ধীজীর কাছে তাঁর এই প্রস্তাব। কিন্তু, ঠিক শিশুর মতই, গান্ধীজীর মাঝে-মাঝে অদ্ভুত সব ইচ্ছে হত। দিনকয়েক বাদেই কলকাতা ছাড়তে হবে, আমরা তাই তখন গোছগাছ নিয়ে ব্যস্ত। সেইসময়ে গান্ধীজী একদিন সন্ধ্যাবেলা আমাকে বললেন যে, আশ্রমের ঠিক বাইরেই তো সোদপুরের ছোট্ট রেল-স্টেশন। তা ঘর থেকে এক পা বেরিয়েই যদি ওই স্টেশনে গিয়ে রেলগাড়িতে চাপা যায়, আর সেই রেলগাড়িতেই যদি মাদ্রাজ পর্যন্ত যাওয়া যায়, তাহলে সেটা দিব্যি ব্যাপার হয়, গাড়ি পালটাবার ঝঞ্ঝাট আর পোহাতে হয় না। গান্ধীজীর কথা শুনে তো আমি চমকে গেলুম। তা কী করে হয়? সোদপুর হচ্ছে গঙ্গার পূর্বতীরে কলকাতার উপকণ্ঠে বেংগল-আসাম রেলপথের উপরে শহরতলির একটা ছোট্ট স্টেশন। সেক্ষেত্রে গঙ্গার পশ্চিমতীরে রেলপথের বিন্যাস একেবারেই আলাদা। বেংগল-নাগপুর রেলওয়ের মাদ্রাজ-কলকাতা লাইন হচ্ছে নদীর পশ্চিমকূলে। গঙ্গার পূর্বকূলে বেংগল-আসাম রেলওয়ের ট্রেনে উঠে, সেই ট্রেনে করেই ইস্‌ট ইনডিয়ান রেলওয়ের মধ্যে ঢুকে, অতঃপর সেই ট্রেনেই আবার গঙ্গার পশ্চিমকূলে বেংগল-নাগপুর রেলওয়ের মধ্যে প্রবেশ করে কেউ ইতিপূর্বে মাদ্রাজ গিয়েছেন বলে শোনা যায়নি। কিন্তু গান্ধীজীকে সে-কথা তখন কে বোঝাবে। আশ্রম থেকেই তিনি রেল-লাইনের উপরে শহরতলির ট্রেনের আসা-যাওয়া দেখতে পেতেন। দেখতে দেখতেই তাঁর চিত্তে হয়ত এই বাসনা জেগে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, সোদপুর স্টেশনেই যদি তিনি তাঁর তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ওঠেন, আর সেই কামরাতে বসেই যদি সরাসরি মাদ্রাজ যেতে পারেন, তাহলে সে বেশ মজার ব্যাপার হয়।

শুনে আশ্রমের সবাই একবাক্যে বললেন যে, তা সম্ভব নয়। এমন ব্যবস্থা হতেই পারে না। গান্ধীজীকে আমি বললুম যে, ইচ্ছে যখন হয়েছে, তখন রেলওয়ে-কর্তৃপক্ষের কাছে আমি নিশ্চয়ই একবার যাব, এবং জেনে নেব, এমন ব্যবস্থা সত্যিই করা যায় কিনা। ইস্‌ট ইনডিয়ান রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার তখন মিঃ এন সি ঘোষ। আমি তাঁর অফিসে গিয়ে হাজির হলুম, এবং জিজ্ঞেস করলুম, এমন ব্যবস্থা কি তাঁরা করতে পারবেন? ধরা যাক্, গান্ধীজীর ছোট্ট তৃতীয় শ্রেণীর স্পেশ্যাল ট্রেনটি যদি সোদপুরের ছোট্ট রেল-স্টেশন থেকে রওনা হয়ে, বালি ব্রিজের উপর দিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে পশ্চিমকূলে ইস্‌ট ইনডিয়ান রেলওয়ের মধ্যে গিয়ে ঢোকে, তাহলে সেখান থেকে কোনও একটা জায়গাতেই কি তাঁরা ট্রেনটিকে বেংগল-নাগপুর রেলওয়ের মধ্যে চালান করে দিয়ে সরাসরি তার মাদ্রাজ যাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না? রেলওয়ের এই বড়কর্তা সম্ভবত ইতিপূর্বে আর কখনও এমন অভিনব প্রস্তাবের সম্মুখীন হননি। এমন কাণ্ড ইতিপূর্বে কেউ কখনও করেছেন বলেও স্মরণ করা গেল না। বেংগল-নাগপুর রেলওয়ে আসছে দক্ষিণ আর পশ্চিম ভারত থেকে; ইস্‌ট ইনডিয়ান রেলওয়ে আসছে উত্তর ভারত থেকে। তারা হাওড়া স্টেশনের সংগমে এসে মিলিছে। এই পর্যন্ত সবাই জানে। কিন্তু সেই সংগমের কাছাকাছি কোথাও ইস্‌ট ইনডিয়ান রেলওয়ে থেকে একটি ট্রেনকে বেংগল নাগপুর রেলওয়ের উপরে চালান করবার মত কোনও যোগসূত্র আছে কিনা, তা কেউ চট্‌ করে বলতে পারলেন না। মিঃ ঘোষ তখন বেংগল-আসাম, ইস্‌ট-ইনডিয়ান আর বেংগল-নাগপুর —এই তিন রেলওয়ের তিন চীফ ইনজিনীয়ারের এক বৈঠক ডাকলেন। রেলপথের যাবতীয় নকশা ড্রইং ইত্যাদি সেখানে তলব করা হল। এবং শেষপর্যন্ত দেখা গেল যে, হাওড়া টারমিনাসের কাছে শালিমারের বিরাট গুড্‌স ইয়ারডে তেমন একটা

যোগসূত্র সত্যিই আছে বটে। তবে ইতিপূর্বে আর কখনও সেটা কেউ ব্যবহার করেনি। যাই হোক, যোগসূত্র যখন মিলেছে, তখন মাইল পনর-কুড়ির সেই অস্বাভাবিক লাইনটাকে এবারে কাজে লাগানো হবে বলে ঠিক করা হল। আসল কথা, গান্ধীজীর এই ছেলেমানুষী বায়না মেটাবার জন্যেও রেলকর্মীরা যে-কোনও রকম পরিশ্রম বরণে প্রস্তুত ছিলেন। শালিমার গুড্স ইয়ার্ডের অব্যবহৃত সেই লাইনটিকে অতএব পরিষ্কার করা হল, এবং পরীক্ষা করে দেখা হল, সেটা ব্যবহারের যোগ্য আছে কিনা। এবং গান্ধীজীর ইচ্ছাপূরণের পথেও অতঃপর আর কোনও বিঘ্ন ঘটল না। তাঁর তৃতীয় শ্রেণীর স্পেশ্যাল ট্রেনটি সত্যিই সোদপুর স্টেশন থেকে রওনা হয়ে, গঙ্গা পার হয়ে, ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের মধ্যে ঢুকে, শালিমার ইয়ারডের মধ্য দিয়ে, বেংগল-নাগপুর রেলওয়ের মধ্যে প্রবেশ করল এবং সরাসরি মাদ্রাজ গিয়ে পৌঁছল।

মাদ্রাজ থেকে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে তিনি সেবাগ্রামে ফিরে আসেন। ব্রিটিশ পারলামেনটারী প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মাদ্রাজেই গান্ধীজীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। অতঃপর সেই প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আমাকেও নানা স্থানে ঘুরতে হয়। ৯ই ফেবরুয়ারি তারিখে তাঁরা নয়াদিল্লি থেকে ইংলন্ড যাত্রা করেন। প্লেন ছাড়ল বিকেলে। প্রতিনিধিদলকে প্লেনে তুলে দেবার জন্যে আমি উইলিংডন বিমানবন্দরে গিয়েছিলাম। সেইদিনই সন্ধ্যায় ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি জর্জ অ্যাবেল আমাকে টেলিফোন করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। সেই অনুযায়ী আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তখন তিনি এমন একটা অনুরোধ করে বসেন, যা ঠিক প্রত্যাশা করা যায়নি। তিনি জানালেন যে, দক্ষিণ ভারতের যে-সব জায়গায় অনাবৃষ্টির ফলে এক নিদারুণ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে সফর সেরে ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল সেইদিনই বিকেলে রাজধানীতে ফিরেছেন, এবং খাদ্য-পরিস্থিতির জন্য তিনি খুব উদ্বিগ্ন। গান্ধীজীর সঙ্গে ভাইসরয় দেখা করতে চান এবং খাদ্য-সংকট সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চান। অ্যাবেল বললেন, লর্ড ওয়াভেলের কাছ থেকে একখানি চিঠি নিয়ে পরদিন সকালেই আমাকে গান্ধীজীর কাছে যেতে হবে, এবং দেশের খাদ্যাবস্থা সম্পর্কে কী ব্যবস্থা নিলে ভাল হয়, তা নিয়ে ভাইসরয়ের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য গান্ধীজী যাতে নয়াদিল্লি আসতে রাজী হন, তার জন্য আমাকে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। অ্যাবেল জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি এতে সম্মত আছি?

১০ই ফেবরুয়ারির সাত-সকালে সামরিক বিভাগের একখানি বীচক্র্যাফ্ট একা আমাকে নিয়ে নাগপুর যাত্রা করল। আমার হাতে তখন ভাইসরয়ের চিঠি। চিঠিখানি এখানে তুলে দিচ্ছি :

ভাইসরয়-ভবন,
নয়াদিল্লি,
৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬

প্রিয় মিঃ গান্ধী,

খাদ্যাবস্থা নিয়ে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি ইতিমধ্যে মিঃ ঘোষের সঙ্গে কথা বলেছেন। মিঃ ঘোষ এ-বিষয়ে আপনাকে সব বলবেন। দক্ষিণ ভারতে সফর শেষ

করে সদ্য আমি এখানে ফিরেছি। খাদ্যশস্য বাঁচাবার জন্য এবং অনাবৃষ্টি-এলাকার মানুষেরা যাতে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য পায় তার ব্যবস্থা করবার জন্য আমাদের পক্ষে যে-সব প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেবার দরকার হতে পারে, সে সম্পর্কে রাজনৈতিক দল-গুলি কী মনোভাব অবলম্বন করবেন, তারই উপরে অসংখ্য মানুষের জীবন নির্ভর করছে বলে আমার মনে হয়।

আপনার পক্ষে যদি দিল্লি আসা সম্ভব হয়, তাহলে এই সামগ্রিক সমস্যা নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে পারি। তার জন্য আমি খুবই উৎসুক।

এ ব্যাপারে সময়ের প্রশ্নটা অতিশয় জরুরী। আপনি যদি অবিলম্বে যাত্রা করতে পারেন, তাহলে আমি খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করব।

আন্তরিকভাবে আপনার
ওয়াভেল"

এম. কে. গান্ধী, এস্কোয়্যার।

নাগপুর বিমানবন্দরে পেঁৗছে দেখলাম, মধ্যপ্রদেশের গভরনর আমার জন্যে একটি বিরাট মোটরগাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন, এবং আমার জন্যে সেটি অপেক্ষা করছে। ধুলোয় ভর্তি পথের উপর দিয়ে ৪৬ মাইল পাড়ি দিয়ে আমি ওয়ার্ধায় পেঁৗছলাম, এবং জেলার ডেপুটি কমিশনারকে জিজ্ঞেস করলাম, ওয়ার্ধা থেকে আমাকে সেবাগ্রামে পেঁৗছে দেবার জন্যে তিনি আর একটু আটপৌরে একটা গাড়ি আমাকে দিতে পারেন কিনা। গভরনরের মস্ত ঝকঝকে গাড়ি, তকমা-আটা শোফার—আশ্রমের পরিবেশে যে এ-সব খুবই বেখাপ্পা ঠেকবে, তা আমি জানতুম বলেই ডেপুটি কমিশনারের কাছে একটা ছোট গাড়ি চাইলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অতীতে যতই তিক্ত রাজনৈতিক বিরোধ ঘটে থাক না কেন, সাহায্যের জন্যে ভাইসরয় এই যে আবেদন জানিয়েছেন, গান্ধীজী এতে সাড়া দেবেন। কিন্তু আমি ভুল করেছিলাম। গান্ধীজী দিল্লি যাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি আমাকে দৃঢ়ভাবেই জানিয়ে দিলেন যে, ভাইসরয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী দিল্লি যাবার জন্যে আমি যেন তাঁকে পীড়াপীড়ি না করি। আমি যে আদৌ লর্ড ওয়াভেলের অনুরোধ রক্ষা করে গান্ধীজীর কাছে তাঁর চিঠি নিয়ে এসেছি, তার জন্য তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং তক্ষুনি ভাইসরয়কে এই কথা জানিয়ে একটা চিঠি লিখে দিলেন যে, "শারীরিক ও নৈতিক কারণে" ভাইসরয়ের অনুরোধ তিনি রক্ষা করতে পারছেন না। তবে সেইসঙ্গে তিনি এও জানালেন যে, ভাইসরয়ের পক্ষ থেকে কথা বলবার অধিকার দিয়ে একজন প্রতিনিধিকে যদি পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তবে তাঁর সঙ্গে তিনি এ-বিষয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। চিঠিখানি এখানে উদ্ধৃত হল :

সেবাগ্রাম,
১০ই ফেবরুয়ারি, ১৯৪৬

"প্রিয় বন্ধু,

শ্রীসুধীর ঘোষ আপনার ন-তারিখে লেখা চিঠিখানি আমাকে দিয়েছেন। আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন যে, সম্ভব হলে আপনার আমন্ত্রণ আমি রক্ষা করতাম।

কিন্তু, যিনি আমাদের দুজনেরই বন্ধু, তাঁকে আমি বুঝিয়ে বলেছি যে, শারীরিক ও নৈতিক কারণে কেন আমার পক্ষে আপনার আমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি সেই কারণগুলির কথা আপনার কাছে ব্যাখ্যা করে বলবেন, এবং আমার প্রস্তাবটি আপনার কাছে পেশ করবেন। আপনি যদি কোনও প্রতিনিধি পাঠান, তবে আমি সানন্দে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম. কে. গান্ধী"

হিজ একসেলেনসি দি ভাইসরয়

টেলিফোনের সুবিধে সেবাগ্রামেও ছিল।

ভাইসরয়ের প্রস্তাব শুনে গান্ধীজীর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছে, জর্জ অ্যাবেলকে তা আমি টেলিফোন করে জানিয়ে দিলাম। ১১ই ফেবরুয়ারি তারিখেই বিমানযোগে অ্যাবেল নাগপুর চলে এলেন। সেখান থেকে এলেন সেবাগ্রামে। তাঁর সঙ্গে ছিল ভাইসরয়ের লেখা আর-একটি লিপি।

ভাইসরয়-ভবন,
নয়াদিল্লি,
১০ই ফেবরুয়ারি, ১৯৪৬

"প্রিয় মিঃ গান্ধী,

মাদ্রাজ সফরের পরে যে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এ-কথা জেনে দুঃখিত হলাম। একটু বিশ্রাম নিলেই আশা করি আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন।

আপনার পক্ষে যেহেতু দিল্লি আসা সম্ভব হল না, তাই আপনি প্রস্তাব করেছেন যে, খাদ্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্য আপনার কাছে আমি কাউকে পাঠাতে পারি। এই প্রস্তাবে আমি খুশী হয়েছি, এবং অ্যাবেলকে পাঠাচ্ছি। অ্যাবেল আমার চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে পরিচিত। আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ ঘটলে আমি আপনাকে যা-যা বলতুম, তা অ্যাবেলই আপনাকে বলবে।

এই একই বিষয়ে আলোচনার জন্য মিঃ জিন্নাকে আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে দেখা করতে বলছি।

আন্তরিকভাবে আপনার
ওয়াভেল"

যত রকমের বাক্‌নৈপুণ্য জর্জ অ্যাবেলের জানা ছিল, গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনায় বসে তার সবগুলিই তিনি প্রয়োগ করলেন। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হল না। বৃন্ধ অটল। মূলেই আসলে গলদ ছিল। ভাইসরয়ের চিঠিতে লেখা ছিল, "এই একই বিষয়ে আলোচনার জন্য মিঃ জিন্নাকে আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে দেখা করতে বলছি।" এদিকে অ্যাবেলও একটি যৌথ আবেদনের খসড়া

তাঁর সংগে নিয়ে এসেছিলেন। আবেদনটি ভারতবর্ষের জনসাধারণকে উদ্দেশ করে রচিত; তাতে বলা হয়েছিল যে, সংকটের মোকাবিলা করতে হলে খাদ্যশস্য বাঁচাতে হবে এবং আরও ফসল ফলাতে হবে। পরিকল্পনা ছিল এই যে, গান্ধীজী, মিঃ জিন্না আর ভাইসরয় এতে সই করবেন। ব্যাপারটা সেক্ষেত্রে এই দাঁড়াত যে, একটি তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ ব্রিটিশ ভাইসরয়ের উদ্যোগে ভারতবর্ষের হিন্দুদের প্রতিনিধি হিসেবে গান্ধীজী এবং ভারতবর্ষের মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে মিঃ জিন্না তাঁদের আপনাপন সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন যে, ভয়াবহ খাদ্য-সংকটের সমাধান করবার ব্যাপারে তারা যেন সরকারের সংগে সহযোগিতা করে। ভাইসরয় এ-কথা খুব ভালই জানতেন যে, ভারতবর্ষে তাঁর প্রতাপ সীমাহীন বটে, কিন্তু দেশের মানুষের চিত্তে তাঁর কথা এতটুকু রেখাপাত করবে না। তাঁর চারপাশের ধূর্ত আমলারাও জানতেন, গান্ধীজীকে এর মধ্যে জড়িয়ে দেওয়া চাই, একমাত্র তাতেই কাজ হবে। কিন্তু দেশে যখন দুর্ভিক্ষের ছায়া পড়েছে, তখনও এ-ব্যাপারে সেই পুরনো অভিসন্ধিটাই—অর্থাৎ গান্ধীজীকে হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি আর মিঃ জিন্নাকে মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে দেখিয়ে প্যারিটি রক্ষা করবার অভিসন্ধিটাই—ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। যৌথ আবেদনে যদি মুসলিম লীগের নেতা হিসাবে মিঃ জিন্নার স্বাক্ষর নেবার দরকার হয়ে থাকে, তবে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করবার জন্য কংগ্রেস-সভাপতি মৌলানা আজাদকে অনুরোধ করলেই সেটা সংগত কাজ হত। কিন্তু লর্ড ওয়াভেল যাঁদের পরামর্শে পরিচালিত হতেন, সেই ব্রিটিশ আমলাদের বিচারে গান্ধীজী ছিলেন ভারতবর্ষের হিন্দু-সমাজের প্রধান প্রতিনিধি; এবং জিন্না ছিলেন ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজের প্রধান প্রতিনিধি। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটাকে তাঁরা এইভাবেই বিচার করতেন। এই ধরনের বিচারে গান্ধীজীর "নৈতিক" আপত্তি ছিল। লর্ড ওয়াভেলকে লেখা চিঠিতে সে-কথা তিনি জানিয়েও দিয়েছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্যও অবশ্য ভাল যাচ্ছিল না; দেখলেই সে-কথা বোঝা যেত। তবে "নৈতিক" আপত্তি না-থাকলে স্বাস্থ্য তাঁর যাত্রার অন্তরায় হত না। অন্তর থেকে যদি সায় পেতেন, তাহলে স্বাস্থ্য যতই খারাপ হোক, খাদ্য-সংকটের সমাধানে সরকারকে সাহায্য করবার জন্য ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তিনি ঘুরতে রাজী ছিলেন।

ভাইসরয়ের প্রস্তাবকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন গান্ধীজী। কেন প্রত্যাখ্যান করলেন, তা আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু প্রত্যাখ্যানের ভংগি যে এত কঠোর হবে, তা আমি ভাবিনি। ব্যাপার দেখে আমি কিছুটা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এই সূত্রে আমাকেও গান্ধীজী বেশ কঠোর কিছু কথা শোনালেন। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তখন সেবাগ্রাম আশ্রমে ছিলেন। তিনিও যোগ দিলেন সেই আলোচনায়। এ হল ১০ই ফেবরুয়ারি সন্ধ্যাবেলার ঘটনা। পরদিনই জর্জ অ্যাবেলের দিল্লি থেকে আসবার কথা। ঘণ্টা খানেক ধরে গান্ধীজী আর ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সামগ্রিক পর্যালোচনা করলেন। আমাকে তাঁরা যা-যা বললেন, তা আমি শান্ত হয়ে শুনলাম। গান্ধীজী বারবার বলছিলেন যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আমলাদের কথায় তাঁর আস্থা নেই; আমারও থাকা উচিত নয়। কথাটা তাঁকে বারবার বলতে শুনে আমি ঈষৎ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। ঈশ্বর আমাদের বিচারবুদ্ধি দিয়েছেন, এবং তিনি নিশ্চয়ই চান যে, সেটাকে আমরা কাজে লাগাই। গান্ধীজী আমাকে এও বললেন যে, ভাইসরয় ও অন্যান্য সব ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা আমাকে ডাকাডাকি করছেন

বটে, কিন্তু তাতে যেন আমি 'উল্লসিত' না হই। কথাটা শুনে আমি ব্যথা পেয়েছিলাম ঠিকই; তবে এও বুঝতে পারছিলাম যে, তাঁর কথাগুলিতে পিতৃসুলভ স্নেহও অনেকখানি রয়েছে। যাকে তিনি গভীরভাবে স্নেহ করেন, ভর্ৎসনার ছলে তাকে তিনি সতর্ক করে দিচ্ছেন মাত্র। তাঁর চিন্তার গতিপ্রকৃতি আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করতুম। তিনি ছিলেন স্বচ্ছ মনের মানুষ; সেই মনের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার তরঙ্গ কীভাবে উঠছে-নামছে, তার সবটাই যেন স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যেত। কিছুই তিনি লুকিয়ে রাখতেন না। বেশির ভাগ মানুষই দেখেছি কথা দিয়ে যেমন নিজের চিন্তাকে প্রকাশ করে, তেমনি আবার কথা দিয়েই তাকে অনেক সময় ঢেকেও রাখে। গান্ধীজী সেক্ষেত্রে কথার মাধ্যমে নিজের চিন্তাকে শুধু প্রকাশই করতেন; কথার আড়ালে তাকে গোপন করতেন না। এও তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য।

কথা এই যে, আমার মনের মধ্যে একটি শিশুও তো রয়েছে। গান্ধীজী সেদিন স্নেহশীল পিতার মতই কথা বলেছিলেন, কিন্তু তাঁর ভর্ৎসনার তীব্রতায় সেই শিশুটি সেদিন আহত হয়েছিল। ১১ই ফেবরুয়ারি তারিখে অ্যাবেলের সঙ্গে বিমানযোগে আমি দিল্লিতে ফিরলাম; তার পরদিনই রওনা হলাম কলকাতায়। গান্ধীজী বলেছিলেন, ব্রিটিশ আমলাদের বিশ্বাস করা উচিত নয়। সেবাগ্রাম থেকে রওনা হবার পর সারাটা পথ শুধু এই একটি কথাই আমি চিন্তা করেছি। আমার মনে হচ্ছিল, অদ্ভুত এক নিঃসঙ্গতা যেন চারদিক থেকে আমাকে ঘিরে ধরেছে। কলকাতায় ফিরে আমার স্ত্রীকে আমি সমস্ত কথা জানালাম। দিন কাটছিল, কিন্তু আমার অশান্তি কিছুতেই যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত, নিজেকে কিছুটা ভারমুক্ত করবার জন্য, ১৬ই ফেবরুয়ারি তারিখে গান্ধীজীকে আমি একটি চিঠি লিখলাম। চিঠিখানি এই :

১১ লাভলক প্লেস,
বালিগঞ্জ পোঃ,
কলকাতা,
১৬ই ফেবরুয়ারি, ১৯৪৬

"প্রিয় বাপু,

১১ই তারিখে সন্ধ্যায় দিল্লি ফিরে আমি খবর পাই যে, কলকাতায় গুরুতর দাঙ্গা বেধেছে। কর্তৃত্ব যাঁদের হাতে, গোঁয়ার্তুমি না করে যে যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়, এই কথাটা তাঁদের বোঝাতে পারব, এই আশায় পরদিন সকালেই আমি কলকাতা রওনা হই। গভরনরের সঙ্গে আমি দেখা করেছি, এবং যেটুকু আমার সাধ্য তা করেছি।

দিল্লিতে আমি অ্যাবেলের কাছে জানতে পাই, ইতিমধ্যেই তাঁরা এই সংবাদ প্রকাশ করেছেন যে, স্বাস্থ্যগত কারণে আপনার পক্ষে এসে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আপনি তাঁকে এও জানাতে বলেছিলেন যে, আপনার এখন আরও নানা কাজের খুব চাপ যাচ্ছে। অ্যাবেল বললেন, তিনি সেবাগ্রামে ফোন করবেন, এবং যে ভুল হয়ে গিয়েছে, তার জন্য ক্ষমা চাইবেন।

সেবাগ্রামে যখন আপনার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়, তখন আপনি বন্ধু-বান্ধবদের 'অবিশ্বাস' করবার কথা বলেছিলেন। সেবাগ্রাম থেকে চলে আসবার পরে

এ নিয়ে আমি ভেবেছি। আমার মনে হয়েছে, আমি কী করতে চেষ্টা করছি এবং কেন তা করতে চেষ্টা করছি, সে-বিষয়ে আমার কিছু বলা উচিত। কিন্তু এ-নিয়ে কিছু বলাও বড় শক্ত। এইসঙ্গে একটি চিঠি পাঠাচ্ছি। আমি যখন কেমব্রিজ থেকে চলে আসি, তখন এক ইংরেজ তরুণী এই চিঠি আমাকে লিখেছিলেন। আশা করছি, কোনও এক অবকাশের মুহূর্তে এই চিঠিখানি আপনি পড়ে দেখবেন। পত্রলেখিকা একজন কোয়েকার; ধর্মে তাঁর গভীর নিষ্ঠা। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর আমরা পড়েছি; তখন ফ্রেনড্‌স মীটিং হাউসে আমরা একযোগে উপাসনা করতাম। তরুণবয়সীরা কীভাবে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং পরস্পরের অনুরাগী হয়ে ওঠে, তা আপনি জানেন। আমাদেরও পরস্পরকে খুবই ভাল লাগত; তবে বন্ধুত্বের এই সম্পর্কে আমরা ভাবালুতার বন্ধন থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিলাম। এই চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "যে-কাজ সহজে সম্ভব, তা তুমি করতে চাও না, তুমি অন্য পথ বেছে নিয়েছ। তাই আমার আশঙ্কা হয় যে, মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, প্রায়ই তুমি নিঃসঙ্গ বোধ করবে। তবে শক্তির এমন একটা উৎস তোমার আছে, চূড়ান্ত রকমের পরীক্ষা আর নিঃসঙ্গতার মুহূর্তেও যা তোমাকে শক্তি জোগাতে ব্যর্থ হবে না। আমার বন্ধুত্বে যদি তোমার উপকার হয়, তাহলে আমি খুশী হব; এবং এখন যেমন তোমাকে আমার ভালবাসা জানাচ্ছি, তেমনি তখনও জানাব।" ইংল্যানডের যা ভাল, তার মর্ম বুঝতে এই তরুণী আমাকে সাহায্য করেছিলেন; ব্রিটিশ জাতি আর ভারতবাসীদের মধ্যে যাতে শান্তিময় সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তার জন্য কাজ করবার প্রেরণা আমি কেমব্রিজেই পেয়েছি। ১৯৪০ সনের গ্রীষ্মকালে আমি কেমব্রিজ থেকে বিদায় নিই; এই তরুণী তখন আমাকে এই চিঠি, এবং চিঠির সঙ্গে একখণ্ড 'অক্‌স্‌ফোর্ড বুক অব মডার্ন ভার্সেস্‌' পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই চিঠিতে তিনি যে "নিঃসঙ্গতার" কথা বলেছেন, এবারে সেবাগ্রাম থেকে চলে আসবার সময় সেই নিঃসঙ্গতারই অভিজ্ঞতা আমার হল। আমি জানি, কী আমি বলতে চাইছি, তা আপনি বুঝবেন।

আমি বাড়ি ফিরে আসায় শান্তি খুশী হয়েছে। সে আপনাকে তার ভালবাসা জানাচ্ছে।

দিল্লি এবং কলকাতার বিষয়ে আরও অনেক কথা লিখবার ছিল। কিন্তু এ-সব ব্যাপারে চিঠি না-লিখে সাক্ষাৎ-আলোচনাই শ্রেয়। মিঃ কেসি আমাকে আগামীকাল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। যে-সব বিষয়ে আপনি তাঁকে লিখেছিলেন, তার কিছুটা তাঁকে দিয়ে করানো যায় কিনা, তা নিশ্চয়ই দেখব।

মাদ্রাজে আপনার স্বাস্থ্য যেমন দেখেছিলাম, এবং সেবাগ্রামে যেমন দেখলাম, তার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আমি লক্ষ্য করেছি। আশা করছি, পুনায় অবস্থানের ফলে স্বাস্থ্য আবার ভাল হবে।

ভালবাসা জানাই।

সুধীর"

আমার এই চিঠি পড়ে গান্ধীজীর মনে যে-সব চিন্তার উদয় হয়েছিল, ২৪শে ফেবরুয়ারি তারিখে 'হরিজন' পত্রিকার জন্য লেখা এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি তা ব্যক্ত করেন। নিবন্ধটির শিরোনামা "নিঃসঙ্গ নয়"। ১৯৪৬ সনের ৩রা মার্চ সংখ্যায় সেটি প্রকাশিত হয়।

"নিঃসঙ্গ নয়"

(মো. ক. গান্ধী)

সম্প্রতি এক বন্ধু আমাকে লিখেছেন যে, সঙ্গ থাকা সত্ত্বেও তিনি নিঃসঙ্গ বোধ করেন। ইতিপূর্বে আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, আমলা মহলের কথা আমি অবিশ্বাস করি। তারই ফলে তাঁর এই মন্তব্য। তিনি অবিশ্বাস করেন না। এবং তিনি ভেবেছিলেন যে, আমিও তাঁর বিশ্বাসের অংশীদার হব। যখন তিনি দেখলেন যে, তা আমি হব না, তখন তিনি নিরতিশয় হতাশ হলেন। অবশ্য চিঠিখানি তিনি স্পষ্ট করে লেখেননি, এবং এমনও হতে পারে যে, ঠিক এই কথা তিনি বোঝাতে চাননি। তবে আমি তার এই ব্যাখ্যাই করেছি, এবং উত্তরে তাঁকে জানিয়েছি যে, ঈশ্বরের ভক্ত হিসাবে তাঁর কখনও নিঃসঙ্গ বোধ করা উচিত নয়। কেননা, ঈশ্বর তো সারাক্ষণই তাঁর সঙ্গে আছেন। সমগ্র বিশ্ব-সংসার যদি তাঁকে পরিত্যাগ করে, তাতেই বা তিনি বিচলিত হবেন কেন? মস্তিষ্ক নয়, হৃদয় থেকে যদি তিনি বিশ্বাসের প্রেরণা পান, তবে আমি যা-ই বলে থাকি না কেন, তাঁর বিশ্বাসকে তিনি বজায় রাখুন।

আমার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। পারস্পরিক বিশ্বাসকে আমি বিশ্বাস বলি না; পারস্পরিক ভালবাসাকেও আমি ভালবাসা বলি না। যারা তোমাকে ঘৃণা করে, তাদেরও যদি তুমি ভালবাসতে পারো, তো সেই হচ্ছে প্রকৃত ভালবাসা। তোমার প্রতিবেশীকে বিশ্বাস না-করা সত্ত্বেও যদি তাকে তুমি ভালবাসতে পারো তো সেই হচ্ছে প্রকৃত ভালবাসা। ইংরেজ আমলা মহলকে যে আমি বিশ্বাস করি না, তার জোরালো যুক্তি রয়েছে। তবে আমার ভালবাসা যদি খাঁটি হয়, তো ইংরেজকে অবিশ্বাস করেও তাকে আমি ভালবাসব। বন্ধুকে যতক্ষণ বিশ্বাস করছি, শুধু ততক্ষণই তাকে ভালবাসব,—এমন ভালবাসায় লাভ কী? তেমনভাবে তো চোররাও ভালবাসে। পারস্পরিক বিশ্বাসটা যেই ভেঙে যায়, অমনি তারা পরস্পরের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।"

গান্ধীজী এ-বিষয়ে একটি চিঠিও আমাকে লিখেছিলেন। (চিঠিখানি আমি হারিয়ে ফেলেছি।) তাতে তিনি তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় মহম্মদ ও তাঁর শিষ্যের গল্প শুনিয়েছিলেন আমাকে। শত্রুদের চোখে ধুলো দিয়ে তাঁরা দুজনে একবার এক অন্ধকার গুহার মধ্যে আশ্রয় নেন। শিষ্য ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। পয়গম্বরকে তিনি বলেছিলেন, "আমরা নিঃসঙ্গ।" উত্তরে পয়গম্বর তাঁকে বলেন, "নিঃসঙ্গ হওয়া তো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ঈশ্বরই আমাদের সঙ্গে আছেন।"

গান্ধীজী ও ১২৫ বছরের পরমায়ু

সেবাগ্রাম থেকে আমি কলকাতায় ফিরবার এক সপ্তাহের মধ্যে, ১৯৪৬ সনের ১৯শে ফেবরুয়ারি তারিখে, কমন্স সভায় ব্রিটিশ শ্রমিক সরকার ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের তিনজন সদস্যকে নিয়ে গঠিত একটি মিশন খুব শিগগিরই ভারত অভিমুখে রওনা হবেন। ১লা মার্চ তারিখে কাগজে এই খবর পড়লাম যে, তরুণ ব্রিটিশ এম. পি. উডরো ওয়াট এই মিশনের সঙ্গে, মিশনের অন্যতম সদস্য সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে, আবার ভারতে আসছেন। ইতিপূর্বে ব্রিটেন থেকে যে পারলামেণ্টারী প্রতিনিধিদল ভারত-সফরে এসেছিলেন, সেই দলেও তিনি ছিলেন। সে-যাত্রায় ওয়াটের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল। ওয়াটকে, এবং তাঁর মারফতে সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে, আমি আগেভাগেই সতর্ক করে দিলাম যে, গান্ধীজীকে আমি চিনি, পাকিস্তান-প্রশ্নের ফয়সলা করবার জন্য যদি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে কোনও চেষ্টা চলে, ভারতবর্ষে তাহলে বিপর্যয় ঘটবে। ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যরা বিলেত থেকে রওনা হবার আগে, ১৯৪৬ সনের ১লা মার্চ তারিখে, ওয়াটকে একটি চিঠি লিখে বন্ধুভাবে এই কথাটা আমি জানিয়ে দিলাম। চিঠিখানি এখানে উদ্ধৃত হল :

১১ লাভলক প্লেস,
বালিগঞ্জ পোঃ,
কলকাতা,
১লা মার্চ, ১৯৪৬।

"প্রিয় উডরো,

আজ সকালে কাগজে খবর দেখলাম, ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে তুমিও সম্ভবত সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে আবার ভারতে আসছ। এই খবর পড়ে আমি খুশী হয়েছি। ভাবতে আমার ভাল লাগছে যে, ভারত সম্পর্কে তোমার আগ্রহ এখনও ফুরিয়ে যায়নি, এবং বর্তমান যুগের জটিলতম সমস্যার সমাধান-প্রচেষ্টায় তুমি সাহায্য করতে বদ্ধপরিকর। আমাদের সমস্যাকে তোমরা যেভাবে বিচার করো, সে সম্পর্কে গান্ধীজীর মনোভাব কী, সেটা তোমাকে জানিয়ে দেবার জন্যেই এই চিঠি লিখতে বসেছি।

৯ই ফেবরুয়ারি তারিখে উইলিংডন বিমানবন্দরে তোমাদের বিদায় জানিয়ে ফিরে আসবার পর কর্মসূত্রে সেইদিনই সন্ধ্যায় আমি গিয়ে অ্যাবেলের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। দক্ষিণ ভারতের অনাবৃষ্টি-এলাকায় সফর সেরে ভাইসরয় তার খানিক আগে দিল্লিতে ফিরেছেন। খাদ্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি তখন খুবই উদ্বিগ্ন। খাদ্য-সংকট সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্য তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইছিলেন। ভাইসরয়ের একটি চিঠি নিয়ে আমাকে গান্ধীজীর কাছে যেতে বলা

হল। গান্ধীজী যাতে এসে ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে আমি স্বীকৃত হলুম। ১০ই ফেবরুয়ারি সকালে দিল্লি থেকে বিমানযোগে আমি নাগপুর যাই, এবং সেখান থেকে ধুলো-ভর্তি পথে মাইল ছেচল্লিশ মোটর চালিয়ে ছোট্ট একটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছই। সেইখানেই গান্ধীজী থাকেন। আমার বিশ্বাস ছিল, সরকারের সঙ্গে অতীতে যতই বিরোধ ঘটে থাক, খাদ্যের ব্যাপারে সাহায্য করতে তিনি রাজী হবেন। কিন্তু দিল্লি যাবার প্রস্তাব তিনি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন, এবং আমাকে বললেন, দিল্লি যাবার জন্য আমি যেন তাঁকে পীড়াপীড়ি না করি। তবে, যে-সব বিষয়ে ভাইসরয় তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চাইছিলেন, ভাইসরয়ের তরফে কোনও সরকারী প্রতিনিধিকে যদি সে-সব বিষয়ে কথা বলবার অধিকার দিয়ে পাঠানো হয়, তাহলে গান্ধীজী যে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে রাজী, তাও তিনি জানালেন। অ্যাবেল তার পরদিনই দিল্লি থেকে গান্ধীজীর সঙ্গে কথা বলতে আসেন। বিলেতের কাগজে সে-খবর তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ। গান্ধীজী তাঁর সঙ্গে দরকারী কিছু কথাবার্তা বলতে রাজী হলেন বটে, কিন্তু বোঝাই যাচ্ছিল যে, তাঁর অন্তরে মোটেই সাড়া জাগেনি। দেশের মেজাজ যে এখন কীরকম, গান্ধীজীর এই মনোভাব থেকেই তা বোঝা যাবে। এটা যে নেহাতই তাঁর একটা জেদের ব্যাপার, তা তোমাদের ভাবা ঠিক হবে না।

এবারে শোনো, তুমি নিজে যেভাবে ভারত-সমস্যার সমাধান করতে চাও, সে সম্পর্কে গান্ধীজীর মনোভাব কী। তোমার সমাধানটা আমি মোটামুটি জানি। ১০ই ফেবরুয়ারির সন্ধ্যায়, গান্ধীজীর ছোট্ট কুটিরে বসে, এ-বিষয়ে বেশ শান্তভাবে অনেকক্ষণ ধরে তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনা হল। প্রায় ঘণ্টাখানেক তিনি কথা বললেন। তাঁর মন কীভাবে কাজ করছে, তা আমি বুঝতে পারছিলাম। তোমার প্রস্তাব, ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির সীমা আবার এমনভাবে নতুন করে বিন্যাস করা হোক, যাতে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে আর উত্তর-পূর্বে বিরাট এমন দুটি এলাকার সৃষ্টি হয় স্পষ্টতই যা মুসলিম-প্রধান। সেক্ষেত্রে সেই এলাকা দুটির শাসনভার সর্বদা মুসলিমদের হাতে থাকবে এবং সেই হবে তাদের পাকিস্তান; এবং বাকী-ভারতবর্ষের শাসনভার থাকবে অন্যদের হাতে। অতঃপর যথাসময়ে গড়ে উঠবে একটি কেন্দ্রীয় শাসন-সংস্থা; যোগাযোগ, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র-নীতি ইত্যাদি সেই সংস্থার হাতে থাকবে; এবং যেমন পাকিস্তান তেমনি বাকী ভারত তাতে অংশগ্রহণ করবে। গান্ধীজীকে আমি তোমার এই ধারণার কথা বললাম যে, এই পথে অগ্রসর হলে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে একটি মীমাংসায় উপনীত হওয়া হয়ত সম্ভব; পক্ষান্তরে, মুসলিমদের যে দাবি তোমাদের বিবেচনায় প্রায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে, প্রথম থেকেই তাকে নাকচ করলে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে। এর উত্তরে গান্ধীজী বললেন, ভারতবর্ষকে এইভাবে বিভক্ত করা সম্ভব, কিন্তু এ-সমাধান 'কাপুরুষের সমাধান'। গান্ধীজী যা বলেছেন, ঠিক তাই আমি জানালাম। সুতরাং বুঝতেই পারছ যে, ক্যাবিনেট মিশন যদি তোমার প্রস্তাবিত পন্থায় এগোতে চান, তবে তাতে কোনও লাভ হবে না, সে প্রায় ইঁটের দেওয়ালে মাথা ঠোকার সামিল হবে। ১৯৪২ সনে সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন তাঁর প্রস্তাব শুনে গান্ধীজী বলেছিলেন যে, এটা হচ্ছে একটা "পোস্ট্-ডেটেড চেক অন এ ক্র্যাশিং ব্যাংক"। ক্রিপ্সের প্রস্তাব অতঃপর হালে পানি পায়নি। সুতরাং বৃদ্ধের কথাগুলিকে গুরুত্ব দিও।

১০ই ফেবরুয়ারি তারিখে গান্ধীজীর সঙ্গে আমার এই শেষ আলোচনার পরে (আলোচনার সময়ে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদও উপস্থিত ছিলেন) আমি নিজেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এমন কোনও মীমাংসা সম্ভব নয় যা লীগ ও কংগ্রেস উভয়েই মেনে নেবে। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার যে-সিদ্ধান্তই নিন, জোর করে তা কংগ্রেস কিংবা লীগের উপরে চাপিয়ে দেবার প্রয়োজন হবে। যদি মুসলিম লীগের উপরে চাপিয়ে দাও, তাহলে তোমরা অসুবিধেয় না-ও পড়তে পারো; ব্রিটিশ শক্তি ও ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধি কংগ্রেসের শক্তি যদি যুক্ত হয়, সেই মিলিত শক্তিই তাহলে লীগ ও কমিউনিস্টদের মিলিত শক্তিকে দাবিয়ে রাখতে পারবে। পরন্তু সেই শক্তির সঙ্গে যদি কিছুটা জ্ঞান ও ঔদার্য যুক্ত হয়, এবং কংগ্রেস যদি মুসলিমদের হাতে তাদের প্রাপ্যের চাইতেও বেশী ক্ষমতা ও চাকরি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত থাকে, তাহলে কাজ চালিয়ে নেবার মতন একটা ব্যবস্থা হয়ত মুসলিমদের সঙ্গে করে নেওয়া যাবে; বড় রকমের কোনও অভ্যুত্থানও সেক্ষেত্রে হয়ত ঘটবে না। পক্ষান্তরে, জোর করে তোমাদের সিদ্ধান্ত যদি তোমরা কংগ্রেসের উপরে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করো, তাহলে তোমরা রেহাই পাবে না। এ সম্পর্কে আমি দৃঢ়নিশ্চিত। তোমাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আগে থাকতেই আমি একটা বিরূপ ধারণা করে নিয়ে যে এ-কথা বলছি, তা নয়। আমি গান্ধীজীর বন্ধু ঠিকই, এবং আমার সহানুভূতি যে কংগ্রেসের দিকে তাতেও সন্দেহ নেই; কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও এখানকার অবস্থাকে আমি নিরপেক্ষভাবে দেখতে পারি। কংগ্রেস থেকে পাকিস্তানের ব্রিটিশ-সংস্করণ মেনে নেবার সম্ভাবনা সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু অথবা সর্দার প্যাটেল তোমাকে যাই বলে থাকুন, তাতে কোনও সুবিধে হবে না। বৃদ্ধের চিত্ত এ-ব্যাপারে অটল।

আমার ধারণা, ব্রিটিশ সরকার এখন একটিমাত্র কাজই করতে পারেন; ভারতবর্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠদের একাধিপত্য মেনে নিয়ে, এবং তাঁদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে (মুসলিমসহ) সংখ্যালঘুদের দায়িত্ব তাঁদের হাতে ছেড়ে দিতে পারেন। অন্য কোনও বিকল্প-ব্যবস্থা সম্ভব বলে আমার মনে হয় না। এই ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে; কংগ্রেস হয়ত জ্ঞান ও ঔদার্যের পরিচয় দিতে পারে, এবং মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের শান্ত করবার কোনও পথও হয়ত কংগ্রেস খুঁজে নিতে পারে। পক্ষান্তরে পাকিস্তান-প্রশ্নের ফয়সলা করবার জন্য যদি ব্রিটিশ তরফে কোনও চেষ্টা চলে, তবে তার পরিণামে বিপর্যয় ঘটবে।

যাই হোক, শিগগিরই যে তুমি আবার ভারতে আসছ, এটি সুসংবাদ। আমার ধারণা, শেষ পর্যন্ত তোমাকেই হয়ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত হয়ে দিল্লি আসতে হবে। কূটনৈতিক বুদ্ধি তোমার সহজাত; সুতরাং কাজটা তোমাকে মানাবে। আমার তো মনে হয়, আমরাও তোমাকে বরদাস্ত করতে পারব। আর্থারকে আমার সালাম জানিয়ো।

শুভেচ্ছা জানাই।

সুধীর

মেজর ডব্লু ওয়াট, এম. পি.,
হাউস অব কমন্স্, লনডন।

পুনশ্চ : তোমার যদি ইচ্ছে হয়, তাহলে সার্ স্ট্যাফোর্ডকেও এ-চিঠি দেখাতে পারো।"

ওয়াট এর উত্তরে জানালেন যে, ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের তিনজন সদস্যকে আমার চিঠি তিনি দেখিয়েছেন; কিন্তু চিঠি পড়ে তাঁরা বিশেষ উৎসাহিত হননি। ওয়াটের চিঠিখানি এখানে তুলে দিচ্ছি :

১৭ চ্যাট্‌সওয়ার্থ কোর্ট
লনডন ডব্‌ল্যু. এস.
১১ই মার্চ, ১৯৪৬

"প্রিয় সুধীর,

তোমার দীর্ঘ পত্রের জন্য ধন্যবাদ। চিঠিখানি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। ক্যাবিনেটের সদস্য-তিনজনকে তোমার চিঠি দেখানো হয়েছে। চিঠি পড়ে তাঁরা বিশেষ উৎসাহিত হয়েছেন বলে আমার মনে হয় না।

এখন তো ক্যাবিনেট মিশনের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রধানত এরই ফলে, ব্রিটিশ তরফে প্রথম প্রস্তাব কী হওয়া উচিত, সে-বিষয়ে আমার ধারণাও ইতিমধ্যে পাল্টেছে। যে-কাজ একজন ভাইসরয়ের পক্ষে করা শক্ত, তিনজন ক্যাবিনেট-মন্ত্রীর মিলিত চেষ্টায় তা সম্ভব হওয়া উচিত। ব্যক্তিগতভাবে আমি এখন এই পথে চিন্তা করছি যে, গান্ধীজী যাকে বলেন তোমাদের 'ঘাড় থেকে নামা', প্রথমত তারই জন্য এখন আমাদের চেষ্টা করতে হবে, এবং তোমাদের ঘাড় থেকে নেমে যেতে হবে।

সাক্ষাৎমতো এ-বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলব। সাক্ষাতের জন্য আমি খুবই উৎসুক।

দিল্লি থেকে আমাদের কাজ শুরু হবে। তবে আশা করি, সেখানে আমাদের বেশীদিন থাকতে হবে না। তার কারণ, দিল্লিতে এই সময়ে দারুণ গরম পড়ে।

আমার বিবেচনায় একটা ব্যাপার খুবই জরুরী। সেটা এই যে, আলোচনায় বুদ্ধ যাতে যোগ দেন, যে-করেই হোক তার ব্যবস্থা করতে হবে। আলোচনায় যোগ দিলেই তিনি বুঝতে পারবেন যে, আমাদের এই উদ্যোগটা খাঁটি, এবং ক্ষমতা হস্তান্তর করা ছাড়া অন্য-কিছু করবার ইচ্ছা কারও নেই।

চিরকালের জন্য তোমার
উডরো।"

সুধীর ঘোষ, এসকোয়্যার,
১১ লাভলক প্লেস,
বালিগঞ্জ পোঃ,
কলকাতা।

১৯৪৬ সনের ২৪শে মার্চ ক্যাবিনেট মিশন নয়াদিল্লিতে এসে পৌঁছন। গান্ধীজীর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথাটা গভরনর কেসি তাঁদের আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন। ২৮শে মার্চ তারিখে তাঁরা আমাকে ডেকে পাঠালেন। সেই দিনই বিকেলে গিয়ে আমি সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্সের প্রাইভেট সেক্রেটারি জর্জ ব্লেকারের সঙ্গে দেখা করলুম।

ভাইসরয়-ভবনের সাউথ উইংয়ে ক্যাবিনেট মিশনের দপ্তর বসেছিল। আমি যখন জর্জ ব্লেকারের অফিস-ঘরে বসে তাঁর সঙ্গে কথা বলছি, তখন সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স হঠাৎ হাতে কিছু কাগজপত্র নিয়ে সেখানে এসে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে জর্জ বললেন, "সার্, ইনিই মিঃ সুধীর ঘোষ।" শুনে সার্ স্ট্যাফোর্ড বললেন, "তাই বুঝি? তা মিনিট কয়েকের জন্যে আমার ঘরে একবার আসুন।" আমি তাঁর অনুসরণ করলুম। ক্রিপ্স সম্পর্কে নানান রকমের খবর ইতিপূর্বে আমার কানে এসেছিল। শুনেছিলাম, তিনি কঠোর প্রকৃতির মানুষ, স্বল্পভাষী, উন্নাসিক। তাই তাঁর সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে আমি কিছুটা আড়ষ্ট বোধ করছিলাম। কিন্তু, যা আমি আদৌ আশা করিনি, মিনিট কয়েকের মধ্যেই দেখলুম, তিনি বেশ খোলামেলা ভাবে আমার সঙ্গে কথা কইতে শুরু করেছেন। (কেসি যে আমার সম্পর্কে তাঁকে কী বলেছিলেন, তা আমি জানতুম না।)

সার্ স্ট্যাফোর্ড বললেন, "আমাদের একটা উপকার করতে পারেন? সদ্য আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি। এসে দেখছি, ভাইসরয় আমাদের জন্যে যে ব্যবস্থা করে রেখেছেন, সেই অনুযায়ী চললে ১০ই এপরিলের আগে মিঃ গান্ধীর সঙ্গে আমাদের দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। তার অর্থ, মিঃ গান্ধীর সঙ্গে দেখা হতে আমাদের আরও প্রায় হপ্তা দুয়েক লাগবে। এটা আমাদের ভাল ঠেকছে না। আমাদের ইচ্ছে ছিল, এখানে পৌঁছেই সর্বপ্রথম মিঃ গান্ধীর সঙ্গে আমরা দেখা করব। অথচ ভাইসরয় আমাদের কার্যসূচী ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছেন, এবং সেই অনুযায়ী আমন্ত্রণ-লিপিও পাঠানো হয়েছে। এই অবস্থায় মিঃ গান্ধী এখন আসতে রাজী হবেন কিনা জানি না। অথচ, তাঁর সঙ্গে দেখা হবার আগে অন্যান্য একগাদা লোকের সঙ্গে আমাদের দেখা করতে হবে, এও আমাদের পছন্দ নয়। আপনি কি একবার বিমানযোগে পুনা—কিংবা যেখানে তিনি আছেন, সেখানে—যেতে পারবেন, এবং অবিলম্বে তাঁকে দিল্লি আসতে রাজী করাতে পারবেন?

আমি বললুম, "আমি চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু তিনি আসতে রাজী হবেন কিনা, তা বলতে পারি না।"

সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স তক্ষুনি কাগজ কলম টেনে নিয়ে গান্ধীজীর নামে এই চিঠিখানি লিখে দিলেন :

ক্যাবিনেটের প্রতিনিধিদলের দপ্তর,
ভাইসরয়-ভবন, নয়াদিল্লি,
২৮শে মার্চ ১৯৪৬

"প্রিয় মিঃ গান্ধী,

আগামী সপ্তাহে আমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে; এই আমন্ত্রণের ব্যাপারে যে বিভ্রাট ঘটেছে, তার খবর পেয়ে আমি অতিশয় দুঃখ বোধ করছি। আপনি জানেন, আবার আপনার সাক্ষাৎলাভের জন্য এবং এই সমস্যাসংকুল সময়ে আপনার প্রাজ্ঞ উপদেশ লাভের জন্য আমি খুবই উৎসুক।

আগাথা হ্যারিসনকে আমি কথা দিয়েছি যে, আগামী রবিবারে তাঁর ধ্যান ও প্রার্থনার বিশেষ অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত থাকব। আমার আশা, আপনিও হয়ত সেখানে থাকবেন, এবং অন্তত কিছুক্ষণের জন্য আমরা আত্মিক সাযুজ্যে মিলিত হতে পারব। সত্যিই আমি আশা করছি যে, আপনার পক্ষে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা সম্ভব হবে। তাতে আমার আর-একটা লাভ এই হবে যে, সরকারীভাবে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বেই আমি ঘরোয়াভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পাব।

আপনার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ অবশ্য আমি একাধিকবার পেতে চাই। তার কারণ, আমাদের বর্তমান প্রয়াসের গুরুভার বহন করা আমার পক্ষে সহজ নয়; যতটা সম্ভব সাহায্য আমাদের পেতে হবে; এবং যে-সাহায্য আপনি দিতে পারেন, তার চাইতে প্রার্থনীয় এবং প্রাজ্ঞজনোচিত সাহায্য আর কিছু হতে পারে না।

আন্তরিকভাবে আপনার
আর. স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স"

চিঠিখানা তিনি আমাকে পড়ে শোনালেন। জিজ্ঞেস করলেন, ঠিক আছে তো? আমার মনে হল, চিঠিখানা বেশ আন্তরিক হয়েছে; অনুরোধের ভঙ্গীটাও বেশ জোরালো হয়েছে। গান্ধীজী তখন পুনার তিরিশ মাইল দক্ষিণে এক গ্রামে ছিলেন। গ্রামের নাম উরুলিকাঞ্চন। স্যর স্ট্যাফোর্ডকে আমি সে-কথা জানালাম। বললাম, আমি তাঁর কাছে যাব; এবং ক্যাবিনেট মিশন যে অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উৎসুক, সে-কথা তাঁকে জানাব।

বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় এফ. এফ. টার্নবুল এসে ঢুকলেন। বললেন, মিঃ ঘোষ বিদায় নেবার আগে ভারত-সচিব তাঁকে একটা কথা বলতে চান। একই দিনে অতএব ভারত-সচিবের সঙ্গেও আমার দেখা হল। তাঁর সঙ্গেও সেই আমার প্রথম সাক্ষাৎকার। এই প্রবীণ ইংরেজ ভদ্রলোকের সৌজন্যে আমি সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, দয়া করে কি আমি তাঁর কাছ থেকে একখানি চিঠি নিয়ে মিঃ গান্ধীকে পৌঁছে দেব? আমি বললুম, "নিশ্চয়, এ তো আমার পক্ষে আনন্দের কাজ।" শুনে তক্ষুনি তিনি একটি চিঠি লিখে আমার হাতে তুলে দিলেন। চিঠিখানি এই :

২ উইলিংডন ক্রেসেন্ট,
২৮শে মার্চ, ১৯৪৬

"প্রিয় গান্ধীজী,

আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় ও বন্ধুত্বের সূচনা আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে। সেদিন আপনি ক্লিমেন্ট্স ইন্-এ আমাদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে যোগ দিয়েছিলেন। পুনর্বার আপনার সঙ্গে দেখা করে সেই পুরনো পরিচয় আর বন্ধুত্বকে আবার ঝালিয়ে নেবার জন্যে আমি সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছি।

বুধবার অপরাহ্নে যে বৈঠকের ব্যবস্থা হয়েছে, সেখানে তো শুধুই বৃহৎ নীতি নিয়ে আলোচনা হবে। তার আগেই যদি আপনি ঘরোয়া আলোচনার জন্যে সময় করে একবার এই ছোট্ট বাড়িটিতে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারেন, তাহলে আমি খুবই খুশী হব।

শুনেছি, সন্ধ্যা সাতটা আপনার পক্ষে প্রশস্ত সময়। আগামী রবিবার কিংবা সোমবার আমি সেইসময় আপনার দেখা পেতে উৎসুক রইলাম। যদি অন্য সময়ে এলে আপনার সুবিধে হয় তো তা-ই আসবেন; বস্তুত রবিবার আমার হাতে আর অন্য কোনও কাজ নেই।

বাড়ি থেকে রওনা হবার আগে আমার স্ত্রী আমাকে বলে দিয়েছিলেন যে, আপনার সঙ্গে দেখা হলে যেন আপনাকে তাঁর শুভেচ্ছা জানাই।

চিরকাল আন্তরিকভাবে আপনার
পেথিক-লরেন্স"

ভারত-সচিব আমাকে জানালেন যে, আমি যাতে বিমানযোগে পুনা রওনা হতে পারি, তার ব্যবস্থা করবার জন্য ভাইসরয়কে তিনি অনুরোধ করেছেন; ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি মিঃ জর্জ অ্যাবেল এ-ব্যাপারে সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। জর্জ অ্যাবেল যথাসময়ে আমাকে জানালেন, পরদিন সকালে যে-বিমানটি বোমবাই যাবে তাতে তিনি অনেক কষ্টে আমার জন্যে একটি আসনের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। এ যখনকার কথা বলছি, বিমান-পরিবহণের ব্যবস্থা তখন কড়া নিয়ন্ত্রণের অধীনে; এবং সমস্ত আসনই তখন সাধারণত সামরিক বিভাগের লোকেদের জন্য সংরক্ষিত থাকত। কীভাবে তিনি একজন মিলিটারী অফিসারকে হটিয়ে দিয়ে তাঁর আসনটি আমার জন্যে দখল করেছেন, ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি বেশ সবিস্তারে আমাকে তার সালংকার বর্ণনা দিলেন। অতঃপর জানালেন যে, বারাখামবা রোডের যে বাড়িতে আমি থাকি, রাত চারটের সময় ভাইসরয়ের গ্যারাজ থেকে সেখানে একটি গাড়ি পাঠানো হবে, এবং সেই গাড়িই আমাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে পালাম বিমানবন্দরে পৌঁছে দেবে।

শেষ রাত্তিরে আমি অনেক কষ্টে ঘুম থেকে উঠলাম, এবং যাত্রার জন্যে তৈরী হয়ে নিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। পায়চারি করতে করতে লক্ষ্য রাখছি, কখন গাড়ি আসে। কিন্তু গাড়ি আর আসে না। অধৈর্য হয়ে শেষে ভাইসরয়-ভবনের গ্যারাজে ফোন করলুম। নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে ওদিক থেকে উত্তর এল, "মিনিট দুয়েকের

মধ্যেই গাড়ি রওনা হচ্ছে।" গাড়ি আসতে ড্রাইভারকে আমি কষে ধমক লাগালাম। বিরক্তিটা অকারণ নয়। বিস্তর দেরি হয়ে গিয়েছে। আমার ভয় হচ্ছিল, প্লেন ধরা সম্ভব হবে না। ড্রাইভার বলল, ঘুম থেকে সে সময়মত উঠতে পারেনি। দেরির জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে সে ঝড়ের বেগে বিমানবন্দরের দিকে গাড়ি ছোটাল। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হল না। পালামে পৌঁছে শুনলাম, একটু আগেই প্লেন ছেড়ে গিয়েছে। রয়াল এয়ার ফোর্সের যে অফিসারটির হাতে বিমানবন্দরের দায়িত্ব (পালাম তখন রয়াল এয়ার ফোর্সের নিয়ন্ত্রণাধীন), আমার দেরি দেখে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বললেন, আমি যে একটা জরুরী কাজে যাচ্ছি তা তিনি জানেন। সেইজন্যেই প্লেনটিকে তিনি নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাবার পরেও দশ মিনিট আটকে রেখেছিলেন। তবু যে আমি প্লেন ধরতে পারলুম না, সে-দোষ পুরোপুরি আমারই।

রয়াল এয়ার ফোর্সের অফিসারটিকে বুঝিয়ে বললুম যে, সেই সকালেই আমার পুনা পৌঁছনো চাই; সুতরাং যেমন করেই হোক তাঁকে একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তিনি বললেন, ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করলে হয়ত আর-একটা প্লেন পাওয়া যেতে পারে। কী আর করি, বিরসমুখে বসে রইলুম। আধঘণ্টাটাক বাদে অফিসারটি এসে বললেন, "প্লেনটাকে ধরতে না-পারায় আপনার কোনও ক্ষতি হয়নি। বরং ভালই হয়েছে। খবর পেলুম, ইনজিনে গোলযোগ ঘটায় ওটি আবার বিমানবন্দরেই ফিরে আসছে।"

আরও প্রায় আধঘণ্টা বাদে ভদ্রলোক আবার আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, কিছু একটা হয়েছে। ঠিক তা-ই। তিনি বললেন, এইমাত্র খবর পাওয়া গেল যে, প্লেনটি ধ্বংস হয়ে গেছে। দাউ-দাউ করে তাতে নাকি আগুন জ্বলছিল। বুঝতে পারছিলাম যে, এই দুঃসংবাদে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছেন। হবারই কথা। প্লেনটিতে বেশির ভাগই ছিলেন মহিলা-যাত্রী; সামরিক বিভাগের নার্স। ঘটনাটি তার ফলে আরও দুঃখদায়ক হয়ে উঠেছিল। পরে জানা গেল যে, সেই দুর্ভাগা বিমানের একজন যাত্রীও রক্ষা পাননি।

রয়াল এয়ার ফোর্সের অফিসারটি কিন্তু সেই অবস্থাতেও আমার কথা ভোলেননি। চেষ্টা করে তিনি একটা ছ-আসনের বীচ্‌ক্র্যাফ্‌ট প্লেন জোগাড় করলেন, এবং একমাত্র যাত্রী হিসেবে আমাকে তাতে তুলে দিলেন। পাইলটকে তিনি বললেন, যে, জরুরী কাজে আমাকে মহাত্মা গান্ধীর কাছে যেতে হচ্ছে, তাই বোমবাইয়ে না থেমে সরাসরি আমাকে পুনার সামরিক বিমানঘাটিতে নিয়ে নামিয়ে দিতে হবে। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই আমি পুনায় পৌঁছে গেলাম; সেখান থেকে রওনা হলাম উরুলিকাঞ্চন গ্রামের দিকে। আমি যে খুব উত্তেজিত অবস্থায় ছিলুম, সে-কথা বলাই বাহুল্য। গান্ধীজীর কাছে গিয়ে, ভারত-সচিব আর সার্‌ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের চিঠি তাঁর হাতে তুলে দেবার আগেই তাই আমি তাঁকে দুর্ঘটনার বিবরণ শোনাতে লাগলাম। সব শুনে গম্ভীরভাবে গান্ধীজী বললেন, "এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, তুমি ১২৫ বছর বাঁচবে।"

গান্ধীজী চিঠি দুখানি পড়লেন; ব্রিটিশ সরকারের দুই মন্ত্রী তাঁকে যা লিখেছিলেন তা নিয়ে একটুক্ষণ চিন্তা করলেন; তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যিই কি তোমার মনে হয় যে, কাজের সূচী পালটে এখুনি আমার দিল্লি যাওয়া উচিত?" আমি বললুম, এই দুই ইংরেজ ভদ্রলোক যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান; এ-ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহ সম্পর্কে আমার কিছুমাত্র

সন্দেহ নেই; এবং আমার মনে হয় যে, তাঁদের এই ব্যগ্র আহ্বানে গান্ধীজীর সাড়া দেওয়া উচিত।

মিনিট কয়েক গান্ধীজী এ নিয়ে চিন্তা করলেন; খানিকটা আত্মমগ্ন ভাবেই দু-একটা কথা বললেন; তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এর উপরে কিছু নির্ভর করছে না। তবে তোমার যখন এ-ব্যাপারে এতটাই আগ্রহ, তখন তাই হোক; আমি যাব। প্রার্থনা আর সন্ধ্যার খাওয়া শেষ হবার পরেই আমি রওনা হতে পারি।"

ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি আগেই রেল-কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে রেখেছিলেন যে, সুধীর ঘোষ নামে এক ভদ্রলোক যদি পুনা স্টেশনে গিয়ে স্টেশন-সুপারিনটেনডেনটের সঙ্গে দেখা করেন, তাহলে যেখানেই তিনি যেতে চান না কেন, একটা স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা অবশ্যই করে দিতে হবে। স্টেশন সুপারিনটেনডেনটের অফিসে হাজির হয়ে তাঁকে আমি নিজের নাম জানালুম। বললুম, পুনা থেকে তিরিশ মাইল দূরে উরুলিকাঞ্চন গ্রামের ছোট্ট স্টেশন থেকে গান্ধীজী সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় দিল্লি যাত্রা করবেন। গান্ধীজীর দলে মোট ১৩ জন লোক থাকবেন; এবং তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ছাড়া তিনি উঠবেন না।

ছোট্ট একটি স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করে দিলেন পুনার স্টেশনমাস্টার। সামনে ইনজিন, পিছনে গার্ড ভ্যান, মাঝখানে একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা—এই হচ্ছে সেই স্পেশ্যাল ট্রেন। যাত্রা করতে-করতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। ড্রাইভারকে আমি বলে রাখলুম যে, সকালবেলায়, ঘণ্টা দুয়েকের জন্য, গান্ধীজী বোমবাইয়ে নামবেন। ড্রাইভারটি বেশ বুদ্ধিমান। শেষ রাত্রে আমাদের না-জাগিয়ে বোমবাইয়ের কাছে দাদর স্টেশনে সে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখল; তারপর সকাল হতে বোমবাই স্টেশনে গিয়ে ঢুকল। বোমবাই স্টেশনে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে, বহু গান্ধীভক্ত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। স্টেশন থেকে আমাদের উত্তর-বোমবাইয়ের হরিজন-পল্লীতে নিয়ে যাওয়া হল। আমরা যে আসব, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও তো তা কেউ জানতেন না। দেখে বিস্মিত হলাম যে, এরই মধ্যে আমাদের এই স্বল্পকালীন যাত্রাবিরতি উপলক্ষেও ঢালাও ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় ইতিমধ্যেই সাড়া জেগেছিল। ভাইসরয় যে ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন তাকে নাকচ করে গান্ধীজীকে এই যে বিশেষভাবে দিল্লিতে আমন্ত্রণ জানানো হল, এর অর্থ কী হতে পারে, রাজনৈতিক মহলে তা নিয়ে কৌতূহলের সীমা ছিল না। অনেকেই আশা করছিলেন যে, এর ফল সুদূরপ্রসারী হবে। এই যাত্রাকে তাই অনেকে ঐতিহাসিক যাত্রা বলে আখ্যাত করলেন।

স্পেশ্যাল ট্রেনে যত তাড়াতাড়ি দিল্লি পৌঁছনো যাবে ভাবা গিয়েছিল, তত তাড়াতাড়ি অবশ্য পৌঁছনো গেল না। ট্রেনটিকে ছোট-বড় প্রায় প্রতিটি স্টেশনেই দাঁড়াতে হচ্ছিল। তার কারণ, দেশ জুড়ে এই খবর ছড়িয়ে গিয়েছিল যে, মহাত্মা গান্ধী দিল্লি চলেছেন। গান্ধীজীর যাতায়াতের খবর যে কী করে এত তাড়াতাড়ি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত, এবং ট্রেন কখন কোন্ স্টেশনে পৌঁছবে, জনতা যে কী করে এত তাড়াতাড়ি তার খবর পেয়ে যেত, ভাবতে সত্যিই বিস্ময় লাগে। জনতা এসে স্টেশনে-স্টেশনে ভিড় করত, এবং দাবি জানাত যে, তারা যাতে গান্ধীজীর 'দর্শন' পায়, তার জন্য ট্রেন সেখানে থামাতে হবে। স্টেশন মাসটাররাও সানন্দে সে-দাবি মেনে নিতেন। সিগন্যালম্যানরা থামবার সিগন্যাল দিত; ফলে ইনজিন ড্রাইভারেরও ট্রেন না-থামিয়ে উপায় থাকত না। গান্ধীজীর দলে বাকী যাঁরা দিল্লি যাচ্ছিলেন, তাঁদের

চোখে আমিই ছিলুম ভাইসরয়ের বিশেষ প্রতিনিধি। সুতরাং ট্রেন থামবামাত্র আমার কাছে তাঁরা কৈফিয়ত দাবি করতে লাগলেন। এক-একটা স্টেশনে ট্রেন থামে, আর তাঁরা আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "ট্রেন থামল কেন? ব্যাপার কী?" শেষ পর্যন্ত আমি অতিষ্ঠ হয়ে তৃতীয় শ্রেণীর সেই কামরা ছেড়ে ইনজিনে গিয়ে আশ্রয় নিলুম, এবং ড্রাইভারকে বললুম, স্টেশন মাস্টাররা থামবার নির্দেশ দিলেও যেন ট্রেন থামানো না হয়। পর-পর কয়েকটি স্টেশনে তা-ই করা হল; রেল-লাইনের দুই ধারে বিস্তর লোকজন দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও সে-সব জায়গায় ট্রেন থামানো হল না। এত মুহুর্মুহু যে আমাদের থামানো চলবে না, রেল-কর্মচারীরাও অতঃপর তা বুঝে গেলেন। কিন্তু তাতেও যে বিশেষ কাজ হল, তা নয়; বোমবাই থেকে দিল্লির নিজামুদ্দীন রেল-স্টেশনে পৌঁছতে সে-যাত্রায় আমাদের বিস্তর সময় লেগেছিল।

নিজামুদ্দীন থেকে সরাসরি আমরা রীডিং রোডের ভাঙ্গী কলোনিতে চলে গেলুম। সেখানে বাল্মীকি-মন্দিরের পাশে, নয়াদিল্লি মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুদারদের বসতিতে, গান্ধীজীর সদর-দপ্তর বসেছিল। তার ঘণ্টাখানেক বাদেই ১নং উইলিংডন ক্রিসেনটে গিয়ে সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স আর লর্ড পেথিক-লরেনসের সঙ্গে দেখা করলুম আমি। সার স্ট্যাফোর্ড তখুনি ভাঙ্গী কলোনিতে চলে এলেন। পরে এলে তাঁর পক্ষে প্রার্থনা-সভায় যোগ দেওয়া সম্ভব হত না। ভারত-সচিব বললেন, সন্ধ্যা সাতটায় তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে চান। গান্ধীজী তো সৌজন্যের প্রতিমূর্তি। তিনি বললেন, ভারত-সচিবের আসবার দরকার নেই; তিনিই বরং ২ নং উইলিংডন ক্রিসেনটে গিয়ে ভারত-সচিবের সঙ্গে দেখা করবেন।

পরদিন সকালে গান্ধীজী বললেন, আমাকে গিয়ে ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারির কাছে রেলভাড়া মিটিয়ে দিতে হবে। শুনে আমি অস্বস্তিতে পড়লুম। তার কারণ, গান্ধীজীর সুবিধের জন্যই সরকার থেকে স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, ভাড়া দেবার কোনও প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু গান্ধীজী বললেন, ভাড়া আমাদের দিতেই হবে। নিজেই তিনি হিসেব করে বললেন, বোমবাই থেকে দিল্লি পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীতে মাথাপিছু রেলভাড়া হচ্ছে ২৭ টাকা ৬ আনা; সেই হিসেবে আমাদের ১৩ জনের ভাড়া মোট ৩৫৫ টাকা ১৪ আনা দাঁড়াচ্ছে। টাকাটা তিনি আমার হাতে তুলে দিয়ে, নির্দেশ দিলেন, ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারিকে আমি যেন এই টাকাটা দিয়ে দিই। সুতরাং রেলের ভাড়া মেটাবার জন্য আমি জর্জ অ্যাবেলের কাছে গিয়ে হাজির হলুম। সেকালে ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন রীতিমত গণ্যমান্য মানুষ; হাত পেতে তাঁকে ভাড়া নিতে হবে, এই ঝঞ্ঝাট তাঁর মোটেই পছন্দ হল না। গর্জন করে তিনি বললেন, "আমার কাছে ভাড়া মেটাতে আসবার অর্থ কী? আমি কি একজন স্টেশন মাসটার? আর তা ছাড়া, বৃদ্ধকে যে আদৌ ভাড়া মেটাতে হবে, তা-ই বা কে বলল? সরকার তাঁর সুবিধের জন্যে স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তাঁর কাছে তো তার জন্য ভাড়া চাওয়া হয়নি। তবে?"

সুতরাং ব্যাখ্যা করে তাঁকে আমায় বুঝিয়ে বলতে হল যে, এই বৃদ্ধ ব্যক্তিটি একজন সাধারণ মানুষ নন; তাঁর ইচ্ছে-অনিচ্ছের বিরুদ্ধে কারও যাবার উপায় নেই; সুতরাং টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে কোনও লাভ হবে না। স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা না থাকলে তিনি আর-পাঁচজনের মতই তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠতেন, এবং নিজের দলের প্রত্যেকের ভাড়া মিটিয়ে দিতেন। ভারতবর্ষের ভাইসরয়ের কাছ থেকে এ-ব্যাপারে কোনও অনুগ্রহ নেবার ইচ্ছে তাঁর নেই।

শুনে জর্জ অ্যাবেল বললেন, "বেশ, তবে তাই হোক। তবে বৃদ্ধ যখন ভাড়া দিতে এতই ব্যগ্র, তখন সাধারণ তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া তো আমরা নেব না, পুনা থেকে দিল্লি পর্যন্ত স্পেশ্যাল ট্রেনের খরচা তাঁকে মেটাতে হবে।"

বলে তিনি রেলওয়ে বোর্ডকে ফোন করলেন। এবং তাঁদের কাছ থেকে হিসেব জেনে নিয়ে পুনা থেকে দিল্লি পর্যন্ত স্পেশ্যাল ট্রেনের খরচাটা আমাকে জানালেন। মোটামুটি ১৮,০০০ টাকা। জর্জ বললেন, গান্ধীজীর কাছে ভাড়া আদৌ চাওয়া হচ্ছে না। তবু যদি তিনি ভাড়া মেটাবার জন্য জিদ করেন, তবে ওই ১৮,০০০ টাকা তাঁকে দিতে হবে। অগত্যা আমি গান্ধীজীর কাছে ফিরে এসে জানালুম যে, তিনি যদি ভাড়া দিতে চান তো পুরো ১৮,০০০ টাকা তাঁকে দিতে হবে। গান্ধীজী কিন্তু এ-কথা মেনে নিলেন না। তাঁর যুক্তি পাকা। এমনিতে তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে এলে ১৩ জনের ভাড়া পড়ত ৩৫৫ টাকা ১৪ আনা। সুতরাং ওই অংকটাই তাঁর কাছে রেল-কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য। তিনি তো স্পেশ্যাল ট্রেনে আসতে চাননি; সরকার তাঁদের নিজের গরজে তাঁর জন্য স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সুতরাং তার খরচা তিনি দিতে যাবেন কেন? না, স্পেশ্যাল ট্রেনের খরচা তিনি দেবেন না। তৃতীয় শ্রেণীর যা সাধারণ ভাড়া, তিনি তা-ই দেবেন, এবং সরকারকে তা নিতে হবে।

সুতরাং আবার আমি ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারির কাছে গেলুম। গিয়ে বললুম, "দ্যাখো জর্জ, যদি ভাল চাও তো লক্ষ্মী ছেলের মতো টাকাটা নিয়ে নাও। বৃদ্ধকে আমি চিনি। তোমরা যদি ভেবে থাকো যে, যুক্তি-তর্কে তাঁকে হারাতে পারবে, তো মহা ভুল করছ।"

জর্জ অ্যাবেল আর কথা বাড়ালেন না; চুপচাপ টাকাটা নিয়ে নিলেন। অতঃপর রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যানকে এই মর্মে তিনি একটি চিঠি লিখে দিলেন যে, মহাত্মা গান্ধীর শুভেচ্ছাসহ টাকাটা তিনি পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

শান্তির সন্ধানে

গান্ধীজীর দুই কোয়েকার বন্ধু ছিলেন আগাথা হ্যারিসন আর হোরেস আলেকজানডার। তাঁদের সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে নিয়ে, একত্রে আমাদের এই তিনজনকে তিনি একটা ডাক-নাম দিয়েছিলেন। রীডিং রোডের ভাঙ্গী কলোনিতে যখনই আমরা একসঙ্গে তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকতাম, কাজ থেকে তিনি মাথা তুলে তাকাতেন, হাসতেন, তারপর বলতেন, "এই যে, এবারে ত্রিমূর্তির আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা বসতে পারো, কিন্তু খবর্দার, টুঁ-শব্দটি করবে না। সত্যিকারের কোয়েকারের মতন চুপটি করে বোসো। দেখতেই পাচ্ছ, আমি ব্যস্ত।" বলে চুপচাপ তিনি আবার কাজের মধ্যে ডুবে যেতেন। তারপর হাতের কাজ শেষ করে আবার আমাদের দিকে তাকাতেন। চোখের মধ্যে একটু দুষ্টু হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠত। বলতেন, "এবারে বলো, ক্যাবিনেট-মন্ত্রীদের কতটা ঘায়েল করতে পেরেছ।"

স্বর্গত সি. এফ. এনড্রুজ ছিলেন গান্ধীজীর খুবই প্রিয়পাত্র। কোনও ভারতীয়ও সম্ভবত গান্ধীজীর চিত্তের এতটা সান্নিধ্যে আসতে পারেননি। আগাথা হ্যারিসন সেই এনড্রুজেরই বান্ধবী। গোলটেবিল বৈঠক উপলক্ষে ১৯৩২ সনে গান্ধীজী যখন লনডনে যান, এনড্রুজের মাধ্যমে আগাথা হ্যারিসন তখন গান্ধীজীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। ইনডিয়া কনসিলিয়েশন গ্রুপ নামে কোয়েকারদের একটা ছোট্ট সমিতি ছিল; আগাথা ছিলেন তার সেক্রেটারি। বিখ্যাত কোয়েকার কার্ল হীথ এই সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন। সমিতির অন্যান্য সদস্যের মধ্যে হোরেস আলেকজানডার আর জ্যাক হয়ল্যানডের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা কোয়েকার কলেজে অধ্যাপনা করতেন। তা ছাড়া ক্যাডবেরি পরিবারের কয়েকজনও ছিলেন এই সমিতির সদস্য। সমিতির কার্যকলাপের মূলকেন্দ্র ছিল লনডনে; ইউসটন রোডের ফ্রেনড্স হাউসে। সদস্যরা আদর্শনিষ্ঠ নরনারী; এঁদের কাজকর্মের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সংস্রব ছিল না। ইংরেজদের এই ছোট্ট গোষ্ঠীটিতে খুবই উঁচুদরের বুদ্ধি ও প্রতিভার সান্নিধ্য মিলত; ধর্ম সম্পর্কে এঁদের উপলব্ধি ছিল স্বতন্ত্র। কোয়েকাররা শান্তিবাদী মানুষ; সেই কারণেই গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁদের একটা বিশেষ যোগসূত্র রচিত হয়েছিল। গান্ধীজীর অহিংসা আর কোয়েকারদের শান্তিবাদ মূলত একই বস্তু। গান্ধীজীর বিশ্বাসের মূল ছিল হিন্দুধর্মে নিহিত; তার ব্যক্তরূপ ছিল রামধুন। রামই তাঁর ঈশ্বর; গানের মধ্য দিয়ে গান্ধীজী তাঁর মহিমাকীর্তন করতেন। পক্ষান্তরে যিশুর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে তারই ভিত্তিতে কোয়েকাররা তাঁদের শান্তিবাদী আদর্শকে বিকশিত করে তুলেছিলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে কোয়েকারদের যেখানে মিল, আনুষ্ঠানিক ধর্ম নয়, আত্মিক ব্যাপারটাই সেখানে বড় কথা।

তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমি ছিলুম কেমব্রিজের এক আনডার-গ্রাজুয়েট। সেই সময়ে আমি কোয়েকারদের প্রতি আকৃষ্ট হই। প্রতি রবিবার সকালে জেসাস লেনের মীটিং হাউসে গিয়ে আমি তাঁদের সঙ্গে উপাসনা করতুম। সেই উপাসনা-অনুষ্ঠানের নৈঃশব্দ্যের মধ্যে আমি শান্তি আর সম্পদের সন্ধান পেয়েছিলাম। ধর্মে আমি হিন্দু; তবু কোয়েকাররা আমাকে কোয়েকার বলেই ভাবতেন। আমার অবস্থাটা ছিল 'অনারারি কোয়েকার'-এর মতন। কেমব্রিজের বাসিন্দা-কোয়েকারদের

তালিকায় যখন আমার নামও ফী-বার ছেপে বেরুত, তখন সেই কোয়েকারী ভুলটা আমার ভালই লাগত। ছাত্রাবস্থার সেই দিনগুলিতেই আমি লনডনের ইনডিয়া কনসিলিয়েশন গ্রুপের প্রতি আকৃষ্ট হই। বস্তুত কেমব্রিজের আনডারগ্র্যাজুয়েটদের মধ্যেও আমি কোয়েকার-পদ্ধতিতে একটি ইনডিয়া কনসিলিয়েশন গ্রুপ গড়ে তুলেছিলাম। তাঁর সদস্য ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন তরুণ কোয়েকার, এবং মোটামুটি কোয়েকারদের মতই আদর্শে বিশ্বাসী আরও জনাকয় ব্রিটিশ আনডারগ্র্যাজুয়েট। (তাঁদের মধ্যে একজনের নাম এরিক পাইল; তিনি এখন কেমব্রিজের চেসহান্ট কলেজের প্রেসিডেন্ট।) গ্রুপের মধ্যে ভারতীয় বলতে ছিলাম একমাত্র আমি। প্রতি রবিবার আমরা একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সমাধা করতুম। শরতে আর শীতকালে ছাত্রনিবাসেই—পালাক্রমে এক-একজনের ঘরে—মধ্যাহ্নভোজের আসর বসত। বসন্তে আর গ্রীষ্মে আসর বসত ফাঁকা মাঠে, নদীর তীরে। কেমব্রিজ আর রুপার্ট ব্রুকের গ্রাম গ্র্যানটচেসটার—তারই মধ্যে যে-কোনও জায়গায় নদীর ধারে আমরা বসে পড়তুম। মধ্যাহ্নভোজের পদ বলা বাহুল্য বেশী হত না। সুপ, রুটি, মাখন আর মার্মালেড। তার বেশী আয়োজন কী করে করব। আমরা তখন ছাত্র; পকেট তো প্রায় সর্বদাই শূন্য থাকত।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী সার আরথার এডিংটন ছিলেন এই গ্রুপের চেয়ারম্যান। তিনিও ছিলেন কোয়েকার। ইংল্যানডে আর মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে এ-যাবৎ অসংখ্য কোয়েকার আমি দেখেছি, কিন্তু তাঁর মত নিঃশব্দ কোয়েকার আর কাউকে দেখিনি। জেসাস লেনে প্রতি রবিবার সকালে উপাসনা-অনুষ্ঠান হত; সেখানে প্রতি রবিবারই তাঁকে দেখতে পাওয়া যেত। দেখতুম, সমাবেশের এককোণে শান্ত হয়ে তিনি বসে আছেন। পুরো তিন বছর সেখানে উপাসনা করেছি আমি; কিন্তু সেই তিন বছরের মধ্যে একদিনও তাঁকে মুখ খুলতে দেখিনি। আমাদের গ্রুপের অন্যান্য সদস্যরা (তাঁদের মধ্যে অনেক তরুণীও ছিলেন) কিন্তু মোটেই মুখ বুজে থাকতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন প্রবীণ সকলেই যাতে গান্ধীজীকে আর ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবিকে আরও ভালভাবে বুঝতে পারেন, তার জন্য গ্রুপ থেকে আমরা নানা রকমের সভা আর আলোচনা-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতুম। সার্ আরথার এডিংটন ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডনদের মধ্যে আমাদের আরও কয়েকজন সমর্থক ছিলেন। আমি যেখানে পড়তুম, সেই ইমানুয়েল কলেজের টিউটর ডঃ অ্যালেক্স উড, ক্রাইস্ট কলেজের অধ্যাপক চার্লস র‍্যাভেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক সার্ আরনেস্ট বারকারের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সোসাইটি অব ফ্রেনড্স্-এর বাইরে থেকেও এঁদের প্রথম দুজন ছিলেন বিশিষ্ট ব্রিটিশ শান্তিবাদী। মাঝে-মাঝে আমরা বেশ বড় রকমের বিতর্ক-সভার আয়োজন করতুম। তারই একটিতে বক্তৃতা দেবার জন্যে একবার আমরা লনডনের ইনডিয়া লীগ থেকে কৃষ্ণ মেননকে কেমব্রিজে নিয়ে এলুম। বিতর্ক-সভায় সেবারে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন সার্ হিউ ও'নীল আর সার্ অ্যালফ্রেড ওয়াটসন। প্রথমজন তখন সহকারী ভারত-সচিব; সেই সময়ে ভারত-সচিব ছিলেন মিঃ এল এস আমেরি। আর দ্বিতীয়জন কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক। বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে তিনি অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলেন। তা সে যাই হোক, ব্রিটিশ টোরি দলের এই দুই ধুরন্ধরকে সেদিন কৃষ্ণ মেনন একেবারে ধরাশায়ী করে ছেড়েছিলেন। ব্রিটেনের অল্পবয়সী আন্ডারগ্র্যাজুয়েটেরা তাঁদের সেই দুর্দশা দেখে ভারী খুশী।

দুজনে মিলেও তাঁরা কিছু করতে পারলেন না; কৃষ্ণ মেনন একাই তাঁদের ঠান্ডা করে দিলেন। তার দুই দশক বাদে চীনা কমিউনিস্টরা যেদিন থাগলা রিজে আক্রমণ চালাল, সেদিন অবশ্য কৃষ্ণ মেননের সেই রণনৈপুণ্য আমরা দেখতে পাইনি।

লনডনে ইন্‌ডিয়ান কনসিলিয়েশন গ্রুপের কার্যকলাপ সম্পর্কে আমার ঔৎসুক্য ছিল। তারই সূত্রে আমি আগাথা হ্যারিসন আর হোরেস আলেকজান্‌ডারের সান্নিধ্যে আসি। আগাথা আমাকে মায়ের মতন স্নেহ করতেন। চেলসির অন্য পাড়ে, টেমসের তীরে, অ্যালবার্ট ব্রিজ রোডে ২ নং ক্ল্যানবোর্ন কোর্টের একটি ফ্ল্যাটে তিনি থাকতেন। বিদেশে সেই ফ্ল্যাটই আমার আপন বাড়ি হয়ে উঠল। শুধু আমি কেন, প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে অনেকের কাছেই সেই ফ্ল্যাট নিজের বাড়ির তুল্য ছিল। ইন্দিরা নেহরু তখন অক্‌স্‌ফোর্ডের সমারভিল কলেজের ছাত্রী। তিনিও সেখানে মাঝে-মাঝেই যেতেন। কোয়েকারদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ অনেক দিনের। পরে ১৯৪২-৪৩ সনে, ফ্রেনড্‌স অ্যামবুলেন্স ইউনিটের একদল শান্তিবাদী তরুণ ইংরেজ সাইক্লোন আর দুর্ভিক্ষের ত্রাণকার্যে সাহায্য করবার জন্য হোরেস আলেকজানডারের সঙ্গে বাংলা দেশে আসেন। পুরনো সেই যোগাযোগের জন্যই তখন আমি সে-কাজে হোরেস আলেকজানডার আর সেই তরুণদের সঙ্গে হাত মেলাই। আরও পরে, ১৯৪৬ সনের এপ্রিল-মে-জুনে, ক্যাবিনেট মিশনের ভারত-সফরের সময়ে, আমরা তিনজন আবার একযোগে কাজ করেছি। আমি, আগাথা হ্যারিসন আর হোরেস আলেকজানডার—গান্ধীজী তখন আমাদের নাম দিয়েছিলেন 'ত্রিমূর্তি'।

চল্লিশ কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষ। সেই ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য তখন আলোচনা চলেছে। আর সেই আলোচনার ব্যাপারে আমরা ছিলাম উভয় পক্ষেরই আস্থাভাজন। আমাদের পক্ষে সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। বিশেষ করে আমার পক্ষে তো বটেই। আমি ভারতীয়। তবু নম্র স্বভাবের মানুষ লর্ড পেথিক-লরেন্‌স আর গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স—এঁরা দুজনেই আমাকে বিশ্বাস করতেন। অথচ আমার সম্পর্কে তাঁরা কতটুকুই বা জানতেন তখন? গভরনর কেসি যা বলেছিলেন, তার বেশী তো কিছুই তাঁরা জানতেন না। যাই হোক্‌, দুই পক্ষের আস্থাভাজন হয়ে একদিকে আমি যেমন উৎফুল্ল বোধ করেছি; অন্যদিকে তেমনি তখন দেখে দুঃখ পেয়েছি যে, ব্রিটেন আর ভারতবর্ষের উচ্চচেতা দুই দল মানুষ প্রাণপণে পরস্পরকে বিশ্বাস করবার চেষ্টা করেও ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না।

৩১শে মার্চ তারিখে গান্ধীজী নয়াদিল্লিতে এসে পৌঁছলেন। ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে গান্ধীজীর সাক্ষাৎকারের জন্য ভাইসরয় ইতিপূর্বে যে তারিখ ধার্য করে গান্ধীজীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, ব্রিটিশ রাজনীতিক দুজন তার আগেই গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক হন; এবং ঘরোয়াভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলবার অভিপ্রায়ে তার আগেই তাঁকে দিল্লি আসবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। সেই অনুযায়ী ৩১শে মার্চ তারিখেই গান্ধীজী নয়াদিল্লি এলেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁর ঘরোয়া কথাবার্তা হল; অতঃপর আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারের পর্বও চুকল। তাঁর কাছে আর কী তাঁদের প্রত্যাশা, গান্ধীজীর সে সম্পর্কে তখনও কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাঁর তাই মনে হল যে, ভারতবর্ষের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার যে জটিল দায়িত্ব নিয়ে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে এসেছেন, ঠিকমতো সেটা পালনের ব্যাপারে মিশনকে তাঁর যা পরামর্শ দেবার তা তো তিনি দিয়েছেন, এবারে তাঁর পুনা কিংবা সেবাগ্রামে

ফিরে গিয়ে নিজের কাজে মগ্ন হওয়া ভাল। কংগ্রেস দলের সঙ্গে মিশনের যে আলোচনা হবার কথা, সে-আলোচনা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট মৌলানা আজাদের নেতৃত্বে গঠিত প্রতিনিধিদলের সঙ্গে চলবে। ইতিপূর্বে ভারত-সচিবের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে গান্ধীজীর দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। গান্ধীজী সেই আলোচনার শেষে ভারত-সচিবকে জানিয়েছিলেন যে, ক্যাবিনেট মিশন যদি মনে করেন, এতে কিছু কাজ হবে, তো ব্যক্তিগতভাবে তিনি মিঃ জিন্নার সঙ্গে কথা বলতে রাজী আছেন। ১৯৪৬ সনের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে লর্ড পেথিক লরেন্স এই প্রস্তাবের উত্তরে গান্ধীজীকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিখানি এখানে উদ্ধৃত হল :

ক্যাবিনেট ডেলিগেশনের দপ্তর,
ভাইসরয়-ভবন,
নয়াদিল্লি,
৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৬

“প্রিয় গান্ধীজী,

গত সোমবার যখন আমার বাংলোয় আমাদের সাক্ষাৎ হয়, তখন, এবং তারপরে গত বুধবারেও আমার দফতরে আপনি বলেছিলেন যে, মিঃ জিন্নার সঙ্গে আপনি কথা বললে তাতে কাজ হবে বলে যদি আমরা মনে করি, তাহলে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আপনি রাজী আছেন।

আমার এখনও মনে হয় যে, এমন সময় আসতে পারে যখন আপনাদের সাক্ষাৎকারে সত্যই উপকার হবে, এবং আমি জানি, মিঃ জিন্নাও খুবই সানন্দে আপনার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হবেন। তবে আমার সহকর্মীরা ও আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, অবস্থা এখনও এতটা পরিষ্কার হয়নি, যাতে এই মুহূর্তে আপনাদের সাক্ষাৎকারের পরিণামে বেশ-কিছুটা মতৈক্য ঘটা সম্ভব।

আমার মনে হয় যে, আমাদের এই ধারণার কথাটা অবিলম্বে আপনাকে জানিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। কেননা, এর সঙ্গে আপনার কার্যসূচী জড়িত, এবং অনির্দিষ্ট-কালের জন্য আপনাকে আমি দিল্লিতে থাকতে বলতে পারি না।

আমার যে আপনার সঙ্গে দেখা হল, ব্যক্তিগতভাবে তাতে আমি আনন্দিত। বন্ধুভাবে আপনি আমাদের কাজে অনেক সাহায্য ইতিমধ্যেই করেছেন; তার জন্য আমার ধন্যবাদ জানাই।

আন্তরিকভাবে আপনার
পেথিক-লরেন্স।”

ভারত-সচিবের চিঠিখানি আমি দেখলাম। দেখে মনে হল, বিবেচনা ও সৌজন্য-বশতই এ-চিঠি লেখা হয়েছে বটে, কিন্তু গান্ধীজীকে যে দিল্লিতে রাখা দরকার, ভারত-সচিব তা বুঝতে পারেননি। সুতরাং তক্ষুনি আমি সার স্ট্যাফোর্ডের কাছে গেলাম, এবং গান্ধীজীকে দিল্লি থেকে চলে যেতে দিলে যে কত বড় ভুল হবে, সেটা বুঝিয়ে বললাম। সেই সঙ্গে এও বললাম যে, গান্ধীজীকে দিল্লিতে রাখবার জন্যে তাঁকে

যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। আমি জানতুম, ব্রিটিশ মন্ত্রীরা যদি তাঁকে দিল্লিতে থাকবার জন্য অনুরোধ করেন, গান্ধীজীর তাহলে আরও-কয়েকটা দিন থেকে যেতে আপত্তি হবে না। সার স্ট্যাফোর্ড আমার কথাটার তাৎপর্য চট করে বুঝে নিলেন, এবং একই দিনে ভারত-সচিব অন্য কথা বলা সত্ত্বেও, গান্ধীজীকে দিল্লিতে থাকবার অনুরোধ জানিয়ে এই চিঠিখানি লিখে দিলেন :

ক্যাবিনেট ডেলিগেশনের দপ্তর,
ভাইসরয় ভবন,
নয়াদিল্লি,
৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৬

"প্রিয় মিঃ গান্ধী,

শুনতে পাচ্ছি, আপনি হয়ত দিল্লি অবস্থানের মেয়াদ কিছুটা বাড়িয়ে দিতে পারেন। বাড়াবার জন্যেই আমি আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই। সংশ্লিষ্ট মূল পক্ষগুলির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনা শুরু করবার আগে বিভিন্ন স্বার্থ ও শ্রেণীর সঙ্গে আরও কয়েকটি বৈঠক আমাদের সেরে নিতে হবে। অর্থাৎ নানান রকমের সম্ভাবনা এখন গড়ে উঠবার সময়। যাঁরা আপনার উপদেশ চান, তাঁদের উপরে আপনার প্রভাবের মূল্য যে কতখানি, তাও আমি জানি। আরও ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনা শুরু হবামাত্র আমরাও আপনার উপদেশ চাইতে ইচ্ছুক হব। সেক্ষেত্রে আপনি যদি এখন চলে যান, তাহলে তো আপনার সাহায্য আমরা পাব না; সেটা আমাদের পক্ষে খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে।

আমার জন্যে নয়, ভারতবর্ষের জন্যই আপনার এখন নয়াদিল্লিতে থাকা দরকার। দয়া করে থাকুন।

আন্তরিকভাবে আপনার
আর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস।"

গান্ধীজী এ-চিঠির উত্তরে লিখলেন :

হরিজন মন্দির,
৫ই এপ্রিল, ১৯৪৬

"প্রিয় সার্ স্ট্যাফোর্ড,

আপনার সস্নেহ পত্রের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার মৌখিক বার্তাও সুধীর আমাকে জানিয়েছে। মৌলানা সাহেবের নির্দেশে অন্তত ১৬ তারিখ পর্যন্ত আমি এখানে আছি।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম. কে. গান্ধী"

সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স।

চিঠিখানিতে আন্তরিক বন্ধুভাবের পরিচয় ছিল। আমি এটি ক্রিপসের কাছে পৌঁছে দিলাম। শুধু তাই নয়, এর উত্তরে আবার ক্রিপ্সের কাছ থেকে ছোট্ট সহৃদয় আর-একটি চিঠি এনে গান্ধীজীর হাতে তুলে দিলাম আমি। ক্রিপ্স লিখলেন :

ক্যাবিনেট ডেলিগেশনের দপ্তর,
ভাইসরয় ভবন,
নয়াদিল্লি

"প্রিয় মিঃ গান্ধী,

আপনি যে আরও কিছুদিন থাকছেন, তা জেনে আমি খুব খুশী হয়েছি। রোজ যাঁরা গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করছেন, তাঁদের নামের লম্বা তালিকাটিই প্রমাণ করছে, আপনাকে আমরা সকলেই কতটা ভালবাসি।

আন্তরিকভাবে আপনার
আর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স।"

সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস যখন আলোচনা চলেছে, তখন দিনের পর দিন এইভাবেই আমি দুই পক্ষের মধ্যে সেতু বাঁধবার চেষ্টা করেছি। একটু-একটু করে তাঁরা পরস্পরের দিকে এগোচ্ছেন, এটা দেখে আমার খুবই আনন্দ হত। আবার, পরস্পরের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছবার আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও যখন তাঁরা এগোতে পারতেন না, অবস্থাটা তখন খুবই দুঃখদায়ক হয়ে দাঁড়াত।

বৃদ্ধা আগাথা ছিলেন প্রত্যেকের মাতৃস্বরূপা। নয়াদিল্লিতে তিনি প্রতি রবিবার সকালে কোয়েকার উপাসনা-অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। উপাসনা কখনও হত বারাখাম্বা রোডে, মডার্ন স্কুলের একটি ছোট্ট হল্‌এ। আবার কখনও হত জয়সিং রোডে, ওয়াই-ডবলু-সি-এর বাড়িতে, একতলার একটি ঘরে। আগাথা তখন জয়সিং রোডে থাকতেন। গান্ধীজীর মুখ্য সেক্রেটারি শ্রীপ্যারেলাল তাঁর 'দি লাস্ট ফেজ' ('শেষ অধ্যায়') গ্রন্থে এই উপাসনা-অনুষ্ঠানের উল্লেখ করে লিখেছেন :

"সমাবেশে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ যদি তাঁর 'চিন্তা'র অংশ অন্যদের দিতে চান, 'বন্ধু'দের নীরব যোগ-সম্পর্কে তাহলে কিছুক্ষণের জন্য ছেদ পড়ে। যেদিনকার কথা বলছি, সমাবেশে উপস্থিত ভারতীয়দের মধ্যে একজন সেদিন নীরবতা ভঙ্গ করেছিলেন। চার্লি এন্‌ড্রুজের কথা চিন্তা করছিলেন তিনি। 'ইংল্যানডের যা ভাল আর ভারতবর্ষের যা ভাল,' চার্লি এনড্রুজ ছিলেন 'তারই মধ্যে আত্মিকতার এক রেশমী যোগসূত্র'।"

আমিই সেই ভারতীয়; আমিই সেদিন এ-কথা বলেছিলাম। আমার কথায় গান্ধীজী আলোড়িত হয়েছিলেন। উপাসনা-অনুষ্ঠানে তিনিও এ-বিষয়ে কিছু বললেন, এবং উপসংহারে এই আশা প্রকাশ করলেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য চার্লি এন্‌ড্রুজ তো যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষে যা-ই করে থাক না কেন, এতেই তার যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হবে।"

দুই কোয়েকার আর আমি তখন আমাদের সাধ্যমত একদিকে গান্ধীজীর কাজে যথাসাধ্য খেটেছি; অন্যদিকে ব্রিটিশ মন্ত্রীদের কাজে। আমাদের চতুর্দিকে তখন জোর আলাপ-আলোচনা চলছে। ১৯৪৬ সনের ১লা এপ্রিল থেকে ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের তিনজন ক্যাবিনেট-মন্ত্রী আর ভাইসরয় মিলে, ১৮২টি বৈঠকে, যাবতীয় রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী মোট ৪৭২ জন ভারতীয় নেতার সঙ্গে আলোচনা করেন। কী রকম ব্যাপকভাবে যে আলোচনা চলছিল, এর থেকেই তা বুঝতে পারা যাবে। আলোচনার পিছনে প্রধানত যাঁর মাথা খাটছিল, তিনি ক্রিপ্স। ব্রিটিশ উদ্যোগের তিনিই ছিলেন প্রাণস্বরূপ। ভারতবর্ষের দক্ষতম কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে তিনি তখন আলাদাভাবে কিছু কথাবার্তা বলেন। স্বর্গত সার্ এন গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের (পরে তিনি নেহরু সরকারে মন্ত্রী হয়েছিলেন) সঙ্গে ১০ই এপ্রিল তারিখে তাঁর যে বৈঠক হয়, এই প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করতে পারি। আয়েঙ্গার ছিলেন দক্ষ একজন সিভিল সারভ্যান্ট। ভারতবর্ষের দক্ষতম সিভিল সারভ্যান্টদের তিনি অন্যতম। জম্মু আর কাশ্মীর সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল ব্যাপক। সেখানে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ক্রিপ্সের সঙ্গে তাঁর যে কথাবার্তা হয়, এখানে তা তুলে দিচ্ছি। ইতিপূর্বে এই আলোচনার বিবরণ প্রকাশিত হয়নি। ক্যাবিনেট মিশনের চিন্তা তখন কোন্ পথে এগোচ্ছিল, এর থেকেই তা বুঝতে পারা যাবে।

ক্রিপ্স : আপনি আসায় আমি খুশী হয়েছি। আসুন, খোলাখুলিভাবে কথা বলা যাক। অবস্থা সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়?

আয়েঙ্গার : এখনই সেটা স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। আপনিও জানেন, আমিও জানি, অবস্থার গতি এখন নিত্য পালটাচ্ছে। আমার মনে হয়, আপনি এবং মিশনের অন্যান্য সদস্য এখন দুটি লক্ষ্যের উপরে নজর রাখছেন। নূতন সংবিধান রচনার জন্য একটা পরিষদ গড়ে তোলা; এবং কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠা। আপনার কি মনে হয় যে, এ-যাত্রায় এই দুটি সমস্যারই আপনারা সমাধান করতে পারবেন?

ক্রিপ্স : সে-আশা আমার খুবই আছে। আপনাকে আমি জানিয়ে দিতে পারি যে, সমস্যা দুটির সমাধান না-করে আমরা এ-দেশ থেকে বিদায় নিতে রাজী নই।

আয়েঙ্গার : সমস্যা দুটির সমাধানের পথে রয়েছে পাকিস্তানের প্রশ্ন। সমস্যা দুটির সমাধান আপনারা করতে পারবেন, আপনার যদি এমন আশা থাকে, তবে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, পাকিস্তান দাবি সম্পর্কে প্রথমেই আপনাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ক্রিপ্স : হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। এর সঙ্গে শুধু এইটুকু আমি যোগ করব যে, এ-ব্যাপারে একটা মতৈক্য ঘটিয়ে তবেই এই প্রাথমিক প্রশ্ন সম্পর্কে আমরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাই।

আয়েঙ্গার : মতৈক্যের সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল বলে মনে হয় না। মিঃ জিন্না সম্প্রতি যে-সব বিবৃতি দিয়েছেন এবং নানাজনের কাছে যে-সব উক্তি করেছেন তা আপনি নিশ্চয় দেখেছেন। আইনসভার মুসলিম সদস্যদের সম্মেলনে যে-সব বক্তৃতা দেওয়া হল, তাও নিশ্চয় আপনার চোখে পড়েছে।

ক্রিপ্স : নিশ্চয়ই পড়েছে। কথাগুলি যে অগ্নিস্রাবী, তাও লক্ষ্য করেছি। তবে

জেনে রাখুন, এ-সব কথায় আমরা বিশেষ বিচলিত হই না। স্বদেশেও এই ধরনের কথা আমরা শুনে থাকি। এতে আমরা অভ্যস্ত।

আয়েঙ্গার : তা হয়ত হবে। তবে আপনাদের দেশে তো রাজনীতির ভিত অনেক পাকা। সেখানে এই ধরনের কথায় যে প্রতিক্রিয়া হয়, এখানে তা না-ও হতে পারে।

ক্রিপ্‌স : আমি যখন দেখতে পাই, প্রতিপক্ষকে নিন্দা করতে গিয়ে কেউ অস্বাভাবিকভাবে গলা চড়াচ্ছে এবং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে, তখন আমার মনে হয়, লোকটা বুঝতে পেরেছে যে, যে চরম দাবির সে সমর্থক তার অবস্থা ক্রমেই কাহিল হয়ে আসছে।

আয়েঙ্গার : মিশনের আগমনবার্তা ঘোষিত হওয়ায় এবং সেই অনুযায়ী মিশন এ-দেশে আসার ফলেই এইসব গালিগালাজের ঝোঁকটা আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। এইটেই এর প্রত্যক্ষ কারণ। মিশন যে এ-সব কথাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন না, এটা জেনে আমি খুশী হলাম। তবে এইমাত্র আপনি বলছিলেন যে, মতৈক্যের ভিত্তিতে আপনারা পাকিস্তান-প্রশ্নের ফয়সলা করবেন বলে আশা রাখেন। কিন্তু প্রধান দুটি দলের, বিশেষত মুসলিম লীগের, এখন যে মেজাজ, তাতে কী করে যে মতৈক্য ঘটবে তা ঠিক বুঝতে পারছি না।

ক্রিপ্‌স : সমস্যাটাকে কি ইতিমধ্যেই অনেকটা গুটিয়ে আনা হয়নি? প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ইত্যাদি কয়েকটি যৌথ বিষয়ের দায়িত্ব পালনের জন্য একটা ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে তোলা হবে সেইটেই এখন প্রশ্ন। জিন্না বলছেন, পাকিস্তান আর অবশিষ্ট-ভারতের মধ্যে একটা চুক্তির ভিত্তিতে এই বিষয়ের মীমাংসা করতে হবে। আর কংগ্রেস বলছেন, এইসব বিষয়ে দায়িত্ব পালনের জন্য কেন্দ্রে একটি ফেডারেল শাসন-ব্যবস্থা চাই। এই যে দুটি পৃথক দৃষ্টিকোণ, এর মধ্যে সেতুবন্ধ তো আদৌ অসম্ভব নয়।

আয়েঙ্গার : কিন্তু এই দুই দৃষ্টিকোণ কি মূলত পরস্পরের বিপরীত নয়? এক পক্ষ ভাবছে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের কথা; এবং বলছে যে, তাদের মধ্যে চুক্তির সম্পর্ক থাকবে। আর অন্যপক্ষ ভাবছে একটি ফেডারেল রাষ্ট্রের কথা; যাতে এই দুটি বিষয়ের দায়িত্বভার কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকবে।

ক্রিপ্‌স : ঠিক কথা। কিন্তু এই ধরনের মতের পার্থক্য যেখানে দেখা দেয়, সেখানে পক্ষ দুটি তার একটা মীমাংসাও করে নিতে পারেন। তবে হ্যাঁ, তার জন্য তাঁদের মিলিত হওয়া চাই, আলোচনা করা চাই, এবং দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে একটা মীমাংসায় পৌঁছবার চেষ্টা করা চাই। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি আপনাকে বলতে পারি, যা নিয়ে বিরোধ এবং যে-ব্যাপারে মীমাংসা করতে হবে, তা এমন কিছু দুরূহ নয় যে, একটা আপোষ-মীমাংসা সম্ভব হবে না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকার ইতিপূর্বে এর চাইতেও অনেক বৃহৎ সমস্যাকে এই পথেই মিটিয়ে নিয়েছেন, এবং এখনও নিচ্ছেন। কংগ্রেস আর লীগ, দুই পক্ষকেই কিছুটা নরম হতে হবে এবং আলোচনায় বসতে হবে।

আয়েঙ্গার : অর্থাৎ যার যার দাবির থেকে খানিকটা এগিয়ে এসে মাঝপথে তারা মিলিত হবে। সেই মাঝ-বরাবর জায়গাটার একটা আন্দাজ দিতে পারেন?

ক্রিপ্‌স : কনফেডারেশন আর কনফেডারেল কেন্দ্রের ব্যাপারটা তো নতুন নয়।

আয়েঙ্গার : কিন্তু কনফেডারেল কেন্দ্র বলতে কি নেহাতই বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দের সম্মিলন বোঝায় না?

ক্রিপ্‌স : তাই বোঝায় বটে।

আয়েঙ্গার : সাধারণত কেন্দ্রে আমরা একটি আইনসভা এবং এইরকমের আরও কিছু আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা দেখতে পাই। কিন্তু কনফেডারেল কেন্দ্রে তো সে-সব কিছুই থাকবে না।

ক্রিপ্‌স : না, তা থাকবে না।

আয়েঙ্গার : কনফেডারেট শাসন-ব্যবস্থা কোন্ অধিকারে সিদ্ধান্ত নেবে?

ক্রিপ্‌স : এটা যে একটা ঢিলেঢালা সম্মিলন হবে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে আপনাকে তো স্মরণ করিয়ে দেবার দরকার করে না যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও প্রথমে ছিল একটি কনফেডারেশন; পরে তারই থেকে একটি ফেডারেশন গড়ে ওঠে। ভারতবর্ষেও তো তেমনটা না হবার কোনও কারণ নেই।

আয়েঙ্গার : কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা আপনি ভুলে যাচ্ছেন। আমেরিকার ক্ষেত্রে দেখতে পাব যে, তার অঙ্গরাজ্যগুলি প্রথমে ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। তারা ঢিলেঢালা একটি সম্মিলনে যোগ দিয়েছিল। পরে তারা দেখল যে, সেই ঢিলেঢালা সম্মিলনে তাদের প্রয়োজন মিটছে না। তখন আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে তারা একটি ফেডারেল ইউনিয়ন গড়ে তুলল। সেই ফেডারেল রাষ্ট্রটিকেই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবারে ভারতবর্ষের কথা ভাবা যাক। একই কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার অধীনে ভারতবর্ষ তো এখনই একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের অংশগুলিকে আপনি আবার টুকরো-টুকরো করে দিচ্ছেন।

ক্রিপ্‌স : না না, তা আমি করছি না।

আয়েঙ্গার : আমি বলেছি, অংশগুলিকে আপনি টুকরো-টুকরো করে দিচ্ছেন। তার অর্থ এই নয় যে, টুকরো-টুকরো করাই আপনার উদ্দেশ্য। যে-প্রস্তাব আপনার বিবেচনাধীন, সে সম্পর্কে আমার ধারণা কী, তাই আপনাকে জানালাম মাত্র। প্রস্তাবিত পাকিস্তান এবং অবশিষ্ট-ভারতকে নিয়ে আপনারা একটি কনফেডারেল ইউনিয়ন গড়বার কথা ভাবছেন। সেই সম্পর্কে আমার মতামত আপনাকে জানালাম। যা বলছিলাম। পাকিস্তান-দাবি যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে বর্তমানের এই ঐক্যবদ্ধ ভারত-রাষ্ট্রের অংশগুলিকে টুকরো-টুকরো করে দেওয়া হবে, এবং তাদের বলা হবে যে, নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী তারা দুটি কি তার বেশী স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হবে; এবং এই আশায় তাদের একটি ঢিলেঢালা কনফেডারেশন গড়ে তোলা হবে যে, পরে এই কনফেডারেল ব্যবস্থার ত্রুটিগুলিই তাদের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে একটি ফেডারেল ইউনিয়ন গড়ে তুলতে বাধ্য করবে। অর্থাৎ শেষ পরিণতি হিসেবে এই কথাই ভাবা হচ্ছে যে, বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক যোগ-সম্পর্ক এবং যৌথ-বিষয়গুলির পরিচালন-ব্যাপারে যে-অবস্থায় তাদের এনে দাঁড় করানো হবে, মোটামুটিভাবে তা আজকের এই অবস্থারই অনুরূপ। আজ তারা যে-অবস্থায় আছে, তখনও সেই অবস্থাতেই থাকবে। অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হবে না।

ক্রিপ্‌স : আপনার কথাটা আমি বুঝতে পারছি। তবে মীমাংসায় যদি পোঁছতে হয়, তাহলে তো শুধুই যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে একটা গ্রহণযোগ্য কিংবা গৃহীত ব্যবস্থাকে সমর্থন করে যাওয়া চলে না। মনস্তাত্ত্বিক দিকটাও আমাদের ভেবে দেখতে হবে। যাই হোক, আপনার সঙ্গে আমার যে কথা হল, তার থেকে আবার এই ধারণা করে বসবেন না যে, কনফেডারেশনের পথেই আমি মীমাংসা খুঁজব বলে মনঃস্থির করে ফেলেছি।

আয়েঙ্গার : বুঝতে পারছি। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক দিক বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?

ক্রিপ্স : মুসলিমদের মধ্যে এই ভয়টা এখন খুবই ব্যাপক যে, হিন্দুরা তাদের উপরে আধিপত্য করবে। ভয়টা হয়ত ভিত্তিহীন। তবু, ভারতবর্ষকে ভবিষ্যতে যদি শান্তিতে থাকতে হয়, তাহলে মুসলিমদের মনে এই বিশ্বাস জাগাতে হবে যে, যে-রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়বার চেষ্টা চলছে, তাতে তাদের ভয়ের কোনও কারণ থাকবে না।

আয়েঙ্গার : ভয়টাকে দূর করবার জন্য যুক্তিসংগতভাবে যা-কিছু করা সম্ভব, তা তো করতেই হবে। কিন্তু এ-দেশের বাস্তব অবস্থা যদি বিচার করি, এবং মুসলিমদের সংখ্যা আর সেই সংখ্যার বিন্যাসের কথা যদি ভেবে দেখি, তাহলে এ-কথা মেনে নেওয়া শক্ত হয়ে দাঁড়ায় যে, তাদের জন্য আলাদা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে দিলেই এই ভয়ের অবসান হবে। তার কারণ, সেই রাষ্ট্রে মুসলিমরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ হবে বটে, কিন্তু প্রচুরসংখ্যক অমুসলমানও সেখানে থাকবে। যা হোক, দুই পক্ষের মধ্যে মতৈক্য সম্ভব হবে, আপনার এমন আশার কারণ কী? মতৈক্যের জন্য চেষ্টাই বা করা হবে কীভাবে?

ক্রিপ্স : কথাটা আর কাউকে বলবেন না; শুধু এইটুকু আমার কাছ থেকে জেনে রাখুন যে, মুসলিম সম্মেলনে গত দু দিনে যতই অগ্নিস্রাবী বক্তৃতা দেওয়া হয়ে থাক, মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান-প্রধান নেতারা এখন জোর মাথা ঘামাচ্ছেন, কী করে তাঁদের ঘোষিত দাবিগুলিকে কিছুটা কাটছাঁট করে তাঁরা এখন অন্য পক্ষের সঙ্গে একটা মীমাংসায় আসতে পারেন।

আয়েঙ্গার : মুসলিম নেতারা তো দাবির মগডালে বসে আছেন। সেখান থেকে তাঁদের নামিয়ে আনবার কার্যকর উপায় মাত্র একটি। আপনি নিজে কিংবা মিশনের অন্য-কোনও সদস্য যদি যথাসম্ভব শীঘ্র মিঃ জিন্নাকে এখন আভাসে-ইঙ্গিতে স্পষ্ট করে এ-কথা বুঝিয়ে দেন যে, মিশন কিংবা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে তাঁর পাকিস্তান-দাবি মেনে নেবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই, মগডাল থেকে তাহলেই তাঁরা সুড়সুড় করে নেমে আসবেন।

ক্রিপ্স : তাতে যে কাজ হবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কথা এই যে, আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কী হবে, ঘরোয়াভাবেও তা তো আমরা এখন কাউকে জানাতে পারছি না। এখনও তার সময় হয়নি।

আয়েঙ্গার : এ-ব্যাপারে দ্বিধার কোনও অবকাশ আছে বলে আমার মনে হয় না। এ-দেশে আপনাদের যে ইতিহাস, তার পটভূমিকায় এ-কথা চিন্তা করাও আমার পক্ষে অসম্ভব যে, আপনাদের যদি একটা ন্যায়সংগত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বলা হয়, তাহলে দেশটাকে ভেঙে আপনারা দু-তিনটে স্বাধীন রাষ্ট্র করবার সপক্ষে রায় দেবেন।

ক্রিপ্স : আপনার দৃষ্টিভঙ্গির আমি প্রশংসা করি। কিন্তু মীমাংসায় যদি পৌঁছতে হয়, তাহলে কেসটা যার পাকা, সেও তো অনেকসময়—সিদ্ধান্ত পাছে তার বিপক্ষে যায়, এই আশঙ্কায়—নিজের ন্যায্য দাবিরও কিছুটা ছেড়ে দিয়ে থাকে। ছেড়ে দেবার প্রয়োজন যে ঘটে না, এমন তো নয়। বার্-এ প্র্যাকটিস করবার সময় প্রায়ই আমি এমনটা ঘটতে দেখেছি। দেখেছি, যার হয়ে আমি আদালতে লড়ব, কেসটা ষোল-আনা পাকা হওয়া সত্ত্বেও সে আমার কাছে এসে বলেছে, "আমাদের কেস

পাকা ঠিকই, কিন্তু জজ যে কী রায় দেবেন, তা তো আমরা জানি না। ইতিমধ্যে অন্যপক্ষ আমাদের কাছে মীমাংসার প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। ন্যায্যত যা আমাদের প্রাপ্য, এরা তার থেকে কিছু কম দিয়ে ব্যাপারটা মেটাতে চাইছে বটে, কিন্তু, রায়টা যেক্ষেত্রে অনিশ্চিত, এটা সেক্ষেত্রে নিশ্চিত। জজের রায় যে আমাদের বিপক্ষে যাবে না এমন তো কোনও কথা নেই। সুতরাং আপনি কী বলেন? দাবির কিছুটা ছেড়ে দিয়ে মিটিয়ে নেব?"

আয়েঙ্গার : প্রধান দুটি পক্ষ যদি আপোষ-মীমাংসায় পৌঁছতে পারে, তবে তার চাইতে ভাল আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু আপোষের একটা বিপদও আছে। বিশেষ করে তৃতীয় পক্ষের চাপে যদি তার শর্তগুলি নির্ধারিত হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত হয়ত দেখা যাবে যে, দুই পক্ষের একপক্ষ তাতে সন্তুষ্ট হচ্ছে না, কিংবা তার স্বার্থ তাতে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। বস্তুত, দুই পক্ষই শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হতে পারে, এবং কোনও পক্ষেরই স্বার্থ হয়ত এতে অক্ষুণ্ণ থাকবে না।

ক্রিপ্‌স : এমন সম্ভাবনার কথা আমি অস্বীকার করি না। তবে, যে-সিদ্ধান্তে কোনও পক্ষই খুশী নয়, তাও তো অনেকসময় দিব্যি চলে যায়, দেশ তাকে শেষ পর্যন্ত মেনেও নেয়। ভারতীয় ইতিহাসে এমন ব্যাপার তো ইতিমধ্যেই ঘটেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার কথাই ধরুন না কেন।

আয়েঙ্গার : সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা চালু হয়েছে ঠিকই; কিন্তু সকলেই এর নিন্দায় মুখর। নিন্দা মুসলিমরাও করছে। তবু যে এটাকে সাফল্যের সঙ্গে চালু করা গিয়েছিল, তার প্রধান কারণ, ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের হাতে, এবং দরকার বুঝলে একটা অপ্রিয় সিদ্ধান্তকেও তাঁরা জোর করে চাপিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু পাকিস্তানের প্রশ্নে যদি আপনারা অনুরূপ একটা সিদ্ধান্ত করে বসেন, তাহলে কিন্তু অবস্থা একেবারে অন্য রকম দাঁড়াবে। ভারতবর্ষ তো তখন স্বাধীন। সুতরাং পাকিস্তান-প্রশ্নে আপনাদের সিদ্ধান্তের ফলে যে-সব ঝুঁকি দেখা দেওয়া অনিবার্য, সেগুলি সামলাবার জন্যে আপনারা তখন এখানে থাকবেন না। যে-সিদ্ধান্তের পরিণামে সাম্প্রদায়িক বিরোধ আরও প্রবল হয়ে দাঁড়াবে এবং হয়ত গৃহযুদ্ধও দেখা দেবে—এবং যা সামলাবার দায়িত্বও আপনাদের থাকবে না—তেমন সিদ্ধান্ত যদি আপনারা নেন, তো তাতে দেশের অপকারই আপনারা করবেন। সিদ্ধান্তটা যদি ন্যায্য হয়, তবে আপনারা এ-দেশ থেকে বিদায় নেবার পরেও তাকে কার্যকর করা সহজ হবে। পক্ষান্তরে কার দাবি ন্যায্য আর কার অন্যায্য, সেটা বিচার না করে দুই পক্ষের দাবিকেই যদি কিছুটা ছেঁটে দিয়ে তাদের বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করেন আপনারা, এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেন, তবে তার পরিণামে হাঙ্গামা বাধবে।

ক্রিপ্‌স : ঝুঁকি আছে, সে-কথা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু মীমাংসার ব্যবস্থা করতে আমরা বদ্ধপরিকর। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি যদি আপোষে একটা মীমাংসায় উপনীত না হয়, তবে আমরা নিজেরাই একটা-কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।

আয়েঙ্গার : এ-দেশের দলগুলি যদি একটা মীমাংসায় আসতে না-পারে, তবে ক্ষমতা যাঁদের হাতে সেই ব্রিটিশ সরকার অবশ্যই একটা সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারবেন না। সালিশের কথাও তো উঠেছে।

ক্রিপ্‌স : জানি। তা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি যদি ঠিক করে যে, একজন রুশ,

একজন তুর্কী আর একজন চীনাকে নিয়ে একটি কমিটী গঠিত হবে, এবং পাকিস্তান-প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার ভার সেই কমিটীর হাতে অর্পণ করা হবে, তাহলে আমরা সে-ব্যবস্থায় বাধ সাধব কেন, তা আমি বুঝতে পারি না। বলা বাহুল্য, আমাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের নানা যোগ-সম্পর্ক রয়েছে, এবং এখানকার অবস্থা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেকের চাইতেই বেশী; সেই বিচারে আপনার এই অভিমত অবশ্যই যুক্তিযুক্ত যে, ব্রিটেনেরই এ-ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত করা উচিত। কিন্তু সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিই যদি মনে করে যে, বাইরের একটা কমিটীর—যে-ধরনের কমিটীর কথা আমি বলেছি—সিদ্ধান্ত তারা মেনে নেবে, এবং সেইটেই শ্রেয়, তবে আমাদের তো তাতে আপত্তি করবার কোনও কারণ থাকতে পারে না। দুই দলের কাছেই যা গ্রহণযোগ্য এমন একটা মীমাংসায় পেঁৗছনোটাই হচ্ছে প্রধান কথা।

আয়েঙ্গার : সার স্ট্যাফোর্ড, সংবিধান-রচনার ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনি আশা করি এ-কথা মেনে নেবেন যে, দু-দুটি সংস্থার হাতে আপনারা সংবিধান রচনার ভার দিতে পারেন না। শুনতে পাচ্ছি, পাকিস্তান-দাবির সপক্ষে যদি না প্রথমেই একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাহলে সংবিধান রচনার ভারপ্রাপ্ত সংস্থাকে সেক্ষেত্রে দুটি অংশে ভাগ করবার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। তেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে প্রদেশগুলিকে তো আগেভাগেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তারা কে কোন্ সংবিধান-সংস্থায় কিংবা তার কোন্ অংশে থাকবে।

ক্রিপ্‌স : হ্যাঁ।

আয়েঙ্গার : দেশীয় রাজ্যগুলিকেও ঠিক একইভাবে নিজের পথ ঠিক করতে হবে।

ক্রিপ্‌স : হ্যাঁ। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলি যে সেক্ষেত্রে তাদের নিজেদের জন্য পৃথক একটা সংবিধান-সংস্থা চাইতে পারে, এমন সম্ভাবনাকেও আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না।

আয়েঙ্গার : এইসব জটিল সম্ভাবনার কথা কি আপনারা চিন্তা করে দেখেছেন?

ক্রিপ্‌স : জটিলতা তো আছেই। কিন্তু পাকিস্তান-প্রশ্নের কী মীমাংসা হয়, সবকিছু আসলে তারই উপরে নির্ভর করবে। সর্বাগ্রে অতএব সেই বিঘ্নটিকে উত্তীর্ণ হওয়া চাই।

আয়েঙ্গার : সংবিধান-সংস্থাটিকে আপনারা কীভাবে গড়ে তুলবেন? কোন অধিকারবলে? পারলামেনটের আইনের বলে?

ক্রিপ্‌স : (কিছুটা দ্বিধার পরে) তা আমরা এখনও ভেবে দেখিনি। এর জন্যে পারলামেনট থেকে আইন পাশ করবার দরকার হবে বলে তো আমার মনে হয় না।

আয়েঙ্গার : পারলামেনট থেকে আইন যদি না পাশ করানো হয়, তবে অন্তত একটি রাজকীয় ঘোষণার দরকার হবে। এটা একটা বৃহৎ ব্যাপার। বর্তমান ভারত সরকার নেহাতই সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়ে কিংবা ভাইসরয় একটি ঘোষণা জারী করে এ-কাজ করতে পারেন না।

ক্রিপ্‌স : এ-সব কথা আমরা অবশ্যই বিবেচনা করে দেখব। সর্বাগ্রে এখন পাকিস্তান-প্রশ্নের একটা মীমাংসায় পেঁৗছতে হবে; সেইটেই আসল কথা। মীমাংসায় তো পেঁৗছাই; তারপর বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে যে-ভাবে এই ব্যবস্থাটাকে কার্যকর করলে ঠিক হয়, সেইভাবেই করা হবে।

আয়েঙ্গার : দেশীয় রাজ্যগুলির কী হবে? যা মেনে নেওয়া শক্ত, এমন সব

বায়না না-ধরে তারাও এই ব্যবস্থার মধ্যে চলে আসতে চাইবে তো?

ক্রিপ্‌স : ও-দিক থেকে কোনও বিরাট-রকমের অসুবিধে দেখা দেবে বলে আমার মনে হয় না।

আয়েঙ্গার : প্যারামাউন্ট-ক্ষমতার কী হবে? আপনারা যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন, প্যারামাউন্ট-ক্ষমতা তখন কার হাতে ন্যস্ত হবে?

ক্রিপ্‌স : আমরা বিদায় নেবার সঙ্গে-সঙ্গে প্যারামাউন্ট-ক্ষমতারও অবসান হবে। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভ করবে, তখন শুধুই ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ নয়, প্রতিটি দেশীয় রাজ্যও স্বাধীন হবে।

আয়েঙ্গার : ৫৬২টি না ৬০১টি দেশীয় রাজ্যের প্রত্যেকেই স্বাধীন হবে?

ক্রিপ্‌স : হ্যাঁ। স্বাধীন হবার পরে তাদের প্রত্যেকে আবার নতুন করে নতুন ভারত সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থির করে নেবে।

আয়েঙ্গার : ভারতবর্ষে যেভাবে আপনারা ক্ষমতা পরিহার করতে চলেছেন, তার ফলে এই আবার একটি বাড়তি ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হবে। ৫৬২টি দেশীয় রাজ্যের প্রত্যেকে পৃথকভাবে আবার নতুন করে ভারত সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থির করবার জন্য আলোচনা শুরু করবে,—কীভাবে যে আপনি এই আশা করছেন তা আমি বুঝতে পারছি না। এখনকার কথাই ধরা যাক। আপনাদের সঙ্গে এখন চুক্তি আছে তো মাত্র গুটি চল্লিশেক দেশীয় রাজ্যের। যেমন তাদের, তেমনি অন্যান্য দেশীয় রাজ্যকেও ভারত সরকার প্যারামাউন্ট-ক্ষমতা প্রয়োগ করেই একসূত্রে বেঁধে রেখেছেন।

ক্রিপ্‌স : হায়দরাবাদের কথাই ভাবা যাক। ব্রিটিশ ক্রাউনের সঙ্গে এই রাজ্যটির স্থায়ী চুক্তির সম্পর্ক রয়েছে। এখন হায়দরাবাদের মতামত না-নিয়েই যদি তার সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা করে ফেলা হয়, তবে হায়দরাবাদ যে তা মেনে নেবে, এমন কথা ভাবা শক্ত। সে বলে বসতে পারে : আপনারা আর নতুন সরকার মিলে যে-ব্যবস্থাই করুন, আমরা তা মেনে নিচ্ছিনে।

আয়েঙ্গার : প্যারামাউন্ট ক্ষমতাবলে যে-ব্যবস্থা করা হবে, একটা দেশীয় রাজ্য —তা সে হায়দরাবাদেই হোক আর অন্য যে-কোনও রাজ্যই হোক—তা মেনে নেবে না, এমনটাই বরং বিশ্বাস করা শক্ত।

ক্রিপ্‌স : হয়ত আপনার কথাই ঠিক; হয়ত হায়দরাবাদের মত রাজ্যের পক্ষেও দীর্ঘদিন সেই ব্যবস্থাকে অমান্য করা সম্ভব হবে না। কিন্তু আমাদের দায়-দায়িত্বকে তো তাই বলে আমরা উপেক্ষা করতে পারিনে। এ-ব্যাপারে আপনি কী করতে বলেন?

আয়েঙ্গার : যে-ব্যবস্থা স্বাভাবিক, সেইটেই করতে বলি। দেশীয় রাজ্যগুলির উপরে ব্রিটিশ সরকারের যে আধিপত্য, প্যারামাউন্ট-ক্ষমতার মাধ্যমেই তা কার্যকর হয়ে থাকে। ভারতবাসীদের কাছে আপনারা ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চলেছেন। ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষ থেকে আপনারা চলে যাবার পরে যে-সরকার এখানে শাসন-কর্তৃত্ব পাবেন, প্যারামাউন্ট-ক্ষমতার প্রয়োগও তাঁরাই করবেন।

ক্রিপ্‌স : সেটা তো বে-আইনী ব্যাপার হবে।

আয়েঙ্গার : ১৮৫৮ সনে আর ১৯৩৫ সনে কি সেটা বে-আইনী ব্যাপার বলে গণ্য হয়েছিল?

ক্রিপ্‌স : অতীতে যদি একটা অন্যায় আইন জারী হয়ে থাকে, তাহলে এখনও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে, এমনটা নিশ্চয়ই আপনারা আশা করেন না।

আয়েঙ্গার : আপনারা ঠিকমতো সমস্যার মোকাবিলা করছেন না। যাকে আপনি অন্যায় আইন বলছেন, তা এখনও চালু, এবং প্রায় শতাব্দীকাল ধরে দেশীয় রাজ্যগুলি তাকে মান্য করে চলছে। তাতেই তারা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে।

ক্লিপ্‌স : প্যারামাউন্ট-ক্ষমতার বিধান অনুযায়ী দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি আমাদের কিছু দায়িত্ব রয়েছে। যথা, আমরা তাদের রক্ষা করতে বাধ্য। রাজকীয় নৌবহর আর বিমান-বহর ছিল বলেই এতকাল সেই দায়িত্ব আমরা পালন করতে পেরেছি। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরে রাজকীয় নৌবহর আর বিমান-বহর এখানে থাকবে না। সুতরাং নূতন ভারত সরকারের পক্ষে দেশীয় রাজ্যগুলিকে রক্ষা করবার দায়িত্ব পালনও সম্ভব হবে না। এই অবস্থায় দেশীয় রাজ্যগুলিকে আমাদের বলা উচিত হবে না যে, এ-দেশ থেকে বিদায় নেবার সময়ে সেই দায়িত্ব আমরা নূতন ভারত সরকারের হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি। দেশীয় রাজ্যগুলি অতঃপর কী করবে, সেটা স্থির করবার ভার তাদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া ভাল। নূতন ভারত সরকারের সঙ্গে কী ব্যবস্থায় তারা আসবে, সেটা তারাই ঠিক করুক।

আয়েঙ্গার : দেশীয় রাজ্যগুলিকে রক্ষা করবার দায়িত্ব পালন নূতন ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে না, আপনার এই কথার অর্থ কী?

ক্লিপ্‌স : নিজেকে রক্ষা করবার মতও নৌ-বহর আর বিমান-বহর যে নূতন সরকারের থাকবে না, এ তো খুবই স্পষ্ট ব্যাপার।

আয়েঙ্গার : অবস্থাটাকে আপনি বাড়িয়ে বলছেন। এটা ঠিক কথা যে, নৌ-বাহিনী আর বিমান-বাহিনীকে যদি স্বাধীন ভারতবর্ষের সশস্ত্র বাহিনীর উল্লেখযোগ্য অংশ করে তুলতে হয়, তাহলে ভারতীয় নৌবাহিনী আর ভারতীয় বিমান-বাহিনীর প্রভূত উন্নয়ন ঘটাতে হবে। কিন্তু সেই উন্নয়নের কাজ চলবার সময়েই দেশরক্ষার ব্যবস্থাকে জোরদার করবার জন্যে নূতন ভারতবর্ষ অবশ্যই অন্য ব্যবস্থারও আশ্রয় নিতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলছি, ব্রিটেনের সঙ্গেই সে এখন চুক্তি করতে পারে যে, ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী আর বিমান-বাহিনীর গুটিকয় ইউনিট ভারতে মোতায়েন থাকবে। এ-সবই করা হবে দেশরক্ষার জন্য, এবং দেশরক্ষা বলতে তখন দেশীয় রাজ্যগুলির রক্ষা-ব্যবস্থাও বোঝাবে। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে নূতন ভারত সরকার যে প্যারামাউন্ট-ক্ষমতা পাবেন, তার দায়িত্ব পালন করা তাই আদৌ অসম্ভব হবে না। কিন্তু, সে-কথা থাক; দেশীয় রাজ্যগুলিকে রক্ষা করবার জন্যে ব্রিটিশ শক্তিকে যে তাঁদের নৌ-বহর আর বিমান-বহরের উপরে বিশেষ নির্ভর করতে হয়েছিল, তা নিশ্চয়ই আপনি মনে করেন না। প্রধানত ভারতীয় স্থলবাহিনীর উপরেই সেই দায়িত্ব ছিল। এবং নূতন শাসন-ব্যবস্থার সূচনা-পর্বেই এমন একটি ভারতীয় স্থলবাহিনী আমরা পাচ্ছি, যা কিনা দেশের আভ্যন্তর প্রতিরক্ষার প্রয়োজন মেটাতে সম্পূর্ণ সক্ষম। প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষই সে-কথা বলেছেন।

ক্লিপ্‌স : অন্য-দিকটাও ভাবুন। এই দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে ব্রিটিশ ক্রাউনের চুক্তি হয়েছিল। সুতরাং তাদের সম্মতি না নিয়ে ক্রাউনের পক্ষে তো সেই চুক্তির দায়িত্ব অন্য-কারও কাছে হস্তান্তরিত করা সম্ভব নয়।

আয়েঙ্গার : ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে, অন্তত দুবার আপনারা এইভাবেই দায়িত্ব হস্তান্তর করেছেন। প্রথম বারে তো এ-ব্যাপারে দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে পরামর্শ পর্যন্ত করা হয়নি। আমি ১৮৫৮ সনের কথা বলছি। দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে

সম্পর্কের দায়িত্ব সেই বছরে ঈস্‌ট ইনডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ব্রিটিশ ক্রাউনের কাছে চলে যায়। ক্রাউন অতঃপর সপারিষদ গভরনর জেনারেলের মাধ্যমে অর্থাৎ ভারত সরকারের মাধ্যমে সেই সম্পর্কের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ১৯৩৫ সনে তার জায়গায় আবার এক নতুন ব্যবস্থা হল। সেই নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী সপারিষদ গভরনর জেনারেলের কাছ থেকে ক্ষমতা প্রত্যাহার করে ক্রাউন তাকে ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রতিনিধির হাতে অর্পণ করলেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে সপারিষদ গভরনর জেনারেল কিংবা রাজ-প্রতিনিধি—কোনও পদই সম্ভবত থাকবে না; দুটিই লুপ্ত হবে। এখন যাকে ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষ বলা হয়, তার নূতন সরকারই তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হবেন। যে-সব শর্তের উপরে প্যারামাউন্‌ট ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা, তার চাইতে সুবিধাজনক শর্ত যদি দেশীয় রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়, এবং নূতন ভারত সরকারের কাছে এই ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে যদি দেশীয় রাজ্যগুলি অতঃপর সম্মতি দেয়, তবে তো সব দিক দিয়েই ভাল। পক্ষান্তরে, প্রতিটি দেশীয় রাজ্য কিংবা তাদের একাংশ যদি এই হস্তান্তরে আপত্তি তোলে, তাহলে তাদের দ্বিধা সত্ত্বেও প্যারামাউন্‌ট-ক্ষমতা নূতন সরকারের হাতে তুলে দিতেই হবে। কেননা, তা যদি করা না হয়, তাহলে ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা আর পররাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রেই যে শুধু অসুবিধে ঘটবে তা নয়, সর্ব-ভারত সম্পর্কে প্রযোজ্য সাধারণ অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ব্যবস্থার সুপরিচালনাও সেক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

দেশীয় রাজ্যের বিষয়ে ক্রিপ্‌সের আর-কিছু বলবার ছিল না।

আয়েঙ্গার : একটা ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এ-দেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা যে এত প্রবল হয়ে উঠেছে, পৃথক নির্বাচন-ব্যাবস্থাই তার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। দেশের সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নির্বাচকমণ্ডলীর হাতে; সেই নির্বাচক-মণ্ডলীকে যদি জাতি-বর্ণ-ধর্মের ভিত্তিতে গড়া হয়, কোনও দেশেরই রাজনৈতিক জীবন তাহলে সুস্থ থাকতে পারে না। আপনারা এখন যে আলোচনা চালাচ্ছেন, তার মাধ্যমে তো আপনারা বিভিন্ন দলের মধ্যে একটা আপোষ-মীমাংসায় পৌঁছতে চান; সেই মীমাংসার অন্যতম শর্ত হিসেবে পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থার স্থানে যৌথ নির্বাচন-ব্যবস্থাকে মেনে নেবার জন্য আপনারা যদি তাদের উপর চাপ দেন, এবং তাদের দিয়ে এটা মেনে নেওয়াতে পারেন, তাহলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনের ভবিষ্যতের উপরে তার প্রভাব খুবই সুফলপ্রসূ হবে।

ক্রিপ্‌স : আমি যৌথ নির্বাচন-ব্যবস্থার সমর্থক। কিন্তু এই প্রশ্নের মধ্যে মাথা না-গলিয়ে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার অন্তর্বর্তী সরকার আর সংবিধান-সংস্থার উপরে ছেড়ে দেওয়াই কি আমাদের পক্ষে ভাল নয়?

আয়েঙ্গার : পাকিস্তান-প্রশ্নের ফয়সালা করা, অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠা করা এবং সংবিধান-সংস্থা আহ্বান করাই যে এখন আশু কর্তব্য, তাতে সন্দেহ নেই। তবে আমার ধারণা, পাকিস্তান-প্রশ্নের মীমাংসা নিয়ে যখন দুই পক্ষের উপরেই চাপ দেওয়া হচ্ছে, তখন নির্বাচন-ব্যবস্থার এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটিরও যদি মোকাবিলা করা হয়, তবে তাতে অন্তর্বর্তী সরকার ও সংবিধান-সংস্থার উপকার হবে। নির্বাচন-ব্যবস্থা সম্পর্কে এখনই যদি একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব না হয়, তবে না-ই হোক, তাতেও ক্ষতি নেই; যথাসময়ে যাতে এই সমস্যার একটা

সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব হয়, এখনই তার জন্য ক্ষেত্র রচনা করে রাখা যেতে পারে। প্রসঙ্গত বলি, পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা যে শুধু অখণ্ড ভারতবর্ষের সরকারের পক্ষেই ক্ষতিকর হবে তা নয়; বস্তুত পাকিস্তান সম্পর্কে মিঃ জিন্নার ইচ্ছাই যদি পূর্ণ হয়, তবে পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা হিন্দুস্থানের চাইতে পাকিস্তানের পক্ষে আরও বড়-রকমের শিরঃপীড়া হয়ে দাঁড়াবে। মিঃ জিন্না বিভক্ত ভারতের যে ছবি আঁকছেন, তাতে হিন্দুস্থানে হিন্দুদের সংখ্যা দাঁড়াবে ১৫ কোটি; আর সংখ্যালঘু মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়াবে ২ কোটি। পক্ষান্তরে, পাকিস্তানে মুসলমানদের সংখ্যা হবে ৭ কোটি; আর সংখ্যালঘু অমুসলমানদের সংখ্যা হবে ৪ কোটি ৪০ লক্ষের মত।

ক্রিপ্‌স : হা অদৃষ্ট, এই হচ্ছে মিঃ জিন্নার পাকিস্তান! এ এক অবাস্তব কল্পনা। এমন এক রাষ্ট্র গড়ার কথা তিনি ভাবছেন, নামে সংখ্যালঘু হলেও, হিন্দুদের সংখ্যা যেখানে বিপুল হয়ে দাঁড়াবে; আর এই ৪ কোটি ৪০ লক্ষ হিন্দু সেখানে পাকিস্তান সরকারের বিরোধিতা করবে! এমন কথা ভাবাও যায় না। যা হোক্, নির্বাচন-ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করবার ভার যে সংবিধান-সংস্থার হাতেই ছেড়ে দেওয়া ভাল, আশা করি তা আপনি স্বীকার করবেন।

সার্ গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। ক্রিপ্‌সের সঙ্গে আলোচনার শেষে তিনি স্বয়ং তাঁদের কথাবার্তার এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখেন। গান্ধীজীর হাতে এই সংলাপের একটি কপি তুলে দিয়েছিলেন তিনি। কংগ্রেসের বক্তব্য তিনি অতি দক্ষতার সঙ্গে পেশ করেছিলেন; তার জন্য তিনি গান্ধীজীর প্রশংসা অর্জন করেন। নেহরুর চিত্তেও সেই প্রথম তিনি আসন করে নিলেন। পরে তিনি ক্যাবিনেট-সদস্য হয়েছিলেন; নেহরুর আস্থাভাজন ব্যক্তি হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা তখন কম ছিল না।

ক্রিপ্‌স-আয়েঙ্গার বৈঠকের দিনেই ভারতবর্ষের প্রখ্যাত শিল্পপতি শ্রী জি. ডি. বিড়লা তাঁর বাড়িতে ক্যাবিনেট-মিশনের সদস্যদের মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করেন। ভোজের টেবিলে ঘরোয়াভাবে নানা কথা হচ্ছিল। শ্রীবিড়লা তারই মধ্যে বলেন, "সকলেই এখানে বিশ্বাস করে যে, এবারে আপনারা ভারত-ত্যাগে বদ্ধপরিকর। তবে ভাইসরয় আর তাঁর ব্রিটিশ আমলাদের সম্পর্কে অতটা নিশ্চিত বিশ্বাস কারও নেই। তা, ভাইসরয় যদি আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করেন, তাহলে আপনারা কী করবেন?"

উত্তরে সার্ স্ট্যাফোর্ড বললেন, "সেক্ষেত্রে ভাইসরয়কে সঙ্গে নিয়ে আমরা দেশে ফিরব।"

আলোচনার সাফল্য সম্পর্কে সার স্ট্যাফোর্ড যে কতটা আশাবাদী ছিলেন, তাঁর এই মন্তব্য থেকেই তা বুঝতে পারা যায়।

১লা এপরিল থেকে ১৭ই এপরিল পর্যন্ত ক্যাবিনেট মিশন ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে একটানা আলাপ-আলোচনা চালান। ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে কী তাঁরা করতে চান, কংগ্রেস ও লীগের নেতৃবৃন্দ তার একটা মোটামুটি আভাস পেলেন মিশনের কাছে। অতঃপর, নেতৃবৃন্দকে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবার অবকাশ দিয়ে, মিশনের সদস্যরা ১৭ই এপরিল তারিখে কাশ্মীর চলে গেলেন।

গান্ধীজীর মুখ্য সেক্রেটারি শ্রীপ্যারেলাল তাঁর 'দি লাস্ট ফেজ' ('শেষ অধ্যায়')

বইয়ে সেই সময়ের একটি ঘটনার কথা লিপিবন্ধ করে রেখেছেন। তিনি লিখছেন :

"কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যরা তখনও ক্যাবিনেট ডেলিগেশনের প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখছেন। সেইসময়ে, ২৮শে এপ্রিলের অপরাহ্ণে, ক্যাবিনেট ডেলিগেশনের কাছ থেকে গান্ধীজী এই মর্মে একটি বার্তা পান যে, লর্ড পেথিক-লরেন্স আর সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। দেখাটা ভাঙ্গী কলোনিতেও হতে পারে কিংবা ভাইসরয়-ভবনের উদ্যানেও হওয়া সম্ভব। তাঁরা শেষোক্ত স্থানেরই পক্ষপাতী। তার কারণ গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁরা একান্তে সাক্ষাৎ করতে চান। তাঁরা যদি ভাঙ্গী কলোনিতে আসেন, সাক্ষাতের ব্যাপারটা তাহলে জানাজানি হয়ে যাবে। সন্ধ্যাবেলায় গান্ধীজীই তাই ভাইসরয়-ভবনে গেলেন। সেখানে, উদ্যানের গোল জলাশয়ের পাশে বসে, তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে গান্ধীজী বুঝতে পারলেন যে, কংগ্রেসের মধ্যেই গন্ডগোল বেধেছে। কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা গান্ধীজীর সহকর্মী, তাঁদেরই একজনের কাছ থেকে ক্যাবিনেট ডেলিগেশন সম্ভবত একটি চিঠি পেয়েছিলেন। অথচ গান্ধীজী কিংবা ওয়ার্কিং কমিটী সেই চিঠির বিষয়ে কিছু জানতেন না। ব্যাপার দেখে গান্ধীজী স্তম্ভিত হয়ে যান।"

এখানে উল্লেখ করা দরকার, ব্রিটিশ রাজনীতিক দুজনের কাছ থেকে গান্ধীজীর কাছে আমিই সেই বার্তা নিয়ে এসেছিলাম। বস্তুত ব্রিটিশ সরকারের মন্ত্রিদ্বয়কে আমিই এ-কথা জোর দিয়ে বলেছিলাম যে, গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁদের একান্তে দেখা করা দরকার, এবং তাঁদের কোনও দোষ না-থাকা সত্ত্বেও গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁদের যে গুরুতর ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে, সেটা পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার। শ্রীপ্যারেলাল শুধু এইটুকুই বলেছেন যে, একটি চিঠির কথা জানতে পেরে গান্ধীজী স্তম্ভিত হয়ে যান। যা তিনি বলেননি, তা আমিই বলছি। সেই চিঠিখানি মৌলানা আজাদের লেখা। সহকর্মীদের কিছু না-জানিয়ে মৌলানা আজাদই ক্যাবিনেট ডেলিগেশনের কাছে সেই চিঠি লিখেছিলেন।

কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে মৌলানা আজাদের সঙ্গে ক্যাবিনেট মিশনের যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, মৌলানা স্বয়ং তাঁর 'ইনডিয়া উইন্স ফ্রীডম' ('ভারতের স্বাধীনতা লাভ') গ্রন্থে তার বিবরণ দিয়েছেন। ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে সেখানে (পৃ ১৩৯) তিনি লিখছেন, "সম্প্রদায় হিসেবে মুসলিমরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চূড়ান্ত উদ্বেগ বোধ করছিল। এ-কথা সত্য যে, কয়েকটি প্রদেশে স্পষ্টত তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রাদেশিক স্তরে সে-সব অঞ্চলে তাই তাদের ভয়ের কিছু ছিল না। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে ভারতবর্ষে তারা ছিল সংখ্যালঘু; এবং এই ভয়েই তারা অস্থির হয়ে উঠেছিল যে, স্বাধীন ভারতবর্ষে তাদের প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা নিরাপদ থাকবে না।" ব্রিটিশ ক্যাবিনেট-মন্ত্রীরাও বস্তুত এই একই কথা ভাবতেন। ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে মৌলানা আর মিশনের মনোভাবে তাই কোনও পার্থক্য ছিল না; এ-ব্যাপারে তাঁরা পরস্পরের দরদী ছিলেন। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে মৌলানার পন্থা ছিল এই যে, ফেডারেল শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতার যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে, প্রদেশগুলিকে সর্বব্যাপারে যথাসম্ভব স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে হবে, এবং কেন্দ্রের হাতে থাকবে শুধু প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ আর পররাষ্ট্র-নীতির দায়িত্ব। বস্তুত, এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তাঁর আর ক্যাবিনেট মিশনের মতের মধ্যে যে অনেকটাই মিল ছিল,

মৌলানা নিজেই সে-কথা তাঁর গ্রন্থে জানিয়েছেন। মিশন অতএব তাঁদের দুরূহ কাজে মৌলানাকে বন্ধু হিসেবে পেলেন। এ কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়; মৌলানার উদ্দেশ্যও নিশ্চয়ই ষোল-আনা ভালই ছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য যতই ভাল হোক, তিনি যে তাঁর অধিকারের সীমা ডিঙিয়ে যাচ্ছেন, সে-দিকে তাঁর খেয়াল ছিল না। মৌলানা সম্ভবত ভেবেছিলেন যে, ইতিহাসে তিনি একজন মহানায়ক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন; উত্তরকালে বলবে যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা তিনিই মিটিয়ে দিয়েছিলেন, এবং তারই ফলে ব্রিটিশ শ্রমিক সরকারের পক্ষে ক্ষমতা হস্তান্তর করা সম্ভব হয়েছিল। ইতিহাসে এইভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবার মোহেই তিনি তাঁর অধিকারের সীমানা ডিঙিয়ে গিয়েছিলেন।

পণ্ডিত নেহরু ছিলেন অসামান্য নানা মানবিক গুণের সমন্বয়ে গড়া একটি ভাবপ্রবণ মানুষ। কংগ্রেস-শিবিরে তিনিই ছিলেন মৌলানা আজাদের সবচাইতে বড় বন্ধু। অন্যদিকে সর্দার প্যাটেলের সংকল্প ছিল বজ্রকঠিন; তাঁর বাস্তববুদ্ধিও খুবই তীক্ষ্ম ছিল। এবং কংগ্রেস-শিবিরে তিনিই ছিলেন মৌলানার সবচাইতে কঠোর সমালোচক। মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এই মানুষটির চিত্ত যথেষ্ট উদার কিনা, সর্দার প্যাটেল এ সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। মৌলানার সততায় গান্ধীজীর আস্থা ছিল অটল। সর্দার এ-ব্যাপারে গান্ধীজীর সঙ্গে একমত ছিলেন না। কিন্তু মৌলানা সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধা সত্ত্বেও গান্ধীজী এবারে দেখতে পেলেন যে, মৌলানার পরিকল্পনার মধ্যে "পাকিস্তানের বীজ" রয়ে গিয়েছে। ২৯শে এপ্রিল তারিখে কাশ্মীর থেকে ফিরে এসে কয়েকটি "মৌল নীতি"র ভিত্তিতে মিশন যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন, মৌলানার পরিকল্পনার সঙ্গে তার অনেকটা মিল ছিল। মিশন প্রস্তাব করলেন যে, মিশনের উদ্যোগে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে, এইসব "মৌল নীতি"র ভিত্তিতে রচিত পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনার জন্যে, কংগ্রেস আর লীগের প্রতিনিধিদের ১লা মে তারিখে দিল্লি থেকে সিমলা যেতে হবে। এই প্রস্তাবের কথা শুনে গান্ধীজী ঈষৎ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। মিশন অবশ্য গান্ধীজীকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, মিশনের উদ্যোগে সিমলায় গিয়ে মিলিত হবার আমন্ত্রণ রক্ষা করলে কোনও ক্ষতি নেই; কোনও পক্ষকেই এর ফলে কোনও বাধ্যবাধকতায় পড়তে হচ্ছে না। কিন্তু গান্ধীজীর অস্বস্তি তবু গেল না। সিমলায় যেতে বস্তুত তিনি অস্বীকৃত হলেন। ক্যাবিনেট মিশন চাইছিলেন যে, গান্ধীজী সিমলায় চলুন; তার জন্য তাঁদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। কিন্তু গান্ধীজীর মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি সারাক্ষণ লেগেই ছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল যে, কোথাও কিছু-একটা গণ্ডগোল ঘটেছে; কিন্তু সেটা ঠিক কী, তাও তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তাঁর অন্তরে তিনি কোনও সাড়া পাচ্ছিলেন না; আর সেইজন্যই তাঁর মনে হচ্ছিল যে, এ-সব ব্যাপার থেকে তাঁর এখন দূরে থাকাই ভাল। সেদিন সোমবার। গান্ধীজীর মৌন-দিবস। তাঁর চিত্তের এই অশান্তির কথা জানাবার জন্যে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে এক-টুকরো কাগজে কয়েকটি কথা লিখে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি। সেই চিরকুটটি আমি আজও সযত্নে রেখে দিয়েছি। গান্ধীজী তাতে লিখেছিলেন :

"ক্রিপ্‌সসে কহো মেরি পার্টি বড়ি হোগি। সব ম্যানরভিল্‌মে নহি ঠাহর সক্‌তে হে। ম্যায় কোহি খানা নহি চাতা হুঁ। সিমলামে কোহি আরামসে রহ্‌নেকো মিল সকে তো যানা চাহুংগা। দিল চাতা হ্যায় না যাঁউ। মুঝে ছোড় দে তো ঠিক

হোগা। ইয়ে সব ব্লেকার্‌সে বাত করো।

নৈতিক বাত ভি হ্যায়। দুনিয়াকো এক বাত কহ্‌তে হ্যায় ঔর মেরে সে দুসরা কহ্‌তে হ্যায়। উস্‌মে মুঝে কে‘ও ডালে? তুম্‌ পর মেরে বিশ্বাস হ্যায়। ম্যায় মানতা হুঁ কি তুম্‌হারা ঈশ্বর পর বিশ্বাস জিন্দা বিশ্বাস হ্যায়। ইস্‌ পর ঔর কুছ পুছনা হ্যায় তো পুছো।"

অর্থাৎ :

"ক্রিপ্‌সকে বলো যে আমার দল বেশ বড় হবে। ম্যানর্‌ভিল্‌-এ (রাজকুমারী অমৃত কাউরের বাড়ি) এত লোকের জায়গা হবে না। আমি কোথাও যেতে চাই না। সিমলায় গিয়ে আরামে থাকতে পারি এমন জায়গা যদি পাওয়া যায়, তাহলেই যেতে চাইব। অন্তরের থেকে বুঝতে পারছি, আমি যেতে চাই না। আমাকে বাদ দিলেই ভাল হয়। ব্লেকারকে (ক্রিপ্‌সের প্রাইভেট সেক্রেটারি) এ-সব কথা বোলো।

এর একটা নৈতিক দিকও আছে। এরা দুনিয়াকে এক কথা বলছে; আর আমাকে বলছে অন্য কথা। এর মধ্যে আমাকে কেন জড়াচ্ছ? তোমার উপরে আমার আস্থা আছে। আমি মনে করি যে, ঈশ্বরের উপরে যে বিশ্বাস তুমি রেখেছ, তা জীবন্ত। এ-বিষয়ে আর কিছু যদি জিজ্ঞেস করতে চাও তো করো।"

গান্ধীজীর মুখের উপরে বেদনার অভিব্যক্তি। দেখে আমার বুক যেন ভেঙে যাচ্ছিল। গান্ধীজী যে কী নিদারুণ অশান্তির মধ্যে রয়েছেন, ক্রিপ্‌সের কাছে গিয়ে তা আমি জানালাম। বললাম যে, এইসব আলোচনায় যোগ দেবার ইচ্ছে তাঁর নেই; তাই তিনি সিমলা যেতে চান না। সব শুনে ক্রিপ্‌সও খুবই বিচলিত হলেন। গান্ধীজীর এই মনঃকষ্টের কারণ কী, তা জানবার জন্যে অনেকক্ষণ তিনি কথা বললেন আমার সঙ্গে। ক্রিপ্‌স বললেন, যে-নীতির ভিত্তিতে তাঁরা কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের মধ্যে একটা মীমাংসার চেষ্টা করছেন, তাতে গান্ধীজীর এত আপত্তি কেন, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। কেননা, গান্ধীজীর কংগ্রেস-দলের সভাপতি স্বয়ং মৌলানা আজাদের সঙ্গেই তো এ-ব্যাপারে তাঁদের একটা স্পষ্ট বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে; বস্তুত মৌলানা এইমর্মে একটি চিঠিও লিখেছেন যে, কংগ্রেসের মধ্যে যতই আভ্যন্তর মত-বিরোধ থাক না কেন, শেষ পর্যন্ত যে তাঁর কথাই কংগ্রেস মেনে নেবে এ-বিষয়ে তিনি নিশ্চিত।

গান্ধীজীর কাছে ফিরে গিয়ে আমি তাঁকে এই চিঠির কথা বললাম। শুনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "ক্রিপ্‌সের কথা তুমি ভুল শোননি তো? কিংবা কথাটা তুমি ভুল বোঝনি তো?" আমি বললাম, আমার কোনও ভুল হয়নি, ক্রিপ্‌স ঠিক এই কথাই আমাকে বলেছেন।

গান্ধীজীর সঙ্গে যখন আমার কথা হয়, তখন হোরেস আলেকজানডারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখান থেকে চলে আসবার পর হোরেস আমাকে বলেন, "গান্ধীজী একটা ভয়ংকর রকমের আঘাত পেয়েছেন; ওঁর মুখ দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু তুমি কী করবে, কথাটা ওঁকে না-জানিয়ে তো উপায় ছিল না।"

গান্ধীজী সে-রাত্রে ঘুমোতে পারলেন না। সকালে তিনি আমাকে বললেন যে, আমাকে ক্রিপ্‌সের কাছে যেতে হবে, এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করতে হবে, চিঠিখানি তিনি গান্ধীজীকে দেখাতে রাজী আছেন কিনা। ক্রিপ্‌স বললেন, এটা গোপনীয় চিঠি; এবং মৌলানার এই গোপন চিঠি পেয়ে মিশন ধরেই নিয়েছেন যে, মৌলানা নিশ্চয়ই এই চিঠির কথা তাঁর সঙ্গীদের জানিয়েছেন। যাই হোক্, গান্ধীজী যখন

এই চিঠির কথা জানেন না এবং চিঠিখানি দেখতে চান, তখন চিঠিখানি তাঁকে দেখানোই শ্রেয়। ক্রিপ্‌স অতঃপর তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি জর্জ ব্রেকারকে ডেকে চিঠিখানি আমাকে দিতে বললেন।

ভাঙ্গী কলোনিতে ছোট্ট একটি ঘরে গান্ধীজী থাকতেন। তার মেঝেয় বসে চিঠিখানি পড়লেন তিনি। পাঠান্তে তাঁর সামনে ছোট্ট ডেসকের উপরে চিঠিখানি তিনি চাপা দিয়ে রাখলেন। ঠিক এই সময়ে খবর এল যে, মৌলানা সাহেব এসেছেন। গান্ধীজী ছাড়া ঘরের মধ্যে তখন আমরা তিনজন ছিলাম। আমি, রাজকুমারী আর প্যারেলালজী। কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে কথা বলবার সময়ে সেখানে আর-কেউ উপস্থিত থাক, মৌলানা এটা পছন্দ করতেন না। মৌলানা সাহেব এসেছেন শুনেই তাই আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ঘরের এক পাশে একটা কাঠের পারটিশন। রাজকুমারী আর প্যারেলালজী সেই কাঠের পারটিশনের পিছনে বসে গান্ধীজীর কাজকর্ম করতেন। গান্ধীজী তাঁদের এই অনুমতি দিয়েছিলেন যে, পারটিশনের এদিকে গান্ধীজীর সঙ্গে যাঁরই কথাবার্তা হোক্ না, তা তাঁরা শুনতে পারেন। গান্ধীজী আর মৌলানা সাহেবের মধ্যে সেদিন যে-সব কথাবার্তা হয়, তাও তাঁরা দুজনেই শুনতে পেয়েছিলেন। মৌলানা সাহেবকে গান্ধীজী সরাসরি প্রশ্ন করলেন, যে-সব আলোচনা চলছে, সে-বিষয়ে তিনি ভাইসরয়কে কোনও চিঠি লিখেছেন কিনা। উত্তরে মৌলানা বললেন, না, তিনি লেখেননি। মৌলানা সাহেব জানতেন না যে, চিঠি লেখার কথা যখন তিনি অস্বীকার করেন, তখন তাঁর মাত্র কয়েক গজ দূরে গান্ধীজীর সামনে ডেস্‌কের উপরে তাঁর সেই মূল চিঠিখানি রাখা ছিল।

কথাবার্তা বলে মৌলানা সাহেব বিদায় নেবার পর আমাকে ডেকে গান্ধীজী সেই চিঠিখানি আমার হাতে তুলে দিলেন। বললেন, ক্রিপ্‌সকে এটি ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হবে। রাজকুমারী ইতিমধ্যে সেই চিঠির একটি নকল রেখেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর নির্দেশে সেই নকলও তাঁকে নষ্ট করে ফেলতে হল। গান্ধীজী চাইছিলেন না যে, এ-চিঠির কোনও নকল রাখা হোক। ছোট্ট চিঠি। তাতে যে খুব আপত্তিকর কিছু ছিল, এমন আমার মনে পড়ে না। যতদূর মনে পড়ছে, মৌলানা তাতে লিখেছিলেন যে, গান্ধীজীকে নিয়ে, কিংবা মিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে গান্ধীজীর মনে যে-সব সন্দেহ দেখা দিয়েছে তা নিয়ে ক্যাবিনেট মিশনের পক্ষে বিশেষ উদ্বিগ্ন হবার কোনও প্রয়োজন নেই। বস্তুত, কংগ্রেসকে দিয়ে মিশনের প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করাতে পারবেন, মৌলানা যদি এমন কথাই তখন ভেবে থাকেন, তবে তা বলবার অধিকারও তাঁর নিশ্চয়ই ছিল। মৌলানা সম্ভবত ভেবেছিলেন যে, দেশের এতে উপকার হবে। কিন্তু সেটা কোনও কথা নয়। সারা জীবন যাঁকে তিনি বিশ্বাস করে এসেছেন, এমন একজন সহকর্মীও যে এতটাই অসত্যাচারী হতে পারেন, এইটে দেখেই গান্ধীজী গভীর বেদনা অনুভব করেছিলেন।

গোটা পরিবেশে তখন দুঃখের ভাবটাই প্রবল। সর্দার বল্লভভাই এবং আর-একজন সহকর্মীর কাছে গান্ধীজী তাঁর মানসিক আশান্তির কথা ব্যক্ত করেছিলেন, এবং গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ-মহলে অতঃপর মৌলানার চিঠির কথাটা জানাজানি হয়ে যায়। সব শুনে পণ্ডিতজী একেবারে খাপ্পা হয়ে উঠলেন। কিন্তু মজা এই যে, বন্ধুবর মৌলানা আজাদের উপরে তিনি চটলেন না; তাঁর রাগটা গিয়ে আমার উপরে পড়ল। তিনি ধরেই নিলেন যে, কাজটা আমি অনিষ্ট করবার মতলব নিয়ে করেছি। পরে সর্দার প্যাটেল আমাকে বলেন যে, দেশের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য

যে ঐতিহাসিক আলোচনা চলেছে, তার সঙ্গে আমার যোগ-সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ওয়ারকিং কমিটীর সভায় গান্ধীজীর উপস্থিতিতেই পণ্ডিত নেহরু আমার সম্পর্কে বেশ-কিছু কড়া-কড়া মন্তব্য করেছিলেন। তিনি নাকি বলেছিলেন যে, এই যোগ-সম্পর্কটা খুবই অস্বাভাবিক। আমার তো কোনও স্পষ্ট পরিচয় নেই; এমন কী গান্ধীজীর প্রাইভেট সেক্রেটারিও তো আমাকে বলা চলে না। অথচ গান্ধীজীর প্রতিনিধি হিসেবে আমি কিনা দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার গিয়ে ব্রিটিশ সরকারের মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করছি! এমন কী, রাত্তিরেও যাচ্ছি! ব্রিটিশ মন্ত্রীরা তো আমার সঠিক পরিচয়টা পর্যন্ত জানেন না; তাহলে তাঁরা আমাকে এতটা বিশ্বাস করেন কেন? কেন আমাকে নানা গোপন তথ্য পর্যন্ত জানান? পণ্ডিত নেহরু নাকি বলেছিলেন যে, এ এক অদ্ভুত ব্যাপার, এবং ব্যাপারটা তাঁর মোটেই ভাল ঠেকছে না।

ওয়ারকিং কমিটীর বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসেই সর্দার প্যাটেল আমাকে বললেন, "তোমার পণ্ডিতজীর মনে তো সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তাঁর ধারণা, এর মধ্যে তোমার ভূমিকাটি বড়ই রহস্যজনক। শুনে আমার বিচ্ছিরি লাগল।"

ব্যগ্রভাবে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "বাপুজী কী বললেন?"

বল্লভভাই বললেন, "বাপুজী মাত্র একটি কথাই বললেন। রাজ্যের আজেবাজে অভিযোগ। কিন্তু তাও তিনি শান্তভাবে শুনে গেলেন, এবং অভিযোগ শেষ হবার পর শান্তভাবেই মন্তব্য করলেন, 'উস্‌কো ম্যয় নাহি ছোড়্ সক্‌তা।' (ওকে আমি ছাড়তে পারব না।) বাস্, পন্ডীতজী অতঃপর চুপ।"

পণ্ডিতজীর সঙ্গে আমার অনুরাগে-বিরাগে বিমিশ্র সম্পর্কের সেই সূচনা। ১৯৬২ সনে ভারতবর্ষের উপরে চীনের আক্রমণ না-ঘটা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার এই সম্পর্কই চলেছিল।

যাই হোক্, সেইদিনই আমি আবার ক্রিপ্‌সের কাছে যাই। গিয়ে তাঁকে বলি যে, গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা যদি তিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে চান তো এই অবস্থায় মাত্র একটি কাজই তিনি করতে পারেন; গান্ধীজীর কাছে গিয়ে সমস্ত কথা তাঁকে খুলে বলতে পারেন। ক্রিপ্‌স সে-কথা মেনে নিলেন। তবে সর্বাগ্রে তিনি মৌলানার কাছে গিয়ে ব্যাপারটা তাঁকে জানাবার পক্ষপাতী ছিলেন। ক্রিপ্‌স বললেন, "প্রথমে আমি মৌলানার কাছে যাব, এবং তিনিই যাতে আগে সব কথা খুলে বলতে পারেন, তার সুযোগ দেব। মৌলানা যদি তাতে রাজী না হন তো আমিই গান্ধীজীর কাছে গিয়ে সব তাঁকে জানাব।"

সেই অনুযায়ী ক্রিপ্‌স প্রথমে মৌলানার কাছে গেলেন। গিয়ে বললেন, গান্ধীজীর কাছে গিয়ে সব কথা তাঁর খুলে বলা উচিত। মৌলানা তাতে রাজী হলেন না। সুতরাং ক্রিপ্‌স অতঃপর নিজেই গান্ধীজীর কাছে গিয়ে সমস্ত কথা তাঁকে জানালেন। সব শুনে লর্ড পেথিক লরেন্সও দুঃখিত হয়েছিলেন; ব্যাপারটা তাঁরও ভাল লাগেনি। আমাকে ডেকে পাঠিয়ে তিনি বললেন যে, গান্ধীজীর সঙ্গে তিনিও এ নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে চান। গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য ক্রিপ্‌সের সঙ্গে তিনিও ভাঙ্গী কলোনিতে যেতে রাজী ছিলেন। তবে ভারত-সচিবের পক্ষে সেখানে যাবার একটা অসুবিধেও তো আছে। গেলে হয়ত ব্যাপারটা নিয়ে নানারকমের জল্পনা-কল্পনা চলবে। লর্ড পেথিক-লরেন্স তাই আমাকে বললেন যে, সেদিন বিকেলে আমি যদি গান্ধীজীকে একবার ভাইসরয়-ভবনের

পিছন দিককার বাগানে নিয়ে আসতে পারি তো বড়ই ভাল হয়। বাগানে বেড়াতে-বেড়াতেই তাঁরা তিনজন কথা বলতে পারবেন। ব্যাপারটা সে-ক্ষেত্রে কারও দৃষ্টি আকর্ষণও করবে না। ২নং উইলিংডন ক্রিসেন্ট হচ্ছে ভাইসরয়-ভবনের প্রাঙ্গণের মধ্যেই। সেখান থেকেই তাঁরা বাগানে যাবেন; ব্যাপারটা কারও চোখেই পড়বে না।

গান্ধীজী রাজী হলেন। সেদিন সন্ধ্যায় প্রার্থনা-সভার অনুষ্ঠানের পর, মোগল-উদ্যানের পিছন দিক দিয়ে আমাদের গাড়ি ভিতরে ঢুকল। লর্ড পেথিক-লরেন্স আর সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স প্রবেশ-পথেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। গান্ধীজীকে নিয়ে তাঁরা বাগানের মধ্যে চলে গেলেন। দূরে বসে আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম যে, বিষণ্ণ মুখে তিনটি মানুষ কথা বলতে বলতে বাগানের মধ্যে পায়চারি করছেন।

গান্ধীজীকে তাঁরা সেদিন বলেছিলেন যে, সিমলায় তাঁকে যেতেই হবে। যা-কিছুই ঘটে থাক না কেন, ক্যাবিনেট মিশন ও কংগ্রেস নেতারা যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁর উপদেশ-পরামর্শ পেতে পারেন, তারই জন্য তাঁর সিমলা যাওয়া দরকার। তাঁদের অনুরোধে গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত সিমলা যেতে রাজী হলেন। পরদিন সকালে তিনি ক্রিপ্সকে একখানি চিঠি লেখেন। চিঠিখানি এই :

নয়াদিল্লি,
২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৬

"প্রিয় সার্ স্ট্যাফোর্ড,

আমি যে কত বড় অস্বস্তির মধ্যে আছি, তা আপনি বুঝতে পারছেন না। কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। কিন্তু তবু আমি সিমলা যাব। কাজের সূত্রেই অনেকে আমার সঙ্গে থাকেন। এই বিরাট দল নিয়ে রাজকুমারীর বাড়িতে ওঠা যাবে না। সুতরাং সরকারের কাছেই আমাকে আশ্রয় চাইতে হবে। জনা-পনর লোকের জন্য থাকবার জায়গা চাই। পরিচারকের প্রয়োজন হবে না। তবে তৈজসপত্র আর খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। ছাগদুগ্ধ দরকার হবে। ট্রেনে জায়গা রাখবার এবং কালকা থেকে নিয়ে যাবার বন্দোবস্তও করে রাখা চাই। সবকিছুই আমার অস্বাভাবিক ঠেকছে; তবে এও শেষ পর্যন্ত সত্য হল।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম. কে. গান্ধী"

সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স।

বলা বাহুল্য, গান্ধীজী আর তাঁর সঙ্গিদলের সিমলা যাত্রার যাবতীয় ব্যবস্থা সরকার থেকে করে দেওয়া হল। সিমলায় রাজকুমারী অমৃত কাউরের বাড়ি 'ম্যানরভিল' থেকে সামার হিল্-এর 'চ্যাডউইক' বিশেষ দূরে নয়। সেই বিরাট বাড়িটি ছেড়ে দেওয়া হল গান্ধীজীকে। স্পেশ্যাল ট্রেনে আমরা সবাই দিল্লি থেকে কালকা গেলাম; কালকা থেকে সিমলা। সিমলায় তাঁর সঙ্গে থাকবার জন্যে গান্ধীজী বিশেষভাবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, তাঁর কন্যা ও শুশ্রূষাকারিণী মণিবেন, খান আবদুল গফফর খান এবং দুই কোয়েকার বন্ধু আগাথা হ্যারিসন আর হোরেস আলেকজান্ডারকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীরা যখন ব্রহ্মদেশ দখল করে, ব্রহ্ম সরকারের দপ্তর তখন ভারতবর্ষে স্থানান্তরিত হয়।

ব্রহ্মের গভরনর তখন সিমলার এই 'চ্যাডউইক'-এ থাকতেন। বাড়ির সংগে অনেকটা জমি; তাতে গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভা অনুষ্ঠানের বিশেষ সুবিধে হল। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, সিমলায় পৌঁছেই গান্ধীজী আবার সেই একই অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন। কিছুতেই তিনি ঠিক স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। এই অস্বস্তিকে তিনি বলতেন 'সংকটের ভিতরকার সংকট'। হঠাৎ তিনি স্থির করলেন যে, আত্মিক এই সংকটের মুহূর্তে একমাত্র ঈশ্বরের উপরেই তিনি নির্ভর করবেন; অন্য আর কারও কাছ থেকে কোনও সাহায্য নেবেন না। এমন কী, তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ এবং আস্থাভাজন সেই কয়েকটি নরনারী, দিল্লি থেকে যাঁরা তাঁর সংগে সিমলা এসেছিলেন, যাঁরা তাঁর অনাড়ম্বর অশন-ভূষণের উপরে লক্ষ্য রাখতেন, ঘুমের ব্যবস্থা করে দিতেন, চিঠিপত্র লেখা আর অন্যান্য কাজ করতেন, এবং তাঁর বয়সে-জীর্ণ অশক্ত শরীরের সেবাযত্ন করতেন—তাঁদের কাছ থেকেও কোনও সাহায্য নিতে তিনি অসম্মত হলেন। সুতরাং ঠিক হল যে, পরের দিনই তাঁর সঙ্গিদল সিমলা ছেড়ে চলে যাবেন। সেই অনুযায়ী তাঁরা যাত্রার উদ্যোগও করতে লাগলেন। যখন দেখলাম যে, তাঁর সারাক্ষণের সংগী বিশ্বস্ত প্যারেলালজীও (গান্ধীজী বলতেন, 'ও ঠিক কুকুরের মত বিশ্বস্ত') সিমলা ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন আমি গান্ধীজীর কাছে গিয়ে বললাম, "বাপুজী, প্যারেলালভাইও তো চললেন। তাহলে আমিই বা আর কেন থাকি। মনে হয়, আমারও এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত।"

গান্ধীজী বললেন, "না, তোমার যাওয়া চলবে না। তোমাকে আমার দরকার হবে। এই তিন ইংরেজকে আমি যতটা বিশ্বাস করি, তুমি তার চাইতে বেশী করো। আমি তোমার মতো অতটা বিশ্বাস করি না বলেই হয়ত এ'দের সম্পর্কে আমার বিচারে কিছুটা ভুল ঘটতে পারে। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে সেই আশংকা নেই। সেইজন্যই তোমাকে আমি থাকতে বলছি। এ'দের সংগে আলোচনা করবার ব্যাপারে তোমাকে আমার দরকার হবে।"

সুতরাং আমি থেকে গেলাম। গান্ধীজীর কাছে আর রইলেন তাঁর দুই কোয়েকার বন্ধু—আগাথা হ্যারিসন আর হোরেস আলেকজানডার। তা ছাড়া সর্দার বল্লভভাই আর বাদশা খান তো রইলেনই।

নুন আর রাজবন্দী

তাবৎ রাজনৈতিক নেতা যখন ভারতভাগ্য নির্ধারণের আলোচনায় নিমগ্ন, গান্ধীজী তখন ব্রিটিশ সরকারের মন্ত্রীদের দিয়ে আরও কিছু কাজ করিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলেন। ভরতবর্ষে তখন স্বাধীনতার লগ্ন প্রায় সমাগত; অথচ স্বাধীনতা-সংগ্রামেরই বহু সৈনিক তখনও কারাপ্রাচীরের অন্তরালে দিনযাপন করছেন। গান্ধীজী তাঁদের কথা ভুলে যাননি। ভুলে যাননি দরিদ্র জনসাধারণের কথাও। গরিব মানুষেরা যাতে বিনা-শুল্কে নিজেদের নুন নিজেরাই বানিয়ে নিতে পারে, তার জন্য তিনি দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। দিল্লিতে যখন অষ্টপ্রহর রাজনৈতিক আলোচনা চলছে, নুনের প্রশ্নটা তখনও তাঁর মনে ছিল। ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে আলোচনা চালাবার জন্যে দিল্লিতে এসে গান্ধীজী আমাকে দুটি কাজের ভার দিলেন। প্রথমত, ভাইসরয়ের আপত্তি সত্ত্বেও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদানে ভারত-সচিবকে রাজী করাতে হবে। দ্বিতীয়ত, সুদিন যে আসন্ন ভারতবাসীকে তার একটা প্রতীকী আভাসদানের জন্য ভাইসরয়কে দিয়ে লবণ-শুল্ক রদ করবার ব্যাপারে কিছু কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়াতে হবে।

ইতিপূর্বে গান্ধীজী যখন বাংলায় গিয়েছিলেন, কলকাতায় ও তার কাছাকাছি অঞ্চলের বিভিন্ন কারাগারে তিনি তখন রাজবন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা গভরনর কেসিই করে দিয়েছিলেন। গান্ধীজী তখন কেসিকে বলেছিলেন যে, রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। মিঃ কেসি সে-অনুরোধ ফেলতে পারেননি। জানুয়ারি মাসে তিনি ৪১ জন বিশিষ্ট নিরাপত্তা বন্দীকে মুক্তি দেন; ফেবরুয়ারি মাসে মুক্তি দেন ৫১ জনকে। তখনও যাঁরা কারাগারে রয়ে গেলেন, তাঁদের মুক্ত করবার জন্য চেষ্টা চালাবার ভার আমাকে দেওয়া হল। মিঃ কেসির পরে সার্ ফ্রেডারিক বারোজ বাংলার গভরনর হয়ে আসেন। বন্দীমুক্তির জন্য তাঁকে আমি ক্রমাগত অনুরোধ করতে লাগলাম। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে গান্ধীজী আমাকে পুণায় ডেকে পাঠান। সেখানে ডঃ দিনশা মেটার নেচার কিওর ক্লিনিকে তিনি তখন নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করবার চেষ্টা করছিলেন। বাংলার নতুন গভরনরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মিঃ বারোজকে তিনি একখানি চিঠি লিখলেন; তারপর আমার হাতে সেই চিঠিখানি তুলে দিয়ে বললেন যে, গভরনরের হাতে আমাকেই সেটি পৌঁছে দিতে হবে এবং তাঁকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার চেষ্টা করতে হবে। গান্ধীজীর সেই চিঠিখানি এখানে তুলে দিচ্ছি :

নেচার কিওর ক্লিনিক,
৬ টোড়িওয়ালা রোড, পুণা,
১০ই মার্চ, ১৯৪৬

"প্রিয় বন্ধু,

আপনার পূর্ববর্তী গভরনর মিঃ কেসি আপনার জন্য কিছু কাজের দায়িত্ব রেখে গিয়েছেন। আমাকে তিনি বলেছিলেন যে, বাংলাদেশের বাদবাকী রাজবন্দীদের সম্পর্কে আপনাকেই যা করবার করতে হবে।.

আপনার কাজের এই সূচনাপর্বেই আপনাকে বিব্রত করবার ইচ্ছা আমার নেই। তবু যে করতে হচ্ছে, তার কারণ, দমদম জেলের বিশিষ্ট বন্দীদের কাছ থেকে সদ্য আমি একটি চিঠি পেয়েছি। চিঠিখানি পড়লেই সব বুঝতে পারবেন। মন্তব্য হিসেবে আমি শুধু এইটুকু বলছি যে, সন্দেহের বশে—তা সেই সন্দেহ যতই প্রবল হোক্ না কেন— এঁদের বিনা-বিচারে কারারুদ্ধ করে রাখাটা খুবই শোকাবহ ব্যাপার। বস্তুত এ এক কলঙ্কজনক ঘটনা। আমার বিবেচনায়, সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে এঁদের সকলকেই মুক্তি দেওয়া উচিত।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম. কে. গান্ধী"

হিজ একসেলেনসি সার্ ফ্রেডারিক বারোজ,
গভরনর অব বেংগল,
কলকাতা।

দমদম সেন্ট্রাল জেলের বিশিষ্ট রাজবন্দীদের কাছ থেকে যে চিঠি পেয়েছিলেন গান্ধীজী, বারোজের কাছে সেটি তিনি পাঠিয়ে দিলেন। রাজবন্দীদের চিঠিখানিতে শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ আর শ্রীভূপেন দত্তের স্বাক্ষর ছিল। সহকর্মীদের পক্ষ থেকে তাঁরা স্পষ্ট তাতে জানিয়েছিলেন যে, গান্ধীজীর অহিংস নীতিতে একদা তাঁদের আস্থা ছিল না বটে, কিন্তু সন্ত্রাসবাদ তাঁরা পরিহার করেছেন এবং সহিংস আন্দোলন সংগঠনের জন্য চেষ্টা করবার ইচ্ছাও তাঁদের নেই। এ-কথা বলায় তাঁদের মুক্তি দাবি করা গান্ধীজীর পক্ষে আরও সহজ হল। চিঠিখানি এই :

দমদম সেন্ট্রাল জেল,
১৭ই জানুয়ারি, ১৯৪৬

"মহাত্মাজী,

আপনার মুক্তিলাভের পর থেকেই বাংলায় আসবার জন্য আমরা আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। বাংলা আজ আপনার সস্নেহ যত্ন চায়। শেষ পর্যন্ত, সুযোগ মিলবামাত্র, আপনি বাংলাদেশে এসেছেন, এবং আমরা আশা করছি যে, বাংলাদেশও আপনাকে তার শ্রেষ্ঠ অভ্যর্থনা দিয়ে বরণ করে নিয়েছে। শারীরিকভাবে আমরা যে সেই অভ্যর্থনায় যোগ দিতে পারিনি, তার জন্য আমরা দুঃখিত।

আপনাকে আমরা আমাদের আনুগত্য নিবেদন করছি। ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে আনুগত্য জানাচ্ছি আপনার আদর্শ ও কর্মপন্থার জন্য। সেইসঙ্গে জাতির নেতা হিসাবেও আপনাকে আনুগত্য জানাই। গত তিন-চার বছরে জাতীয় জীবনের উপর দিয়ে অনেক পরীক্ষা সংগ্রাম ও যন্ত্রণার ঝড় বয়ে গিয়েছে। তদুপরি এরই মধ্যে স্বজন বিয়োগের দুঃখও সইতে হয়েছে আপনাকে। জাতি যেমন আপনার সঙ্গে জাতীয় দুঃখ-অপমান সহ্য করেছে, তেমনি আপনার স্বজন-বিয়োগের দুঃখেরও সে ভাগ নিয়েছে।

এবারে আমাদের ব্যক্তিগত কথায় আসি। কংগ্রেস যখন সংকটের সম্মুখীন, তখন ব্যাপক ও গভীর বিরোধিতা সত্ত্বেও কংগ্রেসের দায়িত্বভার আমরা গ্রহণ করেছিলাম। আমাদের সামর্থ্য অল্প, সময়ও আমরা কম পেয়েছিলাম। তাতে করে কংগ্রেস-

সংগঠনের কাঠামোটাই আমরা বাঁচাতে পেরেছি মাত্র; সুনির্দিষ্ট কাজের বিচারে বিশেষ কিছু সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এর বছর খানেক আগে, এক প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে, যুগান্তর পার্টিকে আমরা ভেঙে দিয়েছিলাম; অতঃপর বিনা শর্তে আমরা কংগ্রেসে যোগ দিই। তবে কংগ্রেসের কর্মপন্থা ও কার্যসূচীর খুঁটিনাটি কয়েকটি বিষয়ে তখনও আমাদের সংশয় ছিল। আমরা যখন দেখলাম যে, হয় কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক দায়িত্বভার আমাদের নিতে হবে, আর নয়ত নিখিল ভারত কংগ্রেস থেকে বাংলা দেশ ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে যাবে, তখন কিছুক্ষণ আমরা দ্বিধায় দুলেছি। আমাদের অসুবিধাগুলি সম্পর্কে মৌলানা সাহেবের সঙ্গে তখন আলোচনা করেছি আমরা। লিখিতভাবে তাঁকে জানিয়েছি, কংগ্রেসের গৃহীত নীতির সঙ্গে আমাদের পার্থক্য কতটুকু। আপনার কাছে এবং ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যদের কাছে সেই বিবৃতির নকলও আমরা পাঠিয়েছিলাম। ওয়ার্কিং কমিটীতে সেই বিবৃতি আলোচিত হয়; অতঃপর আনুষ্ঠানিক দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য মৌলানা সাহেব আমাদের অনুরোধ করেন।

সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে আমরা কাজ শুরু করলাম। যুদ্ধের সময়ে কংগ্রেসের নীতি যে-পথে অগ্রসর হয়, বিশেষ করে তারই দরুণ আমাদের সংশয় ও পার্থক্য দূরীভূত হল। কিন্তু ১৯৪১ সনের মে মাসে আমরা কারারুদ্ধ হলাম। অতঃপর জাপানী আক্রমণ, স্বয়ংভরতা ও আত্মরক্ষার কর্মসূচী, অগস্ট আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ—যুদ্ধের জের ইত্যাদি নানা ঘটনার ফলে আমরা আপনার আরও কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, এবং আপনার কর্মসূচী আমাদের খুবই ভাল লেগেছে। আমরা যখন কারারুদ্ধ হই, তার ঠিক পরেই আপনার সঙ্গে আমাদের পত্রবিনিময় হয়েছিল। আপনি তখন লিখেছিলেন, "অহিংসার আদর্শকে যে আপনারা অংশত গ্রহণ করেছেন, এইটুকু মেনে নিতেও আমার কিছুমাত্র অসুবিধে নেই। সৎভাবে যদি এর প্রয়োগ হয়, তাহলে এই আংশিক বিশ্বাসই আপনা থেকে আরও প্রসারিত হবে।" আজ আমরা বলতে পারি যে, আপনার অহিংসার আদর্শকে গ্রহণ করতে আর কোনও অসুবিধা আমাদের নেই। এই আদর্শ যে শুধুই ভারতবর্ষে বিপ্লব সাধনের শ্রেষ্ঠ পন্থা, তা নয়; নগ্ন হিংসার ভিত্তিতে যে বিশ্ব-ফ্যাসিবাদ মাথা চাড়া দিয়েছে, তার কবল থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করবারও এটি শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। আপনার অহিংসা ও গঠনমূলক কার্যক্রমই (গ্রামীণ মানুষ ও নিপীড়িতের সেবাই যার প্রাথমিক লক্ষ্য) হচ্ছে সেই পথ, একমাত্র যার মাধ্যমে দাসত্ব ও দুঃখ-দারিদ্র্য থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করা যাবে।

মার্ক্স্‌-এর পথের পথিক ছিলাম আমরা। আজ আমরা আপনার কাছে এসে উপনীত হয়েছি। মানবিক ইতিহাসে মার্ক্স্‌-এর অবদান যে স্মরণীয় এ-কথা অনস্বীকার্য। তবে যেখানে দাঁড়িয়ে বিশেষ-বিশেষ অঞ্চলের জন্য তাঁর কর্মপন্থা তিনি বিবৃত করেছিলেন, ইতিহাস তো সেইখানেই দাঁড়িয়ে নেই। কথাটা আপনার পছন্দ না-হতে পারে, তবু বলি, আপনাকে আমরা মার্ক্স্‌-এরই স্বাভাবিক পূর্ণ-পরিণতি হিসাবে দেখেছি। সর্বস্থানে ও সর্বকালে প্রযোজ্য কতকগুলি অপরিবর্তনীয় বিশ্বাসের তিনি জনক, মার্ক্স্‌কে নেহাত এইভাবে আমরা দেখিনি। পরন্তু মনে করেছি যে, ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে কর্মপন্থা নির্ণয়ের যে নীতি—তিনি তারই প্রবক্তা। এবং এইভাবে দেখবার ফলেই আপনাকে তাঁর স্বাভাবিক পরিণতি বলে আমাদের মনে হয়েছে।

১৯২১ সন থেকে কংগ্রেসে আছি আমরা; কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করছি। তবে বলাই বাহুল্য, দ্বিতীয় একটি মতাদর্শের প্রতিও আমাদের অনুরক্তি ছিল। সে-অনুরক্তি কখনও সুপ্ত থেকেছে, কখনও প্রবল হয়ে উঠেছে। ১৯৩৮ সনে সেই দ্বিতীয় অনুরক্তির আকর্ষণ আমরা কাটিয়ে উঠি, এবং একমাত্র কংগ্রেসের মাধ্যমেই স্বাধীনতার জন্য কাজ করতে থাকি। এখন আমরা বিশ্বাস করি যে, একমাত্র আপনার নীতি ও কর্মসূচীই অভ্রান্ত, তাকেই আমাদের অনুসরণ করা উচিত। আমরা এও বিশ্বাস করি যে, পাঁচমিশালী উপাদানকে প্রশ্রয় না-দিয়ে, অবিভক্ত ও অবিভাজ্য আনুগত্যের ভিত্তিতে কংগ্রেসকে একটি সুদৃঢ় সংগঠনে পরিণত করতে হবে। আমাদের ধারণা, এমনটা না-করা হলে, অন্তত বাংলাদেশে সত্যিকারের কংগ্রেসী কাজ করা শক্ত হবে। বাংলাদেশে তো দলের অন্ত নেই।

জাতিকে জাগিয়ে তুলবার ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে বাংলা অনেক কাজ করেছে। সেই অতীত ঘটনার জন্য বাংলার যুবচিত্তে কিছু গোপন গর্ববোধ ছিল। যার পালা চুকে গিয়েছে, আমাদের কর্মীরা অনেক সময় তাকেই আঁকড়ে ধরে ছিলেন। ফলে আমাদের কাজের অসুবিধে হত। গৌরবময় অগস্ট অভ্যুত্থান ও ভয়াবহ মন্বন্তরের পরে আমাদের মনে হল যে, এক নূতন অবস্থা দেখা দিয়েছে। সত্যিকারের কংগ্রেসী কাজ যাতে করা যায়, এমন একটা অনুকূল পরিবেশের জন্য আমরা তখন সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলাম। কারামুক্ত হয়ে বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতারা যে-সব বিবৃতি দিলেন, তাতেও আমাদের প্রত্যাশা আরও বল পেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, ঘটনা আবার অন্য পথে মোড় নিয়েছে, এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবাস্তব রোমান্টিকতাই তাতে আবার নতুন করে প্রশ্রয় পাচ্ছে। প্রকৃত তথ্যকে বিচার করে দেখা হল না, ইতিহাসের শিক্ষাকে উপেক্ষা করা হল; চাপা দেওয়া হল প্রকট ব্যর্থতাকেও। এমন কি, শীর্ষস্থানীয় নেতারাও তাকে সামলাতে না-পেরে অপ্রত্যাশিত নানা উক্তি করে বসলেন। সম্ভবত আপনি তাঁদের সাবধান করে দিয়েছেন। যাই হোক্, সম্প্রতি আপনি বাংলাদেশে এসেছিলেন; তখন আশা করি দেখতে পেয়েছেন যে, আবহাওয়া আগের তুলনায় অনেক নির্মল। বিশেষত, মন্বন্তরের পরে যে অবস্থা দেখা দিয়েছে, তাতে গঠনমূলক কর্মসূচী অনুযায়ী এখানে কাজ করতে খুবই সুবিধা হবে। অতীতের নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার এই যে শুভলগ্ন, একে ব্যর্থ হতে দেওয়া হবে না বলেই আমরা আশা করি; এবং এও আশা করি যে, আপনার ১৮-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে জনসাধারণকে যাতে সংগঠিত করা যায়, আপনারই প্রেরণায় ও নির্দেশে তার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করা হবে।

আমাদের পরবর্তী সমস্যা সাম্প্রদায়িক। আপনার নীতির ব্যাখ্যাকে ঘুলিয়ে দেবার ফলে এ-ক্ষেত্রেও অনেক অনিষ্ট সাধিত হয়েছে। এটা খুবই দুঃখের বিষয়। আমাদের বিশ্বাস, স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা মেনে নেওয়া এবং সেবার মাধ্যমে জনসাধারণকে তার জন্য তৈরী করাই হচ্ছে পাকিস্তান-প্রস্তাবকে প্রতিরোধ করবার শ্রেষ্ঠ পন্থা। ১৯৩৪—৩৭ সনে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ব্যাপারে যে অবাঞ্ছনীয় খেয়োখেয়ি চলেছিল, তাতে বাংলা দেশের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। আমরা আশা করি, ভারত জুড়ে এখন আবার সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি হবে না।

উপরে যে দৃষ্টিভঙ্গির কথা বললাম, মুক্তিলাভের পরে সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমরা কাজ করে যাব। এখানে কাজ শুরু করবার আগে কিছুকাল আপনার কাছে থাকতে চেষ্টা করব। আপনার পরামর্শ ও সাহায্য নিয়েই ভবিষ্যতে কাজ করব

আমরা। আমরা আশা করি, বাংলা দেশ এবারে ক্রমবিবর্তনশীল সেই গান্ধীকে বুঝতে ও গ্রহণ করতে পারবে, সাধারণ মানুষের প্রতি ভালবাসার মূল ভিত্তির উপরেই যাঁর বিবর্তন ঘটছে।

উপসংহারে আমাদের এই বন্দী-দশা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই। সরকার থেকে যে সন্ত্রাসবাদের অজুহাত দেখানো হয়েছে, তা সর্বৈব মিথ্যা। আমরা গ্রেপ্তার হবার আগেই তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সার্ নাজিমুদ্দীন ব্যক্তিগতভাবে তাঁর পুলিস-রিপোর্টের কথা আমাদের জানিয়েছিলেন, এবং বলেছিলেন যে, কংগ্রেসের কাজ ছাড়া অন্য আর কিছুই আমরা করছি না বলে তিনি খবর পেয়েছেন। এ হল আমরা গ্রেপ্তার হবার মাত্র দু মাস আগের ঘটনা। ১৯৪৩ সনে প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও তিনি আইন-সভায় প্রায় এই একই রকমের বিবৃতি দেন। এই যে সন্ত্রাসবাদের ধুয়ো তোলা হয়েছে, এটা আর কিছুই নয়, পুলিসের একটা চালাকি। এর দ্বারা তাদের দুটি মতলব হাঁসিল হবে। প্রথমত, জনসাধারণের কাছে আমাদের একটা মিথ্যা ছবি তুলে ধরা হবে, এবং তার ফলে আমাদের কাজের অসুবিধে ঘটবে। দ্বিতীয়ত, এর দ্বারা এই রকমের একটা ধারণা সৃষ্টি করা হবে যে, সন্ত্রাসবাদী দলগুলি এখনও সক্রিয়। তার ফলে সৎ অথচ সরল যুবকরা বিভ্রান্ত হতে পারে। কংগ্রেসী কার্যসূচীকে বিঘ্নিত করবার জন্যই, সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের আপন মতলব হাঁসিল করবার উদ্দেশ্যে, এইভাবে একটা ভুয়া সন্ত্রাসবাদী আবহাওয়া জিইয়ে রাখতে চাইছে। কংগ্রেসী কার্যসূচীকে এরা এইজন্য বিঘ্নিত করতে চায় যে, সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ তথা ভারত সরকারের চক্রান্তে যে পুরোদস্তুর ফ্যাসিস্ট কাঠামো গড়ে উঠতে চলেছে, এই কার্যসূচী তার মূলেই আঘাত হানতে চায়। বস্তুত, ১৯৩৪ সনের পরে বাংলা দেশে একটিও সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটেনি। আজ এতদিন বাদেও আমরা সন্ত্রাসবাদের কথা ভাবছি, কিংবা অন্য কোনও রাজনৈতিক গোষ্ঠী ভাবছে, এ-কথা বললে শুধু আমাদের বুদ্ধিকেই নয়, আমাদের দেশপ্রেমকেও অবমাননা করা হয়।

আন্তরিকভাবে আপনার
অরুণচন্দ্র গুহ
ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত
ও বন্ধুবর্গ।"

কলকাতা ছাড়বার আগে মিঃ কেসি আমাকে তাঁর পরবর্তী গভরনর সার্ ফ্রেডারিক বারোজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। মানুষ হিসাবে বারোজ ছিলেন কেসির ঠিক বিপরীত। কেসি ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতিবিদ; এককালে তিনি ক্যাবিনেট-মন্ত্রী হয়েছিলেন; রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তাঁর বিচক্ষণতা ছিল অসামান্য; কেমব্রিজে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন; তদুপরি অসট্রেলিয়ার ধনীশ্রেষ্ঠদের তিনি অন্যতম। সেক্ষেত্রে ফ্রেড বারোজ তাঁর প্রথম জীবনে ছিলেন ইনজিন-ড্রাইভার; পরে ব্রিটিশ রেলকর্মী ইউনিয়নের তিনি চেয়ারম্যান হন। অ্যাটলি সরকারে অনেকেই ছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। ইউনিয়নের কর্মী হিসেবে যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছিলেন, শ্রমিক সরকার তাঁদের অনেককেই নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেন। ফ্রেড বারোজ 'নাইট' উপাধি লাভ করলেন, এবং বাংলা দেশের গভরনর করে তাঁকে পাঠানো হল। তিনিই হচ্ছেন বাংলার শেষ ব্রিটিশ গভরনর। ফ্রেড ছিলেন খাঁটি মানুষ, বিনয়ী। পূর্ববর্তী গভরনরের খ্যাতির দীপ্তিতে তাঁর ব্যক্তিত্ব অবশ্য

মৌন-দিবসে হিন্দীতে এই চিরকুট লিখে গান্ধীজী শ্রীসুধীর ঘোষের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সিমলায় গিয়ে আলোচনা চালাবার ব্যাপারে তাঁর আপত্তি কোথায়, এই চিরকুটে তিনি তার আভাস দেন

As you have been go-between,
I suggest that you two should be
present if they don't mind. Ascertain
from them—

মৌন-দিবসে লেখা গান্ধীজীর একটি চিরকুট। এতে তিনি জানাচ্ছেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে বৈঠকের সময় গ্রন্থকারেরও উপস্থিত থাকা উচিত হবে।

①

I understand
from Sudhir
something quite
different

I understood
that you
proposed
to scrap the
whole plan

①A

of interim
Government
as it has
gone on upto
now & consider
the situation
de novo

②

Then if you
say that you
will form a
Government
[illegible] of the
acceptances
[illegible] work
[illegible] can
[illegible] if you
[illegible] in a
different way
[illegible] if you would

③

discuss the
thing with me
I would gladly
do so after
I have opened
my lips i.e.
after 8 p.m.
meanwhile
you should [illegible]
if you don't
mind the [illegible]
after [illegible]

মৌন দিবসে (২৪ জুন, ১৯৪৬) লেখা গান্ধীজীর কয়েকটি চিরকুট। ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে আলোচনা চলবার সময় তিনি এগুলি লিখেছিলেন।

18-11-46

চি সতীশ,

I have your two notes. You are just now more useful there than here. But when you feel that you want to consult me on anything, of course you are free to come. I am fixed up in E. Bengal for some time, perhaps months to come.

Both your letters are good so far as they go. Of course I was wholly right in what I had said to the Viceroy.

Both the major parties are demoralised. [illegible] only way is the 3rd party, the British rulers. They cannot think [illegible] military [illegible] love of power will not allow them to do so. We see things as we are. Hence the central teaching of the Gita, acquisition of the capacity to see things with detachment as perfect as it is humanly possible.

In my opinion for the British not to leave India till there is perfect peace in the land seems to me to be an impossible dream. What they can and must do is to transfer the whole burden to the willing & capable party and at the earliest moment to withdraw the British part of the army & disband the rest. They should not think of keeping any part for the protection of British interests. These must be left to the good will of the people of India. This is the royal road to peaceful transfer. No other. This conviction has not yet gone home to the cabinet. I don't [illegible] that you can work out all the corollaries in the above. If you flounder at any point send me your questions through a messenger.

Love to you all.

Bapu

[illegible] র কাছে লেখা গান্ধীজীর চিঠি। চিঠির [illegible] ১৯৪৬।

গ্রন্থকার

কিছুটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকারের দিনেই তিনি অকপটে আমাকে বলেন যে, কেসির সঙ্গে আমার যেমন সম্পর্ক ছিল, তাঁর সঙ্গেও যদি আমি তেমন সম্পর্ক রাখি তো তিনি খুশী হবেন। কথাটা শুনে আমার ভাল লেগেছিল। আমাকে, এবং আমার মাধ্যমে গান্ধীজীকে, খুশী করবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। গান্ধীজীর চিঠি পাবার দিন কয়েক বাদে তিনি তার এই উত্তর দিলেন :

গভর্নমেণ্ট হাউস, কলকাতা,
১৬ই মার্চ, ১৯৪৬

"প্রিয় মিঃ গান্ধী,

আপনাকে আমার শ্রদ্ধা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাবার জন্যই এই ছোট্ট চিঠি। সুধীর ঘোষের সঙ্গে আজ সকালে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। মিঃ কেসির সঙ্গে আপনার আলোচনার সূত্রে তাঁকে আপনি যে-সব চিঠি লিখেছিলেন, তাতে কিছু প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। সে-বিষয়ে আমাদের যা বক্তব্য, সুধীর ঘোষকে তা আমি সবিস্তারে জানিয়েছি।

আমাকে আপনি যে চিঠি লিখেছেন, শিগগিরই তার উত্তর দেব। রাজবন্দীদের সম্পর্কে সর্বশেষ অবস্থা তাতে আপনাকে জানানো হবে।

মার্চ মাসের শেষাবধি যে অবস্থা দাঁড়াবে, সে-বিষয়ে সুধীরই আপনাকে জানাবে।

আন্তরিকভাবে আপনার
এফ. বারোজ"

এর তিন দিন বাদে গভরনর বারোজ তাঁর দ্বিতীয় পত্র লেখেন। রাজবন্দীদের মুক্তি দেবার কাজ কেমন এগোচ্ছে, এতে সে-কথা জানানো হয়েছিল।

গভর্নমেণ্ট হাউস,
কলকাতা
১৯শে মার্চ, ১৯৪৬

"প্রিয় মিঃ গান্ধী,

শনিবার দিন সুধীর ঘোষ আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। মিঃ কেসির কাছে যে-সব বিষয় আপনি উত্থাপন করেছিলেন, সে-সব বিষয়ে কাজ কেমন এগোচ্ছে, কথাপ্রসঙ্গে সুধীর ঘোষকে তা আমি জানিয়েছি। তবে, আমার মনে হয় যে, আমার কাছে আপনার ১০ই মার্চ তারিখের চিঠিতে আপনি যে-বিষয়ের কথা বলেছেন, তাতেই আপনার আগ্রহ সবচাইতে বেশী। সেই বিষয়েই এই চিঠি লিখছি।

আপনার চিঠিতে রাজবন্দীদের কথা বলা হয়েছে। এ-বিষয়ে আমি আমার পূর্ববর্তী গভরনরের নীতিই অনুসরণ করে যাচ্ছি। তবে আমার পক্ষ থেকে সংগত-ভাবেই দাবি করা চলে যে, এ-বিষয়ে আমি দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছি। তার প্রমাণ এই যে, যে-সব রাজবন্দীকে খুবই বিপজ্জনক বলে গণ্য করা হয়, একমাত্র তাঁরাই এখনও আটক আছেন, আর-কেউ আটক নেই। মার্চ মাসের প্রথম পক্ষকালের মধ্যে ৬১ জন

রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ১৫ই মার্চ তারিখে বন্দী-সংখ্যা ছিল ১১৫। বর্তমান মাসের শেষ নাগাদ এই সংখ্যাটাকে আরও অনেক কমিয়ে আনা হবে।

আন্তরিকভাবে আপনার
এফ. বারোজ"

এম. কে. গান্ধী, এস্‌কোয়্যার,
নেচার কিওর ক্লিনিক,
৬ টোড়িওয়ালা রোড,
পুণা।

ইনজিন ড্রাইভারের পদ থেকে গভরনরের আসনে উন্নীত সরলমনা এই মানুষটির কাছ থেকে এই রকমের সাড়া পেয়ে গান্ধীজী খুশী হলেন, এবং রাজবন্দীদের মুক্তি দেবার কাজ যেভাবে এগোচ্ছে তাতে যে তিনি কতটা আনন্দিত, সে-কথা জানিয়ে তাঁকে লিখলেন :

নেচার কিওর ক্লিনিক,
৬ টোড়িওয়ালা রোড, পুণা,
২২শে মার্চ, ১৯৪৬

"প্রিয় বন্ধু,
শ্রীসুধীর ঘোষের মারফতে আপনার চিঠি পেয়ে আমি খুশী হয়েছি। তিনিই এ-চিঠি আপনার কাছে নিয়ে যাচ্ছেন; বন্দী, লবণ, ইলেকট্রিক করপোরেশনের কর্মী আর খাদি সম্পর্কে আমি এখন কী ভাবছি, তা তিনিই আপনাকে জানাবেন।
আপনাকে ও লেডি বারোজকে আমার শ্রদ্ধা জানাই।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম. কে. গান্ধী"

হিজ একসেলেন্‌সি দি গভরনর অব বেংগল, কলকাতা।

ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে তখনও যে-সব রাজনৈতিক কর্মীকে আটকে রাখা হয়েছিল, তাঁদের—বিশেষ করে তাঁর দুই প্রিয় শিষ্য শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ ও ডঃ রামমনোহর লোহিয়ার—মুক্তির জন্য গান্ধীজী চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। লর্ড পেথিক লরেন্‌স ও সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ তখন দিল্লিতে। এ নিয়ে তাঁদের কাছে দরবার করবার ভার দেওয়া হল আমাকে। বলা হল যে, আমাকে গিয়ে ভারত-সচিবের কাছে কথাটা পাড়তে হবে, এবং রাজবন্দীদের মুক্তিদানে তাঁকে যেমন করেই হোক রাজী করাতে হবে। ঠাট্টা করে গান্ধীজী আমাকে বললেন যে, এ-কাজে আমি যদি সফল হই তো তিনি আমাকে এর জন্যে পুরস্কার দেবেন। কার্যত দেখা গেল, এ কিছু দুরূহ ব্যাপার নয়। লর্ড পেথিক লরেনস্ আর সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌কে আমি বুঝিয়ে বললুম যে, যে-উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা নয়াদিল্লি এসেছেন, তাতে যদি সফল হতে হয় তো দীর্ঘ দিনের বিরোধের স্মৃতিটাকে মুছে দিয়ে একটি শুভেচ্ছার আবহাওয়া গড়ে তুলতে হবে। কথাটা তাঁরা মেনে নিলেন। সমস্যা হল ভাইসরয়কে কীভাবে রাজী করানো যায়। দীর্ঘ আলোচনার শেষে ভারত-সচিব আমাকে বললেন,

"আপনি বরং এক কাজ করুন। গান্ধীজীকে দিয়ে আমার কাছে একটি চিঠি লেখান। আপনি আমাকে যা-যা এখন বললেন, সেই চিঠিতেও যেন সংক্ষেপে তা-ই বলা হয়। ব্যাপারটা নিয়ে তখন আমি ভাইসরয়ের সঙ্গে আলোচনা করব।"

শুনে তক্ষুনি আমি গান্ধীজীর কাছে ফিরে গেলাম, এবং তাঁকে দিয়ে এই চিঠি লেখালাম :

বাল্মীকি মন্দির,
রীডিং রোড, নয়াদিল্লি,
২রা এপ্রিল, ১৯৪৬

"প্রিয় লর্ড লরেন্স,

আমাদের উভয়েরই বন্ধু সুধীর ঘোষ আমাকে বললেন যে, যে-সব বিষয় নিয়ে তাঁকে আমি আপনার ও সার্ স্ট্যাফোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করতে বলেছিলাম, আপনি সেগুলি আমাকে লিখে জানাতে বলেছেন।

কংগ্রেসী হোন আর না-ই হোন, স্বাধীনতাকামী প্রতিটি মানুষই আজ একটি বিষয় নিয়ে ভাবছেন। স্বাধীনতাকামী সেই মানুষদের মূক জনতার পর্যায়ে ফেলা যায় না। রাজবন্দীদের আশুমুক্তিই তাঁদের চিন্তার বিষয়। সহিংস কিংবা অহিংস, যে-আচরণের অভিযোগেই রাজনৈতিক কর্মীরা কারারুদ্ধ হয়ে থাকুন, তাঁদের প্রত্যেকেরই আজ মুক্তি কাম্য। ভারতবর্ষকে যে স্বাধীনতা দেওয়া দরকার, সকল পক্ষই তা আজ স্বীকার করেন; রাজবন্দীদের অতএব রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক বলে আর এখন গণ্য করা যায় না। দৃষ্টান্ত হিসেবে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ আর ডঃ লোহিয়ার কথাই ধরা যাক। দুজনেই এঁরা শিক্ষিত, মার্জিতরুচি মানুষ; যে-কোনও সমাজই এঁদের মতন মানুষকে নিয়ে গৌরববোধ করতে পারে। এঁদের আটক করে রাখা নেহাতই হাস্যকর ব্যাপার। কাউকে আর এখন গুপ্তকর্মী ভাববারও কোনও অর্থ হয় না। জাতীয় সরকার গঠিত হবার পর সেই সরকারই রাজবন্দীদের মুক্তি দেবেন, এই কথা ভেবে এখন যদি এ-ব্যাপারে হাত গুটিয়ে বসে থাকা হয়, তবে সেই নিষ্ক্রিয়তার অর্থ কারও বোধগম্য হবে না, কেউ সেটা পছন্দও করবে না। স্বাধীনতাও এর ফলে শ্রীহীন হয়ে দাঁড়াবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি জনজীবন-সংক্রান্ত। আমি লবণ-করের কথাই বলছি। এই কর-বাবদে যে রাজস্ব আদায় হয়, তা যৎসামান্য। কিন্তু জনসাধারণকে উৎপীড়িত করবার ব্যাপারে এই কর এমনই একটি অস্ত্র, যার দ্বারা অবর্ণনীয় ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। লবণ বানাবার একচেটিয়া সরকারী অধিকার তাদের জীবনকে যদি বিড়ম্বিত করতে থাকে, জনসাধারণ তো তাহলে স্বাধীনতার তাৎপর্য বুঝতে পারবে না। এ-বিষয়ে আর যুক্তি দিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না। ভারতীয় জনমানসকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করে তুলবার উদ্দেশ্যে যে-দুটি ব্যবস্থার কথা আমি ভেবেছি, তা জানালাম। এতে করে একটা মনস্তাত্ত্বিক সুফল পাওয়া যাবে।

প্রসঙ্গত জানাই, ভিন্ন পরিবেশে এই দুটি ব্যবস্থা নিয়েই মিঃ কেসির সঙ্গে আমি আলোচনা করেছি, এবং বাংলাদেশের বর্তমান গভরনরের সঙ্গেও আমার পত্রালাপ চলছে। আরও জানাই যে, লবণ-কর সম্পর্কে মিঃ অ্যাবেলের কাছ থেকে

আজ আমি খবর পেলাম যে, "সরকারের পক্ষে এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।"

আন্তরিকভাবে আপনার
এম. কে. গান্ধী"

দি রাইট অনারেব্‌ল্‌ লর্ড পেথিক লরেন্‌স,
সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইনডিয়া,
নয়াদিল্লি।

অতঃপর মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ মুক্তি পেলেন, এবং আগ্রা জেল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি নয়াদিল্লির ভাঙ্গী কলোনিতে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলেন। গান্ধীজীকে আমি পুরস্কারের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু সেটা আদায় করে নিতে আর মনে ছিল না। ভারত-সচিব শুধু শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের মুক্তির ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হলেন না; সার্‌ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সও তো সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষ; ভারত-সচিব তাঁকে বললেন যে, তিনি যেন শ্রীনারায়ণের সঙ্গে কথা বলেন, এবং আলোচনার ব্যাপারে তাঁর বন্ধুসুলভ পরামর্শ প্রার্থনা করেন। ১৫ই এপ্রিল তারিখেই শ্রীনারায়ণের সঙ্গে দেখা করলেন সার্‌ স্ট্যাফোর্ড। ১৪ই এপ্রিল তারিখে রাজকুমারী অমৃত কাউরের কাছে লেখা তাঁর এক চিঠিতে এর উল্লেখ আছে। চিঠিটি এখানে তুলে দিচ্ছি :

ক্যাবিনেট ডেলিগেশনের দপ্তর,
ভাইসরয়-ভবন,
নয়াদিল্লি,
রবিবার, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৬।

"প্রিয় রাজকুমারী,

আমি আশা করেছিলাম যে, আজ সকালে কোয়েকার-প্রার্থনানুষ্ঠানের পরে আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলা যাবে। অনুষ্ঠানে আপনকে দেখতে না-পেয়ে তাই দুঃখিত হয়েছি।

গান্ধীজী যে-সব বিষয়ের কথা বলেছেন, তা নিয়ে তাঁর উদ্বেগের হেতু আমরা বুঝি। এ-ব্যাপারে আমাদের যথাসাধ্য আমরা করছিও। তবে যা কিছুই করি, তা তো প্রশাসন-যন্ত্রের মাধ্যমেই করতে হবে, এবং প্রশাসন-যন্ত্র তো সর্বদা দ্রুত কিংবা সহজে চলে না। আগামী কাল নারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে বলে আশা করছি। সাক্ষাতের ব্যবস্থাটা আজই করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু আগে থাকতেই তাঁর আর-একটা মীটিংয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল, তাই তিনি সময় করে উঠতে পারলেন না।

জর্জ ব্লেকার ফিরে আসবামাত্র সুধীরের সঙ্গে যোগাযোগ করব। আমার প্রতি-শ্রুতির কথা আমার খেয়াল আছে।

চিঠির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করছি শিগগিরই আবার দেখা হবে, এবং তখন আমরা পরস্পরের সঙ্গে মত-বিনিময় করতে পারব।

আন্তরিকভাবে আপনার
আর. স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স" [১]

রাজবন্দীদের মুক্তি আদায় করে গান্ধীজী অতঃপর লবণের ব্যাপারে মনোনিবেশ করলেন। এক্ষেত্রে কিন্তু কার্যোদ্ধার তত সহজে হল না। তার কারণ ভাইসরয়, বিশেষ করে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি, জর্জ অ্যাবেলের মনোভাব এ-ব্যাপারে ছিল খুবই অনমনীয়। ভারত-সচিবের কাছেও এই নুনের ব্যাপারটা নেহাতই তুচ্ছ বলে মনে হয়েছিল; গান্ধীজী যে এর উপরে এত গুরুত্ব আরোপ করছেন কেন, তা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তা ছাড়া তিনি ভেবে দেখলেন, এটা এমন কিছু জরুরী ব্যাপার নয় যে, এক্ষুনি এ সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে; মাস কয়েক বাদেই তো নূতন সরকার গঠিত হবে, এবং গান্ধীজীর শিষ্যরাই হবেন তার কর্ণধার; নুনের ব্যাপারে তাঁরাই যা-হয় সিদ্ধান্ত নেবেন। ভারত-সচিবের চিন্তা মোটামুটি এই পথ ধরে এগোচ্ছিল। নিজেকে অতএব তিনি এর মধ্যে আর জড়াতে চাইলেন না। তখন ঠিক হল যে, ভাইসরয়কে গিয়ে এ-ব্যাপারে অনুরোধ জানাবার ভার আমাকেই নিতে হবে, এবং লবণ-কর তুলে দেবার ব্যাপারে তাঁকে রাজী করাবার চেষ্টা করতে হবে।

আমার তখন মনে হল যে, সরাসরি ভাইসরয়ের কাছে গিয়ে কোনও লাভ নেই, তার আগে বরং তাঁর শাসন-পরিষদে যিনি অর্থনৈতিক ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত সদস্য, এ-ব্যাপারে তাঁর সহানুভূতি আর সাহায্য পেলে ভাল হয়। ভাইসরয়ের শাসন-পরিষদে অর্থনৈতিক ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত সদস্য তখন সার্ আর্চিবল্ড রোল্যান্ড্স; লবণ-কর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্বও প্রত্যক্ষত তাঁরই হাতে। সার্ আর্চিবল্ড ইতিপূর্বে হোয়াইটহলে কাজ করেছেন; অসাধারণ কর্মদক্ষ মানুষ বলে তাঁর সুনাম ছিল। সামাজিক নানা অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে এর আগে বারকয়েক দেখা হয়েছে আমার; তাঁর অমায়িক ব্যবহার আমার ভালও লেগেছে। কিন্তু সরকারী কোনও কাজকর্ম নিয়ে তাঁর সঙ্গে কখনও আমার কথা হয়নি। গান্ধীজীর প্রস্তাব ছিল এই যে, স্বাধীনতার এই পূর্বমুহূর্তে, ভারতবর্ষের প্রতি ব্রিটেনের সদিচ্ছার প্রতীক হিসেবে, লবণ-কর প্রত্যাহার করতে হবে। ঠিক করলুম, এই প্রস্তাব সম্পর্কে সার্ আর্চিবল্ডের সঙ্গে কথা বলে দেখব যে, ব্যাপারটাকে তিনি কীভাবে নেন। কথা বললুম, এবং—যা আমি আশা করিনি—দেখতে পেলুম যে, ব্যাপারটাকে তিনি খুবই ভাল মনে নিয়েছেন। লবণ-কর যে কেন তুলে দেওয়া উচিত, সে সম্পর্কে নানা যুক্তি দেখিয়ে আমি একটি 'নোট্' তৈরী করে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটা আমি সার্ আর্চিবল্ডের হাতে তুলে দিলাম। তার প্রথমেই ছিল র‍্যামজে ম্যাকডোনালডের একটি উক্তির উদ্ধৃতি :

"লবণ-কর হচ্ছে একটা জুলুম এবং অত্যাচারের ব্যাপার; জনসাধারণ তা যদি বুঝতে পারে, তবে এই কর শুধুই অসন্তোষ সৃষ্টি করবে। একটা মুনাফাবাজ কোমপানি যেভাবে দরিদ্র ভারতবর্ষকে শোষণ করত, সেই শোষণেরই জের চলেছে এই করের মধ্যে।"

কথাটার তাৎপর্য যে কী, সার্ আর্চিবল্ড্ তা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন। নোট্-এর ভিতর থেকে যে-কটি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল, তার সারবত্তা তাঁর নজর এড়াল না। যথা, সরকারী লবণ-উৎপাদন-কেন্দ্রে (১৯৪৪-৪৫) প্রতিমণ লবণ উৎপাদনে যেক্ষেত্রে চার আনা চার পাই খরচা পড়ে, সেক্ষেত্রে দিল্লিতে প্রতি মণ লবণের পাইকারী দাম হচ্ছে তিন টাকা আট আনা চার পাই। তার থেকে আভ্যন্তর শুল্ক বাবদে যদি এক টাকা ন আনা বাদ দেওয়া হয়, তাহলেও দেখা যাবে যে, উৎপাদন-ব্যয়ের উপরে মণ-পিছু এক টাকা এগারো আনা নেওয়া হচ্ছে। এই অতিরিক্ত পরিমাণের হিসেব দাঁড়াচ্ছে উৎপাদন-ব্যয়ের উপরে শতকরা প্রায় ৬২৩।

কলকাতা-অঞ্চলে সেটাই দাঁড়াচ্ছে শতকরা ১৫৯২-এ। লবণের দামে কলকাতা আর দিল্লির মধ্যে এত পার্থক্যেরই বা কারণ কী? কারণটা কি এই নয় যে, লিভারপুল থেকে আমদানী-করা লবণের প্রায় সবটাই খালাস করা হয় কলকাতা বন্দরে, এবং বাংলাদেশেই তার সবটা বিক্রি হয়ে যায়? এই অস্বাভাবিক আমদানির খরচা পোষাবার জন্যে ১৩ কোটি লোককে করভার বহন করতে হবে কেন? লবণের ব্যাপারে সরকার যে একচেটিয়া ব্যবসার সুবিধা ভোগ করেন, এই হচ্ছে তার ভয়ংকর স্বরূপ। বিনা লাইসেন্সে, কোনও কর না দিয়ে, লবণ বানাবার অধিকার যদি বাংলাদেশের মানুষদের থাকত, তাহলে মাথাপিছু দু-এক আনা মাত্র ব্যয় করেই তারা তাদের প্রয়োজন-মত সমস্ত লবণ তৈরী করে নিতে পারত। সার্ আর্চিবল্ডের হাতে যে নোট্ তুলে দিয়েছিলাম আমি, এইভাবেই তাতে যুক্তিজাল বিস্তার করা হয়েছিল। ব্যাপারটা তিনি চিন্তা করে দেখলেন, এবং আমাকে বললেন যে, সত্য বলতে কী, লবণ-করের প্রশ্নটা ইতিপূর্বে তিনি ভেবে দেখেননি। যাই হোক্, গান্ধীজীর যুক্তি তাঁর ভাল লেগেছে; ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে গোটা ব্যাপারটা তাঁর সঙ্গে তিনি আলোচনা করতেও প্রস্তুত।

৫ই এপ্রিল তারিখে সার্ আর্চিবলডের কাছে লবণ-কর নিয়ে দরবার করতে গিয়েছিলাম। সেইদিনই সন্ধ্যায় তাঁকে আমি ভাঙ্গী কলোনিতে গান্ধীজীর কাছে নিয়ে গেলাম। পরনে ডিনারের পোশাক; নয়াদিল্লিরই কোথাও সেদিন তাঁর ডিনার খেতে যাবার কথা ছিল। সেই পোশাকে গান্ধীজীর ঘরে ঢুকে সার্ আর্চিবল্ড তো মহা অস্বস্তিভরে একটি চেয়ারে বসলেন। অস্বস্তির প্রধান কারণ, গান্ধীজী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মেঝের উপরেই বসে ছিলেন। যে অন্যায় করের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে তিনি সংগ্রাম চালাচ্ছেন, সে সম্পর্কে গান্ধীজী তাঁর সমস্ত বক্তব্য সার্ আর্চিবল্ড্কে বুঝিয়ে বললেন; সার্ আর্চিবল্ড্ মনোযোগ সহকারে সব শুনে যাচ্ছিলেন। বস্তুত গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনায় তিনি এতটাই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে, ডিনারের কথাটা তাঁর মনেই ছিল না। আর-একটু হলেই তাঁর ডিনার সেদিন ফসকে যেত। যাই হোক্, বিদায় নেবার সময়ে সার্ আর্চিবল্ড বললেন যে, মাত্র তিন মাস আগেও যদি গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর দেখা হত, চল্তি বছরের বাজেট থেকে তাহলে লবণ-করকে তিনি বাদ দিয়ে দিতেন। ওয়েল্স-এর এই মানুষটির সঙ্গে কথা বলে খুবই ভাল লেগেছিল গান্ধীজীর। সার্ আর্চিবল্ড বিদায় নেবার পরে তিনি মন্তব্য করলেন যে, ভারতবর্ষে যে-সব ব্রিটনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, ইনিই তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয় দক্ষতম ব্যক্তি। প্রথমজন কে, গান্ধীজীকে সে-কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি জবাব দিলেন, "ম্যালকম হেলি।"

তখনও আমি বুঝতে পারিনি যে, সার্ আর্চিবল্ডের সঙ্গে এই যে আমাদের কথাবার্তা হচ্ছে, এর ফলে তিনি ভাইসরয় এবং যে আই-সি-এস চক্র তখন ভারত শাসন করতেন, তাঁদের বিষ-নজরে পড়বেন।

গান্ধীজীর সঙ্গে যেদিন তাঁর কথা হয়, তার পরদিন সকালেই সার্ আর্চিবল্ড রোল্যানড্স্ আমাকে তাঁর দপ্তরে ডেকে পাঠালেন। এবং আমার সামনেই কেন্দ্রীয় রাজস্ব দপ্তরের সদস্যের নামে একখানা চিঠি ডিকটেট করলেন। চিঠিতে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হল যে, লবণ-কর তুলে দেবার জন্য যেন তিনি অবিলম্বে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। সার্ আর্চিবল্ড মনঃস্থির করেছিলেন যে, লবণ-কর তিনি

রাখবেন না। চিঠির একখানা নকল তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। এখানে সেটি উদ্ধৃত হল :

ফিনান্স মেম্বার অব কাউনসিল,
নয়াদিল্লি,
৬ই এপ্রিল, ১৯৪৬।

"প্রিয় বিঙ্গো,

লবণ-রাজস্ব-কমিশনারদের সঙ্গে পরামর্শ করে অবিলম্বে তুমি যদি এমন একটি পরিকল্পনা রচনা করো, যার ফলে লবণ-কর তুলে দেওয়া যাবে, তাহলে কৃতজ্ঞ হব। বলাই বাহুল্য, লবণ উৎপাদন আর বিক্রয়ের ব্যাপারে দেশীয় রাজ্য ও প্রদেশগুলিতে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এখন আমাদের কী ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে, সেটাও আমি জানতে চাই।

আমার ধারণা, দালালদের যদি আমরা বাদ দিতে পারি, তাহলে লবণ-কর তুলে দিলেও এমন দামে লবণ বিক্রি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে যাতে রাজস্বের পরিমাণ বিশেষ হ্রাস পাবে না। মোটামুটি এই রকমের ব্যবস্থার ভিত্তিতে পরিকল্পনা রচনা করলে যে গুদাম-বাবদে আমাদের খরচা বেশ কিছু বাড়বে, তা আমি জানি; কিন্তু মূলধন হিসেবে সেটা ব্যয় করতে কোনও অসুবিধে হবে না। পরিকল্পনার কাজে হাত দেবার আগে যদি ব্যাপারটা নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাও তো ভাল, সানন্দে আমি আলোচনা করব।

চিরকালের জন্য তোমার
(স্বাঃ) আর্চি রোল্যান্ড্স।"

এইচ গ্রীনফীল্ড্, এসকোয়্যার, সি-আই-ই,
মেম্বার, সেনট্রাল বোর্ড অব রেভিনিউ

এই ব্রিটিশ রাজকর্মচারী অতিদ্রুত যে সাহসিক সিদ্ধান্ত নিলেন, গান্ধীজী তাতে খুশী হয়েছিলেন। তবে ভাইসরয়কে না-জানিয়েই যে আর্চি রোল্যানড্স্ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা তিনি জানতেন না। উৎসাহবশত লবণ-কর সম্পর্কে তিনি ভাইসরয়কে একখানি চিঠি লিখে দিলেন। গান্ধীজী ভেবেছিলেন যে, ফিনান্স মেম্বারের কাজের এতে আরও সুবিধে হবে। চিঠিখানি নিয়ে আমি হিজ একসেলেন্সির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ছুটলাম। সেই চিঠি এখানে তুলে দিচ্ছি :

বাল্মীকি মন্দির,
রীডিং রোড, নয়াদিল্লি,
৬ই এপ্রিল, ১৯৪৬

"প্রিয় বন্ধু,

৩রা তারিখে ক্যাবিনেট-সদস্যদের সঙ্গে যে-দুটি বিষয়ে আমার আলোচনা হয়েছিল, সেই সম্পর্কেই এই চিঠি লিখছি।

লবণ-কর সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্য সার্ আর্চিবল্ড রোল্যানড্স্ গতকাল রাত্রে আমার কাছে এসেছিলেন। আলোচনার শেষে তিনি অকপটে আমাকে

জানান যে, মাস তিনেক আগে যদি আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হত, তাহলে এই কর তিনি তুলে দিতেন। তাঁর সঙ্গে আমার আর যা-যা গুরুত্বপূর্ণ কথা হয়েছে, এখানে আর তার উল্লেখ করছি না। তার কারণ, যথাসম্ভব সংক্ষেপে এই চিঠি লিখতে চাই। শ্রীসুধীর ঘোষকে তিনি ভালই চেনেন। এ-বিষয়ে শ্রীঘোষের সঙ্গে তাঁর আরও-কিছু কথা হয়েছে। সার্ আর্চিবল্ড রোল্যানড্স্ এখন নাকি ভাবছেন যে, মাস তিনেকের মধ্যেই এই কর তিনি তুলে দেবেন। তবে আমি জানি যে, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সমর্থন যদি না মেলে তাহলে বিশেষ একজন রাজকর্মচারীর পক্ষে—তা তিনি যতই ক্ষমতা-শালী কিংবা দক্ষ হোন—কিছুই করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই মানবিক কর্মে আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি। এক্ষেত্রে ক্যাবিনেট-সদস্যদের যা আমি বলেছিলাম, সেই বিবেচনাটাই আরও বড়। সেটা হচ্ছে এই যে, যথাসম্ভব শুভেচ্ছাময় এমন একটি পরিবেশের মধ্যে স্বাধীনতার উন্মেষ ঘটাতে হবে, দূরতম গ্রামের দরিদ্রতম গ্রামবাসীও যার স্পর্শ একেবারে সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করতে পারে। আপনার যদি ইচ্ছে আর সময় থাকে, তাহলে সুধীরবাবুর কাছেই এ-বিষয়ে আপনি আরও খবর জানতে পারবেন। এই চিঠি তিনিই নিয়ে যাচ্ছেন।

রাজবন্দীদের সম্পর্কে আমি কিছুই বলব না। তার কারণ, শুনতে পেলাম যে, তাঁদের মুক্তি আসন্ন।

আন্তরিকভাবে আপনার

হিজ একসেলেন্সি দি ভাইসরয় — এম. কে. গান্ধী"

লর্ড পেথিক-লরেন্স কিংবা সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্সের কাছে গিয়ে সব কথা বেশ সহজে বলতে পেরেছি। কিন্তু ভাইসরয়ের কাছে সেটা সম্ভব হল না। এমনিতে তিনি সৌজন্যের প্রতিমূর্তি। কিন্তু অতিশয় স্বল্পবাক্। ভাইসরয় ভবনের প্রশস্ত পাঠকক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল। সৌজন্যসহকারে তিনি দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। আমি আসন গ্রহণ করলাম, কিন্তু প্রথমেই কিছু বললাম না। ভেবেছিলাম, সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনিই প্রথমে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন। কিন্তু একটি কথাও তাঁর ঠোঁট থেকে খসল না; চুপচাপ তিনি বসে রইলেন। অগত্যা আমাকেই কথারম্ভ করতে হল। লবণ-কর তুলে দেবার ব্যাপারে গান্ধীজীর যে কতখানি আগ্রহ, তা তাঁকে জানালাম। বললাম যে, হিজ একসেলেন্সিকেও এ-ব্যাপারে তিনি আগ্রহশীল করে তুলতে চান। লবণ-কর যে মোটেই ন্যায্য নয় এবং গরিবের জীবনে এ যে একটা দুর্বহ বোঝা, তাও বললাম। মিনিট কয়েক ধরে একটানা কথা বলে তারপর চুপ করলাম আমি। আশা করছিলাম যে, হিজ একসেলেন্সি নিশ্চয়ই এবারে কিছু একটা মন্তব্য করবেন। কিন্তু করলেন না। অগত্যা আমি আমার বক্তব্যের দ্বিতীয় পয়েন্ট্টি নিয়ে কথা বলতে শুরু করলাম। কিন্তু মধ্যপথে তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে প্রথম পয়েন্টের জবাব দিলেন। তাঁর কথা ফুরোলে আমি আবার দ্বিতীয় পয়েন্ট্টিতে ফিরে গেলুম। তারপর তৃতীয় পয়েন্ট্টিতে পৌঁছে সদ্য যখন বেশ উৎসাহভরে কথা বলতে শুরু করেছি এবং ভাইসরয়কে বোঝাচ্ছি যে, ব্রিটিশ সরকার যদি গান্ধীজীর ইচ্ছা পূরণ করেন, তাহলে সেটা তাঁদের শুভেচ্ছার একটা মস্ত প্রতীক বলে গণ্য হবে (আমার ধারণা, আমি বেশ বুদ্ধিমানের মত কথা বলছিলাম!), তখন—আমাকে কথা শেষ করবার সুযোগ না-

দিয়েই—ভাইসরয় হঠাৎ বিনীতভাবে উঠে দাঁড়ালেন, এবং বললেন, "আপনি যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ। লবণ-করের ব্যাপারে মিঃ গান্ধীর বক্তব্য আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে বুঝিয়ে বলেছেন। আচ্ছা, গুডবাই।"

বড়ই অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা। ভাইসরয়ের চিত্তে আমি রেখাপাত করতে পেরেছি কিনা, তা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। মনের মধ্যে রাজ্যের অস্বস্তি নিয়ে আমি গান্ধীজীর কাছে ফিরে এলাম, এবং হিজ একসেলেনসির সঙ্গে আমার আলোচনার বিবরণ তাঁকে জানালাম। সব শুনে গান্ধীজী স্থির করলেন যে, তিনি এবারে নিজেই গিয়ে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করে সব বুঝিয়ে বলবেন। অতঃপর ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারির কাছে এই চিঠি লিখলেন তিনি :

বাল্মীকি মন্দির,
৮ই এপ্রিল, ১৯৪৬।

"প্রিয় মিঃ অ্যাবেল,

আমার পরশুদিনের চিঠিতে আমি যে-বিষয়ের কথা বলেছিলাম, সে সম্পর্কে আমার নিভৃততম চিন্তাকে আমি হিজ একসেলেনসির কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি বলে মনে হয় না। তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে ইচ্ছুক,—অবশ্য তিনি যদি তাঁর মূল্যবান সময় থেকে মিনিট কয়েক আমাকে দিতে পারেন। পারবেন কিনা এবং পারলে সেটা কখন পারবেন,—তা আপনি দয়া করে আমাকে জানাবেন কি?

আন্তরিকভাবে আপনার
এম. কে. গান্ধী"

জি. ই. বি. অ্যাবেল, এসকোয়্যার।

ভাইসরয়ের কাছ থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। বুঝতে পারা গেল যে, লবণ নিয়ে তিনি আর কথা বলতে রাজী নন। সার্ আর্চিবল্ড্ রোল্যানড্স্ যে গান্ধীজীকে জানিয়েছেন যে, তিন মাসের মধ্যেই লবণ-কর তিনি তুলে দেবেন, এ-কথা জানতে পেরে ভাইসরয় ভীষণ চটে গেলেন। জর্জ অ্যাবেল আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোদের উস্কানিতে আর্চি রোল্যান্ড্সকে ডেকে বেশ একচোট তিরস্কার করলেন তিনি। গান্ধীজী আর আমার জন্যই সার্ আর্চিবল্ডের এই বিপদ ঘটল! ভেবে খারাপ লাগছিল যে, একজন ভালমানুষকে আমরা না-বুঝে অসুবিধায় ফেলেছি।

তবে লবণ-করের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর লড়াই সেখানেই থামল না। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লি থেকে সিমলা গেলাম আমরা। সেখানে গিয়ে আবার তিনি অ্যাবেলকে একটা চিঠি লিখলেন :

চ্যাডউইক,
সিমলা ওয়েস্ট,
৩রা মে, ১৯৪৬

"প্রিয় মিঃ অ্যাবেল,

লবণের চিন্তা এখনও আমার মাথা থেকে বিদায় নেয়নি। ইংরেজদের সম্মানের কথা ভেবেই আমি বলছি, এই একচেটিয়া কারবারের সুবিধা লোপ করতে একদিনও দেরি করা উচিত নয়।

এই একচেটিয়া কারবারের ফলাফল যে কী হয়েছে, হিজ একসেলেন্সি তা যাতে সম্যক উপলব্ধি করেন, তার জন্য শ্রীপ্যারেলালের রচিত একটি অতিরিক্ত 'নোট্'ও এইসঙ্গে পাঠাচ্ছি।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম. কে. গান্ধী"

জি. ই. বি. অ্যাবেল, এসকোয়্যার,
সিমলা।

ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি এর উত্তরে লিখলেন :

ভাইসরয়'স ক্যাম্প, ইনডিয়া,
সিমলা
৬ই মে, ১৯৪৬

"প্রিয় মিঃ গান্ধী,

লবণ-কর সম্পর্কে আপনার ৩রা মে তারিখের চিঠি এবং সেইসঙ্গে মিঃ প্যারেলালের যে নোট্ পাঠিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ।

২। আপনি প্রথম যখন এ-বিষয়ে উল্লেখ করেন, তারপর হিজ একসেলেন্সি ব্যক্তিগতভাবে এই সমস্যাটি পরীক্ষা করে দেখেছেন; কিন্তু এ সম্পর্কে যে অনুসন্ধান-কার্য চলেছে তার ফলাফল কী হবে তা অনুমান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এ-বিষয়ে আপনার আগ্রহ কত গভীর, তা তিনি বোঝেন; কিন্তু কর তুলে দিলে তার পরিণাম কী হবে, এবং যে-কোনও নতুন সরকারের উপরে তার প্রতিক্রিয়া গুরুতর হয়ে দেখা দেবে কিনা, সেটা তিনি সর্বাংশে বিচার করে দেখতে চান।

আন্তরিকভাবে আপনার
জি. ই. বি. অ্যাবেল"

এম. কে. গান্ধী, এসকোয়্যার।

এই চিঠির পর, চারদিনের মধ্যেই, ভাইসরয়ের কাছ থেকে আর-একটি চিঠি পাওয়া গেল। তাতে তিনি লিখলেন :

ভাইসরয়'স ক্যাম্প, ইনডিয়া
(সিমলা)
১০ই মে, ১৯৪৬

"প্রিয় মিঃ গান্ধী,

ফিনান্স মেম্বার আমাকে জানাচ্ছেন যে, লবণ-কর কমিয়ে কিংবা তুলে দেওয়া হতে পারে, এইমর্মে গুজব রটার ফলে—অবিলম্বে যদি না প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তাহলে—কয়েকটি অঞ্চলে লবণের দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে বাধ্য। ব্যবসায়ী আর পাইকাররা লবণ-উৎপাদকদের কাছে আর নতুন করে মালের অরডার পেশ করছে না। তাদের মনে এই ভয় দেখা দিয়েছে যে, কর মিটিয়ে যে লবণ তারা

কিনবে, তার বিরাট স্টক তাদের হাতে জমা হয়ে যাবে, এবং কর উঠে যাবার ফলে সেই স্টক তাদের কম-দামে বিক্রি না করে উপায় থাকবে না। বোমবাইয়ের লবণ-ব্যবসায়ী ও সিলত্রী সমিতির পক্ষ থেকে এ-ব্যাপারে জোর দরবার করা হয়েছে।

২। লবণের দুর্ভিক্ষ ঘটলে দরিদ্র মানুষদের জীবনে এক গুরুতর সমস্যা দেখা দেবে। সেই অবস্থা যাতে না ঘটে, তার জন্য সরকার একটি প্রেসনোট প্রকাশ করতে ইচ্ছুক। তার একটি নকল এইসঙ্গে পাঠাচ্ছি।

৩। এইরকমের ব্যবস্থা অবলম্বন না করে যে আমাদের উপায় নেই, আশা করি তা আপনি বুঝবেন।

আন্তরিকভাবে আপনার
ওয়াভেল"

এম. কে. গান্ধী, এসকোয়্যার

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সরকার যে বিজ্ঞপ্তি রচনা করেছিলেন, চিঠির সঙ্গে তার একটি অনুলিপি পাওয়া গেল। সেটি এই :

"সরকার অভিযোগ পেয়েছেন, লবণ-কর কমিয়ে কিংবা তুলে দেওয়া হতে পারে —এইমর্মে গুজব রটবার ফলে ব্যবসায়ী ও উৎপাদকদের মনে এতটাই সংশয় ও অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়েছে যে, লবণ-ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ফলে ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে এবং লবণ-উৎপাদনেও শ্লথভাব দেখা দিয়েছে। বর্তমানে পরিবহণ-সমস্যা খুবই তীব্র; তদুপরি বর্ষাকালে লবণ-পরিবহণের সমস্যা আরও জটিল হয়ে দাঁড়ায়; ফলে যে অবস্থা দেখা দিয়েছে, তাতে উত্তর-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে লবণের দুর্ভিক্ষ ঘটবার আশঙ্কা রয়েছে। এই আশঙ্কা দূরীকরণের জন্য সরকার এ-কথা স্পষ্টভাবে জানাতে চান যে, সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণভাবে তদন্ত না করে—যাতে প্রচুর সময় লাগবে—সরকার এ-বিষয়ে বর্তমান ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটাবেন না; এবং কর মিটিয়ে লবণ কিনে যাঁরা মজুত করেন, মজুত মাল বিক্রির যথেষ্ট সময়ও তাঁদের দেওয়া হবে।"

গান্ধীজী এই চিঠি ও বিজ্ঞপ্তি পড়ে খুবই বিচলিত হন, এবং ভাইসরয়কে অত্যন্ত কড়া ভাষায় একখানা চিঠি লেখেন। চিঠিখানা এখানে তুলে দেওয়া হল :

চ্যাডউইক,
সিমলা ওয়েস্ট,
১১ই মে, ১৯৪৬

"প্রিয় বন্ধু,

লবণ সম্পর্কে আপনার ১০ই তারিখের চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

দায়িত্ববোধহীন চিত্ত যে কীভাবে কাজ করে, এই চিঠিই তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। গত সোমবার আমি যখন মৌন অবলম্বন করেছিলাম, তখন অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে, ব্রিটিশ জাতি সুনামের পরোয়া করে না। মৌন ভঙ্গ হবার পরে ক্যাবিনেট-মিশনের সদস্যরা এসে পড়লেন, এবং উচ্চস্তরের রাজনীতির আলোচনায় আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আপনার আপ্তবাক্য অনুসরণ

করে সম্ভবত এই অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় যে, কোনও অন্যায় কাজ করে অপযশ কুড়োতেও ব্রিটিশ জাতির বিশেষ আপত্তি নেই।

অনুগ্রহ করে যে-বিজ্ঞপ্তিটি আপনি আমাকে পাঠিয়েছেন, আমার বিবেচনায় সেটি একটি কলঙ্কজনক ব্যাপার। আমার চিত্তে সর্বদা জনসাধারণের চিন্তাই জাগরূক; তাদের কাছেই আমার চিত্ত দায়ী এবং তাদের আহ্বানেই সে সাড়া দেয়। এ-ব্যাপারে আমার চিত্ত স্পষ্ট এই কথাই বলছে যে, বিশেষ করে এই দুর্ভিক্ষের দিনে ন্যক্কারজনক এই একচেটিয়া ব্যবসা আর করের বিলোপসাধনই কর্তব্য। কিন্তু এই যে সহজ আর ন্যায্য ব্যবস্থা, আপনার মতে এইটুকুও আপনাদের পরবর্তী সরকার অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্বাধীন সরকার এসে করবেন—সে সরকার যখনই প্রতিষ্ঠিত হোক।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম. কে. গান্ধী”

হিজ একসেলেন্সি দি ভাইসরয়

দেখে আমি উদ্বেগ বোধ করছিলাম যে, লবণ কর সম্পর্কে গান্ধীজী আর ভাইসরয়ের যুক্তিতর্ক ক্রমেই চরম সীমায় এসে পৌঁছচ্ছে। মৌলানা আজাদ তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মী; তাঁর মতন মানুষও যে গান্ধীজীর কাছে এতটা অসত্যাচরণ করতে পারেন, ইতিপূর্বে এইটে আবিষ্কার করে তিনি মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন; এবং তারই ফলে তিনি তখন এক আত্মিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলছিলেন। তাঁর নিত্যসঙ্গীদের সকলকেই তিনি তখন বিদায় দিয়েছেন; এমন কী, যাঁরা তাঁর আহার পরিচ্ছদ আর খুঁটিনাটি প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, তারাও কেউ তখন তাঁর কাছে ছিলেন না। তার কারণ, তাঁর ভাষায়, তিনি তখন “কোনও মানুষের উপরে নয়, একমাত্র ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করতে” চাইছিলেন। তাঁর নিঃসঙ্গতার ভার যাতে লাঘব হতে পারে, বল্লভভাই কিংবা বাদশা খান কিংবা আমার পক্ষে এমন কিছুই তো করবার সাধ্য ছিল না। সকালে সন্ধ্যায় তখনও তিনি প্রার্থনায় বসতেন। কিন্তু তাঁর প্রিয় স্তোত্র আর গানগুলি তাঁকে গেয়ে শোনাবার মতন কেউ তখন নেই। যাঁরা গান গাইতে পারতেন, তাঁরা চলে গিয়েছিলেন। বল্লভভাইয়ের কন্যা মণিবেন আর আমি তাঁদের শূন্য স্থান পূরণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতুম। কিন্তু হায়, আমাদের একজনের গলাও তো গানের গলা নয়!

সর্বোপরি লবণ-কর সম্পর্কে ভাইসরয়ের ওই একগুঁয়েমি। গান্ধীজী আর পারলেন না, কঠোর ভাষায় ওই চিঠি লিখে দিলেন। চিঠির সুর থেকে মনে হল, লক্ষণ শুভ নয়। ভয় হল, এই দুর্বল শরীরেই তিনি হয়ত অনশন শুরু করবেন, এবং এমন চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, সমগ্র দেশ জুড়ে যার ফলে অভ্যুত্থান ঘটবে। উদ্বিগ্ন মনে আমি সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম, এবং তাঁকে বললাম যে, এ-ব্যাপারে তাঁর কিছু করা উচিত। ভাইসরয়ের সঙ্গে কি তিনি এ-সম্পর্কে কথা বলতে পারেন না? ভাইসরয়কে কিছু সৎপরামর্শ দিতে পারেন না? সার্ স্ট্যাফোর্ড এতে সম্মত হলেন। অতঃপর গান্ধীজীর কঠোর চিঠির যে উত্তর এল ভাইসরয়ের কাছ থেকে, তাতে মনে হল, ভাইসরয় কিছুটা নরম হয়েছেন। গান্ধীজীকে তিনি জানালেন :

ভাইসরয়'স ক্যাম্প্, ইনডিয়া
(সিমলা)
১১ই মে, ১৯৪৬

"প্রিয় মিঃ গান্ধী,

লবণ-কর সম্পর্কে আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ। আপনি যদি এ সম্পর্কে আলোচনা করতে চান তো সানন্দে আমি এ-বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলব। আজ সন্ধ্যা সাতটায় কি আপনার অবসর হবে?

আন্তরিকভাবে আপনার
ওয়াভেল"

এম. কে. গান্ধী, এসকোয়্যার

সেইদিনই সন্ধ্যায় ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন গান্ধীজী। যে-ঘরে তাঁরা কথা বলছিলেন, আমি তার পাশের ঘরে বসে ছিলাম। বসে-বসে আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম যে, ওঁদের মধ্যে যেন একটা চূড়ান্ত সংঘর্ষ না ঘটে। আলোচনা শেষ করে বেরিয়ে এলেন গান্ধীজী। মুখ দেখে মনে হল, আগের চাইতে তিনি ঈষৎ প্রফুল্ল। ভাইসরয়-ভবন থেকে আমাদের সামার হিল্-এ নিয়ে যাবার জন্য যে গাড়িটা অপেক্ষা করছিল, সেটাকে তিনি ছেড়ে দিলেন; বললেন, এটুকু পথ তাঁর হেঁটে ফিরতেই ভাল লাগবে। আমার কাঁধে ভর দিয়ে ভাইসরয়-ভবনের বিরাট প্রাঙ্গণ তিনি পার হয়ে এলেন; বাড়ির পিছন দিককার পথ দিয়ে আমরা সামার হিলের দিকে এগোতে লাগলাম। পথ কম নয়। প্রায় দু মাইল। তার উপরে তাঁর স্বাস্থ্য তখন মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। ফলে আমার ভয় করতে লাগল। সামার হিলের পথ অবশ্য খুব খাড়াই নয়। তবু চড়াই ভেঙে তাঁকে উঠতে হচ্ছে, এইটে দেখে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এর ফল হয়ত ভাল হবে না। গান্ধীজী কিন্তু হাসতে হাসতে জিদ ধরেছিলেন যে, তিনি হেঁটেই ফিরবেন। ধীরেসুস্থে চড়াই ভেঙে শেষপর্যন্ত আমরা 'চ্যাডউইক'-এ পৌঁছলাম। এদিকে গাড়ি আমাদের অনেক আগেই 'চ্যাডউইক'-এ ফিরেছিল। ড্রাইভার গিয়ে বল্লভভাইকে বলেছিল যে, ভাইসরয়-ভবন থেকে গান্ধীজী হেঁটে ফিরছেন। শুনে বল্লভভাই আর বাদশা খান এতটাই বিচলিত হয়ে পড়েন যে, তাঁরাও ভাইসরয়-ভবনের দিকে এগোতে থাকেন। গান্ধীজী আর আমি যখন 'চ্যাডউইক'-এর প্রবেশ-পথে গিয়ে পৌঁছেছি, তখন তাঁদের সঙ্গে আমাদের দেখা। বল্লভভাই তো আমার উপরে দারুণ রেগে গেলেন। গান্ধীজীকে আমি এতটা পথ হেঁটে আসতে দিয়েছি বলে খুব একচোট বকুনি দিলেন আমাকে। যেন ইচ্ছে করলেই গান্ধীজীকে আমি বাধা দিতে পারতুম!

গান্ধীজীকে অবশ্য প্রফুল্লই দেখাচ্ছিল। ভাইসরয় যা করতে যাচ্ছিলেন, তা যে অন্যায় কাজ, সে-কথা তিনি তাঁকে বেশ ভালভাবেই বুঝিয়ে দিয়ে আসতে পেরেছিলেন। ভাইসরয় তার পরদিনই গান্ধীজীকে এই চিঠি লেখেন:

ভাইসরয়'স ক্যাম্প, ইন্ডিয়া
(সিমলা)
১২ই মে, ১৯৪৬

"প্রিয় মিঃ গান্ধী,

আপনার সঙ্গে আমার আলোচনার ফলে লবণ-কর সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি আমি আটকে রাখবার ব্যবস্থা করেছি। যে-সব ব্যবসায়ী-সংস্থা অভিযোগ তুলেছিল, ফিনান্স্ মেম্বার তাদের জানিয়ে দেবেন যে, লবণ-কর এক্ষুনি প্রত্যাহার করবার কোনও সম্ভাবনা নেই; এবং তেমন কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হলে আগেই তাদের জানানো হবে। তিনি আশা করছেন যে, এর ফলেই যথেষ্ট পরিমাণ লবণ বাজারে পাওয়া যাবে।

আন্তরিকভাবে আপনার
ওয়াভেল"

এম. কে. গান্ধী, এসকোয়্যার

গান্ধীজী এর উত্তরে লিখলেন :

সিমলা,
১৪ই মে, ১৯৪৬

"প্রিয় বন্ধু,

আপনার ১২ই মে তারিখের চিঠির জন্য এবং লবণ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি আটকে রাখবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম. কে. গান্ধী"

হিজ একসেলেন্সি দি ভাইসরয়

বলা বাহুল্য, গান্ধীজী সেইখানেই থেমে থাকেননি। সেই বছরই অকটোবর মাসে লবণ-কর তুলে দেওয়া হল। তখন তিনি শান্ত হলেন।

বিশ্বাস, না অবিশ্বাস?

৫ই মে তারিখে শুরু হল সিমলার সম্মেলন; সাত দিন ধরে আলোচনা চলল। ক্যাবিনেট মিশনের মধ্যস্থতায় কংগ্রেস আর লীগের প্রতিনিধিবৃন্দ এসে আলোচনায় বসলেন। কংগ্রেস পক্ষে ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রীনেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আর খান আবদুল গফফর খান। মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে এসেছিলেন মিঃ জিন্না, নবাবজাদা লিয়াকত আলি খান, মহম্মদ ইসমাইল খান এবং আবদুর রব নিশতার। কংগ্রেস আর লীগের মধ্যে যে-সব বিষয়ে মতৈক্যের জন্য ৯ই মে তারিখের বৈঠকে ক্যাবিনেট মিশন থেকে প্রস্তাব করা হল, তা হচ্ছে এই :

(১) একটি সর্ব-ভারতীয় ইউনিয়ন সরকার ও আইন-সভা প্রতিষ্ঠিত হবে। পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ, মৌলিক অধিকার—এই চারটি বিষয় তাঁদের এক্তিয়ারে থাকবে। এবং এর ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য যে অর্থের দরকার হবে, তা সংগ্রহ করবার ক্ষমতাও তাঁদের থাকবে।

(২) অবশিষ্ট যাবতীয় ক্ষমতা প্রদেশের উপরে বর্তাবে।

(৩) কয়েকটি প্রদেশ-গোষ্ঠী গড়া হতে পারে; এবং প্রাদেশিক এক্তিয়ারভুক্ত কোন্ কোন্ বিষয়ের দায়িত্ব সম্মিলিতভাবে নেওয়া যায়, এই গোষ্ঠীগুলি তা ঠিক করতে পারবে।

(৪) গোষ্ঠীগুলি তাদের নিজস্ব শাসন-বিভাগ ও আইন-সভা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

(৫) যে-সব প্রদেশে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং যে-সব প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ—তারা কিংবা তাদের মধ্যে কোনও-একটি প্রদেশ গোষ্ঠীতে যোগ দিক আর না-ই দিক—তাদের থেকে সমান অনুপাতে সদস্য নিয়ে, এবং সেইসঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় আইন-সভা গঠন করা হবে।

(৬) যে-অনুপাতের ভিত্তিতে আইন-সভা গঠিত হবে, সেই একই অনুপাতের ভিত্তিতে গঠিত হবে ইউনিয়ন সরকার।

(৭) ইউনিয়ন ও প্রদেশ-গোষ্ঠীগুলির (যদি তেমন গোষ্ঠী গঠিত হয়) সংবিধানে এইমর্মে একটি ব্যবস্থা রাখতে হবে যে, যে-কোনও প্রদেশ তার আইন-সভার ভোটাধিক্যের ভিত্তিতে, প্রথম দশ বৎসর উত্তীর্ণ হবার পর এবং তারপর প্রতি দশ বৎসর অন্তর, সংবিধানের শর্তাবলী পুনর্বিবেচনার দাবি করতে পারবে।

পুনর্বিবেচনার উদ্দেশ্যে একটি সংস্থা গঠিত হবে। যে-ভিত্তিতে এবং ভোটের যে-ব্যবস্থা রেখে মূল গণ-পরিষদ গঠিত হবে, এই সংস্থাও সেই একই ভিত্তিতে গঠিত হবে এবং ভোটের ব্যাপারেও এখানে সেই একই ব্যবস্থা রাখা হবে। সংবিধানকে যেভাবে সংশোধন করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, সেইভাবেই সংশোধন করবার ক্ষমতা এই সংস্থার থাকবে।

(৮) উল্লিখিত ভিত্তিতে সংবিধান রচনার জন্য নিম্নোক্তভাবে গণ-পরিষদ গঠিত হবে :

(ক) প্রতিটি প্রাদেশিক-পরিষদ গণ-পরিষদে প্রতিনিধি পাঠাবেন। প্রাদেশিক পরিষদে যে-সব দল থাকবেন, তাঁরা প্রত্যেকে তাঁদের মোট সদস্য-সংখ্যার এক-

দশমাংশকে গণ-পরিষদের সদস্য হিসাবে পাঠাতে পারবেন।

(খ) বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য তাঁদের জনসংখ্যার ভিত্তিতে, ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের মোট প্রতিনিধি সংখ্যার অনুপাতে, গণ-পরিষদে প্রতিনিধি পাঠাবেন।

(গ) এইভাবে যে গণ-পরিষদ গঠিত হবে, যথাসম্ভব শীঘ্র নয়াদিল্লিতে তার অধিবেশন হবে।

(ঘ) গণ-পরিষদের প্রাথমিক অধিবেশনে এর সাধারণ কার্যক্রম স্থির হবে। অতঃপর এই পরিষদ তিনটি অংশে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক অংশ হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলির প্রতিনিধিত্ব করবে; এক অংশ মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলির প্রতিনিধিত্ব করবে; এক অংশ দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব করবে।

(ঙ) প্রথম অংশ দুটির তখন পৃথক পৃথক অধিবেশন হবে; এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রদেশসমূহের কিংবা যদি ইচ্ছা হয় তবে সামগ্রিকভাবে গোষ্ঠীর সংবিধান সেখানে স্থিরীকৃত হবে।

(চ) এইসব ব্যাপারের মীমাংসা হয়ে যাবার পরে যে-কোনও প্রদেশ,. যদি তার তেমন ইচ্ছা হয় তবে, তার মূল গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে যেতে ও অন্য কোনও গোষ্ঠীতে যোগ দিতে কিংবা আদৌ কোনও গোষ্ঠীতে যোগ না-দিয়ে পৃথক থাকতে পারবে।

(ছ) অতঃপর, ১ থেকে ৭ নং অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে, সেই অনুযায়ী ইউনিয়নের সংবিধান নির্ধারণের জন্য এই তিন অংশ আবার একত্রে মিলিত হবেন।

(জ) ইউনিয়নের সংবিধানে যদি সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের ব্যাপারে কোনও বৃহৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাহলে প্রধান দুটি সম্প্রদায়ের উভয়েই যদি না ভোটাধিক্যে তা অনুমোদন করে, তাহলে তা গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে না।

আলোচনার জন্য কংগ্রেস থেকে যে প্রতিনিধিদল মনোনয়ন করা হয়েছিল, গান্ধীজী তার সদস্য ছিলেন না। কিন্তু আলোচনা ও মতৈক্যের জন্য মিশন যে-সব প্রস্তাব ঠিক করে রেখেছিলেন, মিশন সে-বিষয়ে গান্ধীজীর উপদেশ ও পরামর্শ লাভের জন্য ৮ই তারিখেই তার একটি অনুলিপি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। সেই-দিনই রাত্রে গান্ধীজী এ-বিষয়ে সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্সের কাছে একটি চিঠি লেখেন, এবং আমাকে ডেকে বলেন যে, চিঠিটি অবিলম্বে সার্ স্ট্যাফোর্ডের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তখন বেশ রাত হয়েছে। তা ছাড়া সেদিন আবহাওয়াও ছিল খারাপ; বাইরে তুমুল ঝড়বৃষ্টি চলছিল। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে, গান্ধীজীর মনের মধ্যেও ঝড় বইছে। সুতরাং সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবার আর সাহস হল না। ছাতাটা হাতে নিয়ে সেই ভয়ংকর আবহাওয়ার মধ্যেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। চ্যাডউইক থেকে ভাইসরয় ভবন দু মাইল। তার উপরে রাস্তাও অন্ধকার। কিন্তু উপায় কী, তারই মধ্যে জলকাদা ভেঙে ভাইসরয় ভবনের দিকে হাঁটতে লাগলাম। সেখানে পৌঁছে আর এক বিপদ, শান্ত্রী আমাকে ভিতরে ঢুকতে দেবে না। তার দোষ নেই; বৃষ্টিতে জামাকাপড় ভিজে একশা, আমার সেই চেহারা দেখে সে কী করে বুঝবে যে, বিরাট এক দৌত্যকর্ম সমাধা করতে আমি সেখানে গিয়েছি। যতই তাকে বোঝাবার চেষ্টা করি যে, আমাকে ভিতরে যেতেই হবে, ততই সে বলে যে, আমাকে ঢুকতে দেবার হুকুম তাকে দেওয়া হয়নি। রাত তখন নটা বেজে গেছে। আমার ভাগ্য ভাল, বুকের উপরে লাল তকমা ঝোলানো একটি চাপরাসী তখন ভাইসরয়-ভবন থেকে বেরিয়ে আসছিল; শান্ত্রীর সঙ্গে এক আগন্তুক তর্কাতর্কি করছে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সে; তারপর আমার উপরে চোখ পড়তেই সে একটা

লম্বা সেলাম ঠুকল। আমাকে সে চিনত। ইতিপূর্বে বহুবার সে দিল্লিতে আর সিমলায় মহাত্মাজীর সঙ্গে আমাকে ভাইসরয়-ভবনে দেখেছে। শশব্যস্ত হয়ে শাস্ত্রীকে সে বোঝাতে লাগল যে, এই বাবুজীটি একজন কেউকেটা ব্যক্তি নন; 'গরিবদের যিনি রাজা'—ইনি হচ্ছেন সেই মহাত্মাজীর দূত; সুতরাং এঁকে মোটেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা চলবে না। চাপরাসীর কথায় শাস্ত্রীর যে খুব একটা আস্থা জন্মেছে, তার মুখ দেখে এমন অবশ্য মনে হল না, তবে আমাকে সে এ-ডি-সিদের ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিল। সেখান থেকে একজন এ-ডি-সি সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে ফোন করে জানালেন যে, বিনা অ্যাপয়েন্ট্‌মেন্টেই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। অতঃপর ফোন নামিয়ে রেখে তিনি বললেন যে, স্যার্ স্ট্যাফোর্ড শুয়ে পড়েছেন বটে, তবে আমার সঙ্গে তিনি দেখা করবেন। আমি যেন তাঁর শোবার ঘরে চলে যাই; সেইখানেই কথা হবে। তা-ই গেলুম।

গান্ধীজী যে চিঠি আমার সঙ্গে দিয়েছিলেন, সার স্ট্যাফোর্ডের হাতে সেটি আমি তুলে দিলুম। একবার নয়, অনেকবার তিনি সেই চিঠিখানি পড়লেন। গান্ধীজী তাতে লিখেছিলেন :

চ্যাডউইক,
সিমলা ওয়েস্ট,
৮ই মে, ১৯৪৬

"প্রিয় সার্ স্ট্যাফোর্ড,

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেসের প্রতিনিধি চারজনের মধ্যে জোর বিতর্ক হয়েছে। প্রধান বিবেচ্য বিষয় এই ছিল যে, প্রতিনিধিরা যদি একবার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহলে যাবতীয় শর্তসহ এই প্রস্তাব তাঁরা মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন। কংগ্রেসের পক্ষেও এটা বাধ্যতামূলক হবে, যদি না অবশ্য কংগ্রেস তার এই প্রতিনিধি চতুষ্টয়কেই অস্বীকার করে বসে। লীগের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য হবে। কিন্তু কাল রাত্রে আপনি আমাকে যা বলেছিলেন, সেই অনুযায়ী আমি বললাম যে, কারও পক্ষেই এটা বাধ্যতামূলক নয়। গণ-পরিষদ এর মধ্যে যে-কোনও অংশকে বর্জন করতে পারবে; এবং দুই পক্ষের প্রতিনিধিদলের সদস্যরাই গণ-পরিষদে এই প্রস্তাবসমূহের সঙ্গে আরও কিছু সংযোজন করতে অথবা এর সংশোধন করতে পারবেন। আমি আরও বললাম যে, এই প্রস্তাবগুলি আসলে এমন একটা কাঠামো মাত্র, যার সাহায্যে—খসড়ায় যার আভাস দেওয়া হয়েছে—সেই গণ-পরিষদে দুটি সংস্থাকে এনে মেলানো যেতে পারে। আপনার পক্ষে যদি বলা সম্ভব হয় যে, এই ব্যাখ্যাই ঠিক, এবং এই মর্মে আপনি যদি একটি প্রকাশ্য বিবৃতি দিতে পারেন, প্রধান বিঘ্ন তাহলে দূরীভূত হবে।

প্রস্তাবের দোষগুণ সম্পর্কে বলছি, ছটি হিন্দুপ্রধান প্রদেশ এবং পাঁচটি মুসলিম-প্রধান প্রদেশের প্যারিটি নিয়ে যে অসুবিধে দেখা দিয়েছে, তা দুর্লঙ্ঘ্য। মুসলিম-প্রধান প্রদেশগুলির লোকসংখ্যা ন কোটির বেশী; হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলির লোকসংখ্যা সেক্ষেত্রে উনিশ কোটিরও বেশী। সেই বিচারে এটা তো পাকিস্তানের চাইতেও খারাপ ব্যবস্থা হল। এর পরিবর্তে বরং জনসংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় আইনসভা ও শাসন-পরিষদ গঠন করা হোক। যদি মনে হয় যে, এই ব্যবস্থা ন্যায়-সংগত নয়, তবে এই বিষয়ে এবং আরও যে-সব বিষয়ে মতৈক্য সম্ভব হচ্ছে না, সে

সম্পর্কে রায় দেবার ভার একটি নিরপেক্ষ অ-ব্রিটিশ ট্রাইব্যুনালের হাতে দেওয়া যেতে পারে। এ দুটি ব্যাপার যদি পরিষ্কার হয়ে যায়, আমার পথও তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

নিজে আপনার কাছে না গিয়ে এই চিঠি পাঠালাম। আপনি এখন ভেবে দেখুন, সম্মেলনের আগে আমাদের দেখা হওয়া দরকার, নাকি পত্রবিনিময়ই যথেষ্ট। আমি আপনারই হাতে।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম. কে. গান্ধী"

সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স।

ক্রিপ্‌সের তখন শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। তাঁর স্বাস্থ্য হঠাৎ ভেঙে পড়েছিল। গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আগের দিন রাত্রে তিনি 'চ্যাডউইক'-এ গিয়েছিলেন। কথাবার্তা শেষ হবার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তাঁর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে কি আমি ভাইসরয়-ভবন পর্যন্ত যেতে পারব? গল্প করতে-করতে তাঁকে সেদিন এগিয়ে দিয়েছিলুম আমি। তারপর ভাইসরয়-ভবনে পৌঁছে সদ্য যখন তাঁর ঘরে ঢুকেছি আমরা, ক্রিপ্‌স হঠাৎ মেঝের উপরে টলে পড়লেন। অবিশ্রান্ত বৈঠক আর আলোচনার চাপে আর উত্তেজনায় তাঁর স্বাস্থ্য ভিতরে-ভিতরে ধ্বসে পড়ছিল। শুধু ইচ্ছাশক্তির জোরে তিনি কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেই লৌহকঠিন সংকল্পও আর তাঁকে খাড়া রাখতে পারছিল না। তাঁর উদ্যম প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল।

ক্রিপ্‌সকে সেদিন ভারী ক্লান্ত, ভারী করুণ দেখাচ্ছিল। কিন্তু তিনি কথা বলতে চাইছিলেন। বুঝতে পারছিলাম, দু-একটা ঘরোয়া কথা বলবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। আমি তাঁর শয্যার পাশে চুপ করে বসে রইলাম; বসে বসে তাঁর কথা শুনতে লাগলাম। ক্রিপ্‌স তাঁর স্ত্রী ইসোবেলের কথা বললেন। বললেন, ইসোবেলকে যদি ইংল্যানড থেকে এখানে নিয়ে আসা যেত, তাহলে মন্দ হত না; একা-একা এই দুর্বহ বোঝা আর তিনি বইতে পারছেন না। ক্রিপ্‌স তাঁর ছেলে জনের কথাও সেদিন বলেছিলেন। বলেছিলেন তাঁর চার নাতির কথা।...রাজনীতির ধার ধারে না, গ্রামে থাকে, 'কানট্রিম্যান' কাগজ সম্পাদনা করে, জন বেশ সুখেই আছে।...অবিশ্বাসের বিড়ম্বনা যে কী দুঃসহ, তাও তিনি বলেন। কথায়-কথায় রাজনীতির প্রসঙ্গও উঠল। ক্রিপ্‌স বললেন, আলোচনার প্রস্তাবে তো কোনও দোষ নেই। আসল সমস্যা হচ্ছে কংগ্রেস আর লীগের পারস্পরিক অবিশ্বাস। বড় গভীর সেই অবিশ্বাস। ধীরে-ধীরে কথা বলছিলেন ক্রিপ্‌স। তাঁকে খুব বিষণ্ন দেখাচ্ছিল।

পরদিন সকালে তিনি গান্ধীজীর কাছে একখানি চিঠি লেখেন। চিঠিখানি এই :

ভাইসরয়-ভবন
সিমলা,
৯ই মে, ১৯৪৬

"প্রিয় মিঃ গান্ধী,

ডঃ জীবরাজ আমার চমৎকার চিকিৎসা করছেন। কাল রাত্রে তাঁর চিকিৎসার পরে যখন শুয়ে পড়েছি, তখনই সুধীর আপনার চিঠি নিয়ে এল। তার মারফতে আমার মৌখিক উত্তর আমি পাঠিয়েছি।

সে আপনাকে যা বলেছে, তা-ই যে আমার বক্তব্য, শুধু এই কথাটি জানাবার জন্যই এই চিঠি লিখছি।

আপনার প্রথম কথা সম্পর্কে আমার যা মনে হয়, তা এই : নূতন সংবিধানের ভিত্তি কী হবে, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের প্রতিনিধিরা যদি সে-বিষয়ে একমত হন, তাহলে গণ-পরিষদেও যাতে সেই ভিত্তিটাই গৃহীত হয়, তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে—সৎ মানুষ হিসেবেই—তাঁরা বাধ্য থাকবেন। তা যদি তাঁরা না করেন, তাহলে সেটা কথার খেলাপ হয়ে দাঁড়ায়।

আপনার দ্বিতীয় কথা কেন্দ্রে সমতাবিধান সম্পর্কে। এ সম্পর্কে আপনার অসুবিধার কথাটা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু এ যে "পাকিস্তানের চাইতেও খারাপ ব্যবস্থা"—এমন কথা মেনে নিতে পারছি না। যে অসুবিধা দেখা দিয়েছে, লীগের সংগে সম্মতিক্রমে এক ধরনের আন্তর্জাতিক সালিশের ব্যবস্থা করে তা যদি উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয়, তো তার পথে প্রতিবন্ধক তো কিছু নেই।

নূতন করে যে উপদেশ আপনার কাছে পাওয়া গেল, তাতে উপকার হবে; তার জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ। বৈঠক তো আবার বসছে; বৈঠকের শেষে আজ সন্ধ্যায় আবার আপনার সংগে দেখা করবার জন্য উৎসুক রইলাম।

অতিশয় আন্তরিকভাবে আপনার
আর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স"

প্রদেশ-গোষ্ঠীর জন্য পৃথক সরকার কিংবা আইন-সভা সৃষ্টির যে প্রস্তাব, কংগ্রেস-প্রতিনিধিরা তার ঘোর বিরোধী ছিল। তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন যে, এর ফলে প্রশাসন ও আইন-প্রণয়ন সংস্থার তিনটি পৃথক স্তর সৃষ্টি হবে, এবং পৃথক সেই স্তরগুলির মধ্যে ক্রমাগত সংঘর্ষ ঘটবে। তা ছাড়া তাঁদের সুদৃঢ় অভিমত ছিল এই যে, ভারত-বিভাগের কোনও প্রস্তাব নিয়ে এই সম্মেলনে আলোচনা চলতে পারে না। প্রস্তাব যদি তুলতেই হয় তো গণ-পরিষদে তুলতে হবে। মিঃ জিন্নাও জানালেন যে, মিশন যে-সব প্রস্তাব পেশ করেছেন, মুসলিম লীগের পক্ষে তা অনেকাংশেই আপত্তিজনক, এবং এ নিয়ে আলোচনা করে কোনও লাভ হবে না। হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলির জনসংখ্যা উনিশ কোটি এবং মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলির জনসংখ্যা ন কোটি; সংখ্যার এই পার্থক্য সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার ও আইন-সভার সংগঠনে হিন্দুপ্রধান প্রদেশ ও মুসলিমপ্রধান প্রদেশের মধ্যে সমতাবিধানের যে প্রস্তাব করা হয়েছিল, সে সম্পর্কেও কংগ্রেসের আপত্তি ছিল খুবই তীব্র। এই প্যারিটির প্রশ্নে সালিশির ব্যবস্থা মেনে নিতেও মিঃ জিন্না প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং, মিশনের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও সিমলা-সম্মেলন ব্যর্থ হল, এবং ১৩ই মে তারিখে বিষণ্ণ চিত্তে আমরা নয়াদিল্লিতে ফিরে এলাম।

দিল্লিতে ফিরে এসে আমাদের মধ্যে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। সার্‌ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের স্বাস্থ্য তো এমনিতেই ভেঙে পড়েছিল। তাঁকে নিয়ে খুবই উদ্বেগ দেখা দেয়। ভারত-সচিব তাই তাঁর যত্ন নেবার জন্য লনডন থেকে লেডি ক্রিপ্‌সকে দিল্লিতে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করেন। অসুখ করেছিল আমারও। আমার কণ্ঠনালীতে অদ্ভুত একটা স্ফীতি দেখা দিয়েছিল। তার চিকিৎসার জন্য আমাকে করোলবাগে ডঃ যোশীর নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হল। ডঃ যোশী একজন বিখ্যাত সার্জন; কিন্তু তাঁর নার্সিং হোমটির পরিবেশ দেখলুম বিশেষ

সুবিধে নয়। অপরিষ্কার, অগোছালো। সেই অস্বাভাবিক জায়গায় রীতিমত অস্বস্তিতে যখন আমার সময় কাটছে তখন একদিন সেখানকার কর্মীদের মধ্যে বেশ কিছুটা উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করলুম। কর্মীরা সবাই বলাবলি করছিলেন যে, মহাত্মা গান্ধী তাঁদের নারসিং হোমটি পরিদর্শন করতে আসছেন, সুতরাং সবকিছু বেশ ফিটফাট করে রাখা দরকার। তার খানিক বাদেই মহাত্মাজী এসে উপস্থিত হলেন। ডঃ যোশী ভেবেছিলেন, গোটা নারসিং হোমটাই মহাত্মাজী দেখতে চান। সে-ক্ষেত্রে যখন দেখা গেল যে, তা নয়, বিশেষ একজন রোগীকেই মাত্র তিনি দেখতে এসেছেন, ডঃ যোশী তখন মুষড়ে পড়লেন। যাই হোক্, গান্ধীজীর কাজের চাপ তখন খুবই প্রবল, তবু তখুনি তিনি বিদায় নিলেন না। আমার পাশে বসে এটা-ওটা নানান কথা বলতে লাগলেন। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে, অসুখ হচ্ছে পাপের ফল। আমাকে বললেন, "কী পাপ করেছ বলো তো? নিশ্চয়ই কিছু পাপ করেছ।"

বললুম, "তা করেছি! ইংরেজদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলেছি! এ নিশ্চয়ই তারই ভোগ!"

আমার কথা শুনে গান্ধীজী হেসে উঠলেন। বললুম, "বাপুজী, অন্তত একটা কাজ যে আমি করতে পারি, তা আপনাকে স্বীকার করতে হবে। আমি আপনাকে হাসাতে পারি।"

১৬ই মে তারিখে, রোগশয্যায় শুয়ে, ভারত-সচিবের বেতার ভাষণ শুনলুম। ভাষণটি বিখ্যাত। ব্রিটেনের হাত থেকে ভারতবর্ষের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার জন্য ক্যাবিনেট মিশন কী পরিকল্পনা করেছেন, এই ভাষণে তা বিবৃত করা হল। জ্বরের ঘোরে আমি আচ্ছন্ন হয়ে ছিলুম। সব কথা ঠিক বুঝতে পারলুম না। তবে ভাষণের যে অংশে পাকিস্তান দাবিকে স্পষ্টভাবে অগ্রাহ্য করা হল, সেই অংশ শুনে আমার বেশ আনন্দ হল।

ক্যাবিনেট মিশন নিম্নোক্ত ভাষায় পাকিস্তান-দাবি অগ্রাহ্য করলেন :

"(১) গত ১৫ই মার্চ তারিখে, ক্যাবিনেট মিশন ভারত অভিমুখে যাত্রা করবার প্রাক্কালে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ অ্যাটলি বলেছিলেন :

'ভারতবর্ষ যাতে যথাসম্ভব দ্রুত ও যথাসম্ভব সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা অর্জন করে, তার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাকে সাহায্য করবেন, এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমার সহকর্মীরা সেখানে যাচ্ছেন। বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার স্থলে কোন্ ধাঁচের সরকার গড়ে তোলা হবে, সে সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষই নেবে; সেই সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে যে ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার, আমরা শুধু অবিলম্বে সেটিকে গড়ে তুলবার ব্যাপারে ভারতবর্ষকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক।...আমি আশা করি, ভারতবর্ষ ও তার জনসাধারণ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যেই থাকতে চাইবেন। থাকা যে তাঁদের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক হবে, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত।...তবে ভারতবর্ষ নিজে স্বাধীন-ভাবে সেই সিদ্ধান্ত নেবে।' ব্রিটিশ কমনওয়েল্থ ও এমপায়ারের যে বন্ধন, সেটা বাইরে থেকে চাপা দিয়ে শিকল দিয়ে বাঁধার ব্যাপার নয়। এটা হচ্ছে মুক্ত কয়েকটি জাতির মুক্ত মিলন-ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ যদি স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে সেই অধিকারও তার আছে বলেই আমরা মনে করি। পালাবদলের ব্যাপারটা যাতে যথাসম্ভব মসৃণ ও সহজ হয়, আমরা শুধু সেই ব্যাপারে সাহায্য করব।

(২) ভারতবর্ষ অখণ্ড থাকবে, না খণ্ডিত হবে, এইটেই হচ্ছে মূল প্রশ্ন। এই মূল প্রশ্নে যাতে ভারতবর্ষের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের মতৈক্য ঘটে, তার

জন্য—প্রধানমন্ত্রী মিঃ অ্যাটলি আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে যা বলেছেন, সেই অনুযায়ী—আমরা, অর্থাৎ ক্যাবিনেট-মন্ত্রিবৃন্দ ও ভাইসরয়, প্রধান সেই দুটি ভারতীয় দলকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছি। দীর্ঘদিন ধরে দিল্লিতে আলোচনা চলবার পর কংগ্রেস ও লীগকে আমরা সিমলা-সম্মেলনে মেলাতে পেরেছিলাম। সেখানে তাঁরা পরস্পরের মতামত পুরোপুরিভাবে জানতে পারেন, এবং একটা মীমাংসায় যাতে পৌঁছনো যায়, দুই পক্ষই তার জন্য আপনাপন দাবি অনেকটা ছাড়তেও রাজী ছিলেন। কিন্তু তারপরেও যে ব্যবধান রইল, শেষপর্যন্ত তা আর ঘুচিয়ে দেওয়া গেল না; ফলে কোনও মীমাংসাও সম্ভব হয়নি। মীমাংসা সম্ভব হয়নি বলেই আমাদের মনে হচ্ছে যে, এই অবস্থায় দ্রুত একটি নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের বিবেচনায় যা শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা, তা আমাদের পেশ করা কর্তব্য। যুক্তরাজ্য সরকারের সম্পূর্ণ অনুমোদন নিয়েই আমরা এই বিবৃতি দিচ্ছি।

(৩) আমরা স্থির করেছি যে, ভারতবাসীরা যাতে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ-সংবিধান নির্ধারণ করতে পারেন, অবিলম্বে তার ব্যবস্থা করা উচিত; এবং নূতন সংবিধান যতদিন না নির্ধারিত হচ্ছে ততদিনের জন্য ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য অবিলম্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। জনসাধারণের বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর, এই দুই অংশের প্রতিই আমরা সুবিচার করতে প্রয়াস পেয়েছি; এবং এমন সমাধান সুপারিশ করতে চেষ্টা করেছি, যার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ভারতের শাসনকর্মের একটা কার্যকর ব্যবস্থা হয়, প্রতিরক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়, এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রগতির সুষ্ঠু সুযোগ পাওয়া যায়।

(৪) মিশনের কাছে যে বিপুলপরিমাণ সাক্ষ্যপ্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে, তার পর্যালোচনা এই বিবৃতির উদ্দেশ্য নয়; তবে এ-কথা জানানো আমাদের কর্তব্য যে, একমাত্র মুসলিম লীগের সমর্থকরা বাদে বাকী আর প্রায় সকলের সাক্ষ্যেই ভারতবর্ষকে অখণ্ড রাখবার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে।

(৫) কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা ভারত-বিভাগের সম্ভাব্যতার প্রশ্নটিকে মনোযোগ-সহকারে ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখতে বিরত হইনি। তার কারণ, মুসলিমদের মনে সত্যিই এমন একটা তীব্র আশঙ্কা রয়েছে যে, চিরকালের জন্য তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের শাসনাধীন হতে পারে।

(৬) মুসলিমদের মধ্যে এই আশঙ্কা এখন এতই প্রবল ও ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, নিতান্ত খাতায়-পত্রে কিছু প্রতিবিধান-ব্যবস্থা রেখে একে দূরীভূত করা যাবে না। ভারতবর্ষে যদি আভ্যন্তর শান্তি বজায় রাখতে হয়, তাহলে এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে মুসলিমরা তাদের সংস্কৃতি, ধর্ম এবং অর্থনৈতিক অথবা অন্যান্য স্বার্থের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত ব্যাপারে আত্মকর্তৃত্বের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি পায়।

(৭) সুতরাং মুসলিম লীগ যে স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র দাবি করেছে, প্রথমেই সেই পাকিস্তানের প্রশ্নটিকে আমরা বিচার করে দেখি। এই পাকিস্তান-রাষ্ট্রের অংশ হবে দুটি। উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও ব্রিটিশ বেলুচিস্তান নিয়ে একটি অংশ, এবং উত্তর-পূর্বে বাংলা ও আসামকে নিয়ে একটি অংশ। সীমান্ত-নির্ধারণের প্রশ্নটিকে পরে বিবেচনা করে দেখতে লীগ সম্মত; তাদের দাবি এই যে, নীতিগতভাবে পাকিস্তানকে প্রথমে মেনে নিতে হবে।

স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার জন্য যে যুক্তি দেখানো হয়েছে, তা প্রথমত এই যে, মুসলিমরা যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে আপন ইচ্ছা অনুযায়ী সরকার গঠনের অধিকার তাদের থাকা উচিত; দ্বিতীয়ত, বলা হয়েছে যে, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পাকিস্তান যাতে আত্মনির্ভর হতে পারে, তার জন্য মুসলিমরা যেখানে সংখ্যালঘু এমন বেশ-কিছু অঞ্চলও এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

উল্লিখিত ছটি প্রদেশের সবখানি নিয়ে যদি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সেই রাষ্ট্রে অমুসলমান সংখ্যালঘুদের জনভারও যে কী বিপুল হবে, নীচের এই তালিকা থেকেই তা বুঝতে পারা যায় :

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল	মুসলমান	অমুসলমান
পাঞ্জাব	১,৬২,১৭,২৪২	১,২২,০১,৫৭৭
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ...	২৭,৮৮,৭৯৭	২,৪৯,২৭০
সিন্ধু	৩২,০৮,৩২৫	১৩,২৬,৬৮৩
ব্রিটিশ বেলুচিস্তান ...	৪,৩৮,৯৩০	৬২,৭০১
	২,২৬,৫৩,২৯৪	১,৩৮,৪০,২৩১
	৬২·০৭%	৩৭·৯৩%

উত্তর-পূর্ব অঞ্চল	মুসলমান	অমুসলমান
বাংলা	৩,৩০,০৫,৪৩৪	২,৭৩,০১,০৯১
আসাম	৩৪,৪২,৪৭৯	৬৭,৬২,২৫৪
	৩,৬৪,৪৭,৯১৩	৩,৪০,৬৩,৩৪৫
	৫১·৬৯%	৪৮·৩১%

ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অঞ্চলের মোট লোকসংখ্যা আঠারো কোটি আশি লক্ষ; তার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা মাত্র দু কোটির মত।

এই সংখ্যাগুলির থেকেই বোঝা যায় যে, মুসলিম লীগের প্রস্তাবিত পথে যদি পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়ও, সাম্প্রদায়িক সংখ্যালঘু-সমস্যার তাতে সমাধান হবে না। তা ছাড়া পাঞ্জাব, বাংলা ও আসামের যে-সব জেলা অমুসলমান-প্রধান, সেগুলিকে সার্বভৌম রাষ্ট্র পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করবারও কোনও যুক্তি আমরা দেখছি না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সম্পর্কে যে যুক্তি দেখানো চলে, আমাদের ধারণা, সেই একই যুক্তিতে বলা যায় যে, অমুসলিম অঞ্চলগুলিকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা অনুচিত। বিশেষ করে শিখদের স্বার্থ এই ব্যাপারটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

(৮) সুতরাং, মীমাংসার সম্ভাব্য ভিত্তি হিসাবে, আমরা বিবেচনা করে দেখলাম, শুধুমাত্র মুসলিমপ্রধান অঞ্চলগুলিকে নিয়ে আরও ছোট আকারে পাকিস্তান সৃষ্টি করা যায় কিনা। এ-ব্যাপারে মুসলিম লীগের বক্তব্য এই যে, তেমন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা নিরর্থক, কেননা পাকিস্তান থেকে সেক্ষেত্রে (ক) পাঞ্জাবে পুরো

আম্বালা ও জলন্ধর বিভাগ, (খ) একমাত্র শ্রীহট্ট জেলা ছাড়া সমগ্র আসাম ও (গ) পশ্চিম বাংলার এক বিরাট অংশ বাদ পড়বে। কলকাতাও সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের মধ্যে থাকবে না; শতকরা মাত্র ২৩·৬ জন নাগরিক সেখানে মুসলমান। আমরা নিজেরাও বুঝতে পারছি যে, পাঞ্জাব ও বাংলাকে খণ্ডিত করে সমস্যার সমাধান করতে গেলে সেটা এই দুই প্রদেশের অধিবাসীদের এক বিরাট অংশেরই মনঃপূত হবে না; তাদের স্বার্থ তাতে ক্ষুণ্ণ হবে। বাংলা ও পাঞ্জাবের নিজস্ব ভাষা রয়েছে; তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যও সুপ্রাচীন। তা ছাড়া পাঞ্জাবকে খণ্ডিত করতে গেলে শিখসমাজকেই দ্বিখণ্ড করা হবে; সীমানার দুই দিকেই শিখ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হবে বিপুল। অগত্যা আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হয়েছি যে, বৃহৎ কিংবা ক্ষুদ্র—কোনও আকারের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার এমন সমাধান করা যাবে না, যা গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হতে পারে।

(৯) পূর্বোক্ত যুক্তিগুলি যথেষ্ট জোরালো। তদুপরি প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকেও কয়েকটি কথা চিন্তা করা দরকার। অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রয়োজনের ভিত্তিতেই পরিবহণ, ডাক ও তার-ব্যবস্থাকে এখানে গড়ে তোলা হয়েছিল। সেই ব্যবস্থাকে ভেঙে দিলে তাতে ভারতবর্ষের দুই অংশেরই দারুণ ক্ষতি হবে। প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে অখণ্ড রাখবার প্রয়োজন তো আরও বেশী। অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষার জন্য তার সশস্ত্র বাহিনীকেও এক অখণ্ড সংস্থা হিসেবেই গড়ে তোলা হয়েছে। তাকে যদি আজ ভেঙে দু-টুকরো করা হয়, তবে ভারতীয় স্থল-বাহিনীর সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ও উচ্চমান দক্ষতার উপরেই সে এক মারাত্মক আঘাত হয়ে দাঁড়াবে, এবং তার পরিণাম খুবই বিপজ্জনক হবে। ভারতীয় নৌ ও বিমান-বাহিনীর কার্যকরতাও তার ফলে হ্রাস পাবে। প্রস্তাবিত পাকিস্তান-রাষ্ট্রের ভারতস্থ দুই সীমানা হবে অতিশয় সহজভেদ্য; রাষ্ট্রের আয়তন সুপ্রসর না হওয়ায় পাকিস্তানের আক্রমণ-প্রতিরোধ-ব্যবস্থাও সবল হবে না।

(১০) আর-একটি বিষয়ও গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা দরকার। সেটা এই যে, ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ড করা হলে দেশীয় রাজ্যগুলি তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আরও অসুবিধাগ্রস্ত হবে।

(১১) সর্বোপরি রয়েছে ভৌগোলিক অসুবিধা। প্রস্তাবিত পাকিস্তান-রাষ্ট্রের দুই অংশের মধ্যে প্রায় সাত শো মাইলের ব্যবধান। যুদ্ধ আর শান্তি, উভয় অবস্থাতেই এই দুই অংশের যোগাযোগ নির্ভর করবে হিন্দুস্তানের শুভেচ্ছার উপরে।

(১২) ব্রিটিশ সরকারকে সুতরাং এমন পরামর্শ আমরা দিতে পারি না যে, ব্রিটেনের হাতে বর্তমানে যে ক্ষমতা রয়েছে, তাকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক দুই সার্বভৌম রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়া হোক।"

যাই হোক, মুসলিমরা তো এ-দেশে নিতান্ত একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়, তারাই এখানে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। ক্ষমতার ন্যায্য অংশ তারা যাতে পায়, তার জন্য ক্যাবিনেট মিশন নিম্নোক্ত ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র নির্ধারণের সুপারিশ করলেন :

(১) ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষ ও দেশীয় রাজ্যসমূহ—এই উভয় অংশ নিয়ে গঠিত হবে ভারতীয় ইউনিয়ন। ইউনিয়ন-সরকারের হাতে থাকবে পররাষ্ট্র-নীতি, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য যে অর্থ দরকার হবে, তা সংগ্রহের অধিকারও ইউনিয়ন-সরকারের থাকবে।

(২) ইউনিয়নের একটি শাসন-পরিষদ ও একটি আইন-সভা থাকবে। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ ও দেশীয় রাজ্য, এই দুই অংশের প্রতিনিধিই তাতে থাকবেন। আইনসভায় যদি এমন কোনও বিষয় উত্থাপিত হয়, বৃহৎ কোনও সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন যার সঙ্গে জড়িত, তাহলে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের ভোটাধিক্যে এবং প্রধান দুই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবৃন্দের পৃথক ভোটাধিক্যে সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তা ছাড়া মোট সদস্যবৃন্দের অধিকাংশের উপস্থিত থাকা চাই এবং ভোট দেওয়া চাই।

(৩) ইউনিয়নের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের দায়িত্বভার ও অন্যান্য যাবতীয় ক্ষমতা প্রদেশগুলির উপরে বর্তাবে।

(৪) ইউনিয়নের হাতে যে-সব বিষয় ও ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হবে, তা বাদে অন্যান্য বিষয় ও ক্ষমতা দেশীয় রাজ্যগুলির হাতেই থাকবে।

(৫) প্রদেশগুলি তাদের শাসন-পরিষদ ও আইনসভাসহ বিভিন্ন গোষ্ঠীতে যোগ দিতে পারবে, এবং প্রতিটি গোষ্ঠীই ঠিক করে নিতে পারবে যে, তার অন্তর্ভূক্ত প্রদেশগুলির কোন্ কোন্ বিষয়ের দায়িত্ব গোষ্ঠীগতভাবে পালিত হবে।

(৬) ইউনিয়নের ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর শাসনতন্ত্রে এইমর্মে একটি ব্যবস্থা রাখা চাই যে, যে-কোনও প্রদেশ তার আইনসভায় ভোটাধিক্যের ভিত্তিতে, প্রথম দশ বৎসর উত্তীর্ণ হবার পর এবং তারপর প্রতি দশ বৎসর অন্তর, সংবিধানের শর্তাবলী পুনর্বিবেচনার দাবি করতে পারবে।

মিশন একইসঙ্গে ঘোষণা করলেন যে, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের সমর্থনক্রমে ভারতবর্ষে যাতে একটি কার্যকর শাসন-ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়, তার জন্য —ভবিষ্যৎ-ভারতের শাসনতন্ত্র যখন নির্ধারিত হতে থাকবে—ভাইসরয় অবিলম্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কাজে হাতে দেবেন। ভারতবর্ষকে দুই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত না করেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতারা ব্রিটেনের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণের নৈতিক শক্তি রাখেন কিনা, মিশনের এই ঘোষণা যেন তারই পরীক্ষা হয়ে দাঁড়াল। বস্তুত ভারতীয় নেতাদের প্রতি এ একটি চ্যালেন্জ্।

মিশনের প্রস্তাব নিয়ে গান্ধীজী ও ভারত-সচিবের মধ্যে প্রথম দিকটায় বেশ বন্ধুভাবে সহৃদয় আলোচনাই চলছিল। কিন্তু দিনে-দিনে এই বেদনাদায়ক সত্যটা পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল যে, পরস্পরের প্রতি যত গভীর শ্রদ্ধাই তাঁরা পোষণ করুন, তাঁদের মধ্যে সেতুবন্ধ সম্ভব নয়। 'হরিজন' পত্রিকায় মিশনের প্রস্তাবকে এইভাবে বিশ্লেষণ করলেন গান্ধীজী :

"ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ক্যাবিনেট মিশন ও ভাইসরয় যে স্টেটপেপার প্রকাশ করেছেন, চার দিন ধরে তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে আমার এই বিশ্বাস হয়েছে যে, বর্তমান অবস্থায় এর চাইতে ভাল কোনও দলিল প্রস্তুত করা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দেখবার মতন ইচ্ছা যদি থাকে, তো বুঝতে পারা যাবে যে, আমাদের দুর্বলতাই এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। কংগ্রেস ও লীগ একমত হয়নি, হতে পারেনি। আমরা যদি বোকার মত নিজেদের বোঝাই যে, ব্রিটেনই যাবতীয় বিরোধের স্রষ্টা, তাহলে সেটা একটা মারাত্মক ভুল হবে। বিরোধগুলিকে কাজে লাগাবার মতলব নিয়ে মিশন ইংল্যান্ড থেকে এত দূরে আসেননি। ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাবার সহজতম ও সংক্ষিপ্ততম পন্থা উদ্ভাবনের জন্যেই তাঁরা এসেছেন। বিপরীতটা যতক্ষণ না প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের এই ঘোষণাকে বিশ্বাস

করবার মত সাহস আমাদের থাকা চাই। বঞ্চকের বঞ্চনাতেই সাহস আরও স্ফূর্তি পায়।

আমার প্রশংসার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, ব্রিটিশ দৃষ্টিকোণের বিচারে যা সর্বোত্তম, ভারতীয় দৃষ্টিকোণের বিচারেও তা সর্বোত্তম বলে গণ্য হবে। ভারতীয় দৃষ্টিকোণের বিচারে তা হয়ত আদৌ ভাল না-হতে পারে। ব্রিটিশ বিচারে যা সর্বোত্তম, বস্তুত তা ক্ষতিকারকও হতে পারে। পরবর্তী বক্তব্য থেকেই আমার এই কথার অর্থ আশা করি পরিস্ফুট হবে।

এই দলিলের যাঁরা রচয়িতা, নিজেদের উদ্দেশ্যকে তাঁরা পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সনদ রচনার কাজে বিভিন্ন দলকে মেলাবার জন্যে অন্তত যেটুকু দরকার বলে তাঁদের মনে হয়েছিল, আলাপ-আলোচনার থেকে সেই ন্যূনতম সার তাঁরা সংগ্রহ করে নিয়েছেন। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সম্ভব হলে তাঁরা এমন এক অখন্ড ভারতবর্ষকেই পিছনে রেখে যাবেন, প্রায় গৃহযুদ্ধের তুল্য আভ্যন্তর কলহ-বিবাদে যা বিভক্ত নয়। সেটা সম্ভব হোক আর না-ই হোক, বিদায় তাঁরা নেবেনই। সিমলায় তাঁরা দুটি দলকে সম্মেলনের টেবিলে এনে বসাতে পেরেছিলেন ঠিকই (তার জন্য কতখানি ধৈর্য আর দক্ষতার দরকার হয়েছিল, তা একমাত্র তাঁরাই বলতে পারবেন), কিন্তু দুই পক্ষ তবু মীমাংসায় উপনীত হতে পারলেন না। তাতেও হতাশ না হয়ে তাঁরা ভারতবর্ষের সমতল-ভূমিতে নেমে এলেন, এবং গণ-পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে একটি উত্তম দলিল রচনা করলেন। ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণ অথবা প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে গণ-পরিষদ ভারতের স্বাধীনতার সনদ তৈরী করবেন। এই দলিল একটি আবেদন, একটি উপদেশ। এর মধ্যে কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। আর তাই প্রাদেশিক আইনসভাগুলি প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে, না-ও পারে। প্রতিনিধি হিসাবে যাঁরা নির্বাচিত হবেন, তাঁরা গণ-পরিষদে যোগ দিতে পারেন, আবার না-ও পারেন। আইনসভার সদস্যরা মিলিত হয়ে এমন একটা কার্যক্রম নির্ধারণ করতে পারেন, বিবৃতিতে বর্ণিত কার্যক্রম থেকে যা পৃথক। ব্যক্তি অথবা দল সম্পর্কে যেটুকু-বা বাধ্যতার ব্যাপার আছে, অবস্থার তাগিদ অনুযায়ীই তার ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে। প্রধান দুটি দলের ক্ষেত্রে পৃথক ভোট-ব্যবস্থা নিতান্ত এই কারণে বাধ্যতামূলক যে, আইন-সভার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই তার দরকার হয়েছে, অন্য কোনও কারণে নয়। এই নিবন্ধ লিখতে বসে বিবৃতিটি আমি হাতে তুলে নিয়েছি, অনুচ্ছেদ ধরে-ধরে পুনর্বার এটি পড়েছি, এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এর মধ্যে এমন কিছু নেই, আইনত যা বাধ্যতামূলক। সম্মানবোধ আর প্রয়োজন, বন্ধন মাত্র এই দুটি বস্তুর।

এই দলিলের সেই অংশটি বাধ্যতামূলক, ব্রিটিশ সরকারকে যাতে অঙ্গীকারবদ্ধ করা হয়েছে। এর থেকে আমি অনুমান করছি যে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে, ব্রিটিশ মিশনের সদস্যচতুষ্টয় এ-ব্যাপারে পূর্বাহ্নেই ব্রিটিশ সরকার ও পারলামেন্টের দুটি হাউসের পূর্ণ অনুমোদন লাভ করেছিলেন। মিশনের এই ঘোষণা বস্তুত ক্ষমতা-হস্তান্তরের পথে প্রথম পদক্ষেপ; এর জন্য আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন তাঁদের প্রাপ্য। তবে হস্তান্তর সম্পূর্ণ করবার জন্য যেহেতু আরও কয়েক পা এগোতে হবে, তাই এই প্রথম পদক্ষেপকে আমি 'প্রমিসরি নোট' আখ্যা দিয়েছি।

ভারত এই ঘোষণায় যে সাড়া দেবে, তা হবে স্বেচ্ছামূলক। তবে ঘোষণাকারীরা

স্বভাবতই ধরে নিয়েছেন যে, ভারতীয় দলগুলি সুসংগঠিত ও দায়িত্বশীল; যে-কাজ স্বেচ্ছামূলক, তাও তাঁরা বাধ্যতামূলক কাজের মতই, কিংবা তার চাইতেও বেশী গুরুত্ব দিয়ে সম্পাদন করতে পারেন। লর্ড পেথিক-লরেন্স সংবাদপত্রের জনৈক সংবাদদাতাকে বলেছিলেন "এই ভিত্তিতে যদি তাঁদের মতৈক্য হয়, তবে তার অর্থ হবে এই যে, ভিত্তিটাকে তাঁরা মান্য করবেন; অবশ্য প্রতিটি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যদি এই ভিত্তির পরিবর্তন সাধন করতে চান, তবে তাও তাঁরা করতে পারবেন।" এই অর্থে তিনি ঠিক কথাই বলেছেন যে, ঘোষণার বিষয়বস্তু সম্যকভাবে জেনে যাঁরা প্রতিনিধি-পদ গ্রহণ করবেন, ভিত্তিটাকে তাঁরা মান্য করে চলবেন বলেই ঘোষণাকারীরা আশা করেন—যদি না অবশ্য প্রধান দলগুলিই সেই ভিত্তির পরিবর্তনসাধন করে। দুই কিংবা ততোধিক বিরোধী দল যখন একত্র মিলিত হয়, তখন একটা বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই তা তারা করে থাকে। স্বয়ং-নিযুক্ত একজন মধ্যস্থ (দলগুলি যেহেতু কোনও মধ্যস্থ নিয়োগ করেনি, অতএব ঘোষণাকারীরাই এক্ষেত্রে মধ্যস্থের আসন নিয়েছেন) মনে করছেন যে, ন্যূনতম কিছু শর্ত দিয়ে তিনি যদি সেই দলগুলির সামনে একটা প্রস্তাব পেশ করেন, তাহলে তাদের পক্ষে একটা মীমাংসায় আসা সম্ভব হবে। মিলিত বোঝাপড়ার মধ্যমে তারা এর সঙ্গে আরও কিছু শর্ত যোগ করতে পারে, কিংবা এর থেকে কিছু শর্ত বাদ দিতে পারে, কিংবা এর সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটাতে পারে। সেই স্বাধীনতা তিনি তাদের দিয়েছেন।

ব্যবস্থা এই পর্যন্ত নিখুঁত। কিন্তু ইউনিটগুলির কী হবে? ভারতবর্ষে পাঞ্জাবই হচ্ছে শিখদের একমাত্র নিজভূমি। নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কি শিখরা সেই অংশের অন্তর্ভুক্ত বলে নিজেদের গণ্য করবে, সিন্ধু বেলুচিস্তান আর সীমান্তপ্রদেশকেও যার মধ্যে ঢোকানো হচ্ছে? অথবা ঘোষণায় যাকে 'খ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই পাঞ্জাবের সঙ্গেই কি সীমান্তপ্রদেশকে তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও যুক্ত করা হবে? অথবা আসামকে যুক্ত করা হবে 'গ'-এর সঙ্গে? ঘোষণায় অবশ্য বলা হয়েছে যে, ইউনিট-গুলির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকা চাই। যাদের নিয়ে গঠিত হবে বিভিন্ন অংশ, সেই সদস্য ইউনিটগুলি ইচ্ছা হলে এতে যোগ দিতে পারে। ইচ্ছা হলে তারা এর থেকে বেরিয়েও যেতে পারে। সেই স্বাধীনতা যে তাদের থাকবে, এটা একটা বাড়তি রক্ষাকবচ। ১৫ (৫) নং অনুচ্ছেদে যে স্বাধীনতার ব্যবস্থা রয়েছে, এটাকে তার বিকল্প বলে গণ্য করা চলে না। সেখানে বলা হয়েছে :

'প্রদেশগুলি শাসন-পরিষদ ও আইনসভাসহ প্রদেশ-গোষ্ঠী গড়তে পারবে, এবং প্রাদেশিক কোন্ কোন্ বিষয়ের দায়িত্বভার সম্মিলিতভাবে নেওয়া চলবে, প্রতিটি প্রদেশ-গোষ্ঠীই তা নির্ধারণ করতে পারবে।'

ঘোষণার ১৯ নং ধারায় যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে (আদেশ দেওয়া হয়নি), এই স্বাধীনতা তার দ্বারা প্রত্যাহৃত হয়নি। এতে বলা হয়েছে যে, গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই পরিষদের চেয়ারম্যান বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিবৃন্দকে প্রশ্ন করবেন, গোষ্ঠী-গঠনের নীতি তাঁরা গ্রহণ করবেন কিনা, এবং, যদি গ্রহণ করেন, তাহলে আপনাপন প্রদেশ সম্পর্কে যে কর্তব্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা তাঁরা পালন করতে রাজী আছেন কিনা। প্রতিটি প্রদেশের এই সহজাত স্বাধীনতা, এবং ১৫ (৫) অনুচ্ছেদে যে স্বাধীনতা প্রদেশগুলিকে দেওয়া হয়েছে, তা অক্ষুণ্ণ থাকবে। দুই অনুচ্ছেদের মধ্যে দৃশ্যত যে বিরোধ রয়েছে, এবং বাধ্যবাধকতার যে অভিযোগ উঠেছে—এবং যে বাধ্যবাধকতা থাকলে এই ঘোষণার মহৎ প্রকৃতি নিমেষে পালটে

যাবে—এ ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে তা এড়ানো সম্ভব বলে মনে হয় না। গোষ্ঠী-গঠনের প্রস্তাবে এবং কর্তব্য যেভাবে নির্ধারিত হয়েছে তাতে যাঁরা বিচলিত বোধ করছেন, তাঁদের আমি জানাতে পারি যে, আমার ব্যাখ্যা যদি নির্ভুল হয়, তাহলে বিচলিত হবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই।

এই ঘোষণাটি বস্তুত একটি আবেদন। যথাসম্ভব দ্রুত কীভাবে স্বাধীনতা লাভ করা যেতে পারে, সে-বিষয়ে জাতির প্রতি এটি একটি পরামর্শও বটে। এই কথাটা ভুলে গিয়ে এই ঘোষণা যাঁরা পাঠ করবেন, অনবধানী সেই পাঠকরা এই ঘোষণার অন্তর্ভূত অন্যান্য কয়েকটি বিষয়েও বিভ্রান্ত বোধ করবেন। যথাসম্ভব দ্রুত ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানের এই যে আগ্রহ, এর কারণ খুবই স্পষ্ট। বর্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য থেকে যে নববিশ্বের অভ্যুদয় হবে, পরাধীন ভারত তাতে আর ব্রিটিশ রাজমুকুটের 'উজ্জ্বলতম রত্ন' বলে গণ্য হবে না। রাজমুকুটের সেইটিই হবে সবচাইতে বড় কলঙ্ক। ব্যাপারটা এতই কলঙ্কজনক হবে যে, মুকুটটি তখন নেহাতই আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপের যোগ্য হয়ে দাঁড়াবে। পাঠকদের কাছে আমার অনুরোধ, আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁরা আশা ও প্রার্থনা করুন যে, ব্রিটিশ রাজমুকুট যেন ব্রিটেন আর পৃথিবীর আর একটু মহত্তর প্রয়োজনে লাগে। রাজমুকুটের 'উজ্জ্বলতম রত্ন'টিকে তো অন্যায়ভাবে হাতানো হয়েছে। প্রমিসরি নোট্-এ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি যখন পুরোপুরি পালন করা হবে, ব্রিটিশ রাজমুকুটে তখন সেইটিই হবে এক অতুলনীয় রত্ন। কর্তব্য পালন করলে যে অধিকার জন্মায়, সেই অধিকারবলেই রত্নটি তাঁরা অর্জন করতে পারবেন।"

পক্ষান্তরে, গণ-পরিষদের ভিত্তি সম্পর্কে যেটা মৌলিক প্রশ্ন, ক্যাবিনেট মিশন সে সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্যকে এক সাংবাদিক-বৈঠকে এইভাবে বিবৃত করেছিলেন :

"প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, আমরা যে কয়েকটি শর্ত আরোপ করেছি, সংবিধান-সংস্থা অথবা গণ-পরিষদকে তার পরে সার্বভৌম বলে গণ্য করা যায় কিনা। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য, ভারতীয়রা তাঁদের নিজেদের মধ্যে একটা মীমাংসা করে নিতে পারেননি বলেই আমরা এইসব শর্ত আরোপ করেছি। ভারতীয় দল দুটির পক্ষে যদি সংবিধান রচনার ব্যাপারে একমত হওয়া সম্ভব হত, তাহলে আমরা আদৌ কোনও শর্ত আরোপ করতুম না। কিন্তু এখানে এসে আমরা দেখতে পেলুম যে, অগ্রিম যদি না কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাহলে সর্বদলের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সর্বদলের গ্রহণযোগ্য একটি গণ-পরিষদ গঠন করা সম্ভব হবে না। এমন আশঙ্কা আমরা আগেই করেছিলাম। যাই হোক্, ভারতীয় দলগুলিকেই অতঃপর আমরা জিজ্ঞেস করলাম যে, নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে তাঁরাই এমন কিছু সিদ্ধান্ত করবেন কিনা, যার ফলে গণ-পরিষদের পক্ষে মিলিত হয়ে কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয়। তাঁরা যাতে এতে সম্মত হন, তার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি; এবং এই বিষয়ে তাঁদের মধ্যে যাতে মতৈক্য হয় তার জন্য আমরা অনেকখানি এগিয়েছিলাম। কিন্তু তাতেও কিছু হল না। অগত্যা, এই ভিত্তির প্রস্তাব করেছি আমরা, এবং এই সমস্ত ব্যবস্থার সুপারিশ করেছি; কেননা আমাদের মনে হয়েছিল যে, একমাত্র এই ব্যবস্থার ভিত্তিতেই আমাদের পক্ষে সমস্ত দলের প্রতিনিধিবৃন্দকে একত্র মেলানো সম্ভব হবে, এবং তাঁরা একটি সংবিধান রচনা করবেন। তৎসত্ত্বেও আমরা আপনাদের জানাচ্ছি যে, এমন কী এই ভিত্তিও পাল্টানো যেতে পারে; কিন্তু

পরিবর্তন-সাধনে ইচ্ছুক প্রতিটি দল পৃথকভাবে যদি ভোটাধিক্যে সেই সিদ্ধান্ত নেন, একমাত্র তাহলেই এটা পালটানো যাবে। এর কারণ এই যে, বিভিন্ন দলের এই প্রতিনিধিরা কখনও এই ভিত্তিতে মিলিত হতে রাজী হননি। আমাদের মনে হয়, আমাদের প্রস্তাবের ভিত্তিতে মিলিত হতে তাঁরা রাজী হবেন। যদি এই ভিত্তিতে তাঁদের মতৈক্য হয়, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে, ভিত্তিটা তাঁরা মেনে নিয়েছেন; অবশ্য তারপরেও, এর পরিবর্তন-সাধনে ইচ্ছুক প্রতিটি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মত অনুযায়ী, এই ভিত্তিকে তাঁরা পালটাতে পারবেন।"

ভারত-সচিব তাঁর এই ব্যাখ্যার একটি অনুলিপি গান্ধীজীকে পাঠিয়ে দেন। এবং এটি পাঠ করবার পরেই গান্ধীজী ভারত-সচিবকে 'প্রিয় বন্ধু' কিংবা 'প্রিয় লর্ড পেথিক-লরেন্স' বলে সম্বোধন না করে 'প্রিয় লর্ড' বলে সম্বোধন করতে শুরু করেন। এর আগে আর কখনও তিনি 'প্রিয় লর্ড' বলে তাঁকে সম্বোধন করেননি। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে আমি উদ্বিগ্ন হলাম। বুঝলাম যে, এটা বিপদের সংকেত; পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ক্রমেই তাঁরা দূরে সরে যাচ্ছেন। লর্ড পেথিক-লরেন্সকে গান্ধীজী এইসময়ে নিম্নোদ্ধৃত চিঠিখানি লেখেন :

"প্রিয় লর্ড,

যাঁরা আমার কাছে উপদেশ চান, আমি যাতে আরও ভালভাবে তাঁদের উপদেশ দিতে পারি, তারই জন্য আমার অসুবিধার কথা আপনাকে জানালাম :

এক প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন, "যদি এই ভিত্তিতে তাঁদের মতৈক্য হয়, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে, ভিত্তিটা তাঁরা মেনে নিয়েছেন; অবশ্য তারপরেও, এর পরিবর্তন-সাধনে ইচ্ছুক প্রতিটি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মত অনুযায়ী, এই ভিত্তিকে তাঁরা পালটাতে পারবেন।" এই বাক্যের শেষাংশ আপনি বাদ দিতে পারেন; আমার বিবেচনায় এটি বাহুল্য মাত্র।

এই রাষ্ট্রীয় ঘোষণাপত্রের ১৫ নং অনুচ্ছেদের ভিত্তিও একটি সুপারিশ। আপনি কি মনে করেন যে, প্রস্তাবিত গণ-পরিষদের কোনও সদস্যের ক্ষেত্রে এই সুপারিশ বাধ্যতামূলক? উদ্ধৃত অংশের ভাবটা যেন সেইরকম। এই ঘোষণাপত্রকে যাঁরা সাগ্রহে স্বাগত জানাবেন, কিন্তু ব্যাপারটাকে সূক্ষ্মভাবে বিচার করে, ধরা যাক, প্রদেশ-গোষ্ঠীর ব্যবস্থাটাকে মেনে নিতে পারবেন না, তাঁরা কি আপন সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে গোষ্ঠী-সংক্রান্ত অনুচ্ছেদের বিরুদ্ধে দেশ ও গণ-পরিষদকে তাঁদের মতামত জানাতে পারবেন? আপনার উত্তর যদি হয় 'হ্যাঁ', তাহলে কি তার থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, সীমান্তপ্রদেশ ও আসামকে অযৌক্তিকভাবে যে-অংশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাতে যোগ না দেবার স্বাধীনতা এই প্রদেশ দুটির প্রতিনিধিদের থাকবে?

এ-বিষয়ে আইনের সিদ্ধান্ত কী হবে, তা আমি জানি। গোষ্ঠী-বিন্যাস ব্যবস্থার বিরোধিতা করলে সেটা সম্মানজনক ব্যাপার বলে গণ্য হবে কিনা, আমার প্রশ্ন সেই সম্পর্কে।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম. কে. গান্ধী"

লর্ড পেথিক-লরেন্স

'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধীজীর যে 'বিশ্লেষণ' প্রকাশিত হয়, তার একটি অগ্রিম কপি তিনি সার্ স্ট্যাফোর্ডকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ভরত-সচিব সেটি পাঠ করেন, এবং মিশন সম্পর্কে সহৃদয় মন্তব্যের জন্য গান্ধীজীকে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানান। তবে বিতর্কের মূলে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট এ-কথা জানিয়ে দেন যে, এ-সব বিষয়ে গান্ধীজীর থেকে তাঁর মত একেবারে আলাদা।

গান্ধীজী অতঃপর 'প্রিয় লর্ড' সম্বোধন-সংবলিত আর একখানি পত্র পাঠান। তাতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। চিঠিখানি এখানে উদ্ধৃত হল :

বাল্মীকি মন্দির,
রীডিং রোড, নয়াদিল্লি,
২০শে মে, ১৯৪৬

"প্রিয় লর্ড,

গতকাল সকালে ও তার আগের দিন যে-সব বিষয়ে আমরা কথা বলেছি, সেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ; আমার মনোভাব ও কাজের উপরে তার প্রভাব পড়েছে, এখনও পড়ছে। এই কারণেই তার একটি সংক্ষিপ্তসার এখানে লিপিবদ্ধ করলাম। আমি যদি ভুল বুঝে থাকি তো ভুলটা আপনি শুধরে দেবেন। এর ফলে, এমন কী, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আপনারও হয়ত সাহায্য হতে পারে।

প্রসঙ্গত জানাই, আমাদের আলোচনার তাৎপর্য কী, সেটা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে আমার যথাসাধ্য আমি জানিয়েছি।

ভূমিকা করে নিলাম; এইবারে সেই সংক্ষিপ্তসারটি এখানে পেশ করছি।

(১) আপনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, প্রাদেশিক আইন-সভার ইউরোপীয় সদস্যরা যাতে গণ-পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট না দেন, কিংবা অমুসলিম প্রতিনিধিদের নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হবার আশা না করেন, তার ব্যবস্থা আপনি করবেন।

(২) দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে যে ৯৩ জন প্রতিনিধির নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা, ভূপালের নবাব সাহেব ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর হাতে তাঁদের নির্বাচনের ভার থাকবে। এ-ব্যাপারে যদি পারস্পরিক সম্মতিক্রমে কোনও মীমাংসা না হয়, তাহলে, রাষ্ট্রীয় ঘোষণাপত্রের ২০ নং অনুচ্ছেদে যে উপদেষ্টা কমিটীর কথা বলা হয়েছে, দেশীয় রাজন্যবর্গ ও তাঁদের প্রজাসাধারণের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব সেই কমিটীর উপরে ন্যস্ত হবে।

(৩) ব্রিটিশ বেলুচিস্তানে প্রাদেশিক আইন-সভাজাতীয় কোনও সংস্থা নেই। সুতরাং এই অঞ্চলটিকে গণ-পরিষদের 'বিশেষ দায়িত্ব' হিসেবে গণ্য করতে হবে, এবং এটিকে উপদেষ্টা কমিটীর এক্তিয়ারভুক্ত করতে হবে। ইতিমধ্যে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে বেলুচিস্তানকে অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে সমমর্যাদাসম্পন্ন করে তোলাই হবে অন্তর্বর্তী-কালীন জাতীয় সরকারের কর্তব্য।

(৪) আমি প্রস্তাব করেছিলাম যে, গণ-পরিষদ যতক্ষণ না সংবিধান রচনার কাজ শেষ করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত, আইনগত না-হলেও কার্যত স্বাধীন অবস্থায় প্যারামাউন্ট ক্ষমতার অবসান ঘটাতে হবে। সার্ স্ট্যাফোর্ডের মনে হল যে, এই

প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করাটা বিপজ্জনক হতে পারে। আমার ধারণা তার বিপরীত। আমার প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে নিমেষে এক বিপুল উদ্দীপনা জেগে উঠত। এবং নৃপতিবর্গের অস্তিত্বই যদিও প্যারামাউন্ট ক্ষমতার উপরে নির্ভরশীল, তবু এর চাপও যেহেতু তাঁদের পক্ষে দুর্বহ, তাই তাঁরাও সেক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী শাসন-ব্যবস্থাকে একটা দৈব আশীর্বাদ বলেই গ্রহণ করতেন। প্যারামাউন্ট ক্ষমতার আশু অবসানই সেই নিকষ, যাতে নৃপতিবর্গ ও প্যারামাউন্ট ক্ষমতার অধিকারীর আন্তরিকতা যাচাই হতে পারে।

কিন্তু ভারতবর্ষের এই বিশ্বাস যদি আপনাদের চিত্তে সাড়া না জাগাতে পারে, তাহলে সার্ স্ট্যাফোর্ডের এই অভিমত অনুযায়ী কাজ হলেও ব্যক্তিগতভাবে আমি খুশী হব যে, যে প্যারামাউন্ট ক্ষমতা বস্তুত দেশীয় রাজ্যের প্রজাসাধারণের স্বাধীনতা ও প্রগতিকে দমন করে তাদের বিরুদ্ধে নৃপতিবর্গের স্বার্থই এতকাল রক্ষা করে এসেছে, এখন তাকে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা ও প্রগতির জন্যই প্রয়োগ করা উচিত। দেশীয় রাজ্যের প্রজারা যদি পিছিয়ে পড়ে থাকে, তবে তার হেতু এই নয় যে, প্রত্যক্ষভাবে-ব্রিটিশ-শাসনাধীন এলাকার মানুষের চাইতে তারা কিছু আলাদা প্রকৃতির মানুষ; হেতুটা আসলে এই যে, জোড়া জোয়াল কাঁধে নিয়ে তাদের নাভিশ্বাস উঠেছে। এই অভিমত আমি সমর্থন করি যে, জাতীয় সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে প্যারামাউন্ট ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত।

(৫) গোষ্ঠী-বিন্যাস সম্পর্কে আমার অসুবিধার কথা আপনাকে লিখে জানিয়েছি। তার উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত এ-বিষয়ে আর কিছু বলবার প্রয়োজন করে না।

(৬) আপনি ও স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স খোলাখুলিভাবে সব কথা জানিয়েছেন। এতে আমি আনন্দিত। কিন্তু একইসঙ্গে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাসের কথাটাও আমি জানিয়ে রাখতে চাই যে, দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষা কিংবা বহিরাক্রমণের আশঙ্কা নিবারণের জন্যও যদি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সৈন্য রাখা হয়, স্বাধীনতা তাহলে বস্তুত একটা প্রহসনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। গণ-পরিষদের কাজ শেষ হবার পরেও এ-ব্যাপারে ভারতবর্ষের অবস্থার কোনও উন্নতি হবে না। সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে বর্তমান ব্যবস্থাই যদি বহাল থাকে, তাহলে 'সামনের মাসেই স্বাধীনতা'— এই উক্তি হয় আন্তরিকতাহীন, আর নয়ত এটা একটা অর্থহীন ধ্বনিমাত্র। ব্রিটিশ সরকার যে 'ভারত ছাড়ো' দাবি মেনে নিয়েছেন, এটা শর্তহীন; গণ-পরিষদ সংবিধান রচনায় সফল হোন আর নাই হোন—তাতে কিছু যায় আসে না। প্রতিটি ব্যাপারেই পূর্বেকার মনোভাব আমূল পালটানো চাই।

সর্বোপরি, সৈন্যবাহিনী এ-দেশে থাকা সত্ত্বেও গণ-পরিষদের কাজকর্ম স্বাভাবিক হবে, এমন কথা কোনওক্রমেই বলা চলে না।

(৭) যতই ভাবছি এবং দেখছি, অন্তর্বর্তী সরকার সম্পর্কে আমার এই বিশ্বাস ততই দৃঢ় হচ্ছে যে, যথার্থ যে জাতীয় সরকার—আইনত না হোক—কার্যত কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচিত সদস্যদের কাছে দায়ী থাকবেন, গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচনের নির্দেশ জারী হবার পূর্বেই সেই সরকার গঠিত হওয়া চাই। একমাত্র তখনই, তার আগে নয়, আসন্ন ঘটনাবলীর সত্যচিত্র পরিস্ফুট করে তোলা যাবে। খাদ্যের যে সংকট চলছে, তার জন্য এখন অবিলম্বে একটি শক্তিশালী, কর্মদক্ষ ও সুসংবদ্ধ জাতীয় সরকার গঠন করা দরকার। তা ছাড়া এই গভীর ও ব্যাপক

দুর্নীতি বিদায় নেবে না; তা ছাড়া—বিদেশ থেকে যে খাদ্যশস্য আসবার কথা, ভারতের তটভূমিতে তা এসে পেঁছনো সত্ত্বেও—জনমানস উদ্দীপিত হবে না। ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ আজ বুভুক্ষায় ক্লিষ্ট; জাতীয় সরকার গড়তে যতই দেরি হচ্ছে, সেই ক্লেশও ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতীয় সরকার গড়বার ভার কংগ্রেসকেই দেওয়া হোক আর মুসলিম লীগকেই দেওয়া হোক, তা নিয়ে অতএব প্যারিটির প্রশ্ন উঠতে পারে না। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ও সৎ নরনারীকে এ-কাজের ভার দেওয়া চাই। ভাইসরয় যে এ-ব্যাপারে যথাসম্ভব দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছেন, এটা দেখে অতএব আমি খুশী হয়েছি।

অন্তরিকভাবে আপনার
এম. কে. গান্ধী"

লর্ড পেথিক-লরেন্স

ভারত-সচিব এই চিঠির উত্তর বেশ নম্র ভাষায় দিলেন বটে, কিন্তু নিজের বক্তব্য থেকে এতটুকু নড়লেন না। তিনি জানালেন :

ক্যাবিনেট ডেলিগেশনের দপ্তর,
গোপনীয় ভাইসরয়-ভবন, নয়াদিল্লি,
২১শে মে, ১৯৪৬

"প্রিয় গান্ধীজী,

আপনার ১৯শে ও ২০শে তারিখের পত্র দুটি পাবার পরে কংগ্রেসের কাছ থেকেও এ বিষয়ে আমরা আনুষ্ঠানিক একটি চিঠি পেয়েছি। তাতেও এই একই বিষয়গুলি উত্থাপন করা হয়েছে। শিগগিরই যেহেতু আমরা এই পত্রের জবাব দিতে ইচ্ছুক, অতএব আপনি যেসব বিষয় উত্থাপন করেছেন তা নিয়ে আর এই পত্রে কিছু লিখব না।

আপনার দ্বিতীয় পত্রের কয়েকটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে আমার কিংবা সার স্ট্যাফোর্ডের স্মৃতির মিল হচ্ছে না। যে-যে বিষয়ে আমাদের পার্থক্য হচ্ছে, তা বর্ণনা করে এইসঙ্গে একটি নোট্ পাঠাচ্ছি। আপনার ৬ ও ৭ নং অনুচ্ছেদে আপনি যে কথার আভাস দিয়েছেন, আমরা তা স্বীকার করছি, এবং জানাচ্ছি যে, সেখানে আপনি যে প্রস্তাব দিয়েছেন, আমাদের পক্ষে যে তা মেনে নেওয়া সম্ভব নয় তা আমরা স্পষ্টই আপনাকে জানিয়েছিলাম। প্রতিনিধিদল আমাকে বিশেষ করে এই কথাটা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বলছেন যে, স্বাধীনতা যে আসবে, সেটা নতুন সংবিধান কার্যকর হবার আগে নয়, পরে।

শুভেচ্ছা জানাই।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম. কে. গান্ধী, এসকোয়্যার। পেথিক-লরেন্স"

(পত্রের সংযোজনী)

(১) এমন কোনও আশ্বাস আমরা দিইনি। শুধু এই কথা বলেছি যে, ব্যাপারটাকে আমরা এইদিক থেকে ভেবে দেখছি।

(২) এ সম্পর্কে আমরা বলেছি যে, ঘোষণাপত্রের ১৪নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যবস্থানুযায়ী—অনুচ্ছেদটি আমরা আপনাকে পড়ে শুনিয়েছিলাম—আলাপ-আলোচনা হবে। আলোচনা যে নরেন্দ্রমণ্ডলীর চ্যানসেলর ও কংগ্রেস-সভাপতির মধ্যেও হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

(৩) এটা আপনার প্রস্তাব। আমরা বলেছি যে, এমনভাবে একজন লোক নিয়োগ করা দরকার, তাঁর প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটা যাতে সুনিশ্চিত হয়।

(৪) দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে আপনি যা বলেছেন, সেটা সার্ স্ট্যাফোর্ডের উক্তির ভুল ব্যাখ্যা। তিনি বলেছিলেন, অতীতে কয়েকটি ব্যাপারে প্যারামাউন্ট ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রজাসাধারণের বিরুদ্ধে নৃপতিদের স্বার্থরক্ষা করা হয়েছে, এই রকমের একটা ধারণা যে আছে, তা তিনি জানেন; তবে দেশীয় রাজ্যগুলির পক্ষে যাতে ইউনিয়নে যোগ দেওয়া সহজতর হয়, তার জন্য অন্তর্বর্তী কালে রাজ-প্রতিনিধি সেখানে গণতন্ত্রের পথে তাদের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করবারই চেষ্টা করবেন। আমরা এ-কথাও বলেছিলাম যে, রাজ-প্রতিনিধি প্যারামাউন্ট ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন, এবং এ-ব্যাপারে তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করবেন না; তবে অর্থনৈতিক যে-সব ব্যাপারে উভয় পক্ষেরই স্বার্থ জড়িত রয়েছে, তা নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার ও দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে আলাপ-পরামর্শ চলতে পারে।

গান্ধীজী এর যে উত্তর দিলেন, তার ভাষা বেশ কঠোর। শান্ত মানুষ লর্ড পেথিক লরেন্সকে এতটাই কঠোর ভাষায় জবাব লিখবার কোনও দরকার ছিল কিনা আমি জানিনে।

গান্ধীজী লিখলেন :

বাল্মীকি মন্দির,
রীডিং রোড, নয়াদিল্লি,
২২শে মে, ১৯৪৬

"প্রিয় বন্ধু,

আমার চিঠি দুখানির জবাব আপনি দ্রুত দিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। সেইসঙ্গে এও জানাই যে, উত্তরটি শোচনীয়। পুরনো সেই আমলাসুলভ গন্ধই এতে পাওয়া গেল। 'সত্যিকারের স্বাধীনতা' বলে যে রব তোলা হয়েছে, তার কি তবে কোনও ভিত্তি নেই?

আমার বিশ-তারিখের চিঠিতে যা যা বলেছি, তার প্রতিটিতেই আমি অটল আছি। আমি ভেবেছিলাম, গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী ভঙ্গিটা বুঝি চিরতরে বিদায় নিয়েছে; আপনার চিঠিখানি কিন্তু সেই ভঙ্গিতেই লেখা।

পুরনো বন্ধু হিসেবেই এ-কথা জানালাম।

সার্ স্ট্যাফোর্ড যে অসুস্থ, এ-কথা জেনে খুবই দুঃখিত হয়েছি। আশা করি শিগগিরই তাঁর অবস্থার উন্নতি হবে।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম. কে. গান্ধী"

দি রাইট অনারেব্‌ল লর্ড পেথিক-লরেন্স।

এর দুদিন বাদে, ২৪শে মে তারিখে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠকে—সুদীর্ঘ আলোচনার পর—একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। তাতে বলা হল যে, কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব শক্তিশালী কিন্তু সীমাবদ্ধ হবে; প্রতিটি প্রদেশকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা দিতে হবে; মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত হবে, প্রতিটি সম্প্রদায় আপন অভিরুচি অনুযায়ী জীবন যাপনের সুযোগ পাবে। মিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে একে খাপ খাওয়ানো হবে কী করে, কমিটী তা ভেবে দেখলেন না। বাধ্যতামূলকভাবে 'প্রদেশ-গোষ্ঠী' গড়বার পরিকল্পনায় গান্ধীজী ও তাঁর সহকর্মীদের আদৌ সমর্থন ছিল না। আসল সমস্যা দেখা দিল সেইখানেই। উত্তর-পূর্বে আসাম মুসলিমপ্রধান প্রদেশ নয়, কিন্তু মুসলিমপ্রধান প্রদেশ বাংলার সঙ্গে তাকে এই কারণে মিলিত হতে বাধ্য করা হচ্ছে যে, মস্ত বড় একটা অঞ্চলের উপরে সেক্ষেত্রে মুসলিম লীগের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। আসামের বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতা শ্রীগোপীনাথ বরদলৈ এই ব্যাপারটা নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে কেঁদে ফেলেছিলেন। আসামের জনসাধারণের ভবিষ্যৎ ভেবেই তাঁর এই অশ্রুমোচন। তাঁর মনে হয়েছিল যে, এ অতি নীতিহীন অন্যায় ব্যবস্থা। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ অবশ্যই মুসলিমপ্রধান অঞ্চল, কিন্তু কংগ্রেস দলের সেটা একটা শক্ত ঘাটি, এবং এই প্রদেশ থেকেই কংগ্রেস তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা খান আবদুল গফফর খানকে পেয়েছে। বিরাট একটা এলাকা জুড়ে যাতে মুসলিম লীগের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তার জন্য তাঁর প্রদেশকে জোর করে পাঞ্জাব, সিন্ধু আর বেলুচিস্তানের সঙ্গে একই গোষ্ঠীতে ঢোকানো হবে, মহান এই জাতীয়তাবাদী নেতা এই ব্যবস্থাকে আদৌ মেনে নিতে পারেননি। সন্ত প্রকৃতির মানুষ তিনি; গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠতম সহকর্মীদের অন্যতম। তাঁর মনে হয়েছিল, অন্যায়ভাবে এই যে তাঁর প্রদেশকে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচারে ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে—এ অতি নিষ্ঠুর ব্যবস্থা; বীর পাঠানদের বস্তুত এক্ষেত্রে হিংস্র সিংহের মুখের মধ্যে ছুঁড়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

ক্রিপ্‌স আর পেথিক-লরেন্‌সের মনে হয়েছিল যে, ক্ষমতা গ্রহণের ব্যাপারে দুই পক্ষের যদি না মতৈক্য হয়, তবে তৃতীয় পক্ষ ব্রিটেন এ-ব্যাপারে যে-প্রস্তাবই দিক না কেন, দুই পক্ষেরই কিছু মানুষ সেটাকে অন্যাষ্য বলে মনে করবেন বটে, কিন্তু এই রকমের অবস্থায় পরিপূর্ণ ন্যায়বিচারের আশাটাই বস্তুত অসম্ভবের আশা। মুসলিম লীগকে তাঁরা আশ্বস্ত করতে চেয়েছিলেন, যে, লীগ যেটাকে তার প্রাপ্য অংশ বলে মনে করে, শাসন-ক্ষমতায় সেই অংশ সে পাবে; তাঁদের মনে হল, সেদিক থেকে তাঁদের এই ব্যবস্থাটা আপোস-মীমাংসার একটা সৎ উদ্যোগ। সত্যি বলতে কী, মুসলিম লীগকে খুশী করবার জন্যই তাঁরা প্রাদেশিক গোষ্ঠী-বিন্যাসের এই প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষকে দু টুকরো করে পৃথক দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং পাকিস্তানের জন্ম দেওয়া—সেটা কি এর চাইতেও অনেক খারাপ ব্যবস্থা হত না? ভারতবর্ষের নেতারা তো এর আগে বরাবর বলে এসেছেন যে, তৃতীয় পক্ষই তাঁদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে শাসন চালাচ্ছে, এবং তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতির দরুনই ভারতীয় দলগুলি পরস্পরের সঙ্গে একটা মীমাংসা করে নিতে পারছে না। আর-কিছু না হক, তৃতীয় পক্ষের হাত থেকে যে অতঃপর রেহাই পাওয়া যাবে; এই কথা বিবেচনা করেও কি ভারতীয় নেতারা এই অসন্তোষ-জনক ব্রিটিশ প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না? এই ব্রিটিশ প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ হলে তার মেয়াদ হবে দশ বছর; মেয়াদ ফুরোবার পর ভারতীয়রা তাঁদের ইচ্ছামত এই

ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে পারবেন। দশ বৎসর কাল সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি সংখ্যালঘুদের প্রতি সুবিচার ও ন্যায়সংগত আচরণ করেন এবং তাঁদের ব্যবহার যদি সদয় হয়, তাহলে তৃতীয় পক্ষের অবর্তমানে কি দুই পক্ষের মধ্যে মিলমিশ হয়ে যেতে পারে না?

গান্ধীজী যা চেয়েছিলেন, তা এই যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের সম্পর্কে এই আস্থা রাখতে হবে যে, তাঁরা সংখ্যালঘুদের প্রতি সুবিচার ও ন্যায়সংগত আচরণ করবেন। তাঁর যুক্তি ছিল এই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠরা তা করবেন, কেননা সংখ্যালঘু ন কোটি মুসলমানকে অসন্তুষ্ট ও অসুখী রেখে সংখ্যাগরিষ্ঠরা—তা তাঁদের গরিষ্ঠতা যতই বিপুল হোক—কার্যকরভাবে ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করবেন কীভাবে? ব্রিটিশ সরকার যদি গান্ধীজীকে বিশ্বাস করে তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতেন, তাহলে গান্ধীজী নিজেই এই ন কোটি মুসলমানের অধিকার ও সুবিধা রক্ষা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের উপরে তাঁর প্রভাব ছিল এতই প্রশ্নাতীত যে, অনায়াসেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে তিনি সংখ্যালঘুদের প্রতি অতি-সৎ অতি-ন্যায়পরায়ণ ও অতি-সদয় হতে বাধ্য করতে পারতেন।

কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের হাতে অর্পণ করতে ব্রিটিশ সরকারের বিবেকে বাধছিল। ভারতবর্ষকে বিভক্ত করতে ও পাকিস্তান সৃষ্টি করতে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। এ-ব্যাপারে তাঁদের নৈতিক ও রাজনৈতিক, দ্বিবিধ আপত্তিই ছিল। একইসঙ্গে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে ছেড়ে দিতেও তাঁরা রাজী ছিলেন না। তাঁরা এ-কথা বুঝতে পারেননি যে, ভারতবর্ষের জটিল অবস্থায় মুসলিমদের অধিকার রক্ষার ভার গান্ধীজীর হাতে ছেড়ে দেওয়াই সর্বোত্তম পন্থা; সেই অধিকারের পক্ষে এর চাইতে ভাল রক্ষাকবচ আর কিছুই হতে পারে না। বস্তুত শেষপর্যন্ত তারই জন্য, ১৯৪৮ সনের ৩০শে জানুয়ারি তারিখে, গান্ধীজী তাঁর প্রাণ উৎসর্গ করলেন। ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজীকে ঠিক চিনতে পারেননি। এবং সেইজন্যই তাঁকে ও তাঁর মতামতকে ততটা বিশ্বাস করতে পারেননি।

ব্রিটিশ মন্ত্রিবর্গ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে এই যে ক্লেশজনক ও আত্মসন্ধানী বিতর্ক চলছিল, এরই মধ্যে ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ই মে তারিখের ঐতিহাসিক ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করে ৬ই জুন তারিখে মুসলিম লীগ এক প্রস্তাব পাশ করে। অবশ্য নানা শর্তসাপেক্ষে লীগ এটি গ্রহণ করে; এবং জানায় যে, পাকিস্তান-দাবি মিশন কর্তৃক অগ্রাহ্য হয়েছে বটে, কিন্তু মুসলিমপ্রধান প্রদেশ-গুলির গোষ্ঠীবিন্যাসের মধ্য দিয়ে "পাকিস্তানের মূলতত্ত্ব ও ভিত্তি"কেই তাঁরা মেনে নিয়েছেন। সংবিধান-রচনা সম্পর্কে মিশনের দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাবটিকেও লীগ মেনে নিল। হাসপাতাল থেকে এই সময়ে আমি ছাড়া পাই, এবং গান্ধীজী ও দুই ইংরেজ মন্ত্রীর মধ্যে আমার দৈনন্দিন যাওয়া-আসার কাজ আবার শুরু করি।

ব্রিটিশ মন্ত্রীরা অতঃপর রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে ভারতবর্ষের অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কাজে মনোনিবেশ করলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, মিলিতভাবে আশু ক্ষমতাগ্রহণের ব্যাপারে প্রধান দুটি দলের মধ্যে যদি মতৈক্য হয়, তাহলে সংবিধান-রচনা-সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাব নিয়ে যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে তার সমাধান আরও সহজ হবে। মৌলিক বিরোধটা অবশ্য খুব শিগগিরই প্রকট হয়ে উঠল। ৮ই জুন তারিখে মিঃ জিন্না এক পত্রযোগে ভাইসরয়কে জানালেন,

দপ্তর-বণ্টন নিয়ে আলোচনার সময়ে ভাইসরয় তাঁকে এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, দপ্তরের সংখ্যা হবে মোট ১২; এবং বিভিন্ন দলের অনুপাত এক্ষেত্রে হবে ৫ : ৫ : ২। অর্থাৎ মুসলিম লীগের মনোনীত প্রতিনিধি পাঁচজন; কংগ্রেসের মনোনীত প্রতিনিধি পাঁচজন; শিখদের প্রতিনিধি একজন; ভারতীয় খ্রীস্টান অথবা অ্যাংলো ইনডিয়ানদের প্রতিনিধি একজন। ভাইসরয় বললেন, এমন কোনও আশ্বাস তিনি দেননি; তবে এইরকমের একটা অনুপাতের কথাই তাঁর মনে রয়েছে, আলোচনার সময়ে এমন আভাস তিনি দিয়েছিলেন বলে স্বীকার করলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘুর মধ্যে, অর্থাৎ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে, এমন একটা সংখ্যাসমতা যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের পক্ষে আদৌ গ্রহণযোগ্য ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। তৎসত্ত্বেও ভাইসরয় যে মিঃ জিন্নাকে এমন আভাস দিয়েছিলেন, সেটা ভাইসরয়েরই একটা মারাত্মক প্রমাদ। ভারতসচিব এই প্রমাদের কথা জেনে বিচলিত বোধ করলেন। ১২ই জুন তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন, এবং বললেন যে, ব্যাপারটা নিয়ে তিনি খুব অস্বস্তিতে পড়েছেন। এই জটিল অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের একটা পথ খুঁজে বার করবার জন্য কি গান্ধীজীকে অনুরোধ করা যায় না? ভারত-সচিবকে আমি বললুম যে, খোলা-খুলি গান্ধীজীর সঙ্গে কথা বলা এবং তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করাই হচ্ছে এখন পরিত্রাণলাভের একমাত্র উপায়। ভারত-সচিব তখন বললেন যে, সেইদিনই সন্ধ্যায় যদি গান্ধীজীকে আমি তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে বড়ই ভাল হয়। গান্ধীজীকে ছোট্ট একটি চিঠিও লিখলেন তিনি, এবং চিঠিখানি আমার হাতে তুলে দিলেন। সেটি এখানে উদ্ধৃত করছি :

ক্যাবিনেট ডেলিগেশনের দপ্তর,
ভাইসরয়-ভবন,
নয়াদিল্লি,
১২ই জুন, ১৯৪৬

"প্রিয় গান্ধীজী,

আপনি যদি একবার আমার এখানে আসতে পারেন, তাহলে বড়ই প্রীত হই। আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে। আশা করছি, আজ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আপনার পক্ষে হয়ত আমাদের ২নং উইলিংডন ক্রিসেন্টের বাড়িতে আসা সম্ভব হবে।

শ্রীসুধীর ঘোষ অনুগ্রহ করে এই চিঠিখানি নিয়ে যাচ্ছেন। আপনি যে আসতে পারবেন, সেটা তিনি যদি আমার সেক্রেটারি মিঃ টার্নবুলকে ফোন করে জানিয়ে দেন, তো বড়ই ভাল হয়।

আন্তরিকভাবে আপনার
পেথিক-লরেন্স।"

গান্ধীজীর মনে হল, কীভাবে এখন ক্ষতিপূরণ হতে পারে, সে-বিষয়ে ভারত-সচিবকে পরামর্শ দেবার আগে তাঁর পক্ষে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করা দরকার, এবং তাঁর কাছে জেনে নেওয়া দরকার যে, ঠিক কী রকমের প্রতিশ্রুতি তিনি মিঃ জিন্নাকে দিয়েছেন। সুতরাং, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যদের সঙ্গে দেখা করবার আগেই

বিকেলবেলায় তিনি ভাইসরয়ের কাছে গেলেন, এবং সেইদিনই সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে গেলেন ভারত-সচিবের কাছে। ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের প্রতি তাঁর পরামর্শ কী, সেটা ১২ই এবং ১৩ই জুন তারিখে ভাইসরয়ের কাছে লেখা তাঁর দুটি চিঠিতেই তিনি জানিয়ে দিলেন। চিঠি দুখানি এখানে তুলে দিচ্ছি :

বাল্মীকি মন্দির,
রীডিং রোড, নয়াদিল্লি,
১২ই জুন, ১৯৪৬

"প্রিয় বন্ধু,

আপনার কাছ থেকে প্রায় সরাসরিই আমি ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠকে গিয়েছিলাম। মৌলানা আজাদ অসুস্থ থাকায় তাঁর বাড়িতেই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আপনার সঙ্গে আমার আলোচনার সারমর্ম আমি তাঁদের জানিয়েছি। আপনার প্রস্তাব, নামের তালিকা ঠিক করবার জন্য দলগুলি এই শর্তসাপেক্ষে মিলিত হবে যে, কোনও দলই প্যারিটির কথা বলতে পারবে না; অস্থায়ী অন্তর্বর্তী সরকারের ক্যাবিনেট-সদস্যদের নামের একটি যুক্ত তালিকা পেশ করবার জন্য তাঁদের অনুরোধ করবেন আপনি; তালিকাটি আপনি অনুমোদন করবেন; কিংবা যদি অনুমোদন না করেন, তাহলে তালিকাটির যে-যে সংশোধন আপনার অভিপ্রেত, তার কথা মনে রেখে একটি নতুন তালিকা পেশ করতে বলবেন আপনি; তালিকাটি হবে কোয়ালিশন সরকারের প্রতিনিধিত্বমূলক; এবং তালিকাটিতে শুধু এমন লোকের নাম রাখতে হবে, যাঁদের যোগ্যতা ও ন্যায়নিষ্ঠতার পরিচয় সবাই জানে। কংগ্রেস ওয়ারকিং কমিটীর সদস্যদের আমি বলেছি যে, আপনার এই প্রস্তাব আমি সানন্দে অনুমোদন করেছি। আমি এ-কথাও বলেছি, আপনাদের যুক্ত বিবৃতিতে দীর্ঘমেয়াদী এই যে একটি ব্যবস্থার কথা রয়েছে যে, সাম্প্রদায়িক ভোটের ভিত্তিতেই যাবতীয় বৃহৎ সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে, প্যারিটির পরিবর্তে এই ব্যবস্থাকেই কার্যকর করা উচিত। আমি এও বলেছি যে, সর্বপ্রকারে চেষ্টা করা সত্ত্বেও দুটি দলের মধ্যে যদি মতৈক্য না হয়, তাহলে দুটি দল যে পৃথক দুটি তালিকা পেশ করবে, সেই দুটির গুণাগুণ বিচার করে তার মধ্যে যে-কোনও একটি (দুটির সংমিশ্রণ নয়) আপনাদের গ্রহণ করা উচিত এবং অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্যদের নাম ঘোষণা করা উচিত। তবে সেই চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেবার আগে, যতক্ষণ না একটি যুক্ত তালিকা রচিত হচ্ছে, ততক্ষণ আপনাদের একসঙ্গে বসে আলোচনা করা দরকার। ওয়ারকিং কমিটীকে আমি বলেছি যে, আমার এই প্রস্তাব আপনি অনুমোদন করেছেন বলেই আমার মনে হয়।

আমি এ-ও বলেছি যে, মৌলানা আজাদকে বাদ দিয়ে কোনও যুক্ত-আলোচনার ব্যবস্থা হলে কংগ্রেস-পক্ষ তাতে সম্মত হবে না বলেই আমার বিশ্বাস, কেননা, কংগ্রেসের মর্যাদা এর সঙ্গে জড়িত। আপনি বলেছেন যে, কায়েদে আজম জিন্না এই ব্যাপারটায় খুবই অসন্তুষ্ট হন। তার উত্তরে আমি আপনাকে জানাই যে, তাঁর অসন্তোষ একান্তই অযৌক্তিক। পঁচিশ বছর ধরে যিনি একনিষ্ঠভাবে কংগ্রেসের সেবা করছেন, এবং যাঁর আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেম নিয়ে কোনও প্রশ্ন কখনও ওঠেনি,

কংগ্রেস তাঁকে আজ বিসর্জন দেবে, এমনটা নিশ্চয় আশা করা চলে না। তবে আমি এ-কথাও আপনাকে বলেছি যে, আপনার অভিজ্ঞতা গভীর; তা ছাড়া এই ধরনের অস্বস্তিজনক ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করবার দক্ষতাও আপনার আছে; সেই অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাই এই অসুবিধা থেকে মুক্ত হবার পথ আপনাকে দেখিয়ে দেবে।

সর্বোপরি, ওয়ারকিং কমিটীকে আমি এ-কথাও জানিয়েছি যে, যে ইউরোপীয় ভোটের কথা বলা হচ্ছে, গণ-পরিষদের ব্যাপারে তা যে চিন্তাও করা চলে না, তা আমি আপনাকে বলেছি, এবং এও বলেছি যে, ভারতবর্ষের ইউরোপীয় বাসিন্দারা কিংবা তাঁদের পক্ষ থেকে আপনাদের কেউ এ-বিষয়ে প্রকাশ্য একটা বিবৃতি দিলে তবেই গণ-পরিষদ গঠন সম্ভব হবে। আপনার কাছ থেকে আমি জানতে পারলাম যে, প্রশ্নটা নিয়ে ইতিমধ্যেই আপনারা চিন্তা করে দেখছেন, এবং এর একটা সন্তোষ-জনক মীমাংসাও হয়ে যাবে।

যুক্ত আলোচনার ব্যাপারে সম্ভবত ইতিমধ্যেই আপনারা উদ্যোগী হয়েছেন। তৎসত্ত্বেও, আপনার সঙ্গে আমার আলোচনা সম্পর্কে কী আমি জানিয়েছি, আপনার ও ওয়ারকিং কমিটীর প্রতি কর্তব্যবোধে, তা আমি এখানে বিবৃত করলাম। আপনার কোনও কথা যদি আমি ভুল বুঝে থাকি, তাহলে দয়া করে কি আমার ভুলটা আপনি শুধরে দেবেন?

আপনার জ্ঞাতার্থে জানাই, ওয়ারকিং কমিটী তাঁদের খসড়া চিঠি প্রস্তুত করেই রেখেছিলেন, তবে আমারই পরামর্শে তাঁরা—এই পত্রে বর্ণিত আপনার উদ্যোগের চূড়ান্ত ফলাফল না-জানা পর্যন্ত—তা নিয়ে বিবেচনা মুলতুবী রেখেছেন। প্যারিটি, ইউরোপীয় ভোট এবং প্রস্তাবিত গণ-পরিষদের সদস্য হিসাবে তাঁদের নির্বাচন সম্পর্কে গতকাল আমি আপনাকে যে অভিমত জানিয়েছি, খসড়া-চিঠিতেও সেই একই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।

উপসংহারে এই আশা জানাই যে, আপনার উদ্যোগ সুফলপ্রসূ হবে। সকলেই সাগ্রহে তার জন্য প্রতীক্ষমাণ।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম. কে. গান্ধী"

হিজ একসেলেনসি দি ভাইসরয়, নয়াদিল্লি।

গান্ধীজী তাঁর দ্বিতীয় পত্রে লিখলেন :

ভাঙ্গী কলোনি,
রীডিং রোড, নয়াদিল্লি,
১৩ই জুন, ১৯৪৬

"প্রিয় বন্ধু,

কাল রাত্রে আমি যখন লর্ড লরেন্সের আমন্ত্রণক্রমে তাঁর সঙ্গে দেখা করি, তখন আপনার হয়ে তিনি আমাকে ধন্যবাদ জানালেন।

বিশ্বাস করুন, জ্ঞানত আমি কখনও ধন্যবাদের আশায় কোনও কাজ করিনি। "ডিউটি উইল বি মেরিট হোয়েন ডেট্ বিকামস্ ডোনেশন।" আপনি একজন মহান সৈনিক—একজন দুঃসাহসী সৈনিক। যা ন্যায়সঙ্গত কাজ, সাহসভরে তা সম্পাদন

করুন। কোন্ নৌকোয় পা রাখবেন, তা আপনাকে স্থির করতে হবে। আমি যেটুকু বুঝতে পারছি, তাতে বলতে পারি, একইসঙ্গে দুই নৌকোয় পা রেখে চলা আপনার পক্ষে কখনও সম্ভব হবে না। কংগ্রেস যে নামের তালিকা পেশ করেছে, হয় সেটিকে গ্রহণ করুন, কিংবা লীগ যে তালিকা পেশ করেছে সেইটিকেই নিয়ে নিন। ঈশ্বরের দোহাই, যে সংমিশ্রণ অসম্ভব, তার জন্য চেষ্টা করবেন না, এবং চেষ্টা করতে গিয়ে একটা ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটাবেন না। মোট কথা, আপনার সময়-সীমা বেঁধে দিন, এবং সেই সীমা উত্তীর্ণ হবার পূর্বে আমাদের সবাইকেই সরে যেতে বলুন।

আশা করি যা আমি বলতে চাই, তা ঠিকমত বোঝাতে পেরেছি।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম. কে. গান্ধী"

হিজ একসেলেনসি লর্ড ওয়াভেল।

ভাইসরয়ের কাছ থেকে ১৩ই জুন তারিখেই এই চিঠি দুখানির উত্তর পাওয়া গেল। তিনি লিখলেন :

ভাইসরয়-ভবন,
নয়াদিল্লি,
১৩ই জুন, ১৯৪৬

"প্রিয় মিঃ গান্ধী,

গতকাল এবং আজ আপনি যে চিঠি দুখানি লিখেছেন, তার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আপনি যে-সব কথা লিখেছেন এবং যে-সব পরামর্শ দিয়েছেন, তাতে আমাদের উপকার হবে; সেজন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনার পরামর্শগুলি আমি নিশ্চয়ই মনে রাখব।

আজ সকালে সুধীর ঘোষের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে; আশা করছি আজ বিকেলে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে আমার দেখা হবে।

আন্তরিকভাবে আপনার
ওয়াভেল"

এম. কে. গান্ধী, এসকোয়্যার।

ভাইসরয়ের চিঠি থেকেই বুঝতে পারা যাবে যে, আমাকেও তখন কাজে লাগানো হয়েছিল। অন্তর্বর্তী সরকার গঠন সম্পর্কে ভাইসরয় ও কংগ্রেস দলের মধ্যে মতের যে পার্থক্য ঘটেছিল, কীভাবে সেটা মেটানো যায়, তার উপায় উদ্ভাবনের জন্যই ভাইসরয়ের কাছে পাঠানো হয়েছিল আমাকে। কিন্তু আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলুম যে, এই ব্যবধানের উপরে সেতুবন্ধনের কোনও উপায় নেই। গান্ধীজী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, বিভিন্ন দলের মধ্যে যেভাবে 'থোড়বড়িখাড়া-খাড়াবড়িথোড়' করে দপ্তর বণ্টনের উদ্যোগ চলেছে (ভাইসরয় ইতিমধ্যে ১৩ জন সদস্য নিয়ে ক্যাবিনেট গড়বার এক সংশোধিত ফরমুলা পেশ করেছিলেন। তার বিন্যাসটা এই রকম : একজন তপশীলী সদস্যসহ কংগ্রেস-মনোনীত ৬ জন সদস্য, মুসলিম লীগ-মনোনীত ৫ জন সদস্য ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ২ জন সদস্য), দলগুলির

বিরোধ তাতে ঢাকা পড়েনি; যে মৌলিক অবিশ্বাস তাদের আলাদা করে রেখেছে, তা প্রকট হয়েই আছে। গান্ধীজীর মতে, হয় কংগ্রেস কিংবা মুসলিম লীগ, ব্রিটিশ সরকারকে এই দুয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে; এছাড়া তাঁদের কোনও গত্যন্তর নেই। সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে তিনি একটি চিঠি লিখে তাঁর এই অভিমত জানালেন। সার্ স্ট্যাফোর্ড তখন এই আশঙ্কায় বিচলিত যে, তাঁর দীর্ঘ কয়েক মাসের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হবার উপক্রম হয়েছে। গান্ধীজীর চিঠিখানি এখানে তুলে দেওয়া হল :

নয়াদিল্লি,
১৩ই জুন, ১৯৪৬

"প্রিয় সার্ স্ট্যাফোর্ড,

আপনার মনের মধ্যে যে ঝড় বইছে, সুধীরের কাছে সে-বিষয়ে কিছু শুনলাম। তাঁর আগের দিন আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।

উদ্বিগ্ন হবেন না। যে-কাজে হাত দিয়েছেন, তা আপনার জীবনের দুরূহতম কাজ। আমার মনে হয়, মিশন আগুন নিয়ে খেলা করছেন। প্রথম থেকেই আমি আপনাকে যে পরামর্শ দিয়েছি, আপনার যদি সাহস থাকে, তবে সেই অনুযায়ী কাজ করুন। আপনাদের আগে যখন পারলামেনটারী প্রতিনিধিদল এসেছিলেন, তখন তাঁদেরও আমি বলেছিলাম যে, দু কূল বাঁচানো আপনাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। মুসলিম লীগ আর কংগ্রেস—এই দুই-ই তো আপনাদেরই সৃষ্টি, এই দুয়ের মধ্যে এখন একটিকে আপনাদের বেছে নিতে হবে। পর্যায়ক্রমে আপনারা কখনও কংগ্রেসের দিকে ঢলে পড়ছেন, কখনও লীগের দিকে, এবং এইভাবেই আপনাদের সমস্ত উদ্যম নষ্ট হচ্ছে। এটা চলবে না। হয় যেটা ন্যায়সঙ্গত কাজ, সেটা করুন; আর নয়ত ব্রিটিশ নীতির প্রয়োজন মেটাবার জন্য যা করা দরকার তাই করুন। এ দুয়ের মধ্যে যে-পথেই চলুন, তার জন্য সাহসের দরকার হবে। যাই করুন, আপনাদের কার্যসূচীতে অটল থাকা চাই। যে দিনক্ষণ আপনারা ঠিক করে রেখেছেন, আকাশ ভেঙে পড়লেও যেন তার নড়চড় না হয়। কোয়ালিশন গড়বার দায়িত্ব আপনারা কংগ্রেসকেই দিন আর লীগকেই দিন, ১৬ তারিখের মধ্যেই আপনারা বিদায় গ্রহণ করুন। আপনার যদি মনে হয় যে, আপনারই যে দুটি প্রতিষ্ঠানের স্রষ্টা, তাদের চাইতে ব্রিটেনের পুঞ্জীভূত জ্ঞান এ-ব্যাপারে আরও বেশী নির্ভরযোগ্য, তাহলে আর আমার কিছু বলবার নেই। তবে আমার মনে হয়েছিল যে, তেমন ছাঁচে আপনি গড়া নন। আমার বিশ্বাস যদি সত্য হয়, এবং ব্রিটেনের সাহসিক ঘোষণা যদি না ভারতীয়দের আশাপূরণ করে, তবে ১৬ই তারিখেই আপনি যাত্রা করুন, স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ইংল্যানডে ফিরে যান, এবং ব্যক্তিগত কাজকর্মে ডুব দিন। এই হচ্ছে প্রাজ্ঞবচন।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম. কে. গান্ধী"

গান্ধীজীর এই চিঠি পড়ে আমার নিজেরই একটি সতর্কবাণীর কথা আমার মনে পড়ল। ক্যাবিনেট মিশন লনডন থেকে রওনা হবার আগে, ১৯৪৬ সনের ১লা

মার্চ তারিখে, উডরো ওয়াটের মারফত সার স্ট্যাফোর্ডের কাছে আমি একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। তাতে আমি জানিয়েছিলাম যে, মতৈক্যের ভিত্তিতে এমন কোনও সমাধানে উপনীত হওয়া অসম্ভব, কংগ্রেস ও লীগ, উভয়ের পক্ষেই যা গ্রহণযোগ্য হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতেই অতএব ক্ষমতা তুলে দিতে হবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের সম্পর্কে এই আস্থা রাখতে হবে যে, সংখ্যালঘুদের প্রতি তারা সুবিচার করবে। ব্রিটেনের পক্ষে এ ছাড়া কোনও গত্যন্তর নেই।

স্যার্ স্ট্যাফোর্ড এই চিঠির যে উত্তর দিলেন, তাতে এই প্রথম গান্ধীজীর প্রতি তাঁর কিছুটা উষ্মা প্রকাশ পেল।

ক্যাবিনেট ডেলিগেশনের দপ্তর,
ভাইসরয়-ভবন, নয়াদিল্লি
১৩ই জুন, ১৯৪৬

"প্রিয় মিঃ গান্ধী,

আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আমার আশঙ্কা, আমাদেরই কারও-কারও মত, আপনিও কিছুটা অধৈর্য হয়ে উঠেছেন! কিন্তু সর্বদা আমি মনে রাখি, আপনি আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, এইসব জটিল ব্যাপারে নিরত থাকাকালে আমি যেন "অসীম ধৈর্য" দেখাই। এখানকার জটিল সমস্যাবলীর যাতে সমাধান হতে পারে, তার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করতে আমি দৃঢ়সংকল্প। দেশে ফিরে বিশ্রাম নেবার ইচ্ছাকে সেই সংকল্পের উপরে আমি স্থান দেব না।

ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য যে সাহস দরকার, আমার কিংবা আমার সহকর্মীদের মধ্যে সেই সাহসের অভাব নেই,—এ-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কিন্তু কথা এই যে, সাহসের সঙ্গে বিচক্ষণতাকেও আমরা মেলাতে চাই।

এখনও আমি প্রবল আশা রাখি যে, ভারত পরিত্যাগের আগে আমরা সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে যেতে পারব।

ইতিমধ্যে আপনাকে আমি আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমার অসুস্থতায় আপনি সহানুভূতি ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন; তার জন্য ধন্যবাদ।

অতিশয় আন্তরিকভাবে আপনার
আর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স"

কিন্তু উত্তেজনা এতই প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, সার্ স্ট্যাফোর্ডের এই চিঠি পড়ে গান্ধীজীর অধৈর্য-ভাব হ্রাস পেল না। বস্তুত সেই দিনই সন্ধ্যায় তিনি ভারত-সচিবকে একটি পত্রবাণ নিক্ষেপ করলেন। আগের দিনই আগাথা হ্যারিসন, হোরেস আলেকজানডার ও আমি গান্ধীজীকে অনুরোধ করেছিলাম যে, এ-চিঠি যেন তিনি ভারত-সচিবকে না পাঠান। তার কারণ, আমাদের মনে হয়েছিল যে, ইংরেজ মন্ত্রী দুজনকে তিনি ভুল বুঝেছেন, এবং এ-চিঠি পাঠালে তাঁদের প্রতি সুবিচার করা হবে না। চিঠিখানি এখানে তুলে দিলাম :

নয়াদিল্লি,
১৩ই জুন, ১৯৪৬

"প্রিয় বন্ধু,

আমি আপনাকে কথা দিয়েছিলাম যে, রেভারেন্ড নিকল্‌স রয়ের ভাষণ এবং, যদি খুঁজে পাই তাহলে, কায়েদে আজম জিন্নার ভাষণের একটি অনুলিপি আপনাকে পাঠিয়ে দেব। অংশত এই প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্যই গতকাল আপনার উদ্দেশে আমি একটি দীর্ঘ পত্র লিখেছিলাম। অন্যে আমাকে যেটা পড়ে শুনিয়েছেন বলে আপনাকে জানিয়েছিলাম, সেটার খোঁজ এখনও পাইনি। তবে মুসলিম লীগ কাউনসিলের প্রস্তাবটি পাওয়া গেল। এই প্রস্তাবটি থেকেই বিস্তর কথা বোঝা যাবে; অন্তত আমার তো তা-ই মনে হয়। আমার পত্রটিকে বাদ দিয়ে এই দুটি বস্তু আমি সুধীর ঘোষের হাত দিয়ে আপনাকে পাঠিয়েছিলাম।

পত্রটি যে পাঠাইনি, সেটা আগাথা হ্যারিসন, হোরেস আলেকজানডার ও সুধীর ঘোষের অনুরোধে। তাঁদের মনে হয়েছিল, যে ফল আমি আশা করছি, এই পত্র পাঠালে হয়ত তার বিপরীত ফল ফলবে। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। তার কারণ, দীর্ঘকাল যাবৎ আমরা পরস্পরকে চিনি। অবশ্য, আমাদের পরিচয় যে দীর্ঘ দিনের, এই ব্যাপারটার উপরে আমি জোর দিচ্ছি না; কেননা, সাফ্‌রেজেট আন্দোলনের সেই উন্মাদনাময় দিনগুলিতে যে আমাদের দেখা হয়েছিল, তার পর অনেক বছর আমাদের মধ্যে কোনও যোগাযোগ ছিল না। তবে সম্পর্কের যে-বন্ধনে তখন আমরা বাঁধা পড়েছিলাম, আমার মনে হয়েছিল যে, তা সহজে ছিন্ন হবার নয়। আর তাই অকপটে সব কথা আপনাকে জানিয়ে একটি চিঠি লিখব ভাবলুম। যে মিশনের আপনি নেতা, আমাকে যদি বন্ধুভাবে তার উপদেষ্টা হতে হয়, তাহলে আপনার প্রতি কর্তব্যবোধেই এ-কাজ আমার করা উচিত বলে আমার মনে হয়েছিল। তৎসত্ত্বেও আমার তিন বন্ধুর উপদেশ আমাকে মেনে নিতে হল। আমি তাঁদের বলেছি যে, তাঁদের সঙ্গে আমার যে-সব কথাবার্তা হয়েছে, তার সবটাই তাঁরা আপনাকে জানাতে পারেন।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম. কে. গান্ধী"

লর্ড পেথিক লরেনস্‌

[সংযোজনী]

"প্রিয় বন্ধু,

কথা দিয়েছিলাম যে, রেভারেন্ড জে. জে. এম. নিকল্‌স্‌ রয়ের ভাষণের একটি অনুলিপি আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেব। এইসঙ্গে সেটি পাঠালাম।

অন্তর্বর্তী সরকার যদি গঠিত হয়, তাহলে সেই সরকার কীভাবে কাজ করবেন, কায়েদে আজম জিন্নার ভাষণে তার উল্লেখ ছিল। ভাষণটি এখনও খুঁজে পাইনি। তবে মুসলিম লীগ কাউনসিলের প্রস্তাবটি পেয়েছি। এইসঙ্গে তার একটি কাটিং পাঠালাম। আমার তো মনে হয়, এটির থেকেই বিস্তর কথা বোঝা যাবে।

এর উপরে আবার ইউরোপীয় সমিতির সভাপতি এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে

যা বলেছেন, তা জানা গেল। কাল সন্ধ্যায় প্রার্থনা-সভায় আমি যখন বক্তৃতা দিই, তখনও এ-বিষয়ে আমি কিছুই জানতুম না। আমার বিবেচনায় এটি একটি বিপজ্জনক বিবৃতি। গণ-পরিষদের মাধ্যমে ভবিষ্যতে যে মঙ্গল হবার কথা, এই বিবৃতি সে সম্পর্কে আমার চিত্তে অনাস্থা জাগিয়ে তুলেছে।

স্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় আজ যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, আমার ধারণা, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ মনোভাব মোটামুটি তারই মধ্যে প্রতিফলিত। নিবন্ধটির শিরোনামা 'স্লো মোশন' (ধীর গতি)। তাতে বলা হয়েছে, "বৃহৎ সিদ্ধান্তের প্রাক্কালে বিচার-বিবেচনা, সতর্কতা ও ধীরতা শোভন বটে, কিন্তু নেহাতই উদ্দেশ্যসাধনের কায়দা হিসেবে বাগ্‌বিস্তার করা কিংবা টালবাহানা করা শোভন নয়।" আমার ধারণা, এ সবই হচ্ছে কংগ্রেসের উপরে অকারণে আক্রমণ চালাবার একটা প্রস্তুতি। মিশনের সদস্য হিসেবে আপনি, ও ভাইসরয়, যদি এই একই মত পোষণ করেন, তাহলে—যতই শক্তিশালী কিংবা প্রতিনিধিস্থানীয় হোক না কেন—কংগ্রেসের সঙ্গে আদৌ কোনও সম্পর্ক রাখা আপনাদের উচিত হবে না। কংগ্রেসকে আপনাদের কেমন মনে হয়, সেটা আপনারাই বিচার করবেন, এইটেই স্বাভাবিক।

নিজেকে আমি একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক বলে মনে করি। এবং নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক হিসেবেই আমার মনে হয় যে, কংগ্রেস অকারণে কালক্ষয় করছে না। গুরুত্বপূর্ণ যে মিশনের দায়িত্বভার আপনারা বহন করছেন, তার সঙ্গে সম্পর্কিত কাজকর্মের ব্যাপারে কংগ্রেস বরং অসাধারণ তৎপরতার পরিচয় দিয়েছে। তবে এই পত্র লিখবার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ-কথা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া যে, ভাইসরয় যতক্ষণ না অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করছেন কিংবা হতাশাভরে হাল ছেড়ে দিচ্ছেন, কংগ্রেসকে ততক্ষণ অনিশ্চিতভাবে অপেক্ষা করতে উপদেশ দেওয়াটা আমার পক্ষে অন্যায় হবে। যাদের মধ্যে মিলন হওয়া সম্ভব নয়, তাদের মিলিয়ে কোয়ালিশন সরকার গড়বেন, ভাইসরয় যদি এই আশা করে থাকেন, তবে হতাশ তাঁকে হতেই হবে। ভাইসরয়ের বিবেচনায় যে-দল অধিকতর আস্থা সঞ্চারে সক্ষম, সরকার গঠনের জন্য তাকে আহ্বান করাই হচ্ছে সবচাইতে নিরাপদ, সাহসিক ও সরল পন্থা। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেক্ষেত্রে জাতীয় সরকার গঠিত হবে, এমন সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে এমন যদি মনে হয় যে, কোনও দলই আস্থা সঞ্চারে সক্ষম নয়, তবে সেইমর্মে ঘোষণা করা উচিত, এবং ভাইসরয়ের পক্ষেই সেক্ষেত্রে তাঁর আপন বিবেচনা অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ পন্থায় শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করা উচিত। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীকে অনির্দিষ্ট-কালের জন্য বসিয়ে রাখা উচিত হবে না। নিজের সম্পর্কে বলি, আপনারা যদি চান তো আমি সানন্দে নিজেকে পিছনে অপসৃত করব। তবে আমার মনে হয়, আমার পরামর্শে কোনও কাজ হবে না। আমার চিত্ত যদি বিশ্বাসে ভরপুর থাকে, তবেই আমি পরামর্শ দিতে পারি। অবিশ্বাস যখন আমার কণ্ঠরোধ করে তখন আমি অসাড় হয়ে যাই।

আপনাকে এই চিঠি লিখতে হল, এর জন্য আমি দুঃখিত। তবে আমার অনুভূতিকে যদি আমি ছদ্ম-আবরণে ঢেকে রাখি, তবে তো আমি বন্ধু হিসেবে নেহাতই অযোগ্য হয়ে দাঁড়াব। আমার সত্য-পরিচয়েই আপনার আমাকে জানা উচিত। সেইজন্যই এত অশ্রুমোচন করলুম।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম. কে. গান্ধী"

হোরেস আলেকজানডার, আগাথা হ্যারিসন আর আমি এর আগের দিন গান্ধীজীকে এ-চিঠি লর্ড পেথিক লরেনসের কাছে পাঠাতে দিইনি। আমাদের মনে হয়েছিল যে, একজন ব্যক্তিবিশেষের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যের জন্য এই দুজন সৎ ইংরেজকে দোষী করলে সেটা খুবই অন্যায় কাজ হবে। মন্তব্যটা 'স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকার সম্পাদক ইয়ান স্টীফেন্‌সের। তিনি খ্যাপাটে মানুষ, কারও প্রতিনিধি নন; এমন কী, 'স্টেট্‌সম্যান'-এর অন্যান্য কর্মীদেরও না। আর তা ছাড়া, 'স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকাও তো ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি নয়। কিন্তু আবহাওয়া তখন পারস্পরিক অবিশ্বাসে ভারাক্রান্ত। অন্যান্য রাজনীতিকদের অবিশ্বাস ছিল গান্ধীজীর চাইতেও গভীর, কিন্তু অবিশ্বাসটাকে তাঁরা নিপুণভাবে ঢেকে রাখতেন। সেক্ষেত্রে গান্ধীজীর চিত্ত ছিল এতই অকপট যে, বিরোধীরা স্পষ্টই বুঝতে পারতেন, গান্ধীজী তাঁদের অবিশ্বাস করছেন। অর্থাৎ গান্ধীজী সেটা তাঁদের জানতে দিতেন। এর মধ্যে একটা মধুর সরলতা ছিল, এবং বিদ্বেষ আদপেই ছিল না।

যাই হক, এই জটিল সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য ক্যাবিনেট মিশনও ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। মতৈক্যের ভিত্তিতে ক্যাবিনেট-সদস্যদের নামের তালিকা স্থির করবার দুঃসাধ্য প্রয়াসে ছেদ টানলেন তাঁরা, এবং অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভার একটা সদস্য-তালিকা নিজেরাই পেশ করলেন। ১৬ই জুন তারিখে ভাইসরয়ের এক বিবৃতিতে এই তালিকা ঘোষিত হল। সদস্য হিসেবে এই চোদ্দজনের নাম তাঁরা প্রস্তাব করলেন :

কংগ্রেসের পাঁচজন প্রতিনিধি : শ্রীনেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, শ্রী সি. রাজাগোপালাচারী, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব।

মুসলিম লীগের পাঁচজন প্রতিনিধি : মিঃ জিন্না, নবাবজাদা লিয়াকত আলি খান, খাজা সার্‌ নাজিমুদ্দীন, নবাব মহম্মদ ইসমাইল খান ও সর্দার আবদুর রব নিশতার।

সংখ্যালঘুদের চারজন প্রতিনিধি : সর্দার বলদেও সিং (শিখ), সার্‌ এন. পি. ইনজিনীয়ার (পার্সী), ডঃ জন মাথাই (খ্রীষ্টান) ও শ্রীজগজীবন রাম (তপশিলী)।

তালিকাটি বেশ দক্ষভাবে রচনা করা হয়েছিল। মিঃ জিন্না কংগ্রেসের সঙ্গে যে প্যারিটি দাবি করছিলেন, সেটা এক্ষেত্রে এই অর্থে রক্ষিত হল যে, এতে যেমন মুসলিম লীগের পাঁচজন প্রতিনিধি রইলেন, তেমনি কংগ্রেসেরও পাঁচজন; এবং সেই পাঁচজন কংগ্রেসীর সকলেই হিন্দু। একইসঙ্গে আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে এই তালিকায় কায়দা করে দলে-ভারী রাখবারও ব্যবস্থা হল। শ্রীজগজীবন রাম এতে তপশিলীদের প্রতিনিধি হিসেবে স্থান পেলেন বটে, কিন্তু আসলে তিনিও কংগ্রেসী। তাছাড়া শিখ প্রতিনিধি সর্দার বলদেও সিং এবং খ্রীষ্টান প্রতিনিধি ডঃ জন মাথাইও কংগ্রেসীদের সঙ্গেই হাত মিলিয়ে কাজ করেছেন (এ'রা দুজনেই নেহরু সরকারে ছিলেন, এবং অনুগতভাবে তাঁকেই সমর্থন দিয়েছেন)। উপরন্তু পার্সী প্রতিনিধি, অবসরপ্রাপ্ত রাজ-কর্মচারী, সার্‌ এন. পি. ইনজিনীয়ার সম্পর্কেও আশা করা যাচ্ছিল যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সঙ্গে তিনি হাত মেলাবেন।

ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন এই একই বিবৃতিতে ঘোষণা করলেন : "প্রধান দুটি দল, অথবা তাদের মধ্যে যে-কোনও একটি, যদি উপর্যুক্ত পন্থায় কোয়ালিশন সরকার গঠনে যোগ দিতে অসম্মত হয়, তাহলে ১৬ই মে'র প্রস্তাব যাঁরা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যথাসম্ভব তাঁদের প্রতিনিধিস্থানীয় করে একটি সরকার গঠন করাই হচ্ছে ভাইসরয়ের অভিপ্রায়।" ১৬ই মের প্রস্তাব অর্থাৎ সংবিধান-রচনার দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাবটি

ইতিমধ্যেই, ৬ই জুন তারিখে, কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। কংগ্রেস এ-সম্পর্কে নানাপ্রকার সন্দেহ-সংশয়ের কথা ব্যক্ত করেছিল বটে, কিন্তু প্রস্তাবটিকে বস্তুত অগ্রাহ্যও করেনি; আনুষ্ঠানিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজটা তখনও বাকী। ক্রিপ্স এইসময়ে একান্তে আমাকে গান্ধীজীকে এ-কথা জানাতে বলেন যে, নূতন সরকারে জিন্না প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, এবং ক্রিপ্স আশা করেন যে, জিন্নাকে প্রতিরক্ষা-দপ্তরের ভার নিতে দিয়ে কংগ্রেস তাঁর অহমিকাকে তৃপ্ত করবে। বস্তুত সরকারে যোগ দিতে মুসলিম লীগ তখন খুবই উৎসুক।

কংগ্রেস দলে একজন জাতীয়তাবাদী মুসলিমের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারটা গান্ধীজীর কাছে ছিল অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ একটা নীতির প্রশ্ন। সারা জীবন তিনি সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, এবং কংগ্রেসেরও তিনি নির্মাতা। সেই কংগ্রেস দল শুধুই হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করবে, তাও শুধু বর্ণ-হিন্দুদের, এমন একটা অবস্থাকে কী করে মেনে নেবেন তিনি? কংগ্রেসকে এতটা নামিয়ে আনার চাইতে তিনি বরং মৃত্যু বরণেও প্রস্তুত। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীকে তিনি এই বলে হুঁশিয়ার করে দিলেন যে, এই রকমের দাবির কাছে তাঁরা যদি নতিস্বীকার করেন, তিনি তাহলে দিল্লি ছেড়ে চলে যাবেন, এবং অন্তর্বর্তী সরকার গঠন সংক্রান্ত কোনও আলোচনার সঙ্গেই আর কোনও সম্পর্ক রাখবেন না। কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ স্বয়ং একজন বিশিষ্ট মুসলিম। কংগ্রেস যদি এমন অবস্থা মেনে নেয় যে, নিজের সভাপতিকেই একজন কংগ্রেসী প্রতিনিধি হিসেবে সে মন্ত্রি-সভায় পাঠাতে পারবে না, তো কংগ্রেসের পক্ষে সেটা আত্মহত্যার তুল্য ব্যাপার হবে। গান্ধীজী স্বয়ং মৌলানা-সাহেবকে বোঝালেন যে, কংগ্রেসের একজন হিন্দু-প্রতিনিধির সরে যাওয়া উচিত, এবং কংগ্রেসী মুসলমান হিসেবে মৌলানা-সাহেবের নিজেরই সরকারে প্রবেশ করা উচিত। কংগ্রেস-দলের সভাপতি হিসেবে মৌলানা সাহেবের প্রতিষ্ঠা তো প্রশ্নাতীত। তাঁকে তো কংগ্রেস দলের 'তাঁবেদার' মুসলিম বলা যেতে পারে না। পরবর্তী কালের ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে, শ্রীনেহরুর সরকারে মন্ত্রী-পদ গ্রহণ করতে মৌলানা-সাহেব খুবই আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু সেইসময়ে, গান্ধীজীর অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও, কিছুতেই তিনি সরকারে যোগ দিতে রাজী হলেন না। তাঁর আপত্তির কারণ তিনি তখন জানাননি। দিন কয়েক বাদেই সেটা জানা গেল।

গান্ধীজীর প্রধান সেক্রেটারি শ্রীপ্যারেলাল তাঁর 'দি লাস্ট ফেজ' [শেষ অধ্যায়] গ্রন্থে (পৃ ২৩৪) তাঁর সযত্নে-রাখা দিনলিপির একটি অংশ তুলে দিয়েছেন। দিন-লিপির এই অংশটির তারিখ হচ্ছে ২২ জুন, ১৯৪৬। অংশটি এখানে তুলে দেওয়া হল :

"সুধীর ঘোষ ক্রিপ্সের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি জানালেন, ক্রিপ্স তাঁকে বলেছেন যে, জাতীয়তাবাদী একজন মুসলিমের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে কংগ্রেসের যা বক্তব্য, তা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটী কি এটা প্রত্যাহার করতে পারেন না? মৌলানা সাহেবের কাছ থেকে এইমর্মে একটি লিখিত আশ্বাস পেয়ে তবেই তাঁরা কাজে এগিয়েছিলেন যে, ওয়ার্কিং কমিটী এ-ব্যাপারে জিদ করবেন না। এখন তাঁরা ফ্যাসাদে পড়েছেন। সুধীর জিজ্ঞেস করলেন, কংগ্রেস যদি ক্যাবিনেট মিশনের শর্তে ক্ষমতা গ্রহণ করতে অসম্মত হয়, তো সেক্ষেত্রে তাঁরা লীগের হাতে ক্ষমতা তুলে দিচ্ছেন না কেন। ক্রিপ্স তার জবাবে বললেন যে,

একা-লীগের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া উচিত বলে তাঁরা মনে করেন না।

'সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা তুলে দিচ্ছেন না কেন?'

'সেটা দিতে হলে ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি চাই।'

'সেটা কি এখান থেকে পাওয়া যেতে পারে না?'

'না। তার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-আলোচনা করবার দরকার হবে।'

দুপুরবেলায় ভাইসরয়ের কাছ থেকে একটি চিঠি পাওয়া গেল। তাতে তিনি কংগ্রেস-সভাপতিকে অনুরোধ জানালেন যে অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেস-প্রতিনিধিদের তালিকায় যেন তাঁদের ইচ্ছা-অনুযায়ী কোনও মুসলিমের নাম ঢোকাবার জন্য তাঁরা পীড়াপীড়ি না করেন। এতক্ষণ বাপুর কথায় কাজ হয়নি; এতে কিন্তু হল। ওয়ার্কিং কমিটীতে এই বিষয়টি যখন ভোটে দেওয়া হল, তখন একজন বাদে আর-সকলেই সেই শর্তে ক্ষমতা গ্রহণ করতে অসম্মতি জানালেন।" একমাত্র ব্যতিক্রম, বলাই বাহুল্য, মৌলানা সাহেব।

কংগ্রেস-প্রতিনিধিদের তালিকায় ভাইসরয় একজন মুসলিমের অন্তর্ভুক্তি মেনে নিতে অসম্মত হওয়ায় ২২শে জুন তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেবে না। মনে হল যে, সমস্ত উদ্যম এবারে ব্যর্থ হতে বসেছে। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে, এই আশায় আমরা যারা পুরো তিন মাস ধরে দিবারাত্রি কঠোর পরিশ্রম করেছি, তাদের সকলের পক্ষেই সেই দিনটি বড় দুঃখের। ক্রিপ্‌স আর পেথিক-লরেন্সের দুঃখই সর্বাধিক। গভীর নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করেছিলেন তাঁরা। সেইদিনই সন্ধ্যায় তাঁরা আমাকে ডেকে পাঠালেন, এবং জিজ্ঞেস করলেন, সবকিছুই তো ডুবেছে, এখন এরই মধ্য থেকে কিছুটা যাতে বাঁচানো যায়, তার কোনও উপায় আমি বাতলাতে পারি কিনা। দু-নম্বর উইলিংডন ক্রেসেন্টের বসবার-ঘরে মৃদু গলায় আমরা কথাবার্তা বলছি, এমন সময় মিশনের তৃতীয় সদস্য এ. ভি. আলেকজানডার এসে প্রবেশ করলেন। আসলে তিনি ঘরের মধ্য দিয়ে অন্যত্র যাচ্ছিলেন। আকাটা হীরের মত মানুষ। অফিস-মেসেনজার হিসেবে জীবন শুরু করে তিনি ফার্স্ট্ লর্ড অব দি অ্যাডমিরালটির আসনে এসে পৌঁছেছিলেন। যাই হোক, আমাকে দেখে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, এবং আমার দিকে আঙুল তুলে বললেন, "এই যে, একেই তো আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমাদের দেশের এই দারুণ গ্রীষ্মে তিন-তিনটে মাস ধরে এই যে আমরা ঘেমে মরছি, সে তো আমাদের কাছ থেকে ক্ষমতা নেবার ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য করবার জন্যেই, তাই না? কিন্তু তার প্রতিদানে কী পেলাম আমরা? না আমাদের উদ্দেশ্যের সততা সম্পর্কে একগাদা নোংরা অবিশ্বাস। জিজ্ঞেস করি, কী আমরা করেছি, যার জন্যে এই অবিশ্বাস আমাদের প্রাপ্য ছিল? তোমার ওই বৃদ্ধটিই আমাদের সমস্ত চেষ্টা বানচাল করে দিয়েছেন। তোমার বৃদ্ধটি তাঁর কথা রাখেননি। তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, সরকারে কংগ্রেস-প্রতিনিধি-দলে কোনও মুসলিমকে রাখা হবে না। আশ্বাসটা তিনি লিখিতভাবে দিয়েছিলেন। অথচ, আশ্বাস দিয়েও তিনি তাঁর কথা রাখলেন না। বিচ্ছিরি ব্যাপার।"

বুঝতে পারছিলুম যে, গান্ধীজীর উপরে অ্যালবার্ট আলেকজানডার ভীষণ রেগে গিয়েছেন। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারে কোনও কংগ্রেসী মুসলিম থাকবেন না বলে গান্ধীজী তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, এই অস্বাভাবিক অভিযোগের কোনও অর্থই আমি বুঝতে পারলুম না। সুতরাং ক্রিপ্‌স আর পেথিক-লরেন্সকে জিজ্ঞেস

করলুম, এর অর্থ কী। ক্রিপ্‌স বললেন, "দ্যাখো সুধীর, ভাইসরয়ের কাছে মৌলানা একটি চিঠি লিখেছিলেন। এবং সেই চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে, কংগ্রেসী তালিকায় যাতে কোনও মুসলমানের নাম না থাকে, তিনি তার ব্যবস্থা করবেন। এমন কী, তাঁর নিজের নামও যদি প্রস্তাবিত হয় তো তালিকার অন্তর্ভুক্ত হতে তিনি রাজী হবেন না।" গান্ধীজীর এত অনুরোধ সত্ত্বেও যে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারে যোগ দিতে মৌলানা সাহেব রাজী হননি কেন, এতক্ষণে সেটা আমি বুঝতে পারলুম।

কথাপ্রসঙ্গে ক্রিপ্‌স আর পেথিক-লরেন্‌সকে আমি বললুম যে, সবই তো ব্যর্থ হল, এখন এরই মধ্য থেকে কিছুটা যদি তাঁরা বাঁচাতে চান তো একটিমাত্র পরামর্শই আমি দিতে পারি। কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের মধ্যে একমাত্র সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলই হচ্ছেন বাস্তববাদী মানুষ, ভাবাবেগে তিনি বিচলিত হন না; তাঁর সঙ্গে তাঁদের একবার একান্তে কথা বলা উচিত। এই সার্বিক ব্যর্থতা থেকে পরিত্রাণলাভের পথ যদি কেউ বাতলাতে পারেন, তো তিনি বল্লভভাই। শুনে লর্ড পেথিক-লরেন্‌স বললেন, আগাথা হ্যারিসন তো ওয়াই-ডবলু-সি এতে আছেন; পরদিন অর্থাৎ রবিবার সকালে সেখানে যে ছোট্ট কোয়েকার প্রার্থনানুষ্ঠান হবে তাতে তিনি যোগ দেবেন; প্রার্থনানুষ্ঠান শেষ হবার পরে সেখান থেকে আমি তাঁকে বল্লভভাই প্যাটেলের কাছে নিয়ে যেতে পারব কি? আমি বললুম, পারব।

২২শে জুন সন্ধ্যাবেলায় ভাঙ্গী কলোনিতে ফিরে গিয়ে গান্ধীজীকে আমি দুঃসংবাদ দিলুম। মৌলানা সাহেব যে ভাইসরয়কে চিঠি লিখে এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, সরকারে কোনও কংগ্রেসী মুসলিম থাকবেন না, এ-কথা শুনে গান্ধীজী খুবই বেদনা বোধ করলেন। তবে বিস্মিত তিনি হলেন না। তার কারণ, এমন ব্যাপার এই প্রথম ঘটল না, সহকর্মীদের না-জানিয়ে এবং তাঁদের অনুমোদন না নিয়ে মৌলানা সাহেব এর আগেও একবার মিশনকে অনুরূপ একটি চিঠি লিখেছিলেন। মৌলানা সাহেবের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ভালই ছিল। তিনি চাইছিলেন যে, কংগ্রেস ও লীগের বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে মিটে যাক; তার জন্য জিন্না-সাহেব যে মূল্য দাবি করছিলেন, তাও দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর কাছে এটা কংগ্রেসের নৈতিক মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নয়। সেদিন রাত্রেও তাঁর ঘুম হল না। এটা যে আমারই একটা কারসাজি, এবারে অবশ্য নেহরু এমন অভিযোগ তুলতে পারলেন না। তার কারণ, সেইদিনই রাত্রে জর্জ অ্যাবেল রাজকুমারী অমৃত কাউরের সঙ্গে দেখা করেন। মৌলানা যে সত্যিই এমন আশ্বাস দিয়ে একটি চিঠি লিখছেন, এবং চিঠিখানি যে তাঁদের হেফাজতে আছে, রাজকুমারীকে এ-কথা জানানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। অ্যাবেল বললেন, গান্ধীজী অকারণে অসুবিধের সৃষ্টি করছেন। দুঃসংবাদটা অতএব শুধু আমিই সেদিন শোনাইনি।

পরদিন অর্থাৎ ২৩শে জুন সকালে যেভাবে বল্লভভাই প্যাটেলের সন্ধান পাওয়া গেল, সে এক অভিজ্ঞতা বটে! কোয়েকার প্রার্থনানুষ্ঠানে গান্ধীজী আর ভারত-সচিব দুজনেই উপস্থিত ছিলেন। সেখানে নীরবতা ভঙ্গ করে আমি বললুম যে, কতখানি বেদনাভরে উদারচিত্ত দুইদল মানুষকে আমাদের দেখতে হচ্ছে। তাঁদের একদল ভারতীয়, অন্যদল ব্রিটিশ। তাঁদের দুই দলই চান ন্যায্য কাজ করতে; তবু পরস্পরের মনের তাঁরা নাগাল পাচ্ছেন না। এ এক নিদারুণ ট্রাজেডি। গান্ধীজী আর পেথিক-লরেন্‌স শান্তভাবে সারাক্ষণ নীরব হয়ে বসে রইলেন। বড়দের কাছে

বকুনি খাবার সময় স্কুলের ছেলেদের যা মনের অবস্থা হয়, কে জানে তাঁদের মনেরও তখন সেইরকম অবস্থা হয়েছিল কিনা!

প্রার্থনানুষ্ঠান শেষ হবার পরে ভারত-সচিবের সঙ্গে আমি তাঁর গাড়িতে গিয়ে উঠলুম, এবং শোফারকে জানালুম, আমরা আলবুকার্ক রোডে বিড়লা-ভবনে যাব। (আলবুকার্ক রোডের নাম এখন তিস্ জানুয়ারি মার্গ। ১৯৪৮ সনের তিরিশে জানুয়ারি তারিখে এই বিড়লা-ভবনেই এক ধর্মোন্মাদ হিন্দুর হাতে নিহত হয়েছিলেন গান্ধীজী। সেই শোকদিবসের স্মরণেই রাস্তাটির এই নামকরণ।) বল্লভভাই প্যাটেল বিড়লা-ভবনে থাকতেন। ভারত-সচিব অবশ্য বিড়লা-ভবনে ঢুকতে রাজী হলেন না। বাড়ির বাইরে রাস্তার উপরে গাছতলায় তাই গাড়ি দাঁড় করানো হল, এবং বল্লভভাইয়ের সন্ধানে আমি ভিতরে ঢুকলুম। আমাদের অবস্থা তখন পলাতক দুই স্কুল-বালকের মত! বিড়লা-ভবনে বল্লভভাইকে পাওয়া গেল না; শুনলুম, গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য তিনি রীডিং রোডের ভাঙ্গী কলোনিতে গিয়েছেন। আমি আর ভারত-সচিব অতএব রীডিং রোডের দিকে যাত্রা করলুম। আরউইন রোডে রোমান ক্যাথলিক গির্জার কাছে গিয়ে পৌঁছেছি, এমন সময় দেখি, উল্টো দিক থেকে আর-একটা গাড়ি আসছে। তাতে বল্লভভাই আর তাঁর কন্যা মণিবেন। হাত তুলে তাঁদের গাড়ি আমি থামালুম। অতঃপর হেঁটে রাস্তা পার হয়ে গিয়ে জানলুম যে, ভারত-সচিব তাঁর সঙ্গে কথা বলতে খুবই উৎসুক, বল্লভভাই কি আমাদের গাড়িতে আসবেন? আরও দু-একটা কথা হল বল্লভভাইয়ের সঙ্গে। অতঃপর স্থির হল যে, গোল পোস্ট অফিসের সামনে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ধারণ না-করে বরং ২নং উইলিংডন ক্রেসেন্টে ভারত-সচিবের বাড়িতে যাওয়া যাক। তাই গেলুম আমরা। সেখানে আধ ঘণ্টা যে কথাবার্তা হল, তার তাৎপর্য ঐতিহাসিক। সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স ও মিঃ এ. ভি. আলেকজানডারও যোগ দিলেন আমাদের আলোচনায়। বল্লভভাইয়ের সঙ্গে আলাদাভাবে ক্যাবিনেট মিশনের এই প্রথম সাক্ষাৎকার। মৌলানা আজাদের নেতৃত্বে যে কংগ্রেস-প্রতিনিধিদল সিমলার আলোচনা-বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন, ইতিপূর্বে তার অন্যতম সদস্য হিসেবেই শুধু বল্লভভাইকে দেখেছেন তাঁরা। বল্লভভাই ছিলেন বিরাট একজন সংগঠক এবং সত্যিকারের বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন একজন রাষ্ট্রনীতিবিদ্। যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে কী করা যেতে পারে, এবং কী করা যেতে পারে না, মাত্র আধঘণ্টার মধ্যেই বল্লভভাই সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত করে ফেললেন। ভারত-সচিব বললেন, সংবাদপত্রে তিনি এইমর্মে খবর দেখেছেন যে, অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য ১৬ই জুন তারিখে ভাইসরয় যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী তা প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এবং ১৬ই মে তারিখে ক্যাবিনেট মিশন কর্তৃক সংবিধান-রচনার যে দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, ওয়ার্কিং কমিটী ইতিমধ্যেই সে-বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তবে আনুষ্ঠানিক প্রত্যাখ্যান-পত্রটি মিশন এখনও পাননি। যাই হোক, দুটি প্রস্তাবকেই প্রত্যাখ্যান করবার সিদ্ধান্ত তো কংগ্রেস শিগগিরই জানাবে বলে মনে হচ্ছে; জানাবার পরে অবস্থাটা এই দাঁড়াবে যে, সংবিধান-রচনার দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাব একমাত্র মুসলিম লীগই মেনে নিল, এবং অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতেও তারা খুবই উৎসুক। পক্ষান্তরে দুটি প্রস্তাবকেই প্রত্যাখ্যান করেছে কংগ্রেস। যুক্তির দিক থেকে ভাইসরয়ের তখন সরকার গঠনের জন্য মুসলিম লীগকে আহ্বান করবার প্রয়োজন দেখা দেবে। তার কারণ ঘোষণায় এ-সম্পর্কে বলা হয়েছে :

"প্রধান দুটি দল, অথবা তাদের মধ্যে যে-কোনও একটি, যদি কোয়ালিশন সরকার গঠনে যোগ দিতে অসম্মত হয়, তাহলে ১৬ই মের প্রস্তাব যাঁরা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যথাসম্ভব তাঁদের প্রতিনিধিস্থানীয় করে একটি সরকার গঠন করাই হচ্ছে ভাইসরয়ের অভিপ্রায়।"

আলোচনায় বাধা দিয়ে আমি এই সময়ে বললুম যে, লীগের সঙ্গে প্যারিটির ভিত্তিতে এবং কোনও কংগ্রেসী মুসলিমকে তালিকায় না রেখেই কংগ্রেস-দল সরকারে যোগ দিক, গান্ধীজী এটা চান না, এইখানেই তাঁর আসল আপত্তি। তার কারণ, এমন অবস্থার তিনি সৃষ্টি হতে দিতে চান না, যাতে কংগ্রেস শুধুই হিন্দুদের প্রতিনিধিস্থানীয় একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায়। তবে সংবিধান-রচনা সংক্রান্ত দীর্ঘ-মেয়াদী প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁর আপত্তি এতটাই প্রবল নয়। প্রাদেশিক গোষ্ঠী বিন্যাস সম্পর্কে ১৬ই মের বিবৃতির ১৯নং অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে, সে বিষয়ে গান্ধীজীর সংশয় মিশন দূর করতে পারেন। গান্ধীজীর আর-একটি আপত্তি হচ্ছে গণ-পরিষদে ভারতবর্ষের ইউরোপীয় সমাজকে কয়েকটি আসন দেবার ব্যাপারে। (প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে তাঁদের কিছু-সংখ্যক আসন ছিল।) তা ব্রিটিশ সরকারই এই আপত্তির অবসান ঘটাতে পারেন। ব্রিটিশ সরকার যদি ঘরোয়াভাবে কিন্তু শক্ত ভঙ্গীতে এখানকার ইউরোপীয় সমাজকে জানিয়ে দেন যে, তাঁদের ভোটাধিকার তাঁরা যেন প্রয়োগ না করেন, তাহলে নিশ্চয়ই এখানকার ইউরোপীয় সমাজ সেই নির্দেশ অমান্য করতে সাহসী হবেন না। আমার এই যুক্তিটা বল্লভভাইয়ের ভাল লাগল। মিশনকে তিনি জানালেন যে, অন্তর্বর্তী সরকার গঠন সম্পর্কে বিভিন্ন দলের সঙ্গে যা-কিছু আলোচনা হয়েছে, তা যদি তাঁরা নাকচ করে দিতে পারেন, এবং আমি যে দুটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছি, মিশন যদি সে-বিষয়ে গান্ধীজীকে সন্তোষজনক আশ্বাস দিতে পারেন, তাহলে তিনি হয়ত সংবিধান-রচনা সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে ওয়ার্কিং কমিটীকে রাজী করাতে পারবেন, এবং অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রশ্নটির মীমাংসাও দিনকয়েক বাদে নতুন করে হতে পারবে। বল্লভভাইয়ের কথায় যেন হতাশার অন্ধকারে আশার আলো দেখতে পাওয়া গেল। সার্ স্ট্যাফোর্ড একটা কাগজে তখুনি কয়েকটি কথা লিখে সর্দার প্যাটেলকে দেখালেন। আগে যেখানে ছিল "১৬ই মের ঘোষণার ১৯নং অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী", এখন সেখানে পাঠ বদলে করা হল "১৬ই মের ঘোষণার বিধান অনুযায়ী"। রাষ্ট্রীয় ঘোষণাপত্রের ১৯নং অনুচ্ছেদটির বিষয় ছিল প্রাদেশিক গোষ্ঠীবিন্যাস। গণ-পরিষদের সদস্য হিসেবে যাঁরা নির্বাচিত হতে চান, সেইসব প্রার্থীদের দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নেবার জন্য সরকার থেকে আইনসভাগুলির স্পীকারদের কাছে সংকল্প-পত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই সংকল্প-পত্রে যা বলা হয়েছিল, তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ই মে তারিখের ঘোষণার ১৯নং অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী প্রার্থীরা সংবিধান-সংস্থায় নির্বাচিত হতে চাইছেন। ফলে এই সন্দেহ দেখা দিল যে, প্রাদেশিক গোষ্ঠী-বিন্যাসের ব্যাপারে প্রতিটি সদস্যকে আগে থাকতে সংকল্পবদ্ধ করে রাখা হচ্ছে, এবং এ-ব্যাপারে তাঁদের কোনও স্বাধীনতা থাকবে না। সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স সেক্ষেত্রে শব্দ-বিন্যাস যেভাবে পরিবর্তিত করবার প্রস্তাব করলেন, তাতে স্পষ্ট হল যে, গণ-পরিষদের সদস্যরা যে সংকল্প-পত্রে স্বাক্ষর করবেন, তাতে তাঁদের উপরে সংবিধান-রচনায় সহযোগিতা করবার দায়িত্ব বর্তাবে মাত্র। মিশন বল্লভভাইকে এই আশ্বাসও দিলেন যে, প্রাদেশিক আইনসভাগুলির ইউরোপীয়

সদস্যরা যাতে গণ-পরিষদের সদস্যপদের জন্য কোনও প্রার্থী দাঁড় না করান অথবা গণ-পরিষদের নির্বাচনে ভোট না দেন, তাঁরা তার ব্যবস্থা করবেন। বল্লভভাই বললেন, এই দুটি ব্যবস্থার ভিত্তিতে তিনি এখন কংগ্রেসকে বোঝাতে পারবেন যে, অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করেও সংবিধান-রচনা সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। ক্রিপ্‌স এবং পেথিক-লরেন্‌স এজন্য সর্দারকে তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানালেন। তাঁরা স্থির করলেন যে, এই আলোচনা সম্পর্কে সর্দার প্যাটেল গান্ধীজীকে সব জানাবার পরে তাঁরা গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করবেন।

পরবর্তী কাজ হল গান্ধীজীকে রাজী করানো। সর্দার প্যাটেল গান্ধীজীর কাছে গিয়ে ব্রিটিশ মন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর আলোচনার বিবরণ তাঁকে জানালেন। শ্রীপ্যারেলাল তাঁর দিনলিপিতে ১৯৪৬ সনের ২৪শে জুন তারিখে যা লিখে রেখেছিলেন, তা থেকে তাঁর গ্রন্থে তিনি নীচের অংশটুকু তুলে দিয়েছেন :

"আজ সকালে বাপুর সঙ্গে দেখা করতে এসে সুধীর তাঁকে জানালেন যে, গতকাল রাত্রে তিনি ক্রিপ্‌সের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ক্রিপ্‌স তাঁকে জানিয়েছেন, তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, কংগ্রেস যদি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাটি মেনে নেয় ও স্বল্পমেয়াদী প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য ১৬ই জুনের ঘোষণা অনুযায়ী ক্যাবিনেট মিশন যা-কিছু করেছেন, তা নাকচ করে দেওয়া হবে এবং এ-ব্যাপারে আবার নতুন করে চেষ্টা করা হবে। তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বাপু ও সর্দারকে তাঁরা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। জিন্নাকে প্রদত্ত লর্ড ওয়াভেলের আশ্বাস যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, মনে হয় যে, তাঁরা এবারে সেই জঞ্জাল সাফ করবার সংকল্প নিয়েছেন। সকাল সাতটায় সর্দার আর সুধীরকে সঙ্গে নিয়ে বাপু ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।"

২৪শে জুন সকালে ব্রিটিশ মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে যাবার আগে গান্ধীজী একটুকরো কাগজে আমার উদ্দেশে (সেদিন ছিল তাঁর মৌন-দিবস) লিখে দেন : "As you have been go-between I suggest that you too should be present if they don't mind. Ascertain from them." অর্থাৎ "তুমিই যেহেতু মধ্যস্থ, তাই আমি প্রস্তাব করছি যে, তাঁরা যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে তোমাকেও উপস্থিত থাকতে হবে। আপত্তি হবে কিনা, তাঁদের কাছে জেনে নাও।" ঐতিহাসিক সেই চিরকুটটি আমি আজও আমার কাছে সযত্নে রেখে দিয়েছি। গান্ধীজী যখনই ভাইসরয় কিংবা ব্রিটিশ মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, তখনই তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে নিতেন। কিন্তু সব সময়ে যে আমি তাঁদের আলোচনার জায়গায় উপস্থিত থাকতাম, তা নয়। পাশের ঘরে বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতাম আমি। গান্ধীজী এইসব আলোচনা-বৈঠকে যাবার পথে গাড়ির মধ্যে বসে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ভালবাসতেন। কখনও-কখনও তাঁর মনের কথা আমাকে জানিয়ে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতেন তিনি। ফিরতি-পথেও বলতেন, বৈঠকে কী কী কথা হল, সে সম্পর্কে তাঁর নিজের ধারণাই বা কী। কখনও-কখনও আবার এ সম্পর্কে আমার মনোভাবও তিনি জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন। এবারে কিন্তু তিনি বিশেষভাবেই চাইছিলেন যে, ব্রিটিশ মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনার সময় আমাকেও সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে। টেলিফোন করে স্যার

স্ট্যাফোর্ডকে তাই জিজ্ঞেস করলাম যে, আমি উপস্থিত থাকলে তাঁরা কিছু মনে করবেন কিনা। তিনি বললেন, আমি যদি আলোচনায় যোগ দিই, তাহলে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা সকলেই খুশী হবেন। অতঃপর ১৯৪৬ সনের ২৪শে জুন তারিখের সেই গুরুত্বপূর্ণ সকালবেলায়, ঘড়িতে যখন সাতটা বাজে, গান্ধীজী বল্লভভাই আর আমি গিয়ে ক্যাবিনেট-মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিলাম।

সেদিন ছিল সোমবার। গান্ধীজীর মৌন-দিবস। টুকরো এক-একটা কাগজে তিনি তাঁর বক্তব্য তাই লিখে জানাচ্ছিলেন, আর তাঁর পাশে বসে সেগুলি আমি পড়ে শোনাচ্ছিলাম। গান্ধী-সংগ্রহাগারে শ্রীপ্যারেলাল এই চিরকুটগুলি অতি যত্ন করে রেখে দিয়েছেন। আগের দিন ক্রিপ্‌স আমাকে যা বলেছিলেন, সংক্ষেপে তিনি সেটা আবার ব্যাখ্যা করে বললেন। শুনে গান্ধীজী একটা টুকরো-কাগজে লিখলেন :

"সুধীরের কাছে আমি যা শুনেছি, তা কিন্তু একেবারেই আলাদা কথা। আমি যা বুঝেছি তা এই যে, অন্তর্বর্তী সরকার সম্পর্কে এ-যাবৎ যা-কিছু পরিকল্পনা হয়েছে, তা সাকুল্যে নাকচ করে দিয়ে অবস্থাটাকে আপনারা আবার নতুন করে বিবেচনা করে দেখতে চান।"

কথাগুলি আমি পড়ে শোনালাম। তারপর বললাম যে, সার্ স্ট্যাফোর্ডও কিন্তু বস্তুতপক্ষে আলাদা কিছু বলছেন না। সার্ স্ট্যাফোর্ডও অতঃপর সবিস্তারে তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন, তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, কংগ্রেসের পক্ষে যদি অন্তর্বর্তী কোয়ালিশন সরকার গঠনের স্বল্পমেয়াদী প্রস্তাব মেনে নেওয়া সম্ভব না-ও হয়, তবু সংবিধান-রচনার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাটাও সে যদি মেনে নেয়, তাহলে অবস্থাটা তখন এই দাঁড়াবে যে, সংবিধান-রচনার পরিকল্পনাটা কংগ্রেস আর লীগ দুই পক্ষই মেনে নিল। সেক্ষেত্রে, তাঁদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, সময় অনুকূল হলে, দুই পক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে একটি সরকার গড়া যাবে। পক্ষান্তরে কংগ্রেস যদি দুটি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে মিঃ জিন্না দাবি জানাতে পারবেন যে, ১৬ই মের প্রস্তাব (সংবিধান-রচনা সংক্রান্ত) যে-পক্ষ মেনে নিয়েছে, শুধু সেই মুসলিম লীগের প্রতিনিধি নিয়ে সরকার গড়া হোক।

এই ব্যাখ্যা শুনে গান্ধীজী তাঁর টুকরো-কাগজগুলিতে লিখলেন, "আপনারা যদি বলেন যে, প্রস্তাব-গ্রহণের এই ভিত্তিতে আপনারা সরকার গড়বেন, তাহলে আমার তো মনে হয় সে-সরকার কার্যকর হবে না। আপনাদের যদি দারুণ রকমের তাড়া না থাকে, এবং এ-বিষয়ে আপনারা যদি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান, তাহলে মুখ খুলবার পরে, অর্থাৎ রাত আটটার পরে, সানন্দে আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলব। ইতিমধ্যে, ভাইসরয়ের ২২শে জুন তারিখের পত্রে উল্লেখিত প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে (কংগ্রেস) ওয়ার্কিং কমিটী যে পত্র পাঠাচ্ছেন সেটি আপনাদের হস্তগত হবে। আমার ধারণা, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রশ্নটির উপরে এই পত্রখানি নতুন আলো ফেলেছে। আমি যতদূর জানি, মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করাটা যেখানে ওয়ার্কিং কমিটীর পক্ষে আত্মহত্যার তুল্য হয়ে দাঁড়ায়, একমাত্র সেখানেই তাঁরা প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন; তা নইলে মিশনকে বাধা দেওয়া নয়, তার কাজে সাহায্য করাই হচ্ছে ওয়ার্কিং কমিটীর উদ্দেশ্য। সুধীরের কথায় এই অন্ধকারের মধ্যেও আমি আলো দেখতে পেয়েছি। কিন্তু সত্যিই সেটা আলো তো?

"গণ-পরিষদের প্রসঙ্গে বলি, গতকাল বিকেল পর্যন্তও আমি এই কথাই ভেবেছি যে, গণ-পরিষদকে কার্যকর করতে কংগ্রেসের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু

গতকাল যে নিয়মাবলী আমি পড়লাম, আমার মানসিকতার তা আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। মারাত্মক একটা ত্রুটি রয়েছে দেখলাম। তার জন্য কাউকে আমি দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু ত্রুটি ত্রুটিই। তিন পক্ষ যেন তিন রকমের মন নিয়ে কাজ করে সাফল্যলাভের আশা না করে।"

সরকার থেকে প্রাদেশিক আইনসভাগুলির স্পীকারদের কাছে প্রেরিত নির্দেশের মধ্যে যে ত্রুটি ছিল, তারই কথা বলছিলেন গান্ধীজী। নির্দেশে বলা হয়েছিল, গণ-পরিষদের সদস্যপদে যাঁরা নির্বাচিত হতে চান, সেই প্রার্থীদের এইমর্মে একটি সংকল্প-পত্রে স্বাক্ষর করতে হবে যে, ১৬ই মের রাষ্ট্রীয় ঘোষণাপত্রের ১৯নং অনুচ্ছেদের (যার বিষয় ছিল প্রাদেশিক গোষ্ঠী-বিন্যাস) বিধান অনুযায়ী তাঁরা একটি সংবিধান রচনা করবেন। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ঘোষণাপত্রটির তাৎপর্য ছিল এই যে, ইচ্ছা হলে তাঁরা প্রদেশ-গোষ্ঠী গড়তে পারবেন, তবে নিতান্ত সেইজন্যই যে তাঁরা মিলিত হবেন তা নয়।

সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স জানালেন যে, গান্ধীজী যাকে 'ত্রুটি' বলছেন, তার সংশোধন করাই মিশনের উদ্দেশ্য। এ-কথা শুনে গান্ধীজী লিখলেন :

"সেক্ষেত্রে সমগ্র বিষয়টি থেকে বিশেষ-একটি ধারাকে বিচ্ছিন্ন করা আপনাদের উচিত হবে না। 'সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় ঘোষণাপত্রের বিধান অনুযায়ী'—এ-কথা বলছেন না কেন?"

সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স বললেন, বিষয়টিকে ওইভাবে পরিষ্কার করে নিশ্চয়ই বিবৃত করা যেতে পারে। গান্ধীজী অতঃপর তাঁর শেষ কথা লিখে দিলেন :

"যাই হোক, আজ রাত্রে আমি এই প্রশ্নটি নিয়েও সানন্দে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব। আপনাদের অনেক অসুবিধে ঘটালাম; তার জন্য আমি দুঃখিত। তবে, কেন যে এত সব করছি, তা আপনি বুঝবেন বলেই আমি আশা করি।"

স্পষ্ট বোঝা গেল, গান্ধীজী এতক্ষণে একটু নরম হয়েছেন। ঠিক হল, সেইদিনই সন্ধ্যায় ভাইসরয়-ভবনে মিশনের এক আনুষ্ঠানিক বৈঠকের ব্যবস্থা হবে, এবং ভাইসরয়কে সঙ্গে নিয়ে ক্যাবিনেট-মন্ত্রীরা তাতে গান্ধীজীর সঙ্গে মিলিত হবেন। ফিরবার পথে গাড়ির মধ্যে বসে সর্দার বল্লভভাই গান্ধীজীকে জিজ্ঞেস করলেন, "১৯ নম্বর অনুচ্ছেদটি নিয়ে আপনার সন্দেহের কথা আপনি প্রকাশ করেছিলেন; সে-বিষয়ে এ'রা আপনাকে স্পষ্ট আশ্বাস দিলেন। এর চাইতে বেশী আর আপনি কী চান?" গান্ধীজীর মনে তখনও কিছু সন্দেহ ছিল। এ-বিষয়ে আমার মতামত জানতে চাইলেন তাঁরা। আমি বললাম, গান্ধীজী যা চান, মিশন যে তা দিতে রাজী আছেন, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

সর্দার বল্লভভাইয়ের মনোভাব যে কত বাস্তববাদী, এবং কাজের যে তাতে কত সুবিধে হয়, সোমবার সকালবেলার সেই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকেই ব্রিটিশ মন্ত্রীরা তা বুঝতে পেরেছিলেন। সেই সকালবেলাতেই খানিক বাদে লর্ড পেথিক-লরেন্সের প্রাইভেট সেক্রেটারি ফ্র্যাংক টার্নবুল আমাকে টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করলেন যে, সন্ধ্যাবেলা ভাইসরয়-ভবনে যে বৈঠক হবার কথা, তাতে উপস্থিত থাকবার জন্য সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে আমি রাজী করাতে পারব কিনা। সর্দার প্যাটেল তখন কংগ্রেসের সভাপতি নন; গান্ধীজীর মতন একটা আলাদা-রকমের প্রতিষ্ঠাও তাঁর ছিল না। তিনি আমাকে বললেন, ভারত-সচিব যদি বিশেষভাবে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান, একমাত্র তাহলেই তিনি বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেন। ভারত-সচিবের

পক্ষ থেকে এইজন্যই আমার কাছে এ বিষয়ে একটি চিঠি পাঠানো হল। চিঠিখানি এখানে তুলে দিচ্ছি :

ক্যাবিনেট ডেলিগেশনের দপ্তর,
ভাইসরয়-ভবন,
নয়াদিল্লি,
২৪. ৬. ৪৬

"প্রিয় সুধীর ঘোষ,

আজ সকালে মিঃ গান্ধী যখন উইলিংডন ক্রেসেন্‌টে এসে মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন সর্দার প্যাটেলও তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন; তাতে করে ডেলিগেশনের এই ধারণা হয়েছে যে, আজ রাত্রে মিঃ গান্ধী যখন ডেলিগেশন ও ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, তখন তিনি চাইতে পারেন যে, সর্দার প্যাটেলও তাঁর সঙ্গে থাকুন। এই কারণেই ডেলিগেশন আপনাকে এ-কথা জানিয়ে দেবার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সর্দার প্যাটেল এখানে আসুন, এইটেই যদি মিঃ গান্ধীর অভিপ্রেত হয়, তাহলে সর্দার প্যাটেলের আগমনে ডেলিগেশনও খুবই খুশী হবেন।

আন্তরিকভাবে আপনার
এফ. এফ. টার্নবুল"

সুধীর ঘোষ, এসকোয়্যার।

বলাই বাহুল্য, আমি বল্লভভাইয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলুম না; তবে আমাদের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। আর তাই, চিঠি যদিও আমার নামে এল, বল্লভভাই তবু বিনা দ্বিধায় আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

২৪শে জানুয়ারির সন্ধ্যায় গান্ধীজীর সঙ্গে গিয়ে ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন বল্লভভাই। বৈঠকে যোগ দিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে, গণ-পরিষদের সদস্যপদে নির্বাচনপ্রার্থীদের জন্য যে সংকল্প-পত্র পাঠানো হয়েছিল, মন্ত্রীরা সে-বিষয়ে কিছু জানতেন না। তাঁদের অজ্ঞাতসারে সরকারের রিফর্মস দপ্তর থেকে এই সংকল্প-পত্র প্রেরণ করা হয়। সর্দার প্যাটেলের মনে হল যে, এ সম্পর্কে মিশন যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। গান্ধীজীর চিত্তে কিন্তু তখনও সন্দেহ-সংশয় ছিল। সেইদিনই রাত্রে সার্‌ স্ট্যাফোর্ডের কাছে তিনি যে চিঠি লেখেন, এই সন্দেহ-সংশয় তাতে ব্যক্ত হয়েছে। চিঠিখানি এখানে উদ্ধৃত হল :

ভাঙ্গী কলোনি,
রীডিং রোড,
নয়াদিল্লি,
২৪শে জুন, ১৯৪৬

"প্রিয় সার্‌ স্ট্যাফোর্ড,

আপনার ও লেডি ক্রিপ্‌সের প্রতি আমি গভীর সহানুভূতি বোধ করছি। এই চিঠি আপনাকে লিখতে না-হলেই আমি খুশী হতুম। কিন্তু লিখতে আমাকে

হবেই। আমার ধারণা, ওয়ার্কিং কমিটী এখন গণ-পরিষদে যোগ দিতে উৎসুক; কিন্তু তাই বলে তো আমি অন্ধকারে ঝাঁপ দেবার পরামর্শ দিতে পারি না। এই অন্ধকারের মধ্যেও সুধীর আমাকে যে আলো দেখাতে পেরেছিল, তা যেন হারিয়ে গিয়েছে। যাবতীয় প্রতিশ্রুতির দায়-দায়িত্বকে যদি সত্যিই আপনি আবর্জনাকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে চান, তবে তখন তো শুধুই শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। আলোচনার সময়ে এ-বিষয়ে আরও তথ্য জানবার জন্য পীড়াপীড়ি করা তো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। গভরনরদের কাছে প্রেরিত নির্দেশে যে কোনও ক্ষতি হবে না, তা বোঝা গেল বটে, কিন্তু এরই ফলে এক মারাত্মক সম্ভাবনার পথ খুলে গিয়েছে। ওয়ার্কিং কমিটীকে অতএব আমি এই পরামর্শ দিতে চাই যে, অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে যদি যোগ-সম্পর্ক না থাকে, তাহলে দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাবটিকে তাঁরা যেন মেনে না নেন। নিজের বিবেক-বুদ্ধির বিরুদ্ধে আমি কিছু করতে পারব না, এবং তাঁদের আমি এই পরামর্শই দেব যে, সম্পূর্ণভাবে তাঁরা যেন নিজেদের বিচার-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হন। এইটুকুই আমি বলতে চাই যে, কথাবার্তা বলে এমন আলো আমি পেলাম না, আমার চারপাশের অন্ধকারকে যা মুছে দিতে পারে। বিপদের আশঙ্কাকে প্রমাণ করতে পারি, এমন কোনও স্পষ্ট তথ্যও অবশ্য আমার হাতে ছিল না।

আপনাকে এই চিঠি লিখতে হল, এর জন্য আমি দুঃখিত। তবে আমার মনে হয়েছিল যে, আগামীকাল সকাল সাড়ে ছটায় মৌলানা সাহেবের বাড়িতে ওয়ার্কিং কমিটীর যে বৈঠক হবে, সেখানে আমার অনুভূতির কথা জানাবার আগেই আপনাকে এটা জানানো আমার কর্তব্য।

আন্তরিকভাবে আপনার

সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স। এম. কে. গান্ধী"

পরদিন অর্থাৎ ২৫শে জানুয়ারি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় বল্লভভাই অতি জোরালোভাবে এই যুক্তির অবতারণা করলেন যে, সংবিধান-সংক্রান্ত প্রস্তাবটিকে মেনে নেবার ব্যাপারে যদি আর কিছুমাত্র টালবাহানা চলে, কংগ্রেসের সম্মান তাহলে নিদারুণভাবে নষ্ট হবে। বিতর্কে সেদিন বল্লভভাই-ই জয়লাভ করলেন, এবং ২৫শে জানুয়ারি তারিখেই কংগ্রেস তার এই সিদ্ধান্তের কথা ক্যাবিনেট মিশনকে আনুষ্ঠানিক-ভাবে জানিয়ে দিল যে, অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের স্বল্পমেয়াদী প্রস্তাবটি কংগ্রেস মেনে নিচ্ছে না; তবে সংবিধান-রচনা সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাবটিকে মেনে নিচ্ছে। তিন মাস ধরে যে চেষ্টা চালিয়েছিলেন ক্যাবিনেট মিশন, তার ফল প্রায় সবটাই নষ্ট হতে বসেছিল; বল্লভভাই তার অর্ধেকটা বাঁচিয়ে দিলেন। ক্যাবিনেট-মন্ত্রীরা এজন্য বল্লভভাইয়ের প্রতি যথেষ্টই কৃতজ্ঞতা বোধ করেছিলেন। এর মাত্র কয়েকদিন বাদে, ১৯৪৬ সনের ২৯শে জুন, তাঁরা ভারত পরিত্যাগ করেন।

নয়াদিল্লি থেকে ক্যাবিনেট মিশনের রওনা হবার আগের দিন অর্থাৎ ২৮শে জুন সন্ধ্যার কথা বলছি। সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স আর লর্ড পেথিক-লরেন্স আমাদের 'ত্রিমূর্তি'কে—অর্থাৎ আগাথা হ্যারিসন, হোরেস আলেকজানডার আর আমাকে—আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন যে, তাঁদের ২নং উইলিংডন ক্রেসেন্টের বাড়িতে গিয়ে সেদিন তাঁদের সঙ্গে আমাদের সন্ধ্যা যাপন করতে হবে। আসলে এইভাবেই

তাঁরা আমাদের বলতে চেয়েছিলেন : "ধন্যবাদ"। আড়ম্বর ছিল না। শান্ত পরিবেশে আমাদের নৈশাহার শেষ হল। তারপর কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে শান্তভাবে কিছুক্ষণ গল্পসল্প করলুম। গল্প মানে বিগত তিনটি ঐতিহাসিক মাসের স্মৃতিরোমন্থন। আমাদের সাফল্য আর আমাদের ব্যর্থতা নিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলুম আমরা। মনে পড়ে যে, সার্ স্ট্যাফোর্ড সেদিন স্বৈরতন্ত্রী সমাজ-ব্যবস্থা আর মুক্ত সমাজ-ব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য নিয়ে অতি সুন্দরভাবে আলোচনা করেছিলেন। অমায়িক পেথিক (লর্ড পেথিক-লরেন্সকে তাঁর বন্ধুরা সবাই স্নেহভরে 'পেথিক' বলে ডাকতেন) স্ট্যাফোর্ডকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা স্ট্যাফোর্ড, তুমি তো সোভিয়েট রাশিয়ার খবর রাখো, সেখানে তুমি রাষ্ট্রদূত ছিলে। তা কী রকমের সমাজ-ব্যবস্থা সেখানে গড়ে তোলা হয়েছে?" স্ট্যাফোর্ড বললেন, "খুব সহজেই সেটা বুঝিয়ে দিতে পারি, পেথিক। এইটুকু বললেই হবে যে, সেখানকার সমাজ-ব্যবস্থায় সুধীরের মতন মানুষের সন্ধান পাওয়া যাবে না।" শুনে আমরা জিজ্ঞেস করলুম, এ-কথার অর্থ কী। সার্ স্ট্যাফোর্ড বললেন, "বলছি। এই যে আমাদের সামনে সুধীর বসে আছে, এ হচ্ছে তরুণ একজন ভারতীয়। তা এই তরুণ ভারতীয়টিকে ইতিপূর্বে আর কখনও আমরা দেখিনি। মাত্র তিন মাস আগে ভারতবর্ষে এসে আমরা প্রথম ওকে দেখলুম। ওর সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি? ডিক কেসি যেটুকু জানিয়েছিল, মাত্র সেইটুকুই তো আমরা জানতুম। জানতুম যে, মিঃ গান্ধীর সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে। বাস্, তার বেশী আর কিছুই আমরা জানতুম না। তা গত তিন মাস ধরে মিঃ গান্ধীর তরুণ দূত হিসেবে রোজই—তাও রোজ মাত্র একবার নয়, অনেকবার করে—দিনে-রাত্রে ওকে আমরা দেখেছি। বহু সময়েই মিঃ গান্ধীকে ও বলেছে যে, তিনি আমাদের ভুল বুঝছেন এবং আমাদের প্রতি অবিচার করছেন; আবার আমরা কোথায় গান্ধীজীর প্রতি আস্থা না-রেখে ভুল করেছি এবং বিভ্রাট বাধিয়েছি, তাও ও আমাদের অসঙ্কোচে জানিয়েছে। আমাদের যিনি প্রধান প্রতিপক্ষ, তারই দূত হিসেবে কাজ করেছে সুধীর; অথচ আমাদের যেগুলি গুপ্ত-খবর, তাও ওকে জানাতে আমরা দ্বিধা করিনি। অথচ মাত্র তিন মাস আগেও ওকে আমরা চিনতুম না! রুশ সমাজ-ব্যবস্থায় এমনটা হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের সমাজ-ব্যবস্থার এইখানেই হচ্ছে আসল পার্থক্য।"

নিঃসঙ্গ তীর্থযাত্রী

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যরা সংবিধান-রচনা সংক্রান্ত প্রস্তাবটি মেনে নিলেন। গান্ধীজীর এতে সায় ছিল না, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, তাতে ক্ষুণ্ণ না হয়ে, ওয়ার্কিং কমিটীকেই এ-ব্যাপারে প্রবলভাবে তিনি সমর্থন করলেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য এইখানেই। ৭ই জুলাই তারিখে, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনে, কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রী অংশ এই সিদ্ধান্তের প্রবল বিরোধিতা করেন; তাঁদের নেতা ছিলেন শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ। কিন্তু সেই বিরোধিতা সত্ত্বেও কংগ্রেস ২০৪-৫১ ভোটে ব্রিটিশ পরিকল্পনা অনুমোদন করল। দলের উদ্দেশে গান্ধীজী বললেন :

"এ-কথা স্বীকার করতে আমি রাজী আছি যে, প্রস্তাবিত গণ-পরিষদকে জনসাধারণের পারলামেনট বলা যায় না। এর অনেক ত্রুটি আছে। কিন্তু আপনারা সকলেই তো পোড়-খাওয়া ঝানু যোদ্ধা। সৈনিকরা কখনও বিপদকে ভয় পায় না। প্রস্তাবিত গণ-পরিষদে ত্রুটি যদি কিছু থেকেই থাকে, তবে আপনারাই তা দূর করবার ব্যবস্থা করবেন। এটাকে একটা চ্যালেন্‌জ্‌ হিসেবে নিন। এর মোকাবিলা করতে হবে। এটাকে অজুহাত হিসেবে কাজে লাগিয়ে প্রস্তাবটিকে প্রত্যাখ্যান করা ঠিক হবে না। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ কাল বললেন যে, প্রস্তাবিত গণ-পরিষদে যোগ দেওয়া বিপজ্জনক হবে; সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটীর প্রস্তাবটিকে নাকচ করাই তাঁদের কর্তব্য। তাঁর এই কথায় আমি বিস্মিত হয়েছি।"

সেক্ষেত্রে, অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের স্বল্পমেয়াদী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেও সংবিধান-রচনা সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাবটিকে যে মেনে নেওয়া হয়েছিল, এ সম্পর্কে শ্রীনেহরু যা বললেন, তা অবশ্য ক্ষোভজনক। মৌলানা আজাদের কাছ থেকে সভাপতির দায়িত্বভার নেবার সময় বোম্বাই কংগ্রেসের অধিবেশনে ৬ই জুলাই তারিখে তিনি বললেন যে, এটা কংগ্রেস কর্তৃক দীর্ঘ কিংবা স্বল্পমেয়াদী কোনও প্রস্তাব মেনে নেবার প্রশ্নই নয়। "আপাতত আমরা স্থির করেছি যে, গণ-পরিষদে যাব। বাস্, তাছাড়া আর কোনও-কিছুর সম্পর্কেই আমাদের কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।" তাও অন্য কোথাও নয়, এক সাংবাদিক বৈঠকেই তিনি বলে বসলেন যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ যে 'খ'-গোষ্ঠীতে যোগ দেবার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেবে, এমন সম্ভাবনাই বারো আনা; এই প্রদেশ-গোষ্ঠীটি অতএব ভেঙে পড়বে। তিনি আরও বললেন, "নিশ্চিত বিশ্বাস ও প্রত্যয় নিয়েই আমি বলতে পারি যে, বাংলা-আসামকে জুড়ে গোষ্ঠী গড়া যাবে না, তার কারণ কোনও অবস্থাতেই আসাম এই ব্যবস্থাকে বরদাস্ত করবে না।" মিঃ জিন্নাও কিছুমাত্র দেরি না-করে শ্রীনেহরুর বিবৃতিকে ধিক্কার দিলেন। তিনি বললেন, "এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা যার উপরে দাঁড়িয়ে আছে, এতে করে সেই মূল ভিত্তিটিই অস্বীকৃত হল। এর মৌলিক ব্যবস্থাবলী এবং পরিকল্পনা-মান্যকারী দলগুলির দায়িত্ব ও অধিকারও এতে অস্বীকৃত হয়েছে।" ১৬ই মে তারিখের সংবিধান-রচনা সংক্রান্ত প্রস্তাবটি শ্রীনেহরু ও তাঁর সহকর্মীদের দ্বারা স্বীকৃত হবার পূর্বে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন এ-কথা পরিষ্কারভাবে তাঁদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, মিঃ জিন্না যে 'ভিত্তি'র কথা বলছেন,

এমন কী, তাও পালটানো যাবে, কিন্তু দুই দলের যে-কোনও একটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের দ্বারা সে-কাজ হওয়া চাই। ভারত-সচিব তখন এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "এই ভিত্তিতে যদি তাঁরা একযোগে কাজ করতে রাজী হন, তবে তার অর্থ হবে এই যে, ভিত্তিটাকে তাঁরা মেনে নেবেন। কিন্তু অতঃপর যদি ভিত্তিটাকে তাঁরা পালটাতে চান, তাহলে দুই দলের যে-কোনও একটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মত অনুযায়ী তাও করা যাবে।" শ্রীনেহরুর মতন মানুষের পক্ষে অতএব এমন কথা বলা খুবই ক্ষোভের ব্যাপার যে, সংবিধান-রচনা সংক্রান্ত ব্রিটিশ প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি যা-খুশি করতে পারেন, এবং তাঁর দল যদিও প্রস্তাবটি মেনে নিয়েছে, তাতে কোনও দায়িত্ব বর্তায়নি। শ্রীনেহরুর বিবৃতিতে মিঃ জিন্না খুবই চটে গেলেন। আসলে কথাটা এই যে, ব্রিটিশ সরকারের দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী দুটি প্রস্তাবই মেনে নেওয়া সত্ত্বেও যে তাঁকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে আহ্বান করা হয়নি, মিঃ জিন্না এতে খুবই হতাশ হয়েছিলেন। সেই আশাভঙ্গজনিত ক্রোধের জের তখনও কাটেনি।

মিঃ জিন্নাকে, বস্তুত, পাকিস্তান-দাবি পরিহার করেই সংবিধান-রচনা সংক্রান্ত ব্রিটিশ প্রস্তাবটিকে স্বীকার করতে হয়েছিল। ২৭শে জুলাই তারিখে বোম্বাইয়ে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের এক বৈঠকে তিনি ব্রিটিশ প্রস্তাব সম্পর্কে মুসলিম লীগের সেই স্বীকৃতি প্রত্যাহার করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, লীগের পক্ষে অতঃপর তাদের "জাতীয় লক্ষ্য পাকিস্তানকেই আঁকড়ে ধরা ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর নেই।" স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স আর বল্লভভাই প্যাটেলকেও ধিক্কার দিলেন তিনি।

আমি তখন লনডনে। ক্যাবিনেট মিশন দিল্লি থেকে লনডন যাত্রা করবার আগে সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স গান্ধীজীকে অনুরোধ জানিয়ে গিয়েছিলেন যে, আমাকে যেন লনডনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ২রা জুলাই তারিখে প্রধানমন্ত্রী মিঃ অ্যাটলির কাছে আমার পরিচয় জানিয়ে গান্ধীজী আমাকে একটি চিঠি লিখে দেন। সেই পরিচয়পত্রে আমাকে তিনি "গ্রেট ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বিশ্বাসযোগ্য ও দৃঢ় সেতু" বলে বর্ণনা করেছিলেন। এই অসামান্য প্রশংসায় আমি বিস্মিত হই, এবং গান্ধীজীকে জিজ্ঞেস করি, সত্যিই কি এ-কথা তিনি বিশ্বাস করেন? গান্ধীজী তাতে বলেন, "গান্ধী যা বিশ্বাস করে না, তা লিখবার জন্য সে কাগজে কলম ঠেকায় না।" যাই হোক্, বিমানযোগে ইংল্যানড্ যাব, ফিরবও বিমানযোগে, তা ছাড়া দু-তিন মাস সেখানে আমাকে থাকতে হবে। ব্যাপারটা যে বেশ ব্যয়সাধ্য, গান্ধীজী তা ভুলে যাননি। তা ছাড়া, সেই ব্যয় বহনের ক্ষমতা যে আমার নেই, তাও তিনি জানতেন। কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ তখন বল্লভভাই প্যাটেল। গান্ধীজীকে বললুম, বল্লভভাই আমাকে জানিয়েছেন যে, এটা কোনও সমস্যাই নয়। গান্ধীজী তাতে বললেন, কংগ্রেস থেকে তিনি আমাকে টাকা নিতে দেবেন না। আমি যে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে লনডন যাব, এটা তাঁর মনঃপূত নয়। ব্রিটিশ মন্ত্রীদের অনুরোধে, গান্ধীজীর পূর্ণ সম্মতিক্রমে, আমি সেখানে যাচ্ছি; কংগ্রেসের উপরে নির্ভর না করে এ-ব্যাপারে আমাকে স্বাধীন থাকতে হবে। তাই হল। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী মিঃ জে আর ডি টাটা আমার যাবতীয় খরচা দিয়ে দিলেন।

টিকেট কিনতে গিয়ে দেখলুম, গণ্ডগোল বেধেছে। গণ্ডগোল যেভাবে বাধানো হয়েছিল, সেই পদ্ধতিটা একেবারে মার্কা-মারা; এর থেকে আমি অবস্থাটাও বেশ

আঁচ করতে পারলুম। খুলে বলি। যুদ্ধের সময় বিদেশ-যাত্রার ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণভাবেই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। নয়াদিল্লি থেকে রওনা হবার আগে সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স আমাকে জানিয়েছিলেন যে, যাত্রার ব্যাপারে আমাকে যাতে সর্ব-প্রকার সুবিধে দেওয়া হয়, ক্যাবিনেট মিশন তার জন্য ভাইসরয়ের দপ্তরকে নির্দেশ দিয়ে যাবেন। কথাটা আমার মনে ছিল। ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি জর্জ অ্যাবেলকে তাই আমি সব জানালুম। অ্যাবেল তাতে বললেন যে, এ নিয়ে কিছু অসুবিধে দেখা দিয়েছে। ভাইসরয় ভাবছেন যে, মিঃ ঘোষ যদি লনডন যান, তাহলে মিঃ জিন্নাকেও একবার জিজ্ঞেস করা উচিত যে, তিনি তাঁর কোনও প্রতিনিধিকে লনডন পাঠাতে চান কিনা। প্রোটোকলের এই যে বাড়াবাড়ি, সেকালের ভাইসরয় আর বড়-বড় সব ব্রিটিশ আমলাদের এইটেই ছিল চ্যারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আমি বললুম, কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে আমি লনডন যাচ্ছি না। কিন্তু সে-যুক্তি খারিজ হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ আমি সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্সকে একখানি চিঠি লিখে জানালুম যে, আমার যাত্রার ব্যাপারে ভাইসরয় আপত্তি তুলেছেন। ১৯শে জুলাই তারিখে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি তার উত্তরে আমাকে লিখলেন :

বোর্ড অব ট্রেড,
মিল ব্যাংক, এস. ডব্লু. ১
১৯শে জুলাই, ১৯৪৬

"প্রিয় সুধীর,

৮ই জুলাই তারিখে সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্সকে তুমি যে চিঠি লিখেছ, আমাকে তিনি তার উত্তর লিখতে বলেছেন।

তোমার যুক্তরাজ্যে আসা নিয়ে কিছু ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এর জন্যে তিনি এবং আমরা সকলেই দুঃখিত। তিনি আশা করছেন, এ-চিঠি তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছতে-পৌঁছতেই ভুল-বোঝাবুঝির অবসান হবে।

চিরকালের জন্য তোমার
জর্জ বি. ব্লেকার।"

সুধীর ঘোষ, এস্কোয়্যার।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি আমাকে জানালেন যে, বি. ও. এ. সি আমার জন্য আসনের ব্যবস্থা রাখবে। লনডনে পৌঁছে আমি জানতে পারলুম যে, আমার লনডন-যাত্রা নিয়ে ভারত-সচিব আর ভাইসরয়ের মধ্যে দ্রুত তার-বিনিময় হয়েছিল। ভারত-সচিব বেশ কড়াভাবেই লর্ড ওয়াভেলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, প্রতিনিধি পাঠাবার জন্য মিঃ জিন্নাকে কিছু বলবার কোনও প্রশ্নই উঠছে না। মিঃ ঘোষ যে লনডন যাচ্ছেন, সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে নয়, কিংবা কারও প্রতিনিধি হয়েও নয়। মিঃ গান্ধী কিংবা কংগ্রেস, কারও পক্ষ থেকেই তিনি লনডন যাচ্ছেন না। বস্তুত ভারত-সচিব আর সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্সের অনুরোধেই তিনি লনডন যাচ্ছেন। তাঁদের ধারণা, মিঃ ঘোষ যদি লনডনে থাকেন, তাতে তাঁদেরই কাজের সুবিধে হবে।

কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে 'প্যারিটি' রক্ষার উৎকট আগ্রহটা বস্তুত এক বিচিত্র পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল!

আমি লনডনে গিয়ে পৌঁছবার ঠিক পরেই, ২৭শে জুলাই তারিখে, শুরু হল মিঃ জিন্নার আক্রমণের পালা। যে-সমস্ত দল ও ব্যক্তি ভারতকে অখণ্ড রাখবার চেষ্টা করছিলেন, মিঃ জিন্না এবারে তাঁদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। লীগ ইতিপূর্বে ক্যাবিনেট মিশনের সংবিধান-রচনা সংক্রান্ত প্রস্তাবটি মেনে নিয়েছিল। সেই স্বীকৃতি তিনি প্রত্যাহার করলেন, এবং ঘোষণা করলেন যে, ১৯৪৬ সনের ১৬ই অগস্ট থেকে তিনি 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' শুরু করবেন। খবর শুনে লর্ড পেথিক-লরেন্স আমাকে তাঁর দপ্তরে ডেকে পাঠালেন, এবং খুবই বেদনাভরে বললেন, "নেহরুর কাজের কী ফল হয়েছে দ্যাখো। বোম্বাইয়ের সাংবাদিক-বৈঠকে যে দায়িত্বহীন উক্তি করেছিলেন তিনি, জিন্না তারই ফলে একটা অজুহাত পেয়ে গেলেন। নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবার জন্য ঠিক এইরকমের একটা অজুহাতই তিনি খুঁজছিলেন।" যাই হোক, লর্ড পেথিক-লরেন্স বললেন যে, জিন্না যাতে সহযোগিতা করতে রাজী হন, তার জন্য শেষবারের মত একটা চেষ্টা করে দেখা দরকার, এবং ভাইসরয়ের বদলে শ্রীনেহরুরই তা করা উচিত। তিনি বললেন যে, শ্রীনেহরু যদি ব্যক্তিগতভাবে মিঃ জিন্নার সম্মুখীন হন, তাহলে ভাল হয়। যুক্তিসঙ্গত শর্তে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেবার জন্য মুসলিম লীগকে রাজী করানো আদৌ সম্ভব কিনা, সেটা বুঝবার জন্য আর-একবার চেষ্টা করতে হবে, এবং এই শেষ চেষ্টা শ্রীনেহরুরই করা সঙ্গত। এই শেষ চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, ব্রিটিশ সরকারের সামনে তাহলে একটিমাত্র পথই খোলা থাকবে, মুসলিম লীগকে বাদ দিয়েই সরকার গঠনে উদ্যোগী হতে হবে। শ্রীনেহরুর অপরিণামদর্শী কাজের জন্য খুবই দুঃখ প্রকাশ করলেন তিনি। আমাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই যে তাঁর সঙ্গে কথা হল, ব্যক্তিগতভাবে এর সারমর্ম আমি গান্ধীজীকে জানাতে পারি কিনা। তিনি বললেন, গান্ধীজী সেক্ষেত্রে হয়ত মিঃ জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে শ্রীনেহরুকে রাজী করাতে পারেন।

লনডন থেকে সেবাগ্রামে গান্ধীজীর কাছে কোনও খবর পাঠানো সহজ ছিল না, সে-কথা বলাই বাহুল্য। আশঙ্কা ছিল, ভারত সরকার সেটি মধ্যপথেই জেনে যাবেন, এবং ধাপে-ধাপে সে-খবর মিঃ জিন্নার কানেও পৌঁছে যাবে। এর দিন কয়েক আগেই লনডন থেকে টেলিফোনযোগে বল্লভভাইয়ের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম। তার ঠিক পরেই স্যর্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স আমাকে ডেকে পাঠান, এবং জানিয়ে দেন যে, এ-সব কথাবার্তা আদৌ গোপন থাকে না। দেখলাম, আমার কথাবার্তা যখন সরকার-বাহাদুরের কানে পৌঁছে গিয়েছে, তখন ভারতবর্ষে কোনও গোপন খবর পাঠাতে হলে তার জন্য অন্য কোনও পথ খুঁজে বার করতে হবে। ৪ঠা আগস্ট তারিখে সেবাগ্রামের ঠিকানায় গান্ধীজীকে আমি খোলাখুলি একটা কেব্‌ল্‌ পাঠালাম। তাতে তাঁকে জানিয়ে দিলাম যে, এয়ারমেলে তাঁকে আমি একটা জরুরী বার্তা পাঠিয়েছি, ওয়ার্কিং কমিটীর সামনে সেটা পাঠ করতে হবে।

কেব্‌ল্‌টির বাংলা তর্জমা হচ্ছে এই :

"গান্ধীজী
সেবাগ্রাম
ওয়ার্ধা

নানা কারণে এতদিন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। এখন ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠকের আগে আপনাকে কিছু জানাতে চাই। কথাটা এয়ার-লেটারে সম্পূর্ণ ব্যক্ত করেছি। সে-চিঠি শুক্রবার আপনার কাছে পৌঁছবে। এখানকার বন্ধুরা এই সময়ে আপনার সাহায্য চান। তাঁরা আশা করেন, কংগ্রেস যাতে গণ-পরিষদকে সাফল্যমণ্ডিত করবার সংকল্প পুনর্বার ঘোষণা করে, সর্ববৃহৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ সকল শ্রেণীর সংখ্যালঘুর প্রতি সুবিচার করে এবং সাম্প্রতিক আস্ফালন ও ভীতিপ্রদর্শনের উপরে—এখানে যার মূল্যনির্ণয়ে ভুল হয়নি—বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করে, তার জন্য আপনি কংগ্রেসের উপরে আপনার প্রভাব বিস্তার করবেন। তাঁরা আশা করেন, কংগ্রেস-সভাপতিকে যদি অনুরোধ করা হয় এবং কাজটা যদি ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত শর্তে সম্ভব হয়, তাহলে কোয়ালিশন সরকার গড়বার জন্য শেষবারের মত চেষ্টা করে দেখতে তিনি সম্মতিজ্ঞাপন করবেন। অন্যপক্ষ যদি তারপরেও নিয়ম মেনে খেলতে রাজী না হয়, তাহলে যে ন্যায়সঙ্গত ও উচিত ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হবে, তাতে আমার সন্দেহ নেই। আশা করি, কংগ্রেস এখন এগিয়ে আসবে এবং তৃতীয় পক্ষের হাত থেকে কর্মোদ্যোগের দায়িত্ব তুলে নেবে। ভালবাসা জানাই। সুধীর।
১৮ গ্রসভেনর প্লেস, লনডন।"

তারবার্তাকে বিশদভাবে বিবৃত করে অতঃপর গান্ধীজীর কাছে আমি একটি চিঠি লিখলাম। খামের উপরে কিন্তু গান্ধীজীর নাম লিখলাম না। লিখলাম আমার স্ত্রীর নাম-ঠিকানা। তারপর সেটিকে ডাকে না ফেলে, টাটার লনডন অফিসে নিয়ে গেলাম। তাঁদের অনুরোধ জানালাম, বোমবাই-অফিসে তাঁরা রুটিন-মাফিক যে-সব চিঠিপত্র পাঠান, তার সঙ্গে এই চিঠিখানিকেও বোমবাইয়ে পাঠাতে হবে; এবং সেখান থেকে লোক-মারফত এটিকে দিল্লিতে আমার স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিতে হবে। টাটার কর্মীরা এ-কাজ চট্‌পট্‌ করে দিলেন। ৮ই অগস্‌ট তারিখে ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর যে বৈঠক হয়, সেখানে এই চিঠিখানিই ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়। চিঠিখানি এখানে তুলে দিচ্ছি :

লনডন,
৪ঠা অগস্‌ট, ১৯৪৬

"প্রিয় বাপু,

জিন্নার হুম্‌কির (প্রত্যক্ষ সংগ্রামের) পরে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ভাইসরয়কে নির্দেশ দেন, জিন্নাকে ডেকে পাঠিয়ে তিনি যেন তাঁকে জানিয়ে দেন যে, জিন্না যদি নিয়ম মেনে খেলতে রাজী না থাকেন, তাহলে কংগ্রেস এবং অন্যান্য যাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ও জিন্নাকে বাদ নিয়ে এগিয়ে যেতে রাজী আছেন, তাঁদের হাতেই দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হবে বলে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত করেছেন। ভাইসরয় তাতে বলেন যে, হুম্‌কি দেবার পরেই যদি জিন্নাকে ডেকে পাঠানো হয়, তাহলে এই ধারণার সৃষ্টি হবে যে, ব্রিটিশ সরকার তাঁর হুমকিতে ভয় পেয়েছেন।

জিন্নার সঙ্গে তিনি দেখা না করবার পরামর্শ দেন। ক্যাবিনেটও তাতে সম্মত হন।

জিন্নার আস্ফালনে বস্তুত উপকারই হয়েছে। অবস্থা এর ফলে আরও সহজ হল। এখানকার মন্ত্রীদের, এবং এখানে ও ভারতবর্ষে শাসন-ব্যবস্থার, টনক নড়বার খুবই দরকার ছিল। এই আস্ফালনেই তাঁদের টনক নড়েছে। গতানুগতিকভাবে এখন আর তাঁরা মনে করেন না যে, কংগ্রেসীরা তাঁদের শত্রু এবং মুসলিমরা তাঁদের বন্ধু। কারা যে তাঁদের বন্ধু, এবং কারা যে বন্ধু নয়, সেটা এখন তাঁরা বুঝতে পেরেছেন। জিন্নার হুমকিতে প্রভূত উপকার হয়েছে। তিনি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন; এখন আর তাঁর উদ্ধারের আশা নেই।

ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত করেছেন যে, নিকটভবিষ্যতেই কংগ্রেসের হাতে দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হবে। তাঁদের প্রতিনিধিকে তাঁরা প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছেন। তবে আপনার কাছে তাঁদের ঐকান্তিক বক্তব্য এই যে, লীগ যাতে সরকারে যোগ দেয়, তার জন্য একটা শেষ চেষ্টা করে দেখা উচিত—অবশ্য ন্যায্য ও যুক্তিসংগত শর্তে যদি তা আদৌ সম্ভব হয়। তাঁরা মনে করেন যে, এ-ব্যাপারে ভাইসরয় কিছু করলে তাতে কোনও লাভ হবে না। তাঁদের কথা এই যে, কোনওরকম আমন্ত্রণের জন্য অপেক্ষা না করে এবং কোনও আনুষ্ঠানিকতার মুখাপেক্ষী না হয়ে কংগ্রেস-সভাপতির পক্ষে এখন ভাইসরয়ের হাত থেকে এ-কাজের দায়িত্ব নিয়ে নেওয়া উচিত। বলা হচ্ছে যে, সভাপতির পক্ষে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করে এ-কথা জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য যে, তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করতে প্রস্তুত, এবং মিঃ জিন্না আদৌ নিয়ম মেনে খেলতে চান কিনা সেটা দেখবার জন্য তিনি মিঃ জিন্নার কাছে যেতে রাজী আছেন। ভাইসরয়কে নির্দেশ দেওয়া আছে যে, অনুরূপ প্রস্তাব এলে তিনি যেন তৎক্ষণাৎ তাতে সম্মত হন। এই ব্যবস্থা বস্তুত ভাইসরয় কর্তৃক কংগ্রেস-সভাপতিকে সরকার গঠনে আহ্বান জানাবার সামিল। মিঃ জিন্না যদি সহযোগিতা করতে অসম্মত হন, এবং এমন শর্ত আরোপ করেন যা কংগ্রেস-সভাপতির পক্ষে হয়ত গ্রহণ করা অসম্ভব, তাহলে কংগ্রেস-সভাপতি ভাইসরয়কে জানিয়ে দেবেন যে, তিনি তাঁর যথাসাধ্য করেছেন, এবং মিঃ জিন্নার সঙ্গে কাজ করা সত্যিই সম্ভব নয়। এইরকমের একটা শেষ চেষ্টার ফল হবে এই যে, কংগ্রেসের যুক্তিবাদিতা ও ঔদার্যই এতে প্রকাশ পাবে এবং বিশ্বের চোখে কংগ্রেসের মর্যাদা এতে আরও বাড়বে। ব্রিটিশ সরকারের কাছে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এখন পূর্ববর্তী যে-কোনও সময়ের তুলনায় অনেক বেশী। কংগ্রেস-সভাপতির চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে ভাইসরয়কে এই নির্দেশ দেওয়াই আছে যে, সেক্ষেত্রে কংগ্রেস এবং অন্যান্য সংখ্যা-লঘুদের প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠনের ব্যাপারে ভাইসরয়কে সাহায্য করবার জন্য তিনি কংগ্রেস-সভাপতিকে আহ্বান করবেন। বলা হচ্ছে যে, পাঁচটি আসন শূন্য রাখাই উচিত; মতের পরিবর্তন ঘটলে লীগ যাতে পরে এসে সরকারে যোগ দিতে পারে, তার জন্য দরজা খোলা রাখতে হবে। এইভাবে যে সরকার গঠিত হবে, আইনগতভাবে সেটাও ভাইসরয়ের সরকারই হবে বটে, তবে কংগ্রেস-সভাপতিই কার্যত তার কর্তা হবেন। ভাইসরয়কে নির্দেশ দেওয়া আছে, তিনি মাথা গলাবেন না। শুনলাম, আশ্বাসের ব্যাপার নিয়ে পণ্ডিতজী সম্প্রতি ভাইসরয়কে একটি চিঠি লিখেছেন। বলা হচ্ছে যে, কংগ্রেসকে আপনি বুঝিয়ে বলুন, মুসৌরীতে মৌলানা সাহেবের কাছে ভাইসরয় যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতেই যেন কংগ্রেস সন্তুষ্ট থাকে।

কংগ্রেসের তাতে কোনও লোকসান হবে না। ব্রিটিশ সরকারেরও তাতে কাজের সুবিধে হবে। ভাইসরয়কে নিয়ে যে সমস্যা বেধেছে, তা তাঁরা বোঝেন, কিন্তু এক্ষুনি এ-সম্পর্কে তাঁদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের ব্যাপার নিয়ে চার্চিল তো ইতিমধ্যেই তাঁদের চূড়ান্ত রকমের বেগ দিচ্ছেন। সদ্য তাঁরা শাসন-ভার হাতে পেয়েছেন, এবং বহু রকমের সমস্যা নিয়ে তাঁরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

গণ-পরিষদের প্রসঙ্গে জানাই, আপনার প্রতি অনুরোধ, কংগ্রেস যে বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ সকল শ্রেণীর সংখ্যালঘুর প্রতিই সুবিচার করতে দৃঢ়সংকল্প, এবং প্রত্যেকের জন্য সুব্যবস্থা করতে উৎসুক, কংগ্রেসকে দিয়ে এ-কথা আপনি পুনর্বার ঘোষণা করাবার ব্যবস্থা করুন। এই অনুরোধও জানানো হচ্ছে যে, মিঃ জিন্নার হুমকিকে যেন গুরুত্ব দেওয়া না হয়, এবং তাঁর চ্যালেন্‌জের যেন কোনও জবাব দেওয়া না হয়। তার কারণ, যে-ব্যবস্থা আমাদের অভিপ্রেত, ব্রিটিশ সরকার তা অবলম্বন করবার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই নিয়েছেন। কংগ্রেসকে তাঁরা অনুরোধ জানাচ্ছেন, ঔদার্য যে দুর্বলতা বলে অপব্যাখ্যাত হতে পারে, এই ঝুঁকিকে স্বীকার করে নিয়েও কংগ্রেস যেন তার স্বভাবসিদ্ধ মহানুভবতা ও ঔদার্য দেখায়। এখানকার বক্তব্য এই যে, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি সুষ্ঠু প্রস্তাব যদি গৃহীত হয়, এবং তারপর কংগ্রেস-সভাপতি যদি গিয়ে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করেন (সর্দারকেও সঙ্গে নেওয়া যেতে পারে), তাতেই কাজ হবে। জরুরী কথাটা এই যে, কংগ্রেসকে এখন অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে, এবং কর্মোদ্যোগের দায়িত্ব ব্রিটিশের হাতে ছেড়ে না দিয়ে আপন হাতে সেটা তুলে নিতে হবে।

আমি জানি, যে-অর্থে এই চিঠি লেখা হল, সেই অর্থেই আপনি এটি পড়বেন।

সকলকে ভালবাসা জানাই।

সুধীর।"

আমার চিঠিখানিকে সর্বদিক থেকে বিচার-বিবেচনা করে দেখে অতঃপর ওয়ার্কিং কমিটী একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তাতে বলা হল :

"কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটী দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিল তাঁদের পূর্ব-সিদ্ধান্ত পালটে দিয়ে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, গণ-পরিষদে তাঁরা যোগ দেবেন না।...কমিটী এও লক্ষ্য করছেন, মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে এইমর্মে সমালোচনা করা হচ্ছে যে, ১৬ই মের রাষ্ট্রীয় ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত প্রস্তাবগুলি কংগ্রেস কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে মেনে নেওয়া হয়েছে। কমিটী এ-কথা স্পষ্ট করে জানাতে চান যে, এই ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত সমুদয় প্রস্তাব তাঁরা অনুমোদন করেননি বটে, কিন্তু পরিকল্পনাটিকে তাঁরা সামগ্রিকভাবেই মেনে নিয়েছেন। এর মধ্যেকার অসঙ্গতিগুলিকে মিটিয়ে নেবার জন্য, এবং বক্তব্যে যে-সব ফাঁক রয়েছে, ঘোষণাপত্রে বর্ণিত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেগুলি পূর্ণ করবার জন্য তাঁরা পরিকল্পনাটির ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন একটি মৌলিক ব্যবস্থা; এবং প্রতিটি প্রদেশেরই যেমন গোষ্ঠী গড়বার ও তাতে যোগ দেবার তেমনি না-গড়বার ও যোগ না-দেবার স্বাধীনতা রয়েছে। ঘোষণাপত্রে যে ব্যবস্থা রয়েছে, সেই অনুযায়ীই ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসা হবে, এবং গণ-পরিষদের কংগ্রেসীয় সদস্যদেরও সেই অনুযায়ী কাজ করবার জন্য কংগ্রেস পরামর্শ দেবে।

গণ-পরিষদের সার্বভৌম চরিত্রের উপরে, অর্থাৎ বাইরের কোনও শক্তি অথবা কর্তৃত্বের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে তার কাজ করবার ও ভারতবর্ষের জন্য একটি সংবিধান রচনার অধিকারের উপরে, কমিটী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তবে এ-কাজে আভ্যন্তর যে সীমাবদ্ধতা অবশ্যম্ভাবী, স্বভাবতই তারই মধ্যে পরিষদকে কাজ করতে হবে; এবং সঙ্গত সর্বপ্রকার দাবি ও স্বার্থের সর্বাধিক পরিমাণ স্বাধীনতা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করে স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধান রচনার জন্য এই পরিষদ ব্যাপকতম সহযোগিতা পাবার চেষ্টা করবে।...কমিটী আশা করেন যে, মুসলিম লীগ এবং আর যাঁরাই জাতির তথা আপনাপন বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করেন, তাঁরা সকলেই এই মহান কাজে যোগ দেবেন।"

ভারত-সচিবের নির্দেশে ১২ই অগস্ট তারিখে ভাইসরয় ঘোষণা করেন যে, একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের জন্য কংগ্রেস-সভাপতিকে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এবং কংগ্রেস-সভাপতি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। ভারত-সচিবের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী গান্ধীজী ইতিমধ্যে শ্রীনেহরুকে বোম্বাইয়ে মিঃ জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজী করিয়েছিলেন। শ্রীনেহরু সেখানে যে সাড়া পেলেন তা নেহাতই আড়ষ্ট। তবে ব্রিটিশ সরকার অতঃপর এই ভেবে শান্তি পেলেন যে, এ-ব্যাপারে যা-কিছু করা সম্ভব ছিল তা সবই করা হয়েছে। সুতরাং এবারে তাঁরা কংগ্রেস-প্রতিনিধি এবং অন্যান্য যে-সব সংখ্যালঘু-প্রতিনিধি কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করতে সম্মত তাঁদের নিয়ে সরকার গঠনে উদ্যোগী হলেন। ঠিক হল যে, মুসলিম লীগের সহযোগিতা কীভাবে পাওয়া যেতে পারে, তা কার্যত যিনি প্রধানমন্ত্রী তিনিই ভেবে দেখবেন। শ্রমিক সরকারের এই যে স্পষ্ট, সতেজ ও—আমার বিবেচনায়—নিঃস্বার্থ সিদ্ধান্ত, অহমিকা ও গোঁড়ামি এর শক্তিক্ষয় করে একে বানচাল করে দিল। আগেই সে-কথা সবিস্তারে বলেছি। উদ্যোগটা ব্যর্থ হল। নেহরুর হঠকারিতা, ওয়াভেলের অযোগ্যতা, ব্রিটিশ আমলাদের মজ্জাগত জড়তা এবং ক্ষমতালোভী লীগ-নেতাদের নিষ্ঠুর কারসাজিই এই ব্যর্থতাকে—সৃষ্টি না করুক—ত্বরান্বিত করেছে।

১৯৪৬ সনের ২রা অকটোবর তারিখে, অর্থাৎ গান্ধীজীর জন্মদিনে, মুসলিম লীগের মুখপত্র 'ডন' আমার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখল যে, আমি হচ্ছি গান্ধীজীর জন্মদিনের উপহার। বন্ধুরা এসম্পর্কে সোৎসাহে বললেন যে, একমাত্র বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়েই ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা হয়ে থাকে। ওইটুকুই আমার সান্ত্বনা।

'ডন' লিখল :

"মিঃ গান্ধীর বয়স আজ আটাত্তর বছর হল। তাঁর সফল রাজনৈতিক জীবনে যে বিপুলপরিমাণ অহিংস বাণী-বিবৃতি তিনি উৎপাদন করেছেন, তার পরিণামে বহু লোক মারা পড়েছে এবং বহু লোকের হাড় ভেঙেছে। এই কারণেই আমাদের বলতে দ্বিধা হচ্ছে যে, আরও অনেকবার যেন এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে।

এই শুভদিনে সাকরেদটিই তাঁর কাছে ছিলেন না। মহামানবই একটা কাজের ভার দিয়ে তাঁকে প্রিয় বন্ধু অ্যাটলির কাছে পাঠিয়েছেন। এই নিয়ে একটা গল্প আছে। অজ্ঞজনের সুবিধার্থে সেটা গোড়ার থেকে বিবৃত করা ভাল।

* * *

বিগত সম্মেলনের সময়ে সিমলায় এক উজ্জ্বল সকালে আমরা শেষ-সংবাদের জন্য হোটেল সেসিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় ছোটখাটো একটি চটপটে মানুষ আমাদের সামনে এসে হাজির হলেন। পরনে ঢিলেঢালা খদ্দরের পায়জামা

আর খদ্দরের কুর্তা; তদুপরি একটি খদ্দরের চাদর তার গলা থেকে উলটো 'ইউ' অক্ষরের মত ঝুলে আছে। চোখে মস্ত একজোড়া কাঁচকড়ার চশমা। পরনের খদ্দর এককালে নিশ্চয়ই পরিষ্কার ছিল।

* * *

সহযোগী জনৈক সাংবাদিক বললেন, 'ইনিই হচ্ছেন মিঃ সুধীর ঘোষ।'

আমরা বললুম, 'বটে! নামটা আমাদের পরিচিত। তা জরুরী সব চিঠি হাতে নিয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াবার এই কাজটা নিশ্চয়ই বেশ মজাদার, তাই না?'

পাঁচ ফুট দু ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের খুদে মহামানবটি এ-কথা শুনে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন এবং নিরুত্তাপ গলায় বললেন, "এর চাইতে অনেক বড় কাজও আমি করতে পারি!" সাংবাদিক-বন্ধুটি আমাদের কানে-কানে বললেন, 'ছোট গান্ধীকে আপনারা চটিয়ে দিয়েছেন।'

* * *

আলোচনার বিষয় চটপট পালটে নিয়ে আমরা আবহাওয়ার প্রসঙ্গ তুললুম। কিন্তু পরিবেশ ইতিমধ্যেই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল; বিষণ্ণ চিত্তে তিনি 'দি রিট্রিট'-এর দিকে রওনা হলেন। মনে হল, তাঁর কুর্তা-পকেট থেকে একটা মোটাসোটা এনভেলাপকে যেন উঁকি মারতে দেখা গেল।

* * *

অতঃপর ভাঙ্গী কলোনি যখন আবার চিঠি-চাপাটির কেন্দ্র হয়ে উঠল, এবং ভাঙ্গী কলোনি আর ভাইসরয়-ভবনের মধ্যে চিঠিপত্রের চালাচালি চলতে লাগল, বার্তার পিছনে বার্তাবহ তখন ঢাকা পড়ে গেলেন। তারপর এক প্রাতঃকালে আমরা এই খবর পেলুম যে, ছোট গান্ধী গিয়ে লনডনে উদিত হয়েছেন।

* * *

আমরা ভাবলুম, 'যাক্, খুদে মহামানবের তাহলে আবার একটা কাজ জুটেছে।' অতঃপর চিন্তাটাকে আমরা ঝেড়ে ফেললুম। কিন্তু খুদের মাহাত্ম্য এইখানেই যে, তাঁদের ঝেড়ে ফেলবার উপায় নেই। মহা আড়ম্বরে এই ছোট গান্ধীটি সেদিন রয়টারকে একটি ইনটারভিউ দিয়েছেন।

* * *

শ্রমিক দলের পত্রিকা 'হেরাল্ড'ও মিঃ গান্ধীর এই অগ্রদূতের উপরে কিঞ্চিৎ আলো ফেলেছেন। তার মোদ্দা কথাটা এই যে, এবারেও তাঁর সঙ্গে একখানি চিঠি ছিল বটে। এটি মিঃ অ্যাটলির কাছে লেখা। এর বয়ানও প্রকাশিত হয়েছে।

* * *

মহামানব তাঁর সাকরেদটির পরিচয় দিতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, তিনি 'একটি সেতু', 'একজন প্রবল প্রেমিক', 'একজন ভাষ্যকার'। সেই যে তিনি একদিন গর্বভরে আমাদের বলেছিলেন, "এর চাইতে অনেক বড় কাজও আমি করতে পারি," সে-কথার তাৎপর্যটা এবারে বুঝতে পারছি। পৃথিবীতে যারা তুলনাহীন, তাদের কথা বলতে গিয়ে শেক্স্পীয়র কি, উন্মাদ আর কবির সঙ্গে, প্রেমিকের কথাও বলেননি?

* * *

নাকি ভাষ্যকারের ভূমিকাটাই আরও বড়? বিখ্যাত সেই ৮নং অনুচ্ছেদের যে ব্যাখ্যা ক্যাবিনেট মিশনকে শুনিয়েছিলেন মিঃ গান্ধী, সেটা এতই জটিল যে, ইংল্যানডে ফিরে যাবার পরে সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স পাছে তাঁর পার্ট ভুলে যান,

তাই তাঁকে খেই ধরিয়ে দেবার জন্যে কি একজন প্রম্‌টারকে সেখানে মোতায়েন রাখবার দরকার হল?

* * *

তবে লক্ষ্য করছি, ডন-এর কাছে যে-কথা সাকরেদটি স্বীকার করেননি, ডেলি হেরাল্‌ড-এর কাছে তা তিনি কবুল করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, তাঁর কাজটা হচ্ছে বার্তাবহের কাজ।

* * *

প্রসঙ্গত একটি ফারসী প্রবচন আমাদের মনে পড়ছে: 'খর্‌-এ-ইসা গর্‌ বা মক্কা রওয়াদ্‌, হনুজ খর্‌ বশাদ্‌'

* * *

মিঃ গান্ধী যে এমন চমৎকার একটি বার্তাবহ জোগাড় করতে পেরেছেন, তার জন্য তাঁর জন্মদিনে আমাদের নিজস্ব অভিনন্দন (সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত) জানাই। বুঝতে পারছি, ডাককর্মীরা যদি ধর্মঘট করেন, তাহলে অন্তত মিঃ গান্ধীর কোনও অসুবিধে হবে না।"

১৬ই আগস্‌ট তারিখে শুরু হল মিঃ জিন্নার 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'। আর তারই সূত্রে কলকাতা জুড়ে হত্যা, ধর্ষণ আর লুণ্ঠনের এক নারকীয় তাণ্ডব শুরু হল। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ অতঃপর পূর্ববঙ্গেও ছড়িয়ে যেতে কিছুমাত্র দেরি হয়নি। নোয়াখালি জেলায় মুসলমানরা হিন্দুদের উপরে যে অত্যাচার শুরু করল, তা অবর্ণনীয়। পরে, হিন্দুরাও বিহারের মুসলিম-সংখ্যালঘুদের উপরে সমান মাত্রায় অত্যাচার চালাতে থাকে। নোয়াখালি জেলায় হিন্দু নারী ও শিশুদের উপরে যে জান্তব অত্যাচার শুরু হয়, তার খবর পেয়ে গান্ধীজী স্তম্ভিত হয়ে যান। তিনি আমাকে বাংলাদেশের গভরনর ফ্রেড বারোজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পাঠিয়ে দেন। দার্জিলিংয়ে আমি গভরনর ও তাঁর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। বারোজ তার কিছুদিন আগেই বিমান থেকে নোয়াখালির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এসেছেন। এ-বিষয়ে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন। আকাশ থেকে নোয়াখালি জেলায় যা-কিছু তিনি দেখেছেন, একটা মানচিত্রের সাহায্যে তা তিনি আমাকে সবিস্তারে বুঝিয়ে বললেন। ফ্রেড বললেন, তাঁর মনে করবার কারণ ঘটেছে যে, বাংলা দেশের প্রধানমন্ত্রী শহীদ সুরাবর্দী বড়ই অস্পষ্ট চরিত্রের মানুষ, কিন্তু তাঁর কিংবা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে তো নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গঠিত এই বাংলা-সরকারকে খারিজ করা সম্ভব নয়। বেশ ব্যগ্রভাবেই তিনি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, গভরনর হিসেবে তাঁর পক্ষে যা-কিছু করা সম্ভব, তা তিনি করেছেন। দীর্ঘ আলোচনার উপসংহারে তিনি বললেন, "আচ্ছা সুধীর, বলো তো, যে-আসনে আমি বসে আছি, সেখানে যদি তোমাকে বসানো হত, তাহলে তুমি কী করতে?" আমি দেখলুম, স্পষ্টভাষণের এটা একটা মস্ত সুযোগ। সুযোগটা আমি ছাড়লুম না। বললুম, "হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কথা না-হয় ভুলেই যাওয়া যাক। যা ঘটেছে, তা যে শাসন-ব্যবস্থারও একটা মারাত্মক বিপর্যয়, তা তো আর অস্বীকার করা চলে না। সেই শাসন-ব্যবস্থার আপনি প্রধান। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের উপায় যখন আপনার নেই, তখন স্বেচ্ছায় এ-দোষের দায়িত্ব আপনার নিজের উপরে নেওয়া উচিত, এবং পদত্যাগ করে দেশে

মহাত্মা গান্ধী ও লর্ড পেথিক-লরেন্‌স। একটি বৈঠকের শেষে (এপরিল, ১৯৪৬)। পিছনে গ্রন্থকার।

ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ডেলিগেশনের দফতর থেকে মহাত্মা গান্ধী বেরিয়ে আসছেন (৩ এপ্রিল, ১৯৪৬)। সঙ্গে গ্রন্থকার।

চলে যাওয়া উচিত। নৈতিক দায়িত্ব স্বীকারের যে একটা ব্রিটিশ ট্র্যাডিশন রয়েছে, আপনি পদত্যাগ করলে তার মর্যাদা রক্ষিত হবে।" আমার পরামর্শ শুনে ফ্রেড কিছুটা হকচকিয়ে গেলেন। পরামর্শটা তিনি যে নেননি, সে-কথা বলাই বাহুল্য। তবে ১২ই অকটোবর তারিখে দিল্লি ফিরে আমি যখন গান্ধীজীকে সব জানালুম, তখন তিনিও আমার কথা মেনে নিয়ে বললেন যে, গভরনরের পক্ষে পদত্যাগ করাই সঙ্গত কাজ হত। সেইদিনই গান্ধীজী নোয়াখালি যাবার জন্য দিল্লি থেকে কলকাতা যাত্রা করলেন। ১৯৪৬-এর অকটোবর থেকে ১৯৪৭-এর মার্চ পর্যন্ত তিনি নোয়াখালিতে ছিলেন। ভাই ভাইয়ের প্রাণ নিয়েছে, এই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য তিনি তখন নোয়াখালির গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কাউকে তিনি দোষ দিতে চাননি। তিনি শুধু ক্ষত নিরাময় করতে চেয়েছিলেন। আমার উপরে এইসময়ে দায়িত্ব ছিল, ক্রিপ্স আর পেথিক-লরেন্সের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। তাঁদের কাছে যে-সব চিঠি লিখতুম আমি, তার খসড়াটা আগে গান্ধীজীর কাছে পাঠিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতুম। ক্রিপ্সের কাছে লেখা আমার সেইসময়কার চিঠিপত্র ও তার উত্তরের নমুনা এখানে পেশ করছি :

২৪ বারাখাম্বা রোড, নয়াদিল্লি,
৫ই নভেম্বর, ১৯৪৬

"প্রিয় সার্ স্ট্যাফোর্ড,

আপনার ২৯শে অকটোবর তারিখের চিঠির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। চীন থেকে যে লেডি ক্রিপ্স সম্পর্কে আপনি সুসংবাদ পেয়েছেন, এ-কথা জেনে খুব খুশী হলাম। ইংল্যানডে ফেরার পথে তাঁর দেখা পাবার জন্য উৎসুক হয়ে আছি।

আমাদের এখানকার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। এক বিপর্যয় থেকে আর-এক বিপর্যয়ের দিকে পা বাড়াচ্ছি আমরা। পূর্ববঙ্গের বীভৎস ঘটনাবলীর পর সংবাদ পাওয়া গেল যে, উত্তর বিহারে তার বদ্‌লা নেওয়া হচ্ছে। বিহারে হিন্দুরা যা করছে, তা পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা যা করেছিল, তারই মত জঘন্য ও অমানুষিক। পার্থক্য শুধু এই যে, হিন্দুরা কোথাও মুসলিম নারীর সম্ভ্রমনাশ করেনি। তবে বিহারে অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন আর হত্যার যে তাণ্ডব চলেছে তা বাংলার মতই ভয়াবহ। মনে হয়, ইতিমধ্যেই প্রায় হাজার খানেক মুসলমান নিহত হয়েছে। এই বর্বরতার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষেরই একটা স্থায়ী নৈতিক ক্ষতি হচ্ছে। নিজেদের আমরা পশুর পর্যায়ে নামিয়ে এনেছি। এই উন্মত্ততা যে সারা দেশে ছড়িয়ে যাচ্ছে, আগের চিঠিতেই তা জানিয়েছিলাম। যেখানেই হিন্দুরা সংখ্যালঘু, সেখানেই মুসলিমরা তাদের হত্যা করবে; যেখানেই মুসলিমরা সংখ্যালঘু, সেখানেই হিন্দুরা তাদের হত্যা করবে। এই বীভৎসতার সূত্রপাত যে মুসলিমদের দ্বারা হয়েছিল, সে-কথা ভেবে সান্ত্বনা পাওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু এর প্রতিকার কী? আমি তো দেখছি এর কোনও প্রতিকার নেই। গত রাত্রে বল্লভভাই অতি নৈরাশ্যভরে বললেন, "অত চিন্তা করে কোনও লাভ নেই। ভারতবর্ষকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করা ছাড়া আর কিছুই আমরা করতে পারি না।" বস্তুত ভারতবর্ষ এখন ঈশ্বরেরই হাতে। তার কারণ, দেশের জন্য আর-কাউকেই

দায়ী করা যাচ্ছে না। না দায়ী করা যাচ্ছে ভাইসরয়কে, না অন্তর্বর্তী সরকারকে, না গভরনরদের, না প্রাদেশিক মন্ত্রীদের। ভাইসরয় অবশ্যই নীতি ও আইনের দিক থেকে দায়ী। কিন্তু তিনি বলছেন যে, তিনি অসহায়। অথচ, পৃথিবীতে এতখানি ক্ষমতা আর কারও হাতে নেই। কিন্তু, যারা আবেদন জানাচ্ছে, একে তো সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদের রক্ষা করবার যোগ্যতা তাঁর নেই, তার উপরে আবার যাঁরা দায়িত্ববহনে ইচ্ছুক, তাঁদের হাতে সেই ক্ষমতা ছেড়ে দিতেও তিনি চান না। তাঁর বক্তব্য শুধু এই যে, অবস্থা এর চেয়েও অনেক খারাপ হতে পারত। তিনি বলছেন, হিন্দু আর মুসলমানকে এক হতে হবে, পরস্পরকে ভালবাসতে হবে; সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে মুছে ফেলে সাম্প্রদায়িক ভালবাসা জাগিয়ে তুলতে হবে। বিহারের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করবার জন্য, এবং সৈন্যবাহিনীর কাছ থেকে আরও কিছু সাহায্য প্রার্থনার জন্য, লিয়াকত আলি আর বল্লভভাই গতকাল রাত্রে একসঙ্গে গিয়ে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কিন্তু বিশেষ সাহায্য তাঁরা পাননি। সাহায্যের বদলে ভাইসরয় তাঁদের এমন একটা লেকচার শুনিয়ে দিলেন যে, তাঁরা হাসি চাপতে পারেননি। কেন্দ্রীয় সরকার অসহায়; এ-ব্যাপারে তাঁদের কোনও কর্তৃত্ব নেই; তাঁরা শুধু জনসাধারণের উদ্দেশে যুক্ত-আবেদন প্রচার করতে পারেন, এবং ভাইসরয়ের কাছে গিয়ে বলতে পারেন: দয়া করে কিছু করুন। গভরনররাও ভাইসরয়ের কথাই প্রতিধ্বনি তুলছেন মাত্র। অর্থাৎ তাঁরাও বলছেন, ভারতবাসীদের আজ পরস্পরকে ভালবাসতে হবে। প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলির সম্পর্কে বলতে পারি, তাঁদের কারও-কারও এ-ব্যাপারে কাজ করবার ইচ্ছা আছে বটে, কিন্তু উপায় নেই। অন্যদের না আছে ইচ্ছা, না আছে উপায়। সুতরাং ভারতবর্ষের ব্যাপারে একমাত্র ভগবানই ভরসা।

মুসলিম আর হিন্দু, দুই পক্ষই কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, মুসলিম ও কংগ্রেসী মন্ত্রীরা মিলিতভাবে বাংলাদেশ পরিদর্শন করছেন ও সমগ্র উত্তর-বিহার সফর করছেন; হিন্দু ও মুসলমান জনতার উদ্দেশে তাঁরা যুক্ত-আবেদনও প্রচার করছেন। এমন কী, ভাইসরয় যাতে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন, তার জন্য তাঁর সঙ্গেও মিলিতভাবে গিয়ে সাক্ষাৎ করছেন তাঁরা। এখনও তাহলে হিন্দু আর মুসলমানরা ব্যাপকভাবে পরস্পরকে হত্যা করছে কেন? কারণটা আর কিছুই নয়, ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ—তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক—আজ হঠাৎ বুঝতে পেরে গিয়েছে যে, কেউ যদি এসে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, অথবা তার স্ত্রীকে কেড়ে নিয়ে যায় ও তার সম্ভ্রমনাশ করে, তবে কেউ এসে তাকে রক্ষা করবে না। সাধারণ মানুষ আজ বুঝতে পেরেছে যে, তার বাড়ি যদি লুঠ করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়ে কিছুমাত্র লাভ হবে না। তার মন ভয়ের দ্বারা কবলিত; তার নিরাপত্তাবোধ সম্পূর্ণ-রূপে নষ্ট হয়েছে। সেই কারণেই সে আইনকে তার আপন হাতে তুলে নিয়েছে। বক্তৃতা শুনিয়ে তো তার নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে আনা যাবে না।

গত অগস্ট মাসে, রাজনৈতিক খেলা হিসেবে, বাংলা দেশে এর সূত্রপাত। সূত্রপাতের পরেই এটি ভয়াবহ আকার ধারণ করে, এবং আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। মাঝখানে দিন কয়েকের জন্য এই ভয়ংকর অবস্থার বিরতি ঘটেছিল, এবং আর বাড়তে না-দিয়ে তখনই এর মূলোচ্ছেদ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম আমরা। কিন্তু সেই সুযোগ আমরা নষ্ট করেছি। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভাই তার জন্য দায়ী। গান্ধীজী

তখনই আপনাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। খুবই কড়া ভাষায় তিনি আপনাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, কলকাতার শোকাবহ ঘটনায় যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, ভাইসরয় তাতে বিভ্রান্ত। গান্ধীজী তখনই আপনাদের জানান যে, ভাইসরয়কে সাহায্য করবার জন্য এমন একজন মানুষ থাকা দরকার, যিনি ভাইসরয়ের চাইতে আরও বিচক্ষণ, বুদ্ধি ধরেন, এবং আইন সম্পর্কেও যাঁর জ্ঞান বেশ পাকা। গান্ধীজীর মনে হয়েছিল যে, তা যদি না করা হয়, কলকাতার ঘটনার পুনরাবৃত্তি তাহলে অবশ্যম্ভাবী। ভাইসরয়ের যে সাহায্য পাওয়া উচিত ছিল, মন্ত্রিসভা থেকে তার ব্যবস্থা করাই হত সঙ্গত কাজ। গান্ধীজী সেইসময়ে ভাইসরয়ের কাছে কড়া ভাষায় একখানি চিঠি লেখেন। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার কাছেও সেই চিঠির বয়ান তারযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। চিঠিখানিকে তখন রূঢ় বলে মনে করা হয়েছিল। তাঁর পত্র ও সতর্কবাণীর তাৎপর্য যে কী, তখন তা কেউ বোঝেননি। কিন্তু এখন যা ঘটল, তখনই সে-বিষয়ে তিনি আপনাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কলকাতায় যা ঘটেছিল, পূর্ববঙ্গে তারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে; উত্তর বিহারেও তা বিস্তৃতি লাভ করেছে, এবং শিগগিরই তা উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়বে। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়েই তখন উন্মত্ততার তাণ্ডব চলবে। মাত্রই কয়েক সপ্তাহ পূর্বে গান্ধীজী যখন আপনাদের সতর্ক করে দেন, তখন এই রকমের একটা আশঙ্কাই তাঁর মনে ছিল। কিন্তু আপনার সহকর্মীরা তখন ভাইসরয়ের উপরেই নির্ভর করলেন, এবং তাঁর বিচারবুদ্ধির উপরেই সবকিছু ছেড়ে দিলেন। ভারতবর্ষের এই বিপর্যয়ের মূল হচ্ছে সেইখানেই।

চল্লিশ কোটি নরনারীর ভাগ্য আজ এই সংকটকালে এমন একজন মানুষের উপর নির্ভর করছে, যাঁর চিত্ত নেহাতই বিভ্রান্ত। এতই বিভ্রান্ত যে, কোন্ পথে যাওয়া তাঁর কর্তব্য তা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। কিন্তু তূরীয় আত্মবিশ্বাসের চাইতে জমকালো ব্যাপার তো আর কিছুই নয়। মুশকিল এই যে, তাতে আমাদের কিছুই উপকার হচ্ছে না; একটার-পর-একটা বিপর্যয় আমাদের জীবনে ঘটে চলেছে। এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা শোকাবহ ব্যাপার এই যে, এই বিপর্যয়গুলি আদৌ অনিবার্য ছিল না; এখানে ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধির উপরে যে দায়িত্বভার ন্যস্ত, সত্যিই যদি তা পালন করবার যোগ্যতা তাঁর থাকত, এই বিপর্যয়গুলিকেও তবে নিবারণ করা যেত। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলবার নেই। তিনি ভাল মানুষ, তিনি সৎ মানুষ। কিন্তু তাঁর সহকর্মীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, স্পষ্টতই তিনি তাঁর দায়িত্বভারের যোগ্য নন, এবং আমরা তার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।

দুটি উপায়ে এই অবস্থার প্রতিকার করা যেতে পারে। কোনওরকমের শর্ত না-রেখে সর্বান্তঃকরণে এবং সম্পূর্ণভাবে আপনারা ভাইসরয়ের হাত থেকে (বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবস্থার মাধ্যমে) অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দিন; তাহলেই দেখবেন যে, আমাদের সমস্যাগুলিকে চট্‌পট্ ধরে ফেলা যাবে। তার কারণ, সরকার তখন ভারতবর্ষের যে-কোনও অঞ্চলে সাধারণ মানুষের ধনপ্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারবেন; এবং ভারতবর্ষের জন্য তাঁরা সম্পূর্ণরূপে দায়িত্ব স্বীকার করবেন। কংগ্রেস, মুসলিম সম্প্রদায় এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদেরও প্রতিনিধিরা আজ সরকারের মধ্যে রয়েছেন; এই সরকার সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিনিধি। সার্বিক ক্ষমতা যদি তাঁদের হাতে থাকে, ক্ষমতার প্রয়োগ না-করেও তাহলে তাঁরা দেশে শৃঙ্খলা বজায়

রাখতে পারবেন। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পূর্ণ হয়েছে, শুধু এইটুকু যদি জানা যায়, এই হাঙ্গামা তাহলেই বন্ধ হয়ে যাবে।

ভারতীয়দের হাতে এক্ষুনি পুরোপুরিভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজী হওয়া যদি আপনাদের পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে—লর্ড ওয়াভেলের জায়গায় অনেক বড়-মাপের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কাউকে পাঠালেও এই সমস্যার প্রতিকার হতে পারে। রুজভেল্ট যাকে বলতেন 'মানবসম্পর্কের বিজ্ঞান', তাতে তাঁর খুবই দক্ষ হওয়া চাই। একমাত্র তাহলেই তিনি বর্তমান অবস্থাজনিত অসুবিধা সত্ত্বেও ভারতীয়দের নেতৃত্ব দিতে পারবেন, এবং এই পালা-বদলের বিপজ্জনক সময়েও দেশে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারবেন। তেমন মানুষ বিরল।

এ দুটি পন্থার একটিও যদি না আপনারা অবলম্বন করতে পারেন, তাহলে বল্লভভাই যা বলেছেন, একমাত্র তা-ই আমরা করতে পারব। অর্থাৎ ভারতবর্ষকে সেক্ষেত্রে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করতে হবে, এবং এই অন্ধ বিশ্বাস লালন করতে হবে যে, দৈববলে একদিন এই হাঙ্গামার অবসান ঘটবে। এই তৃতীয় পন্থাই যদি অবলম্বন করতে হয়, তাহলে ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব আপনারা খোয়াবেন। সেই কথা চিন্তা করেই আমি উদ্বেগ বোধ করি।

আশা করি আপনার স্বাস্থ্য এখন সত্যিই ভাল আছে, এবং আগের মত সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাই।

সুধীর"

সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স এর উত্তরে লিখলেন :

৩ হোয়াইটহল কোর্ট,
এস. ডব্লু. ১
১২. ১১ .৪৬

"প্রিয় সুধীর,

তোমার ৫ই নভেম্বরের চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

তোমার চিঠির উত্তর আমি সবিস্তারে দেব না। আমার ধারণা, বিস্তারিত উত্তর না-লেখাই সমীচীন হবে। আমি শুধুই প্রাপক হিসেবে নিজেকে গণ্য করব!

ভারতবর্ষের অবস্থা এখন সত্যিই খুব খারাপ। তবে আমার বিশ্বাস এই যে, সহযোগ আর অসহযোগের ব্যবহারিক ফলাফল উপলব্ধি করবার জন্যই এই বাস্তব অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করা এবং না-করার ব্যাপারটি খুবই জটিল; সম্পূর্ণ পৃথক পন্থায় এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়ে থাকে। বুদ্ধিমান রাজনীতিকরা যে অবস্থা বুঝতে পারছেন, এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তবে আমার আশঙ্কা, তাঁদের অনুগামীদের অনেকেই হয়ত তা আজও বুঝে উঠতে পারেননি।

শুভেচ্ছা জানাই।

স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স।

শিংগ্‌ল্‌স-রোগের মারাত্মক আক্রমণ থেকে সদ্য মুক্তি পেয়েছি।
আশা করি দিন দুয়েকের মধ্যেই আবার কাজে যোগ দিতে পারব।

স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স।"

মাঝে-মাঝে আমি সমস্যায় পড়ে যেতাম। তার কারণ, গান্ধীজী যে ঠিক কী বোঝাতে চান, কিংবা ক্রিপ্‌স আর পেথিক-লরেনসের কাছে কী আমার লেখা উচিত বলে তিনি মনে করেন, তা আমি পরিষ্কার বুঝে উঠতে পারতাম না। ১৯৪৬ সনের ১৪ই নভেমবর তারিখে লেখা তাঁর এই চিঠি পেয়েও আমি সেই একই সমস্যায় পড়েছিলাম।

১৪-১১-৪৬

"চি. (চিরঞ্জীব) সুধীর,

তোমার চিঠি দুখানি পেয়েছি। এই মুহূর্তে তোমার পক্ষে এখানে থাকার চাইতে ওখানে থাকলেই কাজের বেশী সুবিধে হবে। তবে যখনই তোমার মনে হবে যে, কোনও বিষয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার, তখনই এখানে চলে আসতে পারো। কিছুকাল এখন আমাকে পূর্ববঙ্গেই থাকতে হবে—সম্ভবত কয়েক মাস থাকব।

তোমার দুটি চিঠির বক্তব্যই ভাল। ভাইসরয় সম্পর্কে যা বলেছিলাম, তা ষোল-আনা ঠিকই বলেছিলাম।

দুটি প্রধান দলই এখন—যে যার আপন পন্থায়—হতাশ হয়ে পড়েছে। তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসকদেরও সেই একই অবস্থা। তাঁরা যুক্তিনিষ্ঠভাবে কিছু ভাবতে পারছেন না। সামরিক মহিমা আর ক্ষমতার মোহই তাঁদের যুক্তিনিষ্ঠভাবে চিন্তা করতে দেবে না। আমরা যে যেমন, অন্যদেরও ঠিক তেমন মনে করি। গীতার মৌলিক শিক্ষা তাই এই যে, মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব ততটাই নিরাসক্ত-ভাবে সবকিছু বিচার করবার শক্তি অর্জন করতে হবে।

ব্রিটিশরা যদি ভেবে থাকে যে, ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তারা এদেশ পরিত্যাগ করবে না, তাহলে আমার মতে তারা অসম্ভবের স্বপ্ন দেখছে। যা তারা করতে পারে ও যা তাদের করতেই হবে, তা হচ্ছে এই যে, ক্ষমতাগ্রহণে ইচ্ছুক ও যোগ্য দলের হাতেই তাদের ষোল-আনা ক্ষমতা তুলে দিতে হবে; এবং যথাসম্ভব দ্রুত সৈন্যবাহিনীর ব্রিটিশ অংশকে তাদের অপসারণ করতে হবে ও বাকী অংশকে ভেঙে দিতে হবে। ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার জন্য এর কোনও অংশকে রাখার কথা তাদের চিন্তা করা উচিত নয়। ভারতবাসীদের শুভেচ্ছার উপরেই এটাকে ছেড়ে দিতে হবে। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের একমাত্র এইটিই হচ্ছে আদর্শ পন্থা। ক্যাবিনেট এ-কথা এখনও বুঝতে পারেননি। যে-ব্যবস্থার কথা উপরে বলা হল, তার যাবতীয় অনুসিদ্ধান্ত যে তুমি নির্ধারণ করতে পারবে, তাতে সন্দেহ করি না। কোথাও যদি আট্‌কে যাও তো কারও মারফতে তোমার প্রশ্নগুলি আমাকে পাঠিয়ে দিও।

তোমাকে ও শান্তিকে ভালবাসা জানাই।

বাপু"

ঠিক করলাম, নোয়াখালির গ্রামে গিয়ে এসম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করব। সেই যাত্রার স্মৃতি আমার চিত্তে আজও অম্লান হয়ে আছে। নোয়াখালির সুদূর গ্রামাঞ্চলে গিয়ে সেদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম আমি। মনে হয়েছিল, সমস্ত কিছুর থেকে নিজেকে ছিন্ন করে নিয়ে যেন এক অচেনা পরিবেশের মধ্যে দিনযাপন করছেন তিনি। আজও যখন সেই পরিবেশের পটভূমিকায় স্থাপন করে তাঁর কথা চিন্তা করি, তখন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ একটি মানুষের চিত্রই আমার স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে।

দিল্লি থেকে বিমানযোগে কলকাতায় এলাম আমি; কলকাতা থেকে ট্রেনে উঠে ঘণ্টা কয়েক বাদে পদ্মাতীরে গোয়ালন্দে গিয়ে পোঁছলাম; নদীপথে সারাটা দিন স্টীমারে কাটল; পোঁছলাম চাঁদপুর বন্দরে। চাঁদপুরের এস-ডি-ওর কাছ থেকে একটি জীপ নিয়ে মাইল তিরিশেক যাবার পরে পথের উপরে একটি নদী পড়ল। নৌকোয় নদী পার হয়ে পোঁছলাম রামগঞ্জে। অতঃপর স্যুটকেশ কাঁধে নিয়ে মাইল সাতেক পদব্রজে পাড়ি দিয়ে যখন চণ্ডীপুর গ্রামে পোঁছলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। গ্রামবাসীদের কাছে খবর পাওয়া গেল যে, গান্ধীজী সেখানে এক রজকের বাড়িতে আছেন। পথ অন্ধকার; সুপারির সারিতে চোখ আটকে যায়; এই অন্ধকারে এই অচেনা জায়গায় পথ চিনে নিয়ে কী করে এখন আমি গান্ধীজীর কাছে গিয়ে পোঁছব? গ্রামের একটি ছেলেই শেষপর্যন্ত সেই বাড়িটিতে আমাকে পোঁছে দিল।

গৃহকর্তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তার অতিথির সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে পারি কিনা। তাতে হাত তুলে সে একটি কুঁড়েঘর আমাকে দেখিয়ে দিল। ঘরের মধ্যে ম্লান আলো। উঁকি মেরে দেখলাম, গান্ধীজী বসে আছেন। কাজ করছেন। পাশেই একটি হারিকেন লণ্ঠন; তার চিমনিটা ভাঙা। আমার পায়ের শব্দে তিনি মুখ তুলে তাকালেন। দেখলাম, পরিচিত হাসিটি তাঁর মুখের উপরে ফুটে উঠেছে। "এই যে সুধীর," গান্ধীজী বললেন, "ভাবছিলাম, কখন তুমি আসবে।" স্যুটকেশটা নামিয়ে রেখে তাঁর তক্তপোষের এক প্রান্তে গিয়ে বসলাম আমি।

প্রথমেই তাঁকে জানালাম যে, পণ্ডিতজী আর সর্দারের কাছ থেকে দুখানি চিঠি নিয়ে এসেছি। গান্ধীজী কিন্তু সে সম্পর্কে কোনও ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন না; ক্ষমতা-হস্তান্তর সম্পর্কেও না। মৃদু গলায় তিনি শুধালেন, এতটা পথ আমার স্যুটকেশ কে বয়ে এনেছে। বললুম, আমিই ঘাড়ে করে বয়ে এনেছি ওটিকে। শুনে তিনি খুশী হলেন। গ্রামবাসীদের কাউকে দিয়ে আমার স্যুটকেশ না বইয়ে কাজটা যে আমি নিজেই করেছি, এটা তাঁর ভাল লাগল। অতঃপর কলকাতা থেকে গোয়ালন্দ এবং গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত কীভাবে এসেছি, তা নিয়ে খুঁটিনাটি নানান প্রশ্ন করলেন তিনি। পথে কোনও কষ্ট হয়েছিল কিনা, স্টীমারে কী খেলাম, চাঁদপুর থেকে রামগঞ্জ তিরিশ মাইল পথ কীভাবে পাড়ি দিলাম, নদী পার হলাম কীভাবে, চণ্ডীপুর গ্রাম খুঁজে নিতে খুব কষ্ট হয়েছিল কিনা, সব তিনি জেনে নিলেন।

পরবর্তী প্রশ্নটির জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। "মশারি সঙ্গে এনেছ তো?" বুঝলাম, মারাত্মক ভুল করে ফেলেছি। স্বীকার করতে হল, আনিনি। শুনে তিনি খুব একচোট বকুনি দিলেন আমাকে। "বাংলা দেশে তোমার জন্ম। নোয়াখালির গ্রামে যে মশারি ছাড়া ঘুমোনো সম্ভব নয়, তা কি তোমার জানা নেই?" একমাত্র মানু গান্ধীই তখন গান্ধীজীর কাছে ছিলেন। নিজের কাছ থেকে আর-সবাইকে সরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। রান্না করে দেওয়া, অন্যান্য প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য

রাখা—গান্ধীজীর যাবতীয় কাজ তখন তাঁর এই নাতনীটিকেই একা-হাতে করতে হত। মশারির প্রসঙ্গটা তাঁর কানে গিয়েছিল। ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে মানু বললেন, তাঁর একটা বাড়তি মশারি আছে, সেটা তিনি আমাকে ছেড়ে দিতে পারেন।

মশারির ঝঞ্ঝাট তো মিটল। অতঃপর মানুকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমার জন্য খাবার রাখা হয়েছে কিনা। প্রতিবাদ করে বললাম যে, পথেই আমি খেয়েছি, এখন আর আমার বিশেষ ক্ষিধে নেই। দুর্বল একজন বৃদ্ধ; যে সাদামাঠা খাদ্যে তিনি অভ্যস্ত, তার থেকেও নিজেকে তিনি বঞ্চিত করেছেন; এখন আমার আহার-নিদ্রার ব্যবস্থা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন তিনি; ব্যাপার দেখে আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু আমার আপত্তিতে তিনি কর্ণপাত করলেন না। অগত্যা কী আর করা, বেচারা মানু একটা প্লেটে করে যে খাবার এনে দিলেন, চটপট সেটা আমাকে উদরসাৎ করতে হল।

এতক্ষণে একটু স্বস্তি পেলেন গান্ধীজী। বৃহৎ ব্যক্তি এবং বৃহৎ প্রসঙ্গ নিয়ে এতক্ষণে তিনি কথা বলতে শুরু করলেন।

"সিংহদের সঙ্গে তোমার দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে তো? তাঁরা তোমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করছেন তো? তাঁদের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসেছ বলছিলে না?" উপর্যুপরি কয়েকটি প্রশ্ন করলেন গান্ধীজী।

"সিংহরা" আর কেউ নন, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী। আমার সঙ্গে কথা বলবার সময় ঠাট্টাচ্ছলে গান্ধীজী মাঝে-মাঝে এই দুজন বৃহৎ ব্যক্তিকে "সিংহ" বলে উল্লেখ করতেন।

বললুম, "হ্যাঁ, আমার সঙ্গে তাঁরা খুব ভাল ব্যবহার করেন। তবে, আপনি তো জানেনই, এক-নম্বর সিংহটিকে আমি একটু ভয় পাই, তাঁর সম্পর্কে আমাকে কিছুটা হুঁশিয়ার থাকতে হয়। ডেপুটি-সিংহটিকে নিয়ে আমার কোনও ভাবনা নেই। তাঁর কাছে আমি সমস্ত কথাই বলতে পারি; তিনি তাতে কিছু মনে করেন না।"

আমার কথার ধরনে যেন মজা পেলেন গান্ধীজী। হেসে উঠলেন। ধোবির ঘরে, কেরোসিন-লণ্ঠনের ম্লান আলোয় সেই হাসিটি আমার বড় মধুর লাগল।

গান্ধীজীর হাসি থামবার পর চিঠি দুখানি বার করে আমি তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম। আমাকেই সে-চিঠি খুলতে বললেন গান্ধীজী; পড়ে শোনাতে বললেন। তা-ই করলাম আমি, আর শান্তভাবে তিনি শুনে যেতে লাগলেন। পত্র-পাঠ শেষ করে দেখি, তাঁর মুখের উপরে গাম্ভীর্য ঘনিয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তারপর যেন কিছুটা আত্মগতভাবেই, বললেন, "ওদের ইচ্ছা, আমি দিল্লি ফিরে যাই; তাই না?" বললুম, "হ্যাঁ। দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বৃহৎ এবং কঠিন নানা সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাঁদের। আপনার পরামর্শ ছাড়া তো তা সম্ভব নয়।"

শুনে আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন গান্ধীজী। নীরবে সমস্ত কথা চিন্তা করলেন। তারপর ধীরে-ধীরে শান্ত গলায় বললেন, "না, তা হয় না। আমার স্থান এইখানে। এইখানেই আমি থাকব।"

আমাকে কেন দিল্লি থেকে নোয়াখালিতে আসতে বলেছেন, অতঃপর সেই প্রসঙ্গ উঠল। ১৯৪৬ সনের সেপটেম্বর মাসে কংগ্রেস দল অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেন; আর ১৯৪৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটেনের শ্রমিক সরকার ভারতের জন্য একজন নূতন ভাইসরয় নিয়োগ করেন। মধ্যবর্তী সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্যার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, ভারতের অবস্থা সম্পর্কে আমি যেন

পত্রযোগে তাঁকে ওয়াকিবহাল রাখি। সেই অনুযায়ী এই সময়ে সার্ স্ট্যাফোর্ড ও লর্ড পেথিক-লরেন্সের কাছে মাঝে-মাঝেই চিঠি লিখতাম আমি; গান্ধীজীর বক্তব্য তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করতাম। সার্ স্ট্যাফোর্ড ও লর্ড পেথিক-লরেন্সের কাছে লেখা আমার দুটি দীর্ঘ চিঠির খসড়া আমি গান্ধীজীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। গান্ধীজী সে সম্পর্কে তাঁর মতামত জানিয়ে আমাকে যে চিঠি লেখেন, ইতিপূর্বেই তা উদ্ধৃত হয়েছে। সত্যিই আমি আটকে গিয়েছিলাম; আমার মনে হচ্ছিল, গান্ধীজীকে আমি যেন পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছি না। এই কারণেই, দীর্ঘ সেই দুটি চিঠির খসড়া নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে, তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। চিঠির কয়েকটি জায়গা তিনি সংশোধন করলেন, এবং বলে দিলেন, স্যার স্ট্যাফোর্ডকে ঠিক কী কথা আমার জানাতে হবে।

সেদিন রাত্রে শয্যাগ্রহণের আগে গান্ধীজী বললেন, আরও কয়েকটা দিন যেন আমি নোয়াখালিতে তাঁর কাছে থাকি।

আর-কেউ তখন গান্ধীজীর কাছে ছিলেন না। অনেকটা সময় তাই তখন তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছি আমি। তাঁর সঙ্গে পদব্রজে আমি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতাম। গান্ধাজী তাঁর চটিজোড়াও এইসময়ে বর্জন করেছিলেন। খালিপায়ে হাঁটতেন তিনি; কোনও গ্রামে এক রাত্রির বেশী থাকতেন না। গ্রামবাসীরা যে-কুটিরেই তাঁকে আশ্রয় দিত, সেইখানেই তিনি ঘুমোতেন। যে-খাবার এনে দিত, তা-ই তিনি খেতেন। তাঁর নিত্যসঙ্গীদের মধ্যে কেউই এইসময়ে তাঁর কাছে ছিলেন না; এমন কী, বিশ্বস্ত প্যারেলালও না। থাকবার মধ্যে ছিলেন শুধু তাঁর নাতনী মানু, আর একজন দোভাষী। সেই কয়েকটা দিন তাঁর সঙ্গে-সঙ্গেই আমি থেকেছি। দেখেছি, গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার কতখানি উদ্দীপনা সঞ্চার করে। শহরের জনতা অনেক সময়, আর-কিছু নয়, নেহাতই কৌতূহলের তাড়নায় তাঁকে দেখতে আসত। গ্রামের মানুষের সঙ্গে শহরের মানুষের ওইখানেই পার্থক্য। গ্রামের মানুষরা যখন তাঁর কাছে এসে দাঁড়ত, তখন মনে হত সত্যিকারের অন্তরের টানে তারা এসেছে। গান্ধীজীকে দেখে তখন গৌতম বুদ্ধের কথা আমার মনে পড়ত। মনে হত, গৌতম বুদ্ধই যেন গ্রাম থেকে গ্রামে তাঁর সহিষ্ণুতা আর ভালবাসার বাণী প্রচার করে বেড়াচ্ছেন।

মনে পড়ছে এক বৃদ্ধার কথা। গান্ধীজীর সঙ্গে আমি গ্রামের পথ ধরে হাঁটছিলুম। দেখতে পেলুম, পথের ধারে এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছেন। গান্ধীজীর উদ্দেশে বৃদ্ধা বলেছিলেন, "বাবা, আমি অন্ধ। আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। আমি তোমাকে ছুঁতে চাই"। হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধার শিরস্পর্শ করলেন তিনি; তাঁর সঙ্গে কয়েকটি কথা বললেন। শুনে, বৃদ্ধার দৃষ্টিহীন চোখের থেকে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

গান্ধীজীর সঙ্গে তখন গ্রামের পর গ্রামে আমি গিয়েছি. দেখেছি শত-শত গৃহস্থ-বাড়ির ভস্মাবশেষ। সর্বত্র একই কথা শুনেছি। শুনেছি, ভাই কীভাবে ভাইয়ের প্রাণ নিয়েছে। গান্ধীজী তার জন্য কাউকে দোষ দেননি। দোষ দিতে তো সেখানে যাননি তিনি; গিয়েছিলেন ক্ষতের উপশম করতে।

সকলেই জানেন, সঙ্গীদের মধ্যে কারও একজনের কাঁধে হাত রেখে গান্ধীজী পথ হাঁটতেন। যাঁর কাঁধে হাত রাখতেন তিনিই তখন হয়ে দাঁড়াতেন তাঁর যষ্টি। যে-কদিন তখন গান্ধীজীর কাছে ছিলাম আমি, সেই কদিন তিনি

আমাকেই তাঁর যষ্টি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। আমার কাঁধে হাত রেখে তিনি তখন পথ হাঁটতেন; হাঁটতে-হাঁটতেই আমার সঙ্গে কথা বলতেন। বলতেন, তিনি কতটা নিঃসঙ্গ। বলতেন, পূর্ববঙ্গে যা তিনি করতে চাইছেন, এমন কী, তাঁর সহকর্মীরাও তার তাৎপর্য পুরোপুরি বুঝতে পারছেন না; তিনি যদি দিল্লি কিংবা সেবাগ্রামে ফিরে যান, তাহলেই তাঁরা খুশী হবেন। কিন্তু তাঁর হৃদয় তো পড়ে আছে পূর্ববঙ্গের এই গ্রামের মধ্যে। সত্যি যা তিনি করতে চান, এইখানেই তা তিনি করতে পারছেন। সেদিক থেকে তাঁর কিছুমাত্র ক্ষোভ নেই; সেদিক থেকে তিনি সুখী মানুষ।

পূর্ববঙ্গে গান্ধীজীর এই উপস্থিতি কিন্তু বাংলা সরকারের মোটেই ভাল লাগছিল। না। বাংলা সরকার ভাবছিলেন যে, যে-সব দুষ্কর্ম তাঁরা করেছেন, গান্ধীজীর উপস্থিতির ফলে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। গান্ধীজী ভাবছিলেন অন্য কথা। তিনি ভাবছিলেন, আর-কিছু তো তিনি করতে চান না; ভয়ার্ত নরনারীর প্রাণে তিনি শুধু আস্থার ভাবটাকে আবার জাগিয়ে তুলতে চান; সেইসঙ্গে হিন্দু-মুসলমান জনতাকে তিনি বুঝিয়ে বলতে চান যে, সৎ প্রতিবেশী হয়ে পরস্পরকে ভালবেসে তাদের বসবাস করতে হবে। নিজেরই অন্তরের অন্তস্তলে আরও একবার এক মহান আত্মপরীক্ষায় নিরত হয়েছিলেন তিনি। নোয়াখালিতে কতটুকু ফল পাওয়া গেল, শুধু তা-ই দিয়েই তো তাঁর সেই প্রয়াসের মূল্য যাচাই করা চলে না।

গ্রামের পথে আমরা হাঁটতুম; আর নিচু গলায় (তাঁর শরীর তখন খুবই দুর্বল) গান্ধীজী কথা বলতেন। কথা বলতে-বলতেই যেন ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসকে তিনি প্রদক্ষিণ করে আসতেন। বলতেন বিদেশী শাসন থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করবার জন্য তাঁর সারা জীবনের প্রয়াসের কথা। যে বিরাট প্রতিষ্ঠানকে তিনি গড়ে তুলেছেন, এবং নিজের হাতে তৈরী করেছেন যে-সব মহান নেতাকে,—তাঁদের সকলের কথাই বলতেন তিনি। বলতেন, দীর্ঘ পথ পর্যটনের পরে এমন একটা জায়গায় এসে তিনি পৌঁছেছেন, যেখানে তাঁর নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। তাঁর সারা-জীবনের সঙ্গীদের মধ্যে কেউই তখন তাঁর পাশে নেই। তিনি তখন বুঝতে পারছিলেন যে, যে-ভারতভূমিকে তিনি প্রাণাধিক ভালবাসেন, তা দ্বিখণ্ডিত হতে চলেছে। সেই উপলব্ধি তাঁকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল। সমস্ত কথা শেষ হবার পরে বেদনাবিদ্ধ কণ্ঠস্বরে—যে কণ্ঠস্বর শুনলে শ্রোতার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে—তিনি বললেন, "তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, আজ আমি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ?"

গান্ধীজীর পিতৃহৃদয়

পৃথিবীর নানা স্থানে গিয়েছি আমি। গিয়েছি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়; গিয়েছি ইউরোপে; গিয়েছি এশিয়ার দেশে দেশে। এই সফরকালে প্রায়ই একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতুম আমি। অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, "এত অসংখ্য মানুষের উপরে গান্ধীজীর এই যে অসামান্য প্রভাব, এর কারণ কী?" উত্তরে বলি, এই প্রভাবের মূলে রয়েছে তাঁর ভালবাসা। তাঁর ভালবাসবার ক্ষমতা ছিল প্রায় অবিশ্বাস্য। এতখানি ভালবাসতেন বলেই সকলে খুব সহজেই তাঁর বশীভূত হত। তাঁর ভালবাসা নৈর্ব্যক্তিক ছিল না; শুধু মানবতাকে ভালবেসেই তিনি ক্ষান্ত হননি। ব্যক্তি-মানুষকে তিনি ভালবেসেছেন, তার ব্যক্তিগত দুঃখে-সুখে সাড়া দিয়েছেন। অনায়াসেই সবাই তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারত; যতই ব্যস্ত থাকুন, তাদের তিনি ফিরিয়ে দিতেন না। সকলের সঙ্গেই দেখা করতেন তিনি; সকলের কথাই ভাবতেন। দূরে থাকা সত্ত্বেও তাঁর চিত্তপট থেকে কেউ মুছে যেত না। কী করে যে এত অসংখ্য মানুষকে তিনি তাঁর চিন্তায় এবং অনুভূতিতে স্থান দিয়েছিলেন, সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

তিনি না ছিলেন রাষ্ট্রপতি; না ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী আর বিমানবাহিনী ছিল না। কিংবা এমন প্রশাসন-যন্ত্রও তাঁর হাতে ছিল না, যার দ্বারা তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে তিনি অন্যের উপরে চাপিয়ে দিতে পারেন। কোটি কোটি মানুষ তবু তাঁকে মান্য করেছে। তাঁর দেশবাসীর একাংশের কৃত কোনও অন্যায়ের দায় যখনই তিনি নিজের উপরে টেনে নিয়েছেন, এবং বলেছেন যে, তার প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য দিন কয়েকের জন্য তিনি অনশন করবেন, সমগ্র দেশ তখনই বেদনায় উদ্বেগে উত্তাল হয়ে উঠত। দেশবাসীদের কাছে তিনি ছিলেন স্নেহশীল পিতা; আর তাই তাঁকে অনশন করতে দেখলে দেশবাসীর বেদনার সীমা থাকত না। দেবতারাও তো পিতার সম্মান পান। কিন্তু পিতা-গান্ধী দেবতার মত দূরবাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন পার্থিব পিতা; তিনি ছিলেন কাছের মানুষ। তাঁর সঙ্গে তর্ক করা চলত; তাঁর কথায় সায় না দিয়ে দ্বিমত হওয়া চলত। কিন্তু তাঁর স্নেহের উৎস তাতে শুকিয়ে যেত না। তাঁর কথার অবাধ্য হয়ে যখন কেউ বিপদে পড়ত, তখনও তার জন্য তিনি মমতা বোধ করতেন। "আমি তো তোমাকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলাম"—এমন কথা বলে মুখ ফিরিয়ে নেবার মতন মানুষ তিনি ছিলেন না। এ-ব্যাপারে আমার নিজেরই একটা অসামান্য অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেই কথা বলি।

১৯৪৬ সনের ডিসেমবর নাগাদই এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব বেধেছে, তা মেটানো সম্ভব নয়। অন্তর্বর্তী সরকারে এই দুই দলের প্রতিনিধিই ছিলেন, এবং সেখানেও তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। স্থির ছিল যে, ৯ই ডিসেমবর তারিখে গণ-পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হবে। কিন্তু তাতে যোগদানের এবং বাকী-সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করে সংবিধান রচনার কোনও উদ্যোগই মুসলিম লীগের তরফে দেখা যাচ্ছিল না। সংবিধান-রচনা সংক্রান্ত ব্রিটিশ প্রস্তাবটির প্রতি স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে মুসলিম লীগ বোম্বাইয়ে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, তাও তারা নাকচ করেনি। ফলে, মুসলিম লীগ যদি

অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ না দিত, তবে সেইটেই হত যুক্তিসংগত ব্যাপার। কিন্তু মুসলিম লীগ যুক্তির ধার ধারেনি; নিতান্তই কুযুক্তিবলে তারা সরকারের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল। এ-ব্যাপারে মিঃ জিন্নার বক্তব্য ছিল এই যে, সংবিধান-রচনা সংক্রান্ত প্রস্তাবটি কংগ্রেসও মেনে নেয়নি। তিনি বললেন যে, একদিকে আসাম-বাংলা এবং অন্যদিকে পাঞ্জাব-সীমান্তপ্রদেশ-বেলুচিস্তান-সিন্ধুর প্রস্তাবিত গোষ্ঠীবিন্যাসে কংগ্রেসের মনোগত আপত্তি রয়েছে। ফলে এ-কথা পরিষ্কার হয়ে উঠল যে, ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সনের মার্চ মাসে ভারতে আসবার আগে যে অবস্থা ছিল, ভারতীয় রাজনীতি আবার সেই অবস্থাতেই ফিরে গিয়েছে। সেই পুরনো প্রশ্নটাই আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, "পাকিস্তান, না অখণ্ড ভারত?"

এই অবস্থায় ব্রিটেনের শ্রমিক সরকার সিদ্ধান্ত করলেন যে, সমস্যা সমাধানের জন্য আরও একবার তাঁরা চেষ্টা করে দেখবেন। ডিসেমবরের প্রথম সপ্তাহে বিবদমান দলের নেতাদের নিয়ে লনডনে এক বৈঠক বসাবার চেষ্টা করলেন তাঁরা। শ্রীনেহরু প্রথমে লনডনে যেতে রাজী হননি; মিঃ অ্যাটলি একটি ব্যক্তিগত চিঠি লিখে তাঁকে রাজী করালেন। ২রা ডিসেমবর তারিখে শ্রীনেহরু, সর্দার বলদেও সিং, মিঃ জিন্না ও মিঃ লিয়াকত আলি খাঁ লনডনে গিয়ে পৌঁছলেন। লনডন-সম্মেলনেও অবশ্য মীমাংসার প্রয়াস ব্যর্থ হল। ৬ই ডিসেমবর তারিখে শ্রমিক সরকার এক বিবৃতি প্রচার করলেন। তাতে তাঁরা প্রাদেশিক গোষ্ঠী-বিন্যাস সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্যকে আবার নূতন করে অনুমোদন করলেন, এবং কংগ্রেসকে এই অনুরোধ জানালেন যে, কংগ্রেস যেন এই বক্তব্যকে মেনে নিয়ে গণ-পরিষদে মুসলিম লীগের যোগদানের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। ব্রিটিশ সরকার অবশ্য একইসঙ্গে এ-কথাও বললেন যে, এই পুনরনুমোদন সত্ত্বেও যদি গণ-পরিষদ সিদ্ধান্ত করেন যে, এই মৌলিক বিষয়টির ব্যাখ্যার জন্য ভারতবর্ষের ফেডারেল কোর্টে এটিকে পেশ করা উচিত, তবে তা করা যেতে পারে। তবে সে-কাজ তাড়াতাড়ি করতে হবে, এবং ফেডারেল কোর্ট যতক্ষণ না এ-ব্যাপারে রায় দিচ্ছেন, গণ-পরিষদের অন্তর্ভূত দুই প্রদেশ-গোষ্ঠীর অংশের বৈঠক ততক্ষণ মুলতুবী থাকবে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী ২২শে ডিসেমবর তারিখে ঘোষণা করলেন যে, অন্যান্য পক্ষ যদি এই বিষয়টিকে ফেডারেল কোর্টে পেশ করতে কিংবা কোর্টের রায় মেনে নিতে রাজী না থাকে, তবে এটিকে ফেডারেল কোর্টে পেশ করবার কোনও যুক্তি নেই। কমিটী পুনর্বার তাঁদের এই অভিমত জানালেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন স্বীকৃত হয়েছিল; গণ-পরিষদের বিভিন্ন অংশে ভোটগ্রহণের ব্যবস্থার যে ব্যাখ্যা ব্রিটিশ সরকার দিয়েছেন, তা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকারের মূল নীতিরই বিরোধী। গোটা ব্যাপারটার মধ্য থেকে এই সারসত্যটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, গান্ধীজী তাঁর ১৪ই নভেমবরের চিঠিতে (যার বিষয়বস্তু আমি ইতিপূর্বেই ক্রিপ্স এবং পেথিক-লরেনসকে জানিয়েছিলাম) আমাকে যা লিখেছিলেন, তা-ই ঠিক। গান্ধীজী তাতে লিখেছিলেন, "ব্রিটিশরা যদি ভেবে থাকে যে, ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তারা এ-দেশ পরিত্যাগ করবে না, তাহলে আমার মতে তারা অসম্ভবের স্বপ্ন দেখছে। যা তারা করতে পারে ও যা তাদের করতেই হবে, তা হচ্ছে এই যে, ক্ষমতাগ্রহণে ইচ্ছুক ও যোগ্য দলের হাতেই তাদের ষোল-আনা ক্ষমতা তুলে দিতে হবে; এবং যথাসম্ভব দ্রুত সৈন্যবাহিনীর ব্রিটিশ অংশকে তাদের অপসারণ করতে হবে ও বাকী অংশকে ভেঙে দিতে হবে।...শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের একমাত্র এইটিই

হচ্ছে আদর্শ পন্থা। ক্যাবিনেট এ-কথা এখনও বুঝতে পারেননি।"

সত্যিই শ্রমিক-সরকার তা বুঝতে পারেনি। এই অভিমতকে মেনে নেননি তাঁরা। পক্ষান্তরে কংগ্রেস আর লীগের নেতাদের জন্য তাঁরা শক্-ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করেছিলেন। ২০শে ফেবরুয়ারি তারিখে কমন্স সভায় মিঃ অ্যাটলি ঘোষণা করলেন যে, প্রধান দুটি দলের মধ্যে মীমাংসা হোক আর না-ই হোক, ১৯৪৮ সনের জুন মাসের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে শাসনক্ষমতা তুলে দিতে কৃতসংকল্প। মীমাংসা যদি না-ই হয়, তবে দরকার হলে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির হাতে ক্রমে-ক্রমে কিস্তিতে-কিস্তিতে ক্ষমতা তুলে দিতেও প্রস্তুত থাকবেন; এবং বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কার কাছে হস্তান্তরিত করা যায়, তাও তাঁদের নতুন করে ভেবে দেখতে হবে; "ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের কোনও এক কেন্দ্রীয় শাসন-কর্তৃপক্ষের হাতে সামগ্রিকভাবে সেই ক্ষমতা তুলে দেওয়া হবে, নাকি কয়েকটি অঞ্চলে বর্তমান প্রাদেশিক সরকারের হাতে, অথবা অন্য এমন কোনও পন্থায় যা সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় ও ভারতীয় জনসাধারণের যাতে সর্বাধিক কল্যাণ হয়", ব্রিটিশ সরকার তা ভেবে দেখবেন। ওই একই বিবৃতিতে মিঃ অ্যাটলি ঘোষণা করেন যে, লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতবর্ষের ভাইসরয় পদে নিয়োগ করা হবে।

বল্লভভাই প্যাটেল এই অবস্থায় স্থির করেন যে, সামনের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মাসে আমার পক্ষে লনডনে থাকা দরকার। তথ্য ও বেতার দপ্তর এইসময়ে লনডনের ভারতীয় হাইকমিশনে একজন জনসংযোগ-অফিসার নিয়োগের কথা ভাবছিল। এই দপ্তরটিও ছিল সর্দার প্যাটেলেরই হাতে। তিনি আমাকে এই কাজটি নিতে বললেন। আমি তাঁকে জানালুম যে, কাজটা আমার ভালই লাগবে, তবে গান্ধীজীর অনুমোদন ব্যতিরেকে এ-কাজ নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। গান্ধীজী তখন নোয়াখালির গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর সান্নিধ্যই ছিল দুর্গত মানুষের পক্ষে একটি পরম সান্ত্বনার ব্যাপার। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জীবনে সেই সান্ত্বনাই বিলিয়ে যাচ্ছিলেন গান্ধীজী। বল্লভভাই স্বীকার করলেন যে, নোয়াখালিতে গিয়ে গান্ধীজীকে এই কাজের কথাটা আমার বলা দরকার। গান্ধীজী তখন যেখানে ছিলেন, নোয়াখালির সেই সুদূর অখ্যাত গ্রামে গিয়ে বল্লভভাইয়ের প্রস্তাবটা তাঁকে আমি জানালাম। কথাটা শুনবামাত্র গান্ধীজী বললেন, "সেখানে তো কৃষ্ণ মেননই রয়েছে। লনডনে সেই হচ্ছে জওহরলালের আপন মানুষ। তুমি সেখানে যেতে চাইছ কেন? না, এই প্রস্তাবটা আমার মনঃপূত নয়। আমার ধারণা, সেখানে গিয়ে তুমি ঝঞ্ঝাটে পড়বে, এবং তোমার জন্য আমাকে দুশ্চিন্তায় থাকতে হবে। না, তুমি ঝঞ্ঝাটে পড়ো, এ আমি চাই না। কী জানো, বল্লভভাই হচ্ছে শক্তিমান মানুষ, বিরোধিতার মোকাবিলা করতে তার ভালই লাগে। কিন্তু সবাই তো আর তার মত মানুষ নয়, তারা ঝঞ্ঝাট সামলাতে পারে না। এইটে বল্লভভাই বোঝে না। না, তার প্রস্তাবে আমি খুশী হতে পারছি না।। তুমি বরং বল্লভভাইয়ের সঙ্গে এ নিয়ে আর-একবার কথা বলে দ্যাখো। জওহরলালকেও সব জানাও। তারা যা ভাল বোঝে, তাই করো।"

গান্ধীজী আমাকে যা বললেন, নয়াদিল্লিতে ফিরে বল্লভভাইকে তা আমি জানালাম। তিনি বললেন, "ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না। এর সঙ্গে আবার কৃষ্ণ মেননের সম্পর্ক কী? ভারত সরকারের সঙ্গে কৃষ্ণ মেননের কোনও সম্পর্ক

নেই। তিনি সেখানে বেসরকারীভাবে আছেন। ইনডিয়া লীগ চালাচ্ছেন তিনি। ভারতীয় হাইকমিশনের সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক? ক্রিপ্‌স আর পেথিক-লরেন্‌সের মত ক্ষমতাশালী মানুষদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক যে এত ঘনিষ্ঠ, এবং তুমি যে তাঁদের আস্থাভাজন, এই ব্যাপারটা নিয়ে অবশ্য মেননের কিছুটা ঈর্ষা থাকা সম্ভব। তাঁর পথ তাই তোমার পক্ষে না-মাড়ানোই ভাল। তবে, তুমি তো যাচ্ছ সরকারী কাজের দায়িত্ব নিয়ে। কৃষ্ণ মেনন তোমার কী করবেন? বাপু এ-সব কথা বোঝেন না। কী করে বুঝবেন; তাঁকে তো আর সরকারী দপ্তর চালাতে হয় না। আমার তো মনে হয়, তোমার লনডনে যাওয়াই উচিত। মাউন্‌টব্যাটেন আমাদের কাছে নতুন লোক। তিনি যে কেমন লোক, তা আমরা জানি না। ক্রিপ্‌স আর পেথিক-লরেনসের সঙ্গে তাই আমাদের একটা সরাসরি যোগ-সম্পর্ক থাকা দরকার।"

আমার যে লনডনে যাওয়া উচিত, এই সিদ্ধান্ত করবার পরে কিন্তু বল্লভভাইকে কিছু অপ্রত্যাশিত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হল। আমার নিয়োগে আপত্তি জানিয়ে ভাইসরয় তাঁকে একটি চিঠি লিখলেন। ভাইসরয় এই অভিমত জানালেন যে, কংগ্রেসের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগসম্পর্ক রয়েছে, সুতরাং ভারত সরকারের সামগ্রিক বক্তব্যের সুষ্ঠু প্রতিনিধিত্ব আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। কিন্তু বল্লভভাই ছিলেন শক্ত ধাতের মানুষ। ভাইসরয়ের চিঠির উত্তরে তিনি জানালেন, এটা লনডনে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিয়োগের প্রশ্ন নয়। সামান্য একজন জন-সংযোগ অফিসার নিয়োগের ব্যাপার। কাজটা যাঁকে দেওয়া হচ্ছে তিনি কেমব্রিজের গ্র্যাজুয়েট, তাঁর ভাল একটা ডিগরী আছে, জন-সংযোগের অভিজ্ঞতাও আছে। কাজের বিচারে এমন মানুষের মূল্যে বস্তুত অসীম। সুতরাং তথ্য ও বেতার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে এ-ক্ষেত্রে তিনি ভাইসরয়ের পরামর্শ মেনে নিতে পারছেন না। বল্লভভাই তখন ঘুণাক্ষরেও এ-কথা জানতেন না যে, ছ-মাস না-কাটতেই কৃষ্ণ মেননকে লনডনে ভারতীয় হাইকমিশনার পদে নিয়োগ করা হবে। তা যদি জানতেন, তাহলে আমাকে তিনি পাঠাতেন না। যে-কাজ তিনি আমাকে নিতে বললেন, তার দায়িত্ব ছিল দুরূহ, এবং সেইজন্যেই কাজটা আমার নিতে ইচ্ছে হচ্ছিল। ঠিক করলুম, কাজটা আমি নেব। অতঃপর গান্ধীজীকে আমার সিদ্ধান্তের কথা আমি জানিয়ে দিলুম।

১লা মার্চ তারিখে সস্ত্রীক আমি নয়াদিল্লি থেকে বিমানযোগে লনডন যাত্রা করি। পালাম বিমানবন্দরে যাবার জন্য গাড়িতে উঠেছি, এমন সময় একটা টেলিগ্রাম এল। তাতে বলা হয়েছে: "ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। বাপু"

নয়াদিল্লি থেকে রওনা হবার আগে শ্রীনেহরুর সঙ্গেও আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমার কাছে তাঁর দরজা তখন ছিল অবারিত। আমি তাঁকে জানালাম যে, বল্লভভাই আমাকে লনডনে পাঠাবেন বলে স্থির করেছেন। কথাটা শুনে যে তিনি বিশেষ উৎসাহিত হলেন, এমন মনে হল না। গম্ভীরভাবে তিনি বললেন, "সেখানে তো স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের সঙ্গে প্রায়ই তোমার দেখা হবে, তাই, না?" বললুম, সত্যিই তাঁর সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে চাই। শুনে শ্রীনেহরু মন্তব্য করলেন, "কী জানো, তাঁকে তুমি যত বেশী দেখবে, ততই কম জানবে।" আমার মনে হল, স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের মতন মানুষের সম্পর্কে এ এক বিচিত্র মন্তব্য। যাই হোক্‌, কৃষ্ণ মেনন সম্পর্কে গান্ধীজীর কিছু আশঙ্কা ছিল; আমারও ভয় ছিল যে, আমার কাজে তিনি ব্যাঘাত ঘটাতে পারেন। তাই, তাঁর সঙ্গে দেখা

করবার উদ্দেশ্যে, শ্রীনেহরুর কাছে আমি একটি পরিচয়-পত্র চাইলুম। শ্রীনেহরু সেটা লিখে দিলেন। সংক্ষিপ্ত, নিরুত্তাপ পরিচয়-পত্র। তাতে বলা হল যে, ভারত-সচিবের দপ্তর থেকে ভারতীয় তথ্য বিভাগের ভার গ্রহণের জন্য বল্লভভাই প্যাটেল আমাকে লনডন পাঠাচ্ছেন (আমার ধারণা, নেহরু তাঁর চিঠিতে এ-কথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, এই নিয়োগের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই); এই ধরনের কাজে আমার যোগ্যতা কী, তা তিনি জানেন না; তবে হ্যাঁ, কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে তিনি আমাকে যোগাযোগ রাখতে বলেছেন।

আমার মনে হল, এ তো পরিচয়-পত্র নয়, সাবধান-বাণী। তবে যথাসময়ে আমি এটি কৃষ্ণ মেননের কাছে পেশ করলুম।

ক্রিপ্‌সের কাছে লেখা বল্লভভাইয়ের একটি চিঠিও আমি সঙ্গে নিয়েছিলুম। তাতে ক্রিপ্‌সের কাছ থেকে যে সাড়া পাওয়া গেল তা যেমন উদার তেমনি অকপট। বল্লভভাইকে লেখা আমার চিঠিতে তা আমি জানিয়েছিলাম। আমার সেই চিঠিখানি এখানে উদ্ধৃত করছি :

ইনডিয়া হাউস,
লনডন, ডব্‌লু. সি. ২,
১৪ই মার্চ, ১৯৪৭

"প্রিয় সর্দার,

আপনার কাছে চিঠি লিখতে অনেক দেরি হয়ে গেল। তার জন্য আমি দুঃখিত। তবে ব্যাপারটা এই যে, এখানকার মানুষদের মনের খবর জেনেছি, এটা না-বোঝা পর্যন্ত আমি চিঠি লিখতে চাইনি। ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে যে-তিনজন মানুষ জড়িত, সেই ক্রিপ্‌স, অ্যাটলি আর পেথিক-লরেনসের সঙ্গে ইতিমধ্যে আমি দেখা করেছি। এখন আমি অবস্থা সম্পর্কে আমার মতামত আপনাকে জানাতে পারি।

প্রথমেই আপনাকে ক্রিপসের কথা জানাব। ভারতবর্ষের দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে, এ-ব্যাপারে ক্রিপ্‌সই এখানে কেন্দ্র-চরিত্র। ৩রা মার্চ এখানে এসে পৌঁছবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাদেই তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করি; নৈশাহারের পর রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত, অর্থাৎ দীর্ঘ দু ঘণ্টা, তাঁর সঙ্গে আমি সেদিন আলোচনা চালিয়েছিলাম। আমি তাঁকে বললাম যে, ২০শে ফেবরুয়ারি তারিখের বিবৃতিটি যখন প্রচারিত হয়, পন্ডিতজী তখন শুধু এর সদর্থক অংশগুলিকেই বেছে নেন, এবং এমন কিছু কথা বলে একে সাগ্রহ অভ্যর্থনা জানান যা রাজনীতির উর্ধ্বে। কিন্তু বস্তুত এই বিবৃতির মধ্যে এমন অনেক ব্যাপার রয়েছে যা খুবই ধোঁয়াটে ও অস্পষ্ট, এবং তারই ফলে দেশীয় রাজ্যসমূহ ও মুসলিম লীগের সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে কংগ্রেস-নেতাদের অসুবিধা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাতে তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বললেন, দেশীয় নৃপতিরা যদি ভেবে থাকেন যে. ব্রিটিশ সরকার সরাসরি তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং ভারতীয় গণ-পরিষদের তুলনায় ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে তাঁরা হয়ত আরও কিছু বেশী সুবিধা পেতে পারেন, তাহলে তাঁরা নেহাতই বাতুল। আমি তাঁকে বললাম যে, মুসলিম লীগ কিংবা দেশীয় রাজ্যগুলির মনোভাব যাতে আরও সহযোগিতাসূচক হয়, তার জন্য তাদের উপরে

চাপ দেওয়া চলত, কিন্তু বিবৃতিতে তেমন চাপ আদৌ দেওয়া হয়নি। পক্ষান্তরে, ভারতীয়রা নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নিতে না-পারলে প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে ব্রিটিশ সরকার প্রস্তুত থাকবেন, এমন ইঙ্গিত থাকায় স্বভাবতই মুসলিমদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা যদি চুপ করে বসে থাকে এবং ১৯৪৮ সনের জুন মাস পর্যন্ত অসহযোগিতা চালিয়ে যায়, তাহলে মুসলিমপ্রধান প্রদেশ বাংলা, পাঞ্জাব আর সিন্ধু আপনা থেকেই অবশিষ্ট-ভারত থেকে পৃথক হয়ে যাবে, এবং তখন তারা কোনও-রকমের একটা পাকিস্তান খাড়া করে তুলতে পারবে। আমি তাঁকে বললাম যে, ব্রিটিশ সরকার যদি এমন শৃঙ্খলাহীনভাবে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রস্তুত থাকেনও, তবু সমগ্র বাংলা ও সমগ্র পাঞ্জাবকে মুসলিম লীগের হাতে সমর্পণ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তার কারণ, বাংলাকে খণ্ডিত করবার জন্য সেখানকার হিন্দুদের মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রবল আন্দোলন শুরু হয়েছে; এবং পূর্ব-পাঞ্জাবের শিখ ও হিন্দুরাও সেই একই দাবি জানাবেন। তিনি তাতে পরিষ্কারভাবে বললেন যে, ভারত-ত্যাগের পূর্বে ব্রিটিশ সরকার প্রদেশ-বিভাগে কিছুতেই সম্মত হবেন না। তাঁদের ধারণা, এটা আদৌ তাঁদের ব্যাপারই নয়; ভারতীয়রা যদি প্রদেশ-সীমার পুনর্বিন্যাস করতে চায়, তবে নিজেদের মধ্যেই তারা সেটা ঠিক করবে। তিনি মন্তব্য করলেন, "এই ব্যবস্থাটাকে সীমাহীনভাবে টেনে নেওয়া চলে না। একটা জায়গায় তোমাকে থামতেই হবে। প্রদেশই হচ্ছে সেই সীমা। প্রদেশকেও খণ্ড-খণ্ড করে অতঃপর সেই খণ্ডগুলির হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার প্রস্তাব নেহাতই অবাস্তব।" তিনি আরও বললেন যে, তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস, পাকিস্তানের জন্য পীড়াপীড়ি করে সত্যিই কোনও লাভ হবে কিনা, মিঃ জিন্না আর তাঁর সহকর্মীরা এখন এই কথাই ভেবে মরছেন। যে-পাকিস্তান তাঁরা দাবি করেছিলেন, এবং যে-পাকিস্তান তাঁদের পাবার সম্ভাবনা, তার মধ্যে বিস্তর ফারাক। এ-পাকিস্তান পেয়ে তাঁদের বিশেষ লাভ হবে না। আমি বললুম, আমার আশা এই যে, কমন্স সভায় বিতর্কের সময়ে তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের পক্ষে এমন-কিছু বলা সম্ভব হবে, যাতে করে এটা একেবারে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ভারতবর্ষে বিভেদ-প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিতে ব্রিটিশ সরকার আদৌ প্রস্তুত নন, তেমন-কিছু তাঁরা কোনক্রমেই করবেন না। শুনে তিনি হেসে বললেন, "সুধীর, আসলে তোমার ইচ্ছেটা হচ্ছে এই যে, কংগ্রেসের প্রতি আমরা পক্ষপাতমূলক ব্যবহার করব, এবং কংগ্রেস যাতে মুসলিম লীগকে চাপ দিতে পারে তার সুবিধে করে দেব। না, তা আমরা করতে পারি না। আমরা নিরপেক্ষ থাকতে কৃতসংকল্প। কংগ্রেসকে মুসলিমদের সহযোগিতা অর্জন করতে হবে।" আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললুম, কংগ্রেসের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণের প্রশ্নই এটা নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে যে সংখ্যালঘু দলের সহযোগিতা অর্জন করতে হবে, তা আমরা ভালই বুঝি; আমি শুধু এইটুকুই বলতে চেয়েছিলাম যে, এমন কিছুই বলা উচিত হবে না, অসহযোগের প্রবণতা যাতে আরও উৎসাহিত হয়। কথাটার তাৎপর্য তিনি বুঝলেন না। আপনি তো জানেনই যে, এঁরা এখন 'নিরপেক্ষতা'র রাস্তা ধরেছেন; অর্থাৎ যে-রাস্তা এঁরা ধরেছেন, এঁদের বিশ্বাস সেটা নিরপেক্ষ। বিতর্কের প্রাক্কালে লর্ড পেথিক-লরেন্স পারলামেনটের শ্রমিক-সদস্যদের এক সভা ডেকেছিলেন, এবং তাঁদের বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, বক্তৃতার সময়ে প্রত্যেকেরই একেবারে ষোল-আনা নিরপেক্ষ থাকা

দরকার। তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন, মুসলিম লীগকে যদি এমনটা মনে করবার সুযোগ দেওয়া হয় যে, শ্রমিক সরকার ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন, তাহলে মীমাংসার সম্ভাবনা নষ্ট হবে।

সার্ স্ট্যাফোর্ডকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কংগ্রেসকে মুসলিম লীগের সহযোগিতা অর্জন করতে হবে, তাঁর এ-কথার অর্থটা ঠিক কী। ফলে তাঁর মনের কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ল। এখন এটা আমার কাছে স্পষ্ট যে, কংগ্রেস-নেতাদের সম্পর্কে ক্রিপ্‌স আর তাঁর সহকর্মীদের মনে সব-সময়েই একটা ক্ষোভ ছিল; তাঁদের ধারণা, ১৬ই মে তারিখের বিবৃতিতে ঘোষিত ব্রিটিশ প্রস্তাবটিকে কংগ্রেস-নেতারা যথোচিত গুরুত্ব দেননি। ক্রিপ্‌স ও তাঁর সহকর্মীদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতবর্ষে বর্তমানে যে সুতীব্র সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার মূলে রয়েছে পণ্ডিতজীর সেই প্রকাশ্য উক্তি। এ'দের ধারণা, গত জুলাই মাসে বোমবাইয়ে পণ্ডিতজী এই কথাই বলেছিলেন যে, ব্রিটিশ প্রস্তাব মেনে নেওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসের উপরে কোনও দায়-দায়িত্ব বর্তায়নি এবং প্রস্তাবটি সম্পর্কে কংগ্রেস যা-খুশি তা-ই করতে পারে। এ'রা এতে খুবই দুঃখিত; কথাটা এ'রা কোনওক্রমেই ভুলতে পারছেন না। এ'দের প্রত্যেকেরই—বিশেষ করে ক্রিপ্‌সের—এ নিয়ে একটা গভীর ক্ষোভ রয়েছে। এ'দের ধারণা, এই একটামাত্র ঘটনাই ভারতীয় রাজনীতির গতিপথ একেবারে পালটে দিয়েছে। এ নিয়ে এ'দের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। যাই হোক, ক্রিপ্‌সকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখন তাঁদের বিবেচনায় কংগ্রেসের কর্তব্য কী, সেটা কি তিনি স্পষ্ট করে বলবেন? আসলে এ'রা যা চান (এবং এই একটি ব্যাপারে ক্রিপ্‌স, অ্যাটলি আর পেথিক-লরেনস একমত) তা হচ্ছে এই যে, চূড়ান্ত রকমের একটা চেষ্টা করে কংগ্রেসকে এখন মুসলিমদের চিত্ত থেকে সমস্ত সংশয়-সন্দেহ দূর করতে হবে; এবং স্পষ্ট করে সবিস্তারে বলতে হবে যে, ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে কংগ্রেস যে ৬ই ডিসেমবর তারিখের ব্রিটিশ ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছে এ-কথার অর্থ কী। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, কিছুকাল পূর্বে লিয়াকত আলি খাঁও এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে সবিস্তারে কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছিলেন, এবং জানতে চেয়েছিলেন, ব্রিটিশ ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া হয়েছে বলতে কংগ্রেস ঠিক কী বোঝাতে চাইছে। ক্রিপ্‌সের ধারণা, লিয়াকত আলির প্রশ্নের রীতিটা পরিচ্ছন্ন হয়নি। সেক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার চান যে, মর্যাদাব্যঞ্জক ভঙ্গীতে কংগ্রেস থেকে এ-সব প্রশ্নের সবিস্তার উত্তর দেওয়া হোক। নতুন ভাইসরয় ভারতবর্ষে গিয়ে পৌঁছবার আগেই কংগ্রেস যদি তা করতে প্রস্তুত থাকে, বাদবাকী কাজ তাহলে ব্রিটিশ সরকারই করতে পারবেন।

অ্যাটলি, ক্রিপ্‌স আর পেথিক-লরেন্‌স আমাকে যা বলেছেন, তা আমি সযত্নে বিচার-বিবেচনা করে দেখেছি। টুকরো-টুকরো করে, শৃঙ্খলাহীনভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজন হবে বলে তাঁরা মনে করেন না; তেমনভাবে ক্ষমতা-হস্তান্তরের ইচ্ছেও তাঁদের নেই। তাঁরা মনে করেন যে, মিঃ জিন্না তো বুদ্ধিমান মানুষ, তিনি শিগগিরই বুঝতে পারবেন যে, যে ধরনের পাকিস্তান তাঁর পাবার সম্ভাবনা রয়েছে, তা পেয়ে কোনও লাভ হবে না। মিঃ জিন্নার চিত্তে এই উপলব্ধি জাগ্রত হবার পর কংগ্রেস যদি জানিয়ে দেয় যে, কী-অর্থে সে ব্রিটিশ-ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছে, এ'দের পক্ষে তাহলে মাউনটব্যাটেনকে এমন নির্দেশ দিয়ে পাঠানো সম্ভব হবে, যাতে করে তিনি মুসলিম লীগকে গণ-পরিষদে নিয়ে আসতে পারবেন।

অন্তর্বর্তী সরকারকে তাঁরা ডোমিনিয়ন সরকারের মর্যাদা দিতে সম্মত কিনা, এই প্রশ্নটিও আমি তুলেছিলাম। বর্তমান সরকারকে কীভাবে ডোমিনিয়ন সরকারে রূপান্তরিত করা যায়, নয়াদিল্লি থেকে যাত্রা করবার দিন ভি. পি. মেনন সে-বিষয়ে আমাকে একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া-পরিকল্পনা* দিয়েছিলেন। সেটি নিয়েও ক্রিপ্‌সের সঙ্গে আমি আলোচনা করি। ক্রিপ্‌স এ-প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। তবে পেথিক-লরেন্‌স এটিকে সযত্নে পরীক্ষা করে দেখছেন। আমার ধারণা, অন্তর্বর্তী সরকারকে এঁরা ডোমিনিয়ন সরকার হিসেবে, এবং পণ্ডিতজীকে তার কার্যত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, গণ্য করতে রাজী হবেন না। এঁদের যুক্তি এই যে, ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে তো এঁরা বিদায়ই নেবেন, এবং মাঝখানের এই কয়েকটা মাস উত্তীর্ণ হবার পরেই তো ভারতবর্ষ ষোল-আনা স্বাধীন হবে, তাহলে আর ব্রিটিশ সরকার এখন ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব নেবেন কেন? অন্তর্বর্তী সরকারকে ডোমিনিয়ন সরকারের মর্যাদা দেবার অর্থই তো কংগ্রেস ও সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে প্রকৃত ও পূর্ণ ক্ষমতা তুলে দেওয়া। তা এঁরা করতে রাজী নন। মুসলিম লীগ সবসময়েই এর বিরোধিতা করেছে, এবং ব্রিটিশ সরকারও মনে করেন যে, এতে করে মুসলিমদের প্রতি অবিচার করা হবে, এবং কাজটা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে অন্যায় হবে। আর তা ছাড়া, যার মেয়াদ হবে এখন থেকে ১৯৪৮ সনের জুন মাস পর্যন্ত, তাঁদের পক্ষে এমন একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা করবার দরকার আছে বলেও তাঁরা মনে করেন না। তবে, ব্রিটিশ সরকারের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী, কংগ্রেস যদি ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাবের ব্রিটিশ ব্যাখ্যাটিকে পুরোপুরি মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে, তাহলে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে নতুন ভাইসরয়কে এমন পরামর্শ দেওয়া সম্ভব হবে, যাতে করে তিনি অন্তর্বর্তী সরকারকে একটা যথার্থ ও কার্যক্ষম ক্যাবিনেটে পরিণত করতে পারেন। কথাটার অর্থ এই নয় যে, গত অগস্ট মাসের মতন আবার তাঁরা সরকার গঠনের জন্য পণ্ডিতজীকে আহ্বান করতে প্রস্তুত থাকবেন। নতুন ভাইসরয়কে যে-সব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনার ব্যাপারে এঁদের যথেষ্ট সতর্ক দেখা গেল। তবে এও অসম্ভব নয় যে, নতুন ভাইসরয় সরকারের সকল সদস্যকে পদত্যাগ করতে বলবেন এবং তারপর আবার নতুন করে সরকার গঠন করবেন। মুসলিমদের যখন আবার নতুন করে সরকারে যোগ দিতে বলা হবে, তখন তাদের হয়ত জানিয়ে দেওয়া হবে যে, সরকারকে কাজ করতে হবে একটি ঐক্যবদ্ধ ক্যাবিনেট হিসেবে; পরস্পরের সঙ্গে বিবদমান পৃথক দুটি দল হিসেবে নয়। ভাইসরয় নিজেই হবেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী। এঁদের বিশ্বাস, ভাইসরয়ের সঙ্গে পণ্ডিতজীর সম্পর্ক খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ হবে; কখনও কোনও অসুবিধে দেখা দেবে বলে এঁরা মনে করেন না। আমি এঁদের মন যতটা বুঝতে পারছি, তাতে মনে হয়, নতুন ভাইসরয়কে এ-ব্যাপারে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হবে, যাতে নিজের দায়িত্বে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

ক্রিপ্‌সকে আমি বললাম যে, ব্রিটিশ ব্যাখ্যাটিকে যেভাবে তাঁরা মেনে নিতে বলছেন, সেভাবে মেনে নিলে বস্তুত আসামকে বাংলার হাতে সমর্পণ করা হয়,

* শ্রী ভি. পি. মেনন তাঁর 'ট্রান্‌সফার অব পাওয়ার ইন্‌ ইনডিয়া' ('ভারতে ক্ষমতা-হস্তান্তর') নামক গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন যে, একজন 'বিশেষ দূত'-এর মারফতে এই পরিকল্পনাটি তিনি ভারত-সচিবের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

বাংলার প্রতিনিধিরাই সেক্ষেত্রে আসামের সংবিধান সম্পর্কে যা-ইচ্ছে তাই করতে পারবেন। এ-ব্যাপারে এ'দের উত্তর এই যে, 'গ' শ্রেণীতে বাংলার প্রতিনিধিরা যে একদল ফন্দিবাজ মানুষ হবেন, আগে থাকতেই এমন কথা ভেবে নেওয়া ঠিক নয়; আসাম সম্পর্কে সুবিচার-অবিচারের দায়িত্বটা তাঁদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া ভাল। সত্যিই যদি তাঁরা অবিচার করেন, তাহলে কী হবে,—এ সম্পর্কে এ'দের উত্তর এই যে, তখনই সেটা ভেবে দেখা যাবে; বাংলার প্রতিনিধিরা আসামের প্রতি অবিচার করলে কী হবে না-হবে আগে থাকতেই তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। এ-ব্যাপারে যে-সব অসুবিধে দেখা দিয়েছে, তার জন্যে এ'রা বাপুকে দায়ী করেন।

উপরে যা বললাম, নতুন ভাইসরয়ের কাছ থেকে কতটুকু আশা করা যেতে পারে, এর থেকেই আপনি তার একটা আন্দাজ পেয়ে যাবেন। আমরা যদি তাঁর সম্পর্কে নিরঙ্কুশ বন্ধুত্বের নীতি অনুসরণ করি, তাতে ক্ষতি কিছুই হবে না, উপরন্তু অনেক লাভ হতে পারে। এ-বিষয়ে পরে আবার লিখব।

আমার জীবন এখানে সাক্ষাৎকারে ঠাসা। এখানে আমার আগমনে প্রভূত উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে, এবং অনেকেই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। আমার সময়ের বেশী ভাগ তাতেই কাটছে। সংবাদপত্রের সম্পাদকদেরও অধিকাংশের সঙ্গেই আমি যোগাযোগ করেছি। 'টাইম্স' পত্রিকায় সম্প্রতি যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ বেরিয়েছে, তা হয়ত আপনি দেখে থাকবেন। নিবন্ধটিতে মোটামুটি উপকারই হয়েছে। শিগগিরই আমি আমার ছোট্ট দপ্তরটি গড়ে তুলে জয়েসের কাছ থেকে দায়িত্বভার নিয়ে নিতে পারব। জয়েসের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে, এবং ভারত-সচিবের সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাৎ হয়, তখন এ সম্পর্কে আমি তাঁর সঙ্গেও কথা বলেছি।

আমাদের ভালবাসা জানাই।

সুধীর"

ভারতবর্ষের নবনিযুক্ত ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ২০শে মার্চ তারিখে লনডন থেকে যাত্রা করেন, এবং ২২শে মার্চ তারিখে নয়াদিল্লিতে পৌছন। ১৯শে মার্চ তারিখে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। ভারত-সচিবের দপ্তর থেকে তিনি তখন তাঁর কার্যভার বুঝে নিচ্ছিলেন। সেই সময়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের প্রাইভেট সেক্রেটারি ক্যাপটেন ল্যাসেল্স্ আমাকে ফোন করে বলেন যে, নবনিযুক্ত ভাইসরয় ভারতে রওনা হবার আগে আমি যেন তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করি ও কথাবার্তা বলি। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে সেই আমার প্রথম সাক্ষাৎকার। কিন্তু প্রথম দিনেই তিনি এমনভাবে আমাকে গ্রহণ করলেন যেন আমি তাঁর অনেককালের বন্ধু। তিনি বললেন যে, ভারত-সচিব ও সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্সের কাছে তিনি আমার সম্পর্কে অনেক কথাই শুনেছেন। গান্ধীজীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার কথাও তিনি জানেন। অতঃপর ভারত সম্পর্কে তাঁর কর্মপন্থার একটা আভাস আমাকে দিলেন তিনি। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যা-কিছু তিনি শুনেছেন, প্রায় ঘণ্টাখানেক তা নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন। জানালেন, ভারতবর্ষে পৌছে পরপর কাদের সঙ্গে তিনি দেখা করবেন। এত খোলাখুলিভাবে তিনি আমাকে সব কথা জানাচ্ছেন কেন, তা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলুম না। একটু বাদেই সেটা অবশ্য স্পষ্ট হয়ে গেল। আলোচনা শেষ

করে তিনি বললেন, "ভারতবাসীদের হাতে ক্ষমতা-হস্তান্তরের ব্যাপারে রক্তপাত অনিবার্য। যাই হোক, আপনি যদি একটা উপকার করেন তো বড় ভাল হয়। নয়াদিল্লি পেঁাছে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমি মিঃ গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। সর্বাগ্রে আমি তাঁরই সঙ্গে দেখা করব। তবে ভারত-সচিবের কাছে শুনতে পেলাম যে, তিনি এখন দিল্লি থেকে অনেক দূরে। বিহারে যেখানে খুব সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়েছিল, তিনি নাকি এখন সেইখানে রয়েছেন। তিনি দিল্লি আসতে রাজী নন। এমন কী, মিঃ নেহরুও তাঁকে নাকি দিল্লি আসতে রাজী করাতে পারেননি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে। আপনি কি তাঁকে একটা চিঠি লিখে দেবেন? চিঠিখানা আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। আজ রাত্তিরেই চিঠিখানা আপনাকে লিখে ফেলতে হবে, এবং কাল সকাল আটটায় সেটিকে ১৬নং বেলগ্রেভ স্কোয়ারে আমার বাড়িতে পেঁাছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়িটা হচ্ছে বাকিংহাম প্রাসাদের ঠিক পিছনে। সকাল আটটার কিছু পরেই আমি বিমানযোগে ভারত-যাত্রা করব। আমি আপনাকে যা-যা বললাম, মিঃ গান্ধীকে তার বিবরণ আপনি চিঠির মধ্যে জানিয়ে দিন, এবং দিল্লি এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে তাঁকে রাজী করাবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন।"

বস্তুত এটি পরিচয়-পত্র ছাড়া আর কী; আর গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ভাইসরয় কিনা আমার মতন মানুষের কাছ থেকে পরিচয়-পত্র নিচ্ছেন! লর্ড ওয়াভেল এমন কথা কল্পনাও করতে পারতেন না। কিন্তু নতুন ভাইসরয় সেই তুলনায় অনেক বেশী বিচক্ষণ মানুষ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, গান্ধীজীকে দিল্লি আনাবার জন্যে কাকে দিয়ে চেষ্টা করাতে হবে।

আর্থার বটমলি, উডরো ওয়াট এবং পারলামেনটের আরও জনাকয়েক তরুণ শ্রমিক-সদস্য সে-রাত্রে কমন্স সভার রেস্তোরাঁয় আমাকে সস্ত্রীক ডিনারের নেমন্তন্ন করেছিলেন। হোয়াইটহল থেকে ওয়েস্ট্‌মিন্স্টার প্রাসাদ পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে আমি তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলাম। তাঁদের বললাম যে, নতুন ভাইসরয় আমাকে মহাত্মা গান্ধীর কাছে একটি চিঠি লিখতে বলেছেন; চিঠিটা আজই লেখা দরকার, কাগজ পেলে সেখানে বসেই চিঠিটা আমি লিখে ফেলতে পারি। 'কমন্স সভা'র ছাপ মারা কাগজ ছাড়া অন্য রকমের কাগজ তাঁরা দিতে পারলেন না। এ-কাগজ সাধারণত পারলামেন্টের সদস্যরাই ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু কী আর করা, অন্য কাগজ না-থাকায় তারই উপরে চিঠিটা আমি লিখে ফেললাম, এবং পরদিন সকালে সেটি ১৬নং বেলগ্রেভ স্কোয়ারে পেঁাছে দেবার ব্যবস্থা করলাম। যথাসময়ে মহাত্মার কাছ থেকে উত্তর এল। উত্তরে তিনি লিখলেন :

পাটনা,
২১. ৪. ৪৭

"চিরঞ্জীব সুধীর ও শান্তি,

তোমাদের সমস্ত চিঠিই আমি পেয়েছি। কাজের চাপ এখন এত বেশী যে, নিতান্ত জরুরী চিঠি ছাড়া অন্য চিঠির উত্তর দেবার মত সময় পাই না। তোমাদের আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। তোমাদের যদি আমাকে কিছু জানাবার থাকে, শুনব। ভাইসরয় সম্পর্কে যা-কিছু আমার করতে হয়েছে, তার খবর তোমরা নিশ্চয় পেয়ে থাকবে। পরস্পরকে আমাদের ভাল লেগেছে। ঘটনাই প্রমাণ করবে, তিনি

কী ধাতু দিয়ে গড়া মানুষ। তবে, নৌবাহিনীর মানুষের পক্ষে যা স্বাভাবিক, তিনি খুব পরিশ্রম করছেন।

তোমাদের দুজনেরই ওখানে পরীক্ষা চলেছে। তোমরা যে এতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হবে, তাতে আমার সন্দেহ নেই। শান্তি কেমন আছে? তার স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে তো? ওখানে সে কী শিখছে?

আমার কাজ খুবই কঠিন। কিন্তু তা নিয়ে আমি কিছু বলতে পারি না। কাজটা যখন হাতে নিই, তখনই তো এর দুরূহতার কথা আমি জানতুম। আশা করি, কিছু-কিছু ভারতীয় কাগজপত্র তোমরা পাচ্ছ। আগাথা ও অন্যান্য বন্ধুদের আমার ভালবাসা জানিও। আশা করি কার্লের স্বাস্থ্য এখন আগের চাইতে ভাল।

তোমাদের দুজনকেই আমার ভালবাসা জানাই।

বাপু"

হাতের লেখা কাঁচা; দেখে মনে হল, বাচ্চা কোনও মেয়েকে দিয়ে চিঠিখানি লেখানো হয়েছে। চিঠির একেবারে শেষে গান্ধীজী তাঁর আপন হাতে দু লাইন লিখে দিয়েছেন। "কাল তোমাকে যে চিঠি লিখেছি, তাতে বোকামি করে ভুল ঠিকানা লেখা হয়েছিল; এটি তারই নকল। মূল চিঠি আমি আপন হাতে লিখেছিলাম।" এত তাঁর দুঃখ, এত তাঁর নিঃসঙ্গতা, কিন্তু তার মধ্যেও—পাছে আমি বেদনা পাই, তাই—তিনি জানাতে ভোলেননি যে, নিজের হাতেই তিনি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, পিতা তাঁর সন্তানের কাছে আপন হাতে চিঠি লেখেননি, অন্যকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন, এমন ধারণা করে আমি হয়ত কষ্ট পেতে পারি। কী গভীর ছিল তাঁর ভালবাসা, এর থেকেই তা বুঝতে পারা যাবে।

মূল চিঠিতে ভুল করে আমার ঠিকানা লেখা হয়েছিল: "সুধীর ঘোষ, হাউস অব কমন্স, লনডন"। পরে অবশ্য সেটিও আমি পেলাম। ব্রিটিশ ডাকবিভাগ কর্মদক্ষ। আমার প্রকৃত ঠিকানা খুঁজে বার করে কেনসিংটনে আমার ফ্ল্যাটে তাঁরা চিঠিখানি পৌঁছে দিয়েছিলেন।

এ-পর্যন্ত বেশ ভালয়-ভালয় কাটল। তার দিনকয়েক বাদেই শুরু হল আমার বিপদের পালা। বাপু যা আশঙ্কা করেছিলেন, তা-ই সত্য হল। শ্রীনেহরুর কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম আমি। ৬ই এপরিল তারিখে লেখা চিঠি; উপরে লেখা 'ব্যক্তিগত'। তাতে তিনি জানালেন:

১৭ ইয়র্ক রোড,
নয়াদিল্লি, ভারতবর্ষ
৬ই এপরিল, ১৯৪৭

"প্রিয় সুধীর,

লনডনে ভারত-বন্ধু সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কাগজে এই খবর পড়ে আমি কিছুটা বিস্ময় বোধ করেছি। এ-রকম সমিতি প্রতিষ্ঠা করা যে ভাল কাজ সে-কথা বলাই বাহুল্য। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ধরনের কোনও সমিতি গঠনের উদ্যোগ করলে তাতে সুবিধে হয় কিনা সে-বিষয়ে আমি সন্দিহান। এমন কী, কংগ্রেসও এই ধরনের কাজ করেনি; তার কারণ কংগ্রেসের মনে হয়েছিল যে, সরকারী পৃষ্ঠ-

পোষণার ব্যবস্থা থাকলে এই ধরনের সমিতির মূল্য কমে যায়। ভারত সরকারের পক্ষে এ-কথা আরও বেশী প্রযোজ্য। উদ্যোগটার অপব্যাখ্যা হতে পারে, এবং বলা হতে পারে যে, এটা একটা দলীয় উদ্যোগ।

২। এ-বিষয়ে আমি সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে কথা বলেছি; ভেলোড়ির কাছেও লিখছি। যা করা হয়েছে, তা ভেঙে দেওয়া হোক, এমন কথা আমি বলি না। সেটা করা শক্ত হবে; তার ফলাফলও অবাঞ্ছনীয় হতে পারে। তবে তুমি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিরা এ-ব্যাপারে এবং এই ধরনের অন্যান্য ব্যাপারে খুবই সতর্কতাসহকারে অগ্রসর হবে, এইটেই আমি চাই।

৩। সমিতির লোকজনদের যে তালিকা দেখছি সেটাকে অবশ্য ভালই মনে হচ্ছে। তাদের মেলামেশার যে ব্যবস্থা হয়েছে তাও ভাল। তবে সরকারীভাবে এর উদ্যোগ হওয়াটা আমার মনঃপূত নয়। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যে-কাজ তুমি করবে, সেটাকে দলীয় কাজ বলে মনে করা হবে, অথবা লনডনে কিংবা অন্যত্র ভারতীয়দের মধ্যে তা নিয়ে সমালোচনা হবে, এটা আমি চাই না। আমরা এখন একটা অস্বস্তিকর ও দুরূহ অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছি, এবং কী আমরা করব এবং কীভাবে তা করতে হবে, সে-বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকা দরকার।

আন্তরিকভাবে তোমার
জওহরলাল নেহরু"

শ্রীসুধীর ঘোষ,
ইনডিয়া হাউস, লনডন।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, লনডনে কিছু মানুষকে আমি এক-জায়গায় এনে মিলিয়েছিলাম। এই গোষ্ঠীটিকে বলা হত 'ভারতবন্ধু'। শ্রীনেহরুর পুরনো বন্ধু এইচ এন ব্রেল্‌সফোর্ড ছিলেন এর নেতা। ভারতবর্ষের সমস্যা আর অসুবিধার কথা ব্রিটিশ জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলাই ছিল এঁদের কাজ। ভারত সরকারের সঙ্গে এই গোষ্ঠীর কোনও সম্পর্কই ছিল না। উদ্যোগটা আমারই বটে, কিন্তু সরকারী সম্পর্কের কোনও নামগন্ধ এতে ছিল না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, বিশিষ্ট ব্রিটনদের এই গোষ্ঠী যদি ভারতবর্ষের বক্তব্য ব্রিটিশ জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলেন, তবে তাতে আশু কাজ হবে; এবং ভারত সরকারের বেতনভোগী কর্মচারীরা যা করবার চেষ্টা করছেন, এতে করে তার জোর আরও বাড়বে। গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য কী, এইচ. এন. ব্রেলসফোর্ডের লেখা এই চিঠিখানি পড়লেই তা বুঝতে পারা যাবে।

৩৭ বেলসাইজ পার্ক গার্ডেন্‌স্‌,
লনডন, এন. ডবলু. ৩,
২৬শে মে, ১৯৪৭

"প্রিয় জওহরলাল,

এই চিঠি আপনার কাছে আমার ও আমার স্ত্রীর গভীর ও সস্নেহ শুভেচ্ছা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। কাজে-ঠাসা এই জটিল দিনগুলিতে সারাক্ষণই আপনার কথা চিন্তা করি আমরা, এবং আপনার শক্তি ও মানসিক শান্তি কামনা করি।

জানিনা, এর মধ্যে দিন কয়েকের জন্য আপনি পাহাড়ে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পেরেছেন কিনা।

এবারে জানাই আমাদের নতুন গোষ্ঠী ভারতবন্ধু-সমিতির কাজ কেমন চলেছে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে যাঁদের কিছুটা বন্ধুসুলভ আগ্রহ আছে ও স্বাধীনতার নবযুগে যাঁরা ঘনিষ্ঠ ও সমমর্যাদাসম্পন্ন সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান, সব দল থেকেই এমন ইংরেজকে আমরা এই সমিতির মধ্যে টানতে চাই। আপনি তা নিশ্চয়ই বুঝবেন। শুধুমাত্র ব্রিটিশরাই এর সদস্য হতে পারবেন। এই ব্যাপারটার উপরে আমি এইজন্যে গুরুত্ব দিচ্ছি যে, লনডনের কিছু ভারতীয় এর উদ্দেশ্যকে ভুল বুঝেছেন, এবং ভেবেছেন যে, এটা বুঝি ইনডিয়া লীগেরই একটা প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান। এর উদ্দেশ্য ও সংগঠন কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক। এর সদস্যদের মধ্যে সর্বদলেরই লোক আছেন। তবে বলাই বাহুল্য, যে-ক'জন টোরি আমাদের সঙ্গে আছেন, স্বাধীনতায় তাঁদের সম্মতি আন্তরিক। এ-পর্যন্ত যে কজন সক্রিয় সদস্য পাওয়া গেছে তাঁরা হচ্ছেন সার স্ট্যানলি রীড, সার জর্জ শুস্‌টার, লেনার্ড এল্‌মহার্স্ট, উডরো ওয়াট ও আমি। তবে অন্য অনেকেও আমাদের কোনও-না-কোনও আলোচনা-বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন লর্ড বীভারিজ, সার হ্যারল্‌ড নিকলসন ও গ্রাহাম হোয়াইট। আর. এ. বাটলার আমাদের প্রথম সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সুধীর ঘোষের মাধ্যমেই এ-যাবৎ আমরা যোগরক্ষা করেছি; তাঁর সম্পর্কে আমাদের সকলেরই খুব উঁচু ধারণা। ঠিক লোককেই আপনি নির্বাচন করেছেন। তাঁর চাইতে পছন্দসই ও জনপ্রিয় জন-সংযোগ অফিসারের কথা ভাবাই চলে না। তিনি খুবই উদ্যোগী ও কল্পনাশীল মানুষ; আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, মাস কয়েকের মধ্যেই তাঁর কাজের সুফল পাওয়া যাবে; দেখা যাবে, জনসাধারণ আরও বন্ধুভাবাপন্ন ও ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছে। সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির ব্যাপারে আমাদের এই গোষ্ঠী কোন্ পথ ধরে অগ্রসর হবে, তা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। ভাবছি, স্টার্লিং ব্যালান্‌স নিয়ে খুব শিগগিরই একটা প্রকাশ্য আলোচনার ব্যবস্থা করব। একজন ভারতীয় সেখানে আপনাদের বক্তব্য বিবৃত করতে পারেন। জনসাধারণের মধ্যে যারা ভারতের অনুরাগী, এ-বিষয়ে আপনাদের বক্তব্য তাদের কাছেও এখনও পর্যন্ত পৌঁছয়নি। তবে সময় নির্বাচনটা যাতে ঠিক হয়, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। কী সিদ্ধান্ত যে নেব, তা আমরা এখনও জানি না। তবে একটা কথা ঠিক। সেটা এই যে, এই গোষ্ঠীকে ঘিরে বেশ বড় ও প্রভাবশালী একটা 'বন্ধু'মহল আমরা গড়ে তুলতে পারব।

আমার আশঙ্কা, ভারতবর্ষে একটি ফেডারেল ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয়ত আপাতত পরিহার করতে হবে। তাই যদি হয়, তবে তার বিকল্প হিসেবে এখন থেকেই কি কনফেডারেশনের কথা চিন্তা করা চলে না? একমাত্র এই পথেই জাতীয় সৈন্যবাহিনীকে অখণ্ড রাখবার আশা করা যেতে পারে। দ্বৈত রাজতন্ত্রের পুরানো প্রথাটিকে এক্ষেত্রে মডেল হিসাবে গ্রহণ করা যায়। অস্ট্রিয়া ও হাংগারি, এরা উভয়েই ছিল সার্বভৌম, স্বাধীন রাষ্ট্র, কিন্তু তাদের সৈন্যবাহিনী ছিল এক। সরবরাহের ব্যাপারে ভোট দেবার জন্য তাদের প্রতিনিধিরা (প্যারিটির ভিত্তিতে) বছরে একবার মিলিত হতেন। যৌথ মন্ত্রী ছিলেন তিনজন; তাঁরা পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও অর্থদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

ব্যবস্থাটা কার্যকর হতে পেরেছিল (কিছু-কিছু বিরোধ অবশ্য বাধত), তার

কারণ হ্যাপ্‌সবার্গ রাজতন্ত্র এক্ষেত্রে যোগরক্ষার কাজ করেছে। তা ছাড়া এ দুটি দেশের শুল্ক-ব্যবস্থাও ছিল যৌথ।

হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের মধ্যে যদি এইভাবে যোগসূত্র রচনা করা যায়, তবে সেই কনফেডারেশনের একজন প্রেসিডেন্ট ঠিক করতে হবে।

ব্রহ্মদেশ ও সিংহলও শেষপর্যন্ত সেই কনফেডারেশনে যোগ দিতে পারে।

তবে আমি কল্পনা করতে পারি যে, কতখানি ব্যগ্রভাবে আপনি ও আপনার সহকর্মীরা এখন সম্ভাব্য নানা ব্যবস্থার কথা ভেবে দেখছেন, এবং এর চাইতে আরও ভাল ব্যবস্থার সন্ধান হয়ত আপনারা পাবেন।

আমি ও আমার স্ত্রী আপনাকে, ইন্দিরাকে ও আপনার নাতিটিকে আমাদের ভালবাসা জানাচ্ছি।

চিরকালের জন্য আপনার
নোয়েল ব্রেল্‌সফোর্ড"

•

এই চিঠিতে অবশ্য কোনও ফল হল না। ঝঞ্ঝাট ক্রমে বাড়তেই লাগল। শ্রীনেহরু ও সর্দার বল্লভভাইয়ের লেখা দুখানি চিঠি পড়লেই তা বোঝা যাবে।

•

নয়াদিল্লি
২০শে জুন, ১৯৪৭

"প্রিয় সুধীর,

তোমার চিঠির উত্তরে দিন কয়েক আগে আমি একটি ছোট্ট চিঠি পাঠিয়েছি। তার ঠিক পরেই সর্দার প্যাটেল তাঁর কাছে লেখা তোমার ২৮শে মে তারিখের চিঠির একটি নকল আমাকে পাঠিয়ে দেন। তিনি নিশ্চয় আলাদাভাবে তোমাকে চিঠি লিখবেন। তবে আমার মনে হয়, এই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমার যা ধারণা হয়েছে, সেটা খোলাখুলিভাবে তোমাকে আমার জানানো উচিত।

প্রথমেই একটা কথা সকলের স্পষ্ট বোঝা দরকার। সেটা এই যে, লনডনে তুমি সর্দার প্যাটেলের প্রতিনিধিত্ব করছ এবং আমার প্রতিনিধিত্ব করছেন আর কেউ—এ-কথা নেহাতই উদ্ভট এবং অর্থহীন। এমন কথা বলাও নেহাত বোকামি যে, সর্দার প্যাটেল ও আমি সরকারে দুই পৃথক নীতি অনুসরণ করে চলেছি। বুদ্ধিমান মানুষদের মধ্যে মতের পার্থক্য ঘটা স্বাভাবিক; কিছু-কিছু ব্যাপারে আমাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতার ভিত্তিতে আমরা কাজ করে থাকি। তার কারণ শুধুই এই নয় যে, আমাদের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের এবং পরস্পরের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল; বর্তমান অবস্থায় সেই সহযোগিতা অত্যাবশ্যকও বটে। লনডনে তুমি বিশেষ কোনও একজন মন্ত্রীর কিংবা অন্য-কারও প্রতিনিধি নও; সেখানে তুমি ভারত সরকারেরই প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছ। এ-ব্যাপারে সরকার যে-সব নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন, স্বভাবতই সেই নিয়ম অনুযায়ী তোমাকে কাজ করতে হবে।

সরকারের রুটিনে-বাঁধা কাজ মাঝে-মাঝে লালফিতের ফাঁসে জড়িয়ে যায়। সঙ্গতভাবেই এর নিন্দাও করা হয়ে থাকে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলব, যে-কোনও প্রতিষ্ঠানে রুটিন আর শৃঙ্খলার প্রতি নিষ্ঠাশীল থাকারও কিছুটা মূল্য আছে। এই কারণেই যথাবিহিত পন্থায় কাজ করা দরকার। তা নইলে বিশৃঙ্খলা ও ভুল-

বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। লনডনে হাইকমিশনারই তোমার ঊর্ধ্বতন কর্তা। তাঁর কাছে গিয়ে তোমার উপদেশ চাওয়া উচিত, এবং যে-কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। তিনি যে শুধুই তোমার উপরওয়ালা, তা নয়; জীবন সম্পর্কে তিনি অনেক বেশী অভিজ্ঞ, লনডনে তিনি অনেক দিন ধরে কাজ করছেন, এবং তাঁর পরামর্শ নির্ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। এ-কথার অর্থ এই নয় যে, ভারত সরকারের যে-দপ্তরের সঙ্গে তুমি বিশেষভাবে যুক্ত, সেই তথ্য ও বেতার দপ্তরের সঙ্গে তুমি সরাসরি যোগ রাখতে পারবে না।

সরকারী কাজের প্রসঙ্গে এইখানেই ছেদ টানছি। যেমন অন্যান্য ব্যাপারের, তেমনি এরও একটা ব্যক্তিগত দিক আছে। তোমার চিঠি থেকে এবং অন্যান্য কিছু-কিছু বিবরণ থেকে মনে হয়, লনডনে তুমি কিছু অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছিলে এবং তোমাকে কেন্দ্র করে কিছু বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এ-কথা জেনে আমি বিস্মিত হইনি। নতুন জায়গায় গিয়ে মানুষকে খুব হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলতে হয় এবং সহকর্মীদের শুভেচ্ছা লাভের চেষ্টা করতে হয়। তা নইলে সন্দেহ দেখা দেয়। ভারতবর্ষের রাজনীতি এখন জটিল, অন্তত বাইরে থেকে দেখে সেই রকমই মনে হয়, এবং প্রত্যহ এখানে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। ঠিক কী যে ঘটছে এবং কোন্ নীতি অনুসরণ করে চলতে হবে, সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে সর্বদা সেটা বুঝে ওঠা শক্ত। নতুন সরকার আসায় নীতির কোনও পরিবর্তন সূচিত হল কিনা তাও স্বভাবতই তাঁরা জানবেন না।

তার উপরে আবার লনডন হচ্ছে ষড়যন্ত্রের লীলাভূমি। ভারতীয় সংগঠনের সংখ্যা সেখানে কম নয়। তাদের অধিকাংশের অস্তিত্বই অবশ্য নেহাতই খাতায়-পত্রে। ইংলনড-প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে স্বভাবতই সর্বরকমের মানুষ রয়েছে। কেউ-কেউ অতি চমৎকার মানুষ; আবার কেউ-কেউ সর্বতোভাবে অবাঞ্ছনীয়। বাদবাকীরা উপর-উপর ভেসে বেড়ায়; অন্যের সমালোচনা করাই তাদের কাজ। নবাগতকে এই সমস্ত-কিছুরই সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর কর্মপদ্ধতি যদি আদৌ আক্রমণাত্মক কিংবা বিস্তারশীল হয়, তবে তিনি বিরোধিতার সম্মুখীন হবেন।

তোমার চিঠিতে তুমি কৃষ্ণ মেনন ও লনডনে তাঁর সহকর্মীদের উল্লেখ করেছ। ইনডিয়া লীগেরও উল্লেখ করেছ তুমি। কৃষ্ণ মেননকে আমি ভালভাবেই চিনি। লনডনে তাঁর কাজের সঙ্গেও আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে। ইনডিয়া লীগের কথাও জানি আমি। কৃষ্ণ মেনন ও তাঁর কাজ সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা খুবই উঁচু। তাঁকে আমি আমাদের একজন দক্ষতম মানুষ বলে গণ্য করি। চমৎকারভাবে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন, এবং আমরা আশা করি যে, ভবিষ্যতে তিনি এর চাইতেও বেশী দায়িত্বপূর্ণ কাজ করবেন।

ইনডিয়া লীগের মধ্যে নানান রকমের মানুষ রয়েছেন। ভারতীয় দৃষ্টিকোণের বিচারে বলা যায় যে, এটিই হচ্ছে ইংলনডে সবচাইতে কার্যক্ষম সংগঠন। এর যে ত্রুটি নেই তা নয়; অতীতে এই প্রতিষ্ঠান কিছু-কিছু ভুল করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে কিংবা অন্যত্র যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কেই সে-কথা বলা যায়। যতটা সম্ভব, ইনডিয়া লীগের কাজের পূর্ণ সুবিধা আমরা নিতে চাই।

তুমি যখন ওখানে যাও, তারপর থেকে কৃষ্ণ মেনন প্রায় একটানা ইংলনডের বাইরে রয়েছেন। আমাদের হয়ে অন্য-কিছু কাজ তাঁকে করতে হবে; সেই কাজের দায়িত্ব নিয়ে শিগগিরই তিনি ইংলনডে ফিরবেন। তাঁর সঙ্গে তোমার যোগাযোগ

রাখা উচিত; তোমার যদি কোনও অভিযোগ থাকে, তাঁকে সে-কথা জানানো উচিত। সাধারণ অবস্থায় তোমাকে অবশ্য ভেলোড়ির পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে।

আশা করি, শিগগিরই তোমার অসুবিধা তুমি কাটিয়ে উঠতে পারবে। কত তাড়াতাড়ি পারবে, প্রধানত সেটা তোমারই উপরে নির্ভর করছে। অন্যদের তো আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না; তবে নিজেদের আচরণ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি যাতে অসুবিধে কাটিয়ে ওঠা যায়। আমার মনে হয়, ইংলনডে তোমার পক্ষে খুবই ভাল কাজ করা সম্ভব; তার কারণ, তুমি কর্মোৎসুক, বুদ্ধিমান, উদ্যোগী। লোকের সঙ্গে তুমি বন্ধুত্ব করতে পারো, অন্যদের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে পারো। তবে তোমার আর-একটু অভিজ্ঞ হওয়া দরকার; এখনও তুমি একটু কাঁচা। এটা অবশ্য শিগগিরই কেটে যাবে। এমনিতে এটা এমন-কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়। তবে এর ফলে অসুবিধের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

আমার ধারণা, রাজনীতির সঙ্গে তোমার প্রাথমিক যোগ-সম্পর্কটা ঘটেছে উল্টোভাবে। সূচনাতেই তুমি রাষ্ট্রীয় নীতির বৃহৎ ব্যাপার নিয়ে উঁচু একটা স্তরে মন্ত্রী ও অন্যান্যদের সংস্পর্শে এসেছ। এক্ষেত্রে তুমি নেহাতই অন্যদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছিলে বটে, কিন্তু এরই ফলে এমন একটা কার্যধারায় তুমি অভ্যস্ত হয়ে যাও, যা ঠিক স্বাভাবিক কার্যধারা নয়। তোমার নিশ্চয় মনে আছে, মাস কয়েক আগে যখন তুমি আমার সঙ্গে দেখা করেছিলে, তখন আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, এই যে সরাসরি তুমি ইংলনডে মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করো, মাঝে-মাঝে এতে কাজের সুবিধে হয় বটে, কিন্তু এর অনেক ঝুঁকি রয়েছে। এর ফলে তাঁরা হয়ত মনে করবেন যে, তুমি আমাদের প্রতিনিধিত্ব করছ, অথচ বস্তুত তুমি হয়ত তা না-ও করতে পারো। এর ফলে আমাদের উপরে হয়ত দায়িত্ব এসে পড়তে পারে; অথচ অন্য পক্ষ সেই দায়িত্বের জালে নিজেকে জড়াবেন না।

অতীতে এবং ইদানীং তোমার যে-সব চিঠি পেয়েছি, তার থেকে মনে হয়, সংযমের শাসনে নিজেকে তুমি বাঁধতে শেখোনি; অথচ গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব যাঁর হাতে, আত্মসংযম তাঁর পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক গুণ।

আমি তোমাকে খোলাখুলি সব জানাচ্ছি। তার কারণ আমি তোমাকে পছন্দ করি; আমি চাই, তোমার উন্নতি হোক। তোমার কাজে যাতে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হতে পারে এমন কিছু ঘটুক, এটা আমি চাই না। তা যাতে না ঘটতে পারে, বলা বাহুল্য তারই জন্য আমি চেষ্টা করব। কিন্তু আমি আশা করি যে, তুমি নিজেকে আর একটু শৃঙ্খলার শাসনে বাঁধবে, আর একটু সংযত হবে। আমাদের সকলকেই এখন ক্রমবর্ধমান দায়িত্বের ভার নিতে হবে; তা যাঁরা নিতে পারেন, তাঁদের সংখ্যা খুবই সামান্য।

এ-চিঠি একান্তভাবেই ব্যক্তিগত; আর-কাউকে এটা দেখাবার দরকার নেই। তবে আমার মনে হয়, সর্দার প্যাটেল ও মিঃ ভেলোড়ির এটা দেখা উচিত। তাঁদের কাছে, অতএব, এর নকল আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আন্তরিকভাবে তোমার
জওহরলাল নেহরু"

শ্রীসুধীর ঘোষ,
কেয়ার অব দি হাই কমিশনার ফর ইনডিয়া ইন লনডন,
ইনডিয়া হাউস, লনডন।

চমৎকার এই চিঠিখানির সুরটা ছিল কূটনৈতিক। সেইটে আমার ভাল লাগেনি। শ্রীনেহরু এই চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, আমাকে তিনি পছন্দ করেন, আমার উন্নতি তাঁর কাম্য, আমাদের সকলকেই ক্রমবর্ধমান দায়িত্বের ভার নিতে হবে, এবং তা যাঁরা নিতে পারেন তাঁদের সংখ্যা খুবই সামান্য। এর দ্বারা তিনি কি সত্যি এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা যাঁদের আছে, আমাকে তিনি তাঁদেরই একজন বলে মনে করেন?—এবং ভালভাবে কাজ করে আমি যদি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারি, তাহলে আমাকে তিনি দায়িত্বের পদ দেবেন, এই কথাই কি বোঝাতে চেয়েছিলেন তিনি? না, তা তিনি আদৌ বোঝাতে চাননি। সমস্ত মহত্ত্ব সত্ত্বেও ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে তিনি ছিলেন ভীষণ জেদী। আমার দুর্ভাগ্য এই যে, নয়াদিল্লিতে ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে যখন কথাবার্তা চলছিল, আমাকে তিনি তখন অপছন্দ করতে শুরু করেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর চিঠিখানিকে খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়, কিন্তু বস্তুত তাঁর অযৌক্তিক ধারণাই এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। চিঠিতে তিনি বলছেন যে, ক্যাবিনেট মিশন লনডনে ফিরে যাবার পরে ক্রিপ্‌স আর পেথিক-লরেন্‌সের কাছে আমি যে চিঠিপত্র লিখতাম, তাতে বিপদের ঝুঁকি ছিল; কেননা আমার মতন মানুষ এইভাবে চিঠি লেখার ফলে, ব্রিটিশ সরকার নিজেদের কোনও প্রতিশ্রুতির দায়ে আবদ্ধ না-করা সত্ত্বেও, কংগ্রেস দলের উপরে হয়ত দায়িত্ব এসে পড়তে পারত। কথাটা অর্থহীন। ক্রিপ্‌সের অনুরোধে আমি চিঠি লিখতাম। তিনি বলেছিলেন, আমার চিঠি পড়ে ভারতবর্ষের ঘটনাবলীর তাৎপর্য বুঝতে তাঁর সুবিধে হয়; আমার চিঠিকে তাই তিনি মূল্যবান মনে করেন। প্রতিটি চিঠি পাঠাবার আগে গান্ধীজী তার খসড়া একবার পড়ে দিতেন। তিনিও মনে করতেন যে, ক্রিপ্‌সের কাছে এই যে আমি চিঠি লিখছি, এতে কাজের খুবই সুবিধে হচ্ছে। শ্রীনেহরু যখন লর্ড ওয়াভেলের অধীনে মন্ত্রী, তখন ব্রিটিশ মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার অবাধ উপায় তাঁর ছিল না। আমার বিশ্বাস, শ্রমিক মন্ত্রিসভাকে তাঁর মতামত জ্ঞাপনের ব্যাপারে আমার এই চিঠিগুলি তখন তাঁর পক্ষেও একটি সুবিধাজনক মাধ্যম হয়ে উঠেছিল।

সবচাইতে দুঃখ পেলাম এই কথা বুঝতে পেরে যে, চিঠিখানি আমাকে সম্বোধন করেই লেখা হয়েছে বটে, কিন্তু আমি এর উদ্দিষ্ট নই, আসলে এর উদ্দিষ্ট হচ্ছেন বল্লভভাই প্যাটেল, এবং ভেলোড়ি। (ভেলোড়ি তখন অস্থায়ীভাবে হাই কমিশনারের কাজ চালাচ্ছেন।) তাঁদের দুজনের কাছেই শ্রীনেহরু এই পত্রের অনুলিপি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। প্রকৃতই যদি এটি একটি ব্যক্তিগত চিঠি হত, এবং একটি তরুণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তাকে কিছু প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়াই যদি শ্রীনেহরুর লক্ষ্য হত, তাহলে তিনি কিছুতেই হাই কমিশনারের কাছে এ-চিঠির অনুলিপি পাঠাতেন না। চিঠির মধ্যে ভাল-ভাল যে-সব কথা রয়েছে, সেগুলি আমাকে উদ্দেশ করে ততটা লেখা হয়নি, যতটা বল্লভভাই প্যাটেলকে উদ্দেশ করে। শ্রীনেহরু জানতেন যে, তিনি আমাকে পছন্দ করেন না বটে, কিন্তু আমার উপরে গান্ধীজী আর বল্লভভাই প্যাটেলের প্রভূত আস্থা রয়েছে। কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে সুধীর ঘোষের বিরোধে শ্রীনেহরু একা ছিলেন এক দিকে; অন্যদিকে ছিলেন গান্ধীজী ও বল্লভভাই প্যাটেল।

এর কিছুকাল বাদে, ভারতবর্ষে ফিরে এসে, গান্ধীজীকে আমি চিঠিখানি দেখাই। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে চিঠিখানি পড়লেন। তারপর মন্তব্য করলেন,

"বিচিত্র চিঠি। যিনি লিখেছেন, তিনি একজন মহৎ মানুষ। স্বভাবতই তিনি দয়ালু এবং উদার। একজন তরুণের প্রতি সুবিচার করবার জন্যে তিনি এখানে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন, কিন্তু আর-এক দিক থেকে তাঁর উপরে আরও প্রবল চাপ পড়ায় তাঁর সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।" বলা বাহুল্য, গান্ধীজী এখানে কৃষ্ণ মেননের কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। মেনন তখন নেহরুর ছায়াস্বরূপ।

এই একই বিষয়ে ডেপুটি 'সিংহ' বল্লভভাইয়ের বক্তব্যও সমান কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁর এই চিঠি থেকেই তা বোঝা যাবে :

তথ্য ও বেতার দপ্তর,
ভারত সরকার,
নয়াদিল্লি, ২৯. ৬. ৪৭

"প্রিয় সুধীর,

তোমার ২৮শে মে, ১৯৪৭ তারিখের চিঠি পেয়ে খুশী হয়েছি। চিঠিখানি পেয়ে তোমার সম্পর্কে আমার উদ্বেগ কিছুটা কাটল। যে-সব অসুবিধের মধ্যে তোমাকে কাজ করতে হচ্ছে, সে-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অবহিত। এ-ব্যাপারে তোমার প্রতিক্রিয়া কী, স্বভাবতই তা আমি জানতে চাইছিলাম। এখন জেনে খুশী হলাম যে, অসুবিধের তুমি মোকাবিলা করছ। নৈরাশ্য আর ভগ্নোদ্যম ভাবটাও আমি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তোমার মতন গুণী ও যোগ্য মানুষ অসুবিধের মোকাবিলা করতে গিয়ে এইভাবে মুষড়ে পড়বে, এটা ঠিক নয়। জনসংযোগ-অফিসারের জীবন তো সুসময়েও এবং অনুকূল অবস্থাতেও পুষ্পশয্যার জীবন নয়। সেক্ষেত্রে তোমাকে কেন্দ্র করে যে পক্ষপাতদুষ্ট বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছে, তাতে ধৈর্য, সাহস আর কৌশল আরও বেশী মাত্রায় থাকা চাই। এইসব অসুবিধের সঙ্গে তোমার পরিচয় যতই বাড়বে, ততই তুমি বুঝতে পারবে, কীভাবে এর মোকাবিলা করতে হয়। এ আমি নিশ্চিত জানি।

জওহরলাল তোমাকে যে চিঠি লিখেছেন, তা আমি দেখেছি। চিঠিখানিতে এমন কিছু আছে, যা হয়ত তোমার ভাল লাগবে না। কিন্তু তার জন্য ভগ্নোদ্যম কিংবা হতাশ না-হতেই আমি তোমাকে অনুরোধ করব। তিনি যে উপদেশ দিয়েছেন, শান্তভাবে, বিনম্র মর্যাদায় তা তুমি গ্রহণ করো। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো যে, এ-ব্যাপারে তোমার দিকের বক্তব্যও আমি সম্পূর্ণ জানি, এবং আমার উপরে সর্বদাই তুমি এই আস্থা রাখতে পারো যে, তোমার অবস্থাটা আমি সহানুভূতি-সহকারেই বিবেচনা করব। যাঁরা তোমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, তাঁদের সন্তোষ বিধানের জন্য তোমাকে অবশ্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে; কিন্তু তাই বলে ক্যাবিনেট-মন্ত্রীদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কচ্ছেদের পরামর্শ তোমাকে আমি দেব না। সরকারী কর্মচারীদের আচরণ সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে এমন কোনও কথা নেই, যার জন্য তোমাকে তা করতে হতে পারে; যদি তোমাকে কেউ ব্যক্তিগতভাবে এইসব সম্পর্ক ছেদ করতে বলেন, তাহলে তিনি নিজের এক্তিয়ার লঙ্ঘন করবেন মাত্র। বস্তুত, ওখানে তুমি যে কাজ নিয়ে রয়েছ, শুধু যে তারই সুবিধের জন্য এইসব যোগ-সম্পর্ক বজায় রাখা দরকার তা নয়, এতে করে আমাদেরও এখানে কাজের কিছুটা সুবিধে অবশ্যই হতে পারে। তবে তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে, যাই

কমিশনারের মনে যেন এমন ধারণার সৃষ্টি না হয় যে, তুমি তাঁর অজ্ঞাতসারে কিছু করছ। তুমি যদি বিচক্ষণ হও, এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে হাই কমিশনারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখো, তাহলে নিশ্চয়ই তেমন ধারণা তাঁর হবে না।

ওখানকার সংবাদপত্র এবং ব্রিটিশ সরকারের অফিসারদের সঙ্গে তুমি যে মূল্যবান যোগসূত্র গড়ে তুলতে পেরেছ, এ-কথা জেনে আমি খুবই খুশী হয়েছি। যে কঠিন কাজ তোমার হাতে, তা সম্পাদনের ব্যাপারে এতে নিশ্চয়ই তোমার অনেক সুবিধে হবে। কাজেকর্মে তোমাকে সাহায্য করবার জন্য যোগ্য একজন লোক পাঠাতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। দুর্ভাগ্যবশত, লোক-নির্বাচনের ব্যাপারে ফেডারেল পাবলিক সারভিস কমিশন বড়ই সময় নিচ্ছেন। লোক-নির্বাচন হয়ে গেলে, এবং নিয়োগটা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হলে তারপর আর তাঁর কাজে যোগ দিতে বিলম্ব হবে না।

জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্রিটিশ নাগরিকদের যে গোষ্ঠী গড়া হয়েছে, আমার মনে হয় না যে, তার থেকে নিজেকে তোমার ছিন্ন করা উচিত। ভারতবর্ষের মর্যাদার যে পরিবর্তন ঘটতে চলেছে, তোমার দায়িত্বভারের গুরুত্বও তার ফলে বৃদ্ধি পাবে; এবং বেসরকারীভাবে যে সব যোগসম্পর্ক তুমি গড়ে তুলেছ, এতে আমাদের কাজের তখন অনেক সুবিধে হবে। আর কিছু না হোক, যারা আমাদের ঘোর বিরোধী, ব্রিটিশ জনসাধারণের সেই অংশের পুরনো বিদ্বেষটা তখন দূর হবে, এবং ভারতবর্ষকে নিয়ে দলাদলির প্রশ্ন উঠবে না। এই কারণেই, আমাদের প্রচার-ব্যবস্থায় এমন একটি নির্দলীয় গোষ্ঠীর প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

ব্রিটিশ সরকারের সর্বশেষ ঘোষণাটিকে এখানে খুবই ভালভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কাগজে তার খবর তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, এবারে অভিযোগ উঠেছে মিঃ জিন্নার বিরুদ্ধেই। বলা হচ্ছে যে, ঘোষণাটিকে তিনি সরাসরি মেনে নেননি, পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। দেশ-বিভাগ হলে প্রশাসনিক যে-সমস্ত প্রশ্ন দেখা দেবে, তারই বিবেচনায় আমরা সবাই এখন ব্যস্ত রয়েছি, এবং যথাসম্ভব শুভেচ্ছা ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে তার মীমাংসা করবার চেষ্টা করছি।

দেশীয় রাজ্য-সংক্রান্ত সমস্যাটি এখন আমাদের সামনে এক বিরাট বাধা। এ-ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের সর্বশেষ মনোভাব অবশ্যই কাজের অনুকূল; তবে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, পলিটিক্যাল দপ্তরের আমলারা ইতিপূর্বে যে-সব দায়-দায়িত্বের ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে রেখেছেন, এবং যে-পন্থায় কাজ করেছেন, তার ফলে আমাদের পথে এক গুরুতর বিঘ্ন দেখা দিয়েছে। এইসব অফিসারের অসহযোগী, এমন কী বিঘ্নসৃষ্টিকারী মনোভাব জনচিত্তে যে তিক্ততা সৃষ্টি করেছে, ব্রিটিশ সরকার সে-বিষয়ে অবহিত হলে আমি খুশী হতুম। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, কয়েকটি দেশীয় রাজ্য বিশ্বাস করে যে, প্যারামাউন্ট ক্ষমতার অবসানের পর তারা স্বাধীনতা লাভ করতে অধিকারী। এইসব রাজ্য সম্পর্কে কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিধেয়, যথাসময়ে তা আমরা বুঝতে পারব। তবে ভেবে দুঃখ হয় যে, সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও আমলারা যদি না আমাদের পথের উপরে এইভাবে কাঁটা বিছিয়ে রাখত, বহু উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা থেকে তাহলে আমরা রক্ষা পেতাম।

টাইমস্ পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ সম্পর্কে তোমার টেলিগ্রাম আমি পেয়েছি।

নিবন্ধটির শুধু সংক্ষিপ্তসারই দেখেছি আমি। জওহরলাল নিজেই অনেকবার যে-অভিমত প্রকাশ করেছেন, মনে হচ্ছে সেইটেই এতে প্রতিফলিত। এ নিয়ে তোমার উদ্বেগের কোনও কারণ নেই।

শান্তিকে ও তোমাকে শুভেচ্ছা জানাই।

আন্তরিকভাবে তোমার
বল্লভভাই"

সুধীর ঘোষ, এস্‌কোয়্যার,
জন-সংযোগ অফিসার,
ভারতীয় হাইকমিশনারের দপ্তর,
ইন্‌ডিয়া হাউস, অল্‌ডুইচ, লনডন, ডব্‌লু. সি.-২।

আমার ব্যক্তিগত সমস্যার খবর জানিয়ে গান্ধীজীকে বিব্রত করিনি আমি। বস্তুত সপ্তাহ কয়েক তাঁর কাছে কোনও চিঠিই আমি লিখিনি৷ আমি যদি তাঁর কাছে চিঠি লিখি তো তাঁকেও আবার তার উত্তরে একটা চিঠি লিখতে হয়। তার মানেই বাড়তি কাজ। নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ সেই মানুষটি, তাঁর তখন মনে হচ্ছিল যে, সমস্ত বন্ধু তাঁকে পরিত্যাগ করে গিয়েছে, বাকী জীবন তাঁকে একা-একা পথ চলতে হবে; সেই অবস্থায় তাঁর কর্মভারের উপরে কে আর-একটা বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দিতে চায়! আমি চাইনি। অথচ আশ্চর্য এই যে, এত কাজের মধ্যেও তিনি অকস্মাৎ এক-একটা ছোট্ট চিঠি লিখে আমাদের খবর নিতেন। তারই একটা চিঠি এখানে তুলে দিচ্ছি :

১০. ৭. ৪৭ এন. ডি

"প্রিয় সুধীর,

প্রায়ই আমি তোমাদের দুজনের কথা ভাবি। আশা করি তোমরা ভাল আছ। মাঝে-মাঝে চিঠি লিখো।

তোমাদের দুজনকে আমার ভালবাসা জানাই।

বাপু"

ছোট্ট কয়েকটি বাক্য। তারই মধ্যে তাঁর মনের খবরকে তিনি সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরতে পারতেন। মানুষের পক্ষে মানুষকে যা বলতে চাওয়া স্বাভাবিক, তার সবটুকুই তাতে ব্যক্ত হত।

ভারতবর্ষে পেঁৗছে মাউন্‌টব্যাটেন কী করেছিলেন, অন্যেরা তার বিবরণ ইতিমধ্যেই লিখেছেন। আমি সেই পর্বের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলুম না। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মীমাংসার কোনও আশা না-থাকায় ভারতবর্ষে একটি ডোমিনিয়নের হাতে কিংবা—ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে যদি দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হয়, সেক্ষেত্রে—দুটি ডোমিনিয়নের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার জন্য, ভি. পি. মেননের সহযোগিতায় তিনি একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন :

(ক) ভারত-বিভাগ হবে কি হবে না, সে সম্পর্কে জনসাধারণের অভিমত জানবার জন্য যে বিধি নির্ধারিত হয়েছে, নেতারা তা মেনে নিচ্ছেন;

(খ) ভারতবর্ষে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ থাকবেন, এমন সিদ্ধান্ত যদি নেওয়া হয়, তাহলে ডোমিনিয়ন মর্যাদার ভিত্তিতে বর্তমান গণ-পরিষদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হবে;

(গ) ভারতবর্ষে দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন সিদ্ধান্ত যদি নেওয়া হয়, তাহলে প্রতিটি রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার, আপনাপন গণ-পরিষদের প্রতি দায়িত্বশীল থেকে ডোমিনিয়ন মর্যাদার ভিত্তিতে ক্ষমতা গ্রহণ করবেন;

(ঘ) পূর্বোক্ত দুই পদ্ধতির যে-কোনটি অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তরিত হোক, —ডোমিনিয়ন মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষার জন্য সংশোধিত ১৯৩৫ সনের ভারত-শাসন আইনের ভিত্তিতেই তা হবে;

(ঙ) দুই ডোমিনিয়নের একই গভরনর জেনারেল থাকবেন; এবং বর্তমান গভরনর জেনারেলকেই পুনর্নিয়োগ করতে হবে;

(চ) দেশবিভাগের স্বপক্ষে যদি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাহলে সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করা হবে;

(ছ) দুই রাষ্ট্রের প্রতিটিতেই সেখানকার কেন্দ্রীয় সরকারের সুপারিশ অনুযায়ী প্রাদেশিক গভরনর নিয়োগ করা হবে;

(জ) দুটি ডোমিনিয়ন যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। কার ভাগে কোন ইউনিট পড়বে, সেটা ঠিক করা হবে রিক্রুটমেনটের আঞ্চলিক ভিত্তিতে; তারা আপনাপন সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। বিমিশ্র ইউনিটের ক্ষেত্রে পৃথকীকরণ ও পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব অর্পণ করা হবে একটি কমিটীর হাতে। ফীল্ড মারশাল সার্ ক্লড অচিনলেক এবং দুই ডোমিনিয়নের দুই চীফ অব জেনারেল স্টাফকে নিয়ে সেই কমিটী গঠিত হবে। গভরনর জেনারেল এবং দুই প্রতিরক্ষা-মন্ত্রীকে নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ এর তত্ত্বাবধান করবেন। বিভাগের কাজ শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই এই পরিষদেরও আয়ুষ্কাল শেষ হবে।"

এই পরিকল্পনাটি সঙ্গে নিয়ে ১৯শে মে তারিখে লর্ড মাউন্টব্যাটেন লনডনে প্রত্যাবর্তন করেন।

যে-সরকারের তিনি প্রধান, তার একজন অফিসার হিসেবে তাঁর প্রতি আমার সম্মান নিবেদনের জন্য যথাকর্তব্য আমি বিমান-বন্দরে যাই। প্রধানমন্ত্রী মিঃ অ্যাটলি স্বয়ং এবং ভারত-সচিব লর্ড লিস্টওয়েলও (লর্ড পেথিক-লরেন্স ইতিমধ্যে পদত্যাগ করেছিলেন) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বৃহৎ ব্যক্তিরা ভাইসরয়কে অভ্যর্থনা জানালেন। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম দূরে। চারপাশে তাকিয়ে ভাইসরয় দেখতে পেলেন যে, আমি দূরে দাঁড়িয়ে আছি। দেখে আমার দিকে তিনি এগিয়ে এলেন; বললেন, "সুধীর, তোমার সেই চিঠির জন্য ধন্যবাদ। চিঠিখানায় কাজ হয়েছিল। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।"

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে পরামর্শ করলেন শ্রমিক মন্ত্রিসভা। পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, অবিলম্বে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেওয়া হবে। তবে, ভি. পি. মেনন যে একটি ডোমিনিয়নের প্রস্তাব করেছিলেন, সেটা মেনে নেওয়া হল না। স্থির হল ডোমিনিয়ন হবে দুটি। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান। মিঃ অ্যাটলি ৩রা জুন

তারিখে কমন্‌স্‌ সভায় মাউন্‌ট্‌ব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন। ভারতবর্ষে ফিরে লর্ড মাউন্‌ট্‌ব্যাটেন ঘোষণা করলেন, ১৯৪৮ সনের জুন মাসে নয়, ১৯৪৭ সনের অগস্‌ট্‌ মাসেই তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করবেন। ১৯৪৭ সনের ১৫ই অগস্‌ট্‌ তারিখে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান, এই দুই ডোমিনিয়নের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হল। লর্ড মাউন্‌ট্‌ব্যাটেন প্রস্তাব করেছিলেন, দুই ডোমিনিয়নের প্রধান হিসেবে একই গভরনর জেনারেল থাকবেন। সেটা অবশ্য হল না। ভারতবর্ষের গভরনর জেনারেল পদে মাউন্‌ট্‌ব্যাটেনই অধিষ্ঠিত রইলেন। পাকিস্তানের গভরনর জেনারেল হলেন মিঃ জিন্না। ১৫ই অগস্‌ট্‌ তারিখে, ঈষৎ নিরানন্দভাবে, আমরা অল্‌ড্‌উইচে স্বাধীনতা উদ্‌যাপন করলাম। জেনারেল জে. এন. চৌধুরী তখন লনডনে ছুটি কাটাচ্ছেন। তাঁর সহযোগিতায়, ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম আমরা। ভারতীয় সৈনিকরা সেই অনুষ্ঠানে স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ-পতাকাকে অভিবাদন জানালেন।

স্বাধীনতা দিবসের প্রত্যূষে আমি একটি টেলিগ্রাম পাই : "ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা জানাই। স্ট্যাফোর্ড ও ইসোবেল ক্রিপ্‌সের ভালবাসা নাও।" গ্লস্‌টারশায়ারের গ্রামের বাড়ি থেকে এই তার পাঠিয়েছিলেন তাঁরা। পরদিন তাঁরা লনডনে এলেন। সেই রাত্রে আমি সস্ত্রীক তাঁদের সঙ্গে নৈশাহারে যোগ দিয়েছিলাম। বল্লভভাই প্যাটেলের মতন স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সকেও সকলে শক্ত মানুষ বলে জানত। সেদিন কিন্তু তাঁকে খুব বিষণ্ণ দেখলাম। তিনি বললেন, প্রধানমন্ত্রী, ভারত-সচিব এবং আরও অনেকের সঙ্গে জওহরলাল শুভেচ্ছা-বিনিময় করেছেন, কিন্তু তাঁর শুভেচ্ছা-তারবার্তার কোনও উত্তর দেননি। শ্রীনেহরু ছিলেন সৌজন্য ও দয়ার প্রতিমূর্তি। কিন্তু, যাঁরা তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসতেন, তাঁদেরও অনেকের প্রতি মাঝে-মাঝে তিনি নির্মম হয়ে উঠতে পারতেন। সার্‌ স্ট্যাফোর্ড সেদিন ডিনার-টেবিলে আমাকে বলেন যে, জওহরলাল যদি তাঁকে বিশ্বাস করতেন, ভারতবর্ষ তাহলে কিছুতেই দ্বিখণ্ডিত হত না। আজও আমার বিশ্বাস এই যে, তিনি ভুল বলেননি।

১৯৪৭ সনের ১৫ই অগস্‌ট্‌ তারিখে, আমাদের প্রথম স্বাধীনতা-দিবসে, কৃষ্ণ মেনন লনডনে ভারতের হাইকমিশনার হলেন। তিনিই হলেন আমার উপরওয়ালা। অতঃপর দ্রুত এ-কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, আমার পক্ষে আর লনডনে কাজ করা সম্ভব হবে না। অকটোবরের প্রথম সপ্তাহে আমি বল্লভভাই প্যাটেলের কাছ থেকে একটি তারবার্তা পাই। তাতে তিনি আমাকে জানান যে, লর্ড মাউন্‌টব্যাটেনের চীফ অব স্টাফ লর্ড ইজমে শলা-পরামর্শের জন্য লনডন যাচ্ছেন; তিনি যখন লনডন থেকে নয়াদিল্লি ফিরবেন তখন তাঁর বিশেষ বিমানে করে আমিও যেন দিন-কয়েকের জন্য দিল্লি আসি। লর্ড ইজ্‌মে গান্ধীজীর কাছ থেকে একটি চিঠি নিয়ে এসেছিলেন আমার জন্যে। তাতে অন্যান্য কথার মধ্যে এই কথাটিও ছিল : "আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, তোমার পক্ষে ও-জায়গা ছেড়ে আসা উচিত।"

দিল্লি পৌঁছে দেখলাম, বিড়লা-ভবনে গান্ধীজী আমার থাকবার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তিনি নিজেও তখন সেইখানেই ছিলেন। তাঁকে আমি সমস্ত কথা খুলে বললাম। মন দিয়ে তিনি খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি কথা শুনলেন। তারপর বললেন, "তুমি তো আমাকে সমস্ত কথা জানিয়েছ। এ-ব্যাপারে এখন যা করবার হয় আমিই করব। যাও, এখন হাল্‌কা মনে ঘুরে বেড়াও।" এমন কথা তিনি বললেন না যে, এমন যে হবে, তা তো তিনি আগেই বলেছিলেন।

গান্ধীজী আমাকে বললেন যে, কৃষ্ণ মেনন আর আমার মধ্যে যে বিরোধ চলছে, তারই ফলে একটা গুরুতর সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে বল্লভভাই আর শ্রীনেহরুর মধ্যে। "দুই সিংহকে এইভাবে আমরা লড়াই করতে দিতে পারি না। লড়াই যদি তাঁরা করতেই চান তো অন্য-কিছু নিয়ে করুন; তোমাকে কেন্দ্র করে লড়াই বাধবে এ আমি চাই না। সুতরাং তুমি জওহরলালের কাছে যাও; তাঁকে গিয়ে বলো যে, তাঁর নিজের লোক যখন হাইকমিশনার ছিলেন না, পালা-বদলের সেই সমস্যাজটিল সময়ে সরকারকে সাহায্য করবার জন্য তোমার যথাসাধ্য তুমি করেছ, কিন্তু এখন আর তুমি লনডনে থাকতে রাজী নও, তার কারণ সেখানে তুমি থাকলে কোনও সত্যিকারের কাজ হবে বলে তোমার মনে হয় না।"

তা-ই আমি করলাম।

মনে আছে, গান্ধীজীর সঙ্গে সেই আলোচনার সময়ে শ্রীনেহরু সম্পর্কে আমার কথায় কিছু ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, "বাপু, আমার মনে হয় যে, এই কৃষ্ণ মেননই হয়ত একদিন পণ্ডিতজীকে ডোবাবেন।"

গান্ধীজী তাতে বললেন, "তোমার কথাটা আমি বুঝতে পারছি। জওহরলাল খুবই মহৎ মানুষ বটে, কিন্তু তিনি লোক চেনেন না, এই তো তুমি বলতে চাও? তা এ-ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু বলো ত, ভারতবর্ষে কি তাঁর চাইতে ভাল মানুষ আর কেউ আছে?"

কথাটার উত্তর দিতে আমার এক মুহূর্তও দেরি হল না। বললুম, "না, তা নেই।"

"তা হলে আর দুঃখ কোরো না; তাঁর মধ্যে যে-সব সদ্‌গুণ রয়েছে, তার প্রতি অনুগত থাকো। তা যদি করো, তাহলেই তুমি ঠিক থাকতে পারবে। আর তা না করে যদি ক্ষোভ পোষণ করো, তাহলেই বুঝব যে, তুমি হেরে গিয়েছ। আমি চাই না যে, তুমি হেরে যাও। তোমার সম্পর্কে তাঁর মনের মধ্যে যে কিছু সংস্কার রয়েছে, তা আমি জানি। কিন্তু উপায় কী। ব্যাপারটা আমি মিটিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারলাম না। যা ঘটেছে, তাকে মেনে নাও; মেনে নিয়ে কাজকর্ম করো।"

গান্ধীজী আরও বললেন যে, এইচ. এন. ব্রেল্‌সফোর্ড যেভাবে শ্রীকৃষ্ণ মেননের ব্যক্তিত্বকে বিচার করেছেন, তার মধ্যে কোনও ভুল নেই। তিনি ঠিক কথাই বলেছেন। এই বলে গান্ধীজী আমার হাতে একটি চিঠি তুলে দিলেন। চিঠিখানি ব্রেল্‌স্‌ফোর্ডের লেখা। সেটি এখানে উদ্ধৃত হল :

৩৭ বেলসাইজ পার্ক গার্ডেন্‌স্‌.
লনডন, এন. ডব্‌লু. ৩,
২৪শে অকটোবর, ১৯৪৭

"প্রিয় গান্ধীজী,

আমার ও আমার স্ত্রীর শুভেচ্ছা ও গভীর সহানুভূতি জানাই। এই দুঃসময়ে আপনার উপরে যে গুরুভার দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে, তা বহন করবার মতন শক্তিও আপনার থাকবে, এই আশাই আমরা করি।

সুধীর ঘোষের সমস্যা সম্পর্কে আমার যা ধারণা, যদি অনুমতি করেন তো তা আপনাকে জানাই। যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁকে করতে হয়, তিনি তার উপযুক্ত; আমার মনে হয়েছিল যে, এ-ব্যাপারে ঠিক-লোককেই নির্বাচন করা হয়েছে। মানুষের

মনে তিনি চট্ করে আস্থা জাগাতে পারেন। সবাই তাঁকে ভালবাসে, বিশ্বাস করে। তা ছাড়া, ভারতবর্ষ সম্পর্কে এ-দেশে বন্ধুসুলভ আগ্রহসঞ্চারের নব-নব পন্থা উদ্‌ভাবনে তিনি উদ্যোগ ও কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

কিন্তু কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে তাঁর যা সম্পর্ক, তাতে তাঁর কর্মপ্রতিভা বিশেষ ফলপ্রসূ হবে কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে। পরিবেশ অনুকূল হলে তাঁর কাজ আরও ফলপ্রসূ হতে পারত।

মনে হতে পারে যে, আমি অন্যের ব্যাপারে মাথা গলাচ্ছি। কিন্তু সেই ঝুঁকি নিয়েই কি আমি কৃষ্ণ সম্পর্কে এক-আধটা কথা বলতে পারি? তাঁকে আমি অনেক বছর ধরে জানি। তাঁর সঙ্গে কাজকর্মে আমার কখনও বিরোধ ঘটেনি, কিংবা ব্যক্তিগত অপ্রীতিরও সৃষ্টি হয়নি। তাঁর নিষ্ঠা ও পরিশ্রমী স্বভাবের জন্য তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তিনি এমন একজন রুগ্ন মানুষ, সহকর্মীদের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক কখনও স্বাভাবিক অথবা সুখকর হতে পারে না। মনে হয় যেন নিজের চারিদিকে সর্বদাই তিনি সন্দেহ আর চক্রান্তের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখেন। লনডনের ভারতীয় সমাজে তিনি ফাটল ধরিয়েছেন, এবং বছরের পর বছর যেভাবে তারা অনৈক্যের পরিচয় দিয়েছে, তা বেদনাদায়ক। ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তিনি এর চাইতে সফল হতে পারেননি। সোরেনসেন আর আগাথা হ্যারিসনের মত জনাকয়েক একনিষ্ঠ ভারতবন্ধু তাঁর সঙ্গে কাজ করতে পেরেছেন বটে, কিন্তু এমন অনেককে তিনি চটিয়েছেন, তাঁর চাইতে আর-একটু সদয় এবং বিচক্ষণ লোকের পক্ষে যাঁদের বন্ধুত্বলাভ সম্ভব হত। কয়েকটি ব্যাপারে তাঁর যোগ্যতা সত্যিই প্রথম শ্রেণীর; কিন্তু অন্যদের প্রতি—তা তাঁরা তাঁর সমকক্ষই হোন আর অধীনস্থ মানুষই হোন—আচরণে বন্ধুভাবাপন্ন ও আস্থাশীল হওয়া তাঁর ধাতে নেই।

আপনার কথা, ভারতবর্ষের কথা এবং আমাদের অন্যান্য বহু ভারতীয় বন্ধুর কথা আমরা দুজনেই খুব গভীর সহানুভূতির সঙ্গে চিন্তা করি। সহানুভূতির সঙ্গে উদ্বেগও মিশে থাকে।

চিরকালের জন্য আপনার
নোয়েল ব্রেল্‌সফোর্ড”

গান্ধীজী সিদ্ধান্ত করলেন, আমাকে ভারতবর্ষে ফিরে আসতে হবে। নয়াদিল্লি থেকে যেদিন আমি লনডন রওনা হই, সেদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন, “তোমার স্থান ভারতবর্ষে। তোমার মত লোকের এখানে কাজের অভাব হবে না। বল্লভভাইয়ের গভীর আস্থা রয়েছে তোমার উপরে। নানান রকমের কাজের মধ্যে যেটা তোমার পছন্দ হয়, সেইটাই তুমি বেছে নিতে পারবে। তা ছাড়া, যদি তুমি ভারতবর্ষে থাকো, তাহলে আমারও অনেক কাজ করে দিতে পারবে তুমি। আমার সেটা ভালই লাগবে।

সুতরাং কাজের জাল গুটিয়ে নেবার জন্যে আমি লনডনে ফিরলাম। সেখান থেকে ১৯৪৭ সনের ডিসেমবর মাসে আমি ভারতবর্ষে ফিরে আসি। শীতের লনডন কোনও ভারতীয়ের পক্ষে ভাল লাগবার কথা নয়। বিলেতের আবহাওয়া আমার স্ত্রীর মোটেই ভাল লাগত না। রৌদ্র-ঝলমল শীতের দিল্লিতে আমরা ফিরে যাচ্ছি, এই চিন্তায় তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি ডাক্তার। লনডন বিশ্ববিদ্যালয়ের

স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে তিনি স্নাতকোত্তর পাঠ নিচ্ছিলেন। সামনের এপ্রিলেই তাঁর একটা পরীক্ষা দেবার কথা। তবে, একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে, নিতান্ত এইজন্যেই তিনি পড়ছিলেন; মাঝপথে যে পড়ার পালা চুকিয়ে দিতে হল, তাতে তিনি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হলেন না। দেশে ফিরবার জন্য তিনি জিনিসপত্র গোছগাছ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এমন সময় এল গান্ধীজীর চিঠি। তাতে আমার স্ত্রীকে তিনি জানালেন যে, আমি ভারতবর্ষে ফিরছি বটে, কিন্তু তাঁর এখনই ফিরে যাবার কোনও কারণ নেই; চিকিৎসাশাস্ত্রের যে কোর্সটি তিনি পড়ছেন, সেটি শেষ না করে তাঁর ফেরা চলবে না। গান্ধীজী সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, পরবর্তী এপ্রিল পর্যন্ত তাঁকে স্বনির্ভর হয়ে লনডনে থাকতে হবে। তবে তাতে তাঁর চিন্তার কোনও কারণ নেই। আগাথা হ্যারিসন এবং অন্য কয়েকজন কোয়েকার বন্ধুকে তিনি চিঠি লিখে দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন তাঁর দেখাশোনা করেন!

আমার স্ত্রী কী করবেন, তা নিয়ে আমরা কেউ গান্ধীজীর উপদেশ-পরামর্শ চাইনি। নেহাতই তুচ্ছ একটা ব্যক্তিগত সমস্যা; সেই দুঃসময়ে তা নিয়ে আর কে তাঁকে বিব্রত করতে চাইবে। তাঁর চিত্ত তখন দুঃখভারাক্রান্ত। কিন্তু তার মধ্যেও তাঁর পিতৃ-হৃদয় মনে রেখেছিল যে, ৬০০০ মাইল দূরে তাঁর স্নেহের পাত্রী একটি তরুণী মেয়ের পড়াশুনো মাঝপথ পর্যন্ত এগিয়ে আছে; এক্ষেত্রে কী করা কর্তব্য তাও ঠিক করেছেন তিনি, এবং যথাসময়ে তাঁর সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দিয়েছেন! সিদ্ধান্তটা আমরা নতমস্তকে মেনে নিলাম।

ভারতবর্ষে ফিরে আসবার পরে হায়দারাবাদের ভারতভুক্তি সংক্রান্ত আলোচনায় শ্রী কে এম মুন্সীকে সাহায্য করবার জন্য অল্প কিছুদিনের জন্য আমাকে হায়দরাবাদে পাঠানো হয়। শ্রীমুন্সী তখন সেখানে ভারত সরকারের এজেন্ট্ জেনারেল। দেশীয় রাজ্য দপ্তরের কাজে অতঃপর আমাকে পাঞ্জাবে পাঠানো হয়। পাতিয়ালা, কাপুরথালা, নাভা, ঝিন্দ্, ফরিদকোট, কালসিয়া আর নালাগড় রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অবসানে সাহায্য করাই ছিল আমার কাজ। হায়দরাবাদে থাকতে ১৯৪৮ সনের জানুয়ারি মাসে আমি গান্ধীজীর কাছ থেকে একটি চিঠি পাই। তাতে তিনি আমাকে দিল্লি গিয়ে দিনকয়েক তাঁর কাছে কাটিয়ে আসতে বলেছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, সৈন্যবাহিনীকে কাজে না-লাগিয়ে হায়দরাবাদকে ভারতভুক্ত করা সম্ভব কিনা। যোগাযোগটা প্রায় দৈব। যেন নিয়তিই তাঁর জীবনের অন্তিম লগ্নে আমাকে আবার তাঁর কাছে টেনে আনল। ১৯৪৮ সনের ২৮, ২৯ ও ৩০শে জানুয়ারি—গান্ধীজীর জীবনের এই শেষ তিন দিন আমি তাঁরই কাছে ছিলাম। ৩০শে জানুয়ারির দুপুরবেলায় তিনি আমাকে বিড়লা-ভবনের পিছন-দিককার বাগানে ডেকে পাঠান। গিয়ে দেখি, জানুয়ারির রৌদ্রালোকে বসে তিনি আপন মনে কাজ করছেন। মাথায় বর্মী কৃষকের টুপি। এর কিছুকাল আগে আউঙ্গ সান দিল্লি এসেছিলেন; তখন গান্ধীজীকে তিনি এই টুপিটি উপহার দেন। আমাকে দেখে তিনি একখানা চিঠি এগিয়ে দিলেন। চিঠিখানা আগাথা হ্যারিসনের লেখা। তার সঙ্গে রয়েছে লনডনের টাইম্স পত্রিকার একটি ক্লিপিং। আগাথা তাঁর চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, গান্ধীজীর দুই শিষ্য, শ্রীনেহরু আর বল্লভভাই প্যাটেলের মধ্যে গুরুতর মতানৈক্য চলছে. এই কানাকানিটা লনডনেও পৌঁছে গিয়েছে, এবং টাইম্স পত্রিকায় তাঁদের এই মতানৈক্য সম্পর্কে যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তাকে একটি অশুভ সংকেত বলে গণ্য করা যায়। গান্ধীজীর কি এ-বিষয়ে কিছু করবার নেই?

চিঠি ও সম্পাদকীয় পড়ে চুপ করে রইলাম। আশা করছিলাম, গান্ধীজী কিছু বলবেন। তিনি তখন কী যেন লিখছিলেন। লেখা শেষ করে, যেন নিজেকে শুনিয়ে, তিনি বললেন, "আমি এ-ব্যাপারে কী করতে পারি?" আমি বললাম, "এ'রা দুজনেই এত বৃহৎ মানুষ যে, এ নিয়ে কেউই এ'দের সঙ্গে কথা বলতে সাহস পায় না। তবে তাঁদের পিছনে অনেকেই এ নিয়ে কানাকানি করে। কখনও হয়ত আপনার মনে হবে যে, এ সম্পর্কে তাঁদের দুজনের সঙ্গেই আপনার কথা বলা দরকার। একমাত্র আপনিই তা পারেন।" আমার কথাটা তিনি ভেবে দেখলেন। তারপর বললেন, "কথাটা তুমি খারাপ বলোনি। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে, আমাকে এ সম্পর্কে কথা বলতে হবে। আজই সন্ধ্যায়, প্রার্থনার পরে, আমি এ নিয়ে আলোচনা করতে পারি। বল্লভভাই আজ চারটের সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। জওহরলাল আসবেন সাতটায়। আমি শুতে যাবার আগে তুমি বরং এসে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।" তাঁকে আর বিরক্ত না করে আমি চলে এলাম। তিনি তাঁর লেখার মধ্যে মগ্ন হয়ে গেলেন।

বিকেল চারটেয় আমি গেলাম দেশীয় রাজ্য দপ্তরে। হায়দরাবাদের জনাকয়েক মন্ত্রীর সঙ্গে সেখানে দপ্তরের কয়েকজন অফিসারের আলোচনা হচ্ছিল। বিকেল পাঁচটার একটু বাদেই বাইরে থেকে কে একজন ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন, এবং উত্তেজিতভাবে বললেন, "গান্ধীজীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।" তৎক্ষণাৎ আমরা উঠে দাঁড়ালাম; কিন্তু সত্যিই যে গান্ধীজী নিহত হয়েছেন, কারও যেন তা বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাঁর মতন মানুষকে কি কেউ হত্যা করতে পারে? দশ মিনিটের মধ্যেই বিড়লা-ভবনে পেশছে গেলাম আমি। পেশছে দেখলাম, বাড়ির বাইরে বিরাট এক জনতা। ভিড় ঠেলে অনেক কষ্টে আমি ভিতরে ঢুকলাম। একতলার পিছন দিককার একটি ঘরে গান্ধীজী থাকতেন। সেখানে পেশছে দেখলাম, ঘরের মেঝেয় পাতা যে তোষকে বসে তিনি কাজ করতেন, তার উপরে তাঁকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। পাশেই বসে আছেন তাঁর দুই প্রিয় শিষ্য, জওহরলাল আর বল্লভভাই। প্রথমজন আবেগপ্রবণ মানুষ; গান্ধীজীর বক্ষে মুখ ঢেকে তিনি শিশুর মত কাঁদছেন। দ্বিতীয়জনের ব্যক্তিত্ব বজ্রকঠিন; নিহত পিতার নাড়িতে হাত রেখে স্তম্ভিতভাবে, নির্বাক প্রস্তরমূর্তির মতন, তিনি বসে আছেন। পিতা যে নিহত হয়েছেন, তা যেন তিনি ভাবতেও পারছিলেন না; নাড়ির উপরে হাত রেখে ভাবছিলেন, যদি জীবনের স্পন্দন মেলে। বিকেল চারটের সময় গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন বল্লভভাই; পিতা যখন অন্য পুত্রটির সঙ্গে তাঁর মতান্তরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, তখন তিনি গভীরভাবে বিচলিত হয়েছিলেন। অনেক কথাই তাঁর বলবার ছিল। বুকের ভার নামিয়ে দিয়ে তিনি কথা বলে যাচ্ছিলেন। কথা যেন আর ফুরোতে চাইছিল না।

পাঁচটা বেজে যখন পাঁচ মিনিট, তখন আভা (গান্ধীজীর পৌত্র কানু গান্ধীর স্ত্রী) এসে গান্ধীজীর ঘড়িটিকে তাঁর সামনে তুলে ধরেন। প্রার্থনা-সভায় যেতে গান্ধীজীর কখনও এক মিনিটও দেরি হত না। আজ দেরি হয়ে গিয়েছিল। গান্ধীজী বললেন, এবারে তাঁকে যেতেই হবে। বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, প্রার্থনা-সভার দিকে যাত্রা করলেন। সমবেত জনতার সামনে গিয়ে তিনি যখন জোড়হস্তে তাদের অভিবাদন গ্রহণ করছেন, একটি মানুষ তখন অকস্মাৎ তাঁর কাছে এসে নুয়ে দাঁড়াল। সবাই ভেবেছিল, সে নত হয়ে গান্ধীজীকে প্রণাম করতে যাচ্ছে। কিন্তু তা নয়। নুয়ে পড়ে সে গুলি চালাল। গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন গান্ধীজী। তিনি

যখন পড়ে যাচ্ছেন, তখন তাঁর ওষ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল তাঁর ঈশ্বরের প্রিয়নাম : "হে রাম"। সেই তাঁর শেষ কথা।

সারা রাত্রি সেদিন সবাই জেগে কাটিয়েছে। সারা রাত্রি সেদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছে বিড়লা-ভবনে; শেষবারের মতন তারা দেখেছে তাদের পিতাকে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন, মস্কোতে লেনিনের মৃতদেহ যেভাবে রেখে দেওয়া হয়েছে, গান্ধীজীর মৃতদেহও সেইভাবে সংরক্ষিত করবার ব্যবস্থা হোক। অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলল এই প্রস্তাব নিয়ে। শেষপর্যন্ত প্যারেলালজী সেই আলোচনায় ছেদ টেনে দিলেন। গান্ধীজীর তিনি প্রিয় শিষ্য, সচিব ও স্নেহভাজন বন্ধু। তিনি বললেন, বাপু চেয়েছিলেন, মৃত্যুর পরে নিকটতম শ্মশানে যেন তাঁকে দাহ করা হয়। পরদিন, লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে, রাজঘাটে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হল। মৃত্তিকায়, সলিলে, আলোকে, অনিলে আর অন্তরীক্ষে মিশে গেল তাঁর নশ্বর দেহ। আমাদের পিতা, আমাদের বাপু তাঁর রামের কাছে ফিরে গেলেন।

সকলের মতন আমিও সেদিন অঝোরে অশ্রুমোচন করেছি। কিন্তু একইসঙ্গে এ-কথাও ভেবেছি যে, এই যে তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, এ হয়ত তাঁর পক্ষে ভালই হল। তিনি যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে ক্রমেই তো তাঁকে আরও নিঃসঙ্গ বোধ করতে হত। আর তা ছাড়া, জীবনের এর চাইতে মহিমময় অবসান তো তাঁর মতন মানুষের পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না। মুসলিমের প্রাণ রক্ষা করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি; হিন্দুর হাতে তাঁর মৃত্যু হল। জওহরলাল নেহরু সেদিন ঠিকই বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, শুধু আমরাই যে তাঁর জন্য কাঁদছি, তা নয়, পাকিস্তানের মানুষরাও তাঁর জন্য সমানভাবে কাঁদছেন। সেই অসামান্য মানুষটিকে এর চাইতে বৃহত্তর সম্মান নিবেদন করা যেত না।

নেহর্-য্গ : বিপ্লবের স্বপ্ন

শ্রীনেহর্র সংগে আমার সম্পর্ক ছিল অন্রাগে-বিরাগে বিমিশ্র। এমন একটা ক্ষেত্র ছিল সেই সম্পর্কের মধ্যে, বিরাগকে দ্রে ঠেলে দিয়ে অন্রাগই যেখানে বেশ কিছ্দিনের জন্য প্রবল হয়ে উঠেছিল। ফরিদাবাদের সমষ্টি-উন্নয়নম্লক প্রকল্পটিই ছিল সেই অন্রাগের ক্ষেত্র। ভারতবর্ষে এমন প্রকল্পে এর আগে হাত দেওয়া হয়নি। ফরিদাবাদ হচ্ছে পাঞ্জাবের গ্রগাঁও জেলার অন্তর্গত এলাকা। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সন পর্যন্ত আমি সেখানে প্রকল্প র্পায়ণের দায়িত্ব পালন করেছি। ১৯৪৮ সনের ৩০শে জান্য়ারি তারিখে গান্ধীজী নিহত হন। তারপরে মাস কয়েক আমি বল্লভভাই প্যাটেলের দেশীয় রাজ্য দপ্তরে প্র্ব-পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যসম্হের আঞ্চলিক কমিশনার হিসেবে কাজ করেছি। পাতিয়ালা, কপ্রথালা, নাভা, ঝিন্দ্, ফরিদকোট, কালসিয়া আর নালাগড়, এই কটি রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ঘ্চিয়ে দেওয়া, এবং পাতিয়ালা ও প্র্ব পাঞ্জাব রাজ্যমণ্ডলীর (পেপস্) মধ্যে তাদের একীভূত করার কাজে সাহায্য করাই ছিল আমার কাজ। এই দেশীয় রাজ্যমণ্ডলীকে পরে পাঞ্জাব রাজ্যের সংগে মিলিয়ে দেওয়া হয়। আমার সদর দপ্তর ছিল সিমলায়। সেখানে একটি রাজপ্রাসাদ—র‍্যাভেন্স্উড—আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। আমার দপ্তর আর বাড়ি, দ্ই-ই ছিল সেই প্রাসাদের মধ্যে। সেখানে একটা উ‍ঁচু জায়গা থেকে স্ন্দর একটি উপত্যকা আমাদের দ্ষ্টিগোচর হত। দেখতে পেতাম, তার পিছনে নীল পর্বতমালাকে কে যেন স্তরে-স্তরে বিন্যস্ত করে রেখেছে। আমি আর আমার স্ত্রী, আমাদের দ্জনেরই সেই দ্শ্য বড় মনোরম লাগত। প্রতি মাসেই অনেক বার আমাকে পাহাড় থেকে সমতলে নেমে আসতে হত, সাতটি দেশীয় রাজ্যের ভিতরে গিয়ে ঘ্রতে হত। সেই সফরও খ্ব ভাল লাগত আমার। কাজের স্ত্রেই গ্রামে গ্রামে ঘ্রতে হত আমাকে। দেখতে হত, যে পাঁচ লক্ষ একর উর্বরা কৃষিভূমিকে ফেলে রেখে ম্সলমানরা সেখান থেকে পাকিস্তানে চলে গিয়েছে, হিন্দ্ আর শিখ প্রজারা যেন বে-আইনীভাবে তা দখল করে না নেয়। প্র্ব-পাঞ্জাব সরকার স্থির করে রেখেছিলেন যে, পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দ্ আর শিখ বাস্তুহারাদের এখানে প্নর্বাসিত করা হবে।

কিন্তু মাস দশেক কাটবার পরেই রাজপ্রাসাদ আর নীল পাহাড়ে আমার বিরক্তি ধরে গেল। কোন্টা কোন্ মহারাজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আর কোন্ সম্পত্তিটার মালিকানা রাজ্য-সরকারের, সরকারকে তার হিসেব-নিকাশে সাহায্য করার চাইতে আর-একট্ উদ্দীপক কাজে হাত লাগাবার জন্যে আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। একটি রাজ্যে এক বিচিত্র ব্যাপার আবিষ্কৃত হল। দেখলাম, আসন্ন ঘটনাবলীকে আন্দাজ করে নিয়ে, মহারাজা সেখানে রাজস্বের নথিপত্রে প্রতিটি জমির মালিক হিসেবে নিজের নাম লিখিয়ে রেখেছেন। অর্থাৎ তিনি দেখাতে চাইছেন, তাঁর রাজ্যের যাবতীয় জমি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ব্যক্তিগতভাবে মহারাজারা আমার সংগে খ্বই সদ্ব্যবহার করতেন। তব্, মহারাজাদের সংগে এই যে ক্টনৈতিক খেলা, কিছ্দিন বাদেই আমার এটা একঘেঁয়ে লাগতে লাগল, এবং 'পেপস্'র প্রতিষ্ঠা হবার সংগে-সংগেই ১৯৪৮ সনের ডিসেমবর মাসে আমি বল্লভভাই প্যাটেলকে অন্রোধ করলাম,

আমাকে যেন অন্য কাজে বদলি করা হয়।

আমি চাইছিলাম শক্ত কাজ। তা শক্ত কাজই আমাকে দেওয়া হল। ভারত সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরে বদলি করা হল আমাকে; পদটা হল ডেপুটি সেক্রেটারির। ভারত-বিভাগের ফলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ষাট লক্ষ হিন্দু আর শিখ বাস্তুহারা হয়ে ভারতে চলে আসে। ভারতবর্ষ থেকেও প্রায় একই সংখ্যক মুসলমান পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও এইভাবে এক কোটি কুড়ি লক্ষ মানুষ ছিন্নমূল হয়নি। জওহরলাল নেহরুর যা-কিছু সদ্‌গুণ, তাঁর সহানুভূতি, তাঁর মমতা,—লক্ষ লক্ষ এই ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন-ব্যাপারেই তার আশ্চর্য প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল। এমনিতে তিনি ছিলেন অসহিষ্ণু মানুষ, বিশেষ করে নির্বোধ লোকদের তিনি আদপেই সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু বাস্তুহারাদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। তাদের জন্য তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় দিয়েছেন; কখনও এতটুকু বিরক্তি প্রকাশ করেননি।

এক দিল্লিতেই পনর লক্ষ বাস্তুহারা আশ্রয় নিয়েছিল। দিল্লির চারপাশের জেলাগুলিতে উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল আরও লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষ। বাস্তুহারাদের হাতে একটি অব্যর্থ হাতিয়ার ছিল। কোনও ব্যাপারে কোনও অভিযোগ জানাবার থাকলেই সেটি প্রয়োগ করত তারা। দলে দলে তারা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে রওনা হত, এবং সেখানে গিয়ে তাঁর বাড়ির প্রবেশ-পথের উপরে বসে থাকত। অভিযোগের হেতুগুলিকে দূর করবার একটা-কিছু ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তারা সেখান থেকে নড়ত না। দায়িত্বটা আমার হোক আর না-ই হোক, এরই সূত্রে দিনে রাত্রে যে কোনও সময় প্রধানমন্ত্রী আমাকে তাঁর বাড়িতে ডেকে পাঠাতেন। ডাক পড়লেই বুঝতুম, বাস্তুহারারা তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছে, তাদের অভিযোগ সম্পর্কে একটা-কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। একদিনের কথা বলি। সেদিন রাত্রে আমাকে ফোন করে শ্রীনেহরু জানালেন যে, তিনি খেতে বসতে পারছেন না। কী ব্যাপার? না গোয়ালিয়রের এক শিবির থেকে একদল বাস্তুহারা এসেছে। তাঁর দোরগোড়ায় বসে আছে তারা, কিছুতেই নড়তে চাইছে না। মুশকিল হয়েছে এই যে, তাঁর বাড়িতে একজন অতিথি রয়েছেন, এবং সেই অতিথিটি হচ্ছেন ইন্দোনেশিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট ডঃ মহম্মদ হাতা। সব মিলিয়ে একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং আমি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গেলুম। সেখানে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করলুম বাস্তুহারাদের সঙ্গে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের আবার গোয়ালিয়রে ফিরে যেতে রাজী করালুম। তার জন্য গোয়ালিয়রের কমিশনারকে ফোন করে এই ব্যবস্থা করতে হল যে, বাস্তুহারাদের অভিযোগের তিনি একটা প্রতিকার করবেন। কিন্তু সমস্যা বাধল বাস্তুহারাদের ফেরার ব্যবস্থা নিয়ে। রেলের টিকিট কাটবার পয়সা তাদের নেই। অবস্থাটা অতঃপর এই দাঁড়াল যে, শ তিনেক টাকা পেলে তবেই তারা টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে গোয়ালিয়রে ফিরতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর পকেটে কখনও মনিব্যাগ কিংবা টাকাকড়ি থাকত না। গোটা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজলুম। তাতেও বিশেষ সুবিধে হল না। সেক্রেটারি এবং অন্যান্য যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে মাত্র গুটিকয়েক টাকা পাওয়া গেল। অগত্যা কী আর করা, একটা গাড়ি নিয়ে সেই রাত্তিরে আমি বেরিয়ে পড়লুম, এবং কাছাকাছি যে-সব বন্ধুবান্ধব ছিলেন, তাঁদের বাড়িতে বাড়িতে হানা দিয়ে কোনক্রমে শ তিনেক টাকা জোগাড় করে আবার বীরদর্পে প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে ফিরে

এলুম। বাস্তুহারাদের হাতে সেই টাকাটা তুলে দিয়ে তাদের গোয়ালিয়রে ফেরত পাঠানো হল। প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর অতিথি নইলে খেতে বসতে পারছিলেন না। পরদিন সকালেই প্রধানমন্ত্রী তাঁর সাহায্য তহবিল থেকে একটা চেক কেটে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। চেকের সঙ্গে এল সুন্দর একটা চিঠি। তাতে তিনি লিখেছিলেন, "কাল রাত্তিরে জাদুবলে তুমি যে তিন শো টাকা জোগাড় করেছিলে, এইসঙ্গে তা পাঠিয়ে দিলাম।"

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরে কাজ করবার সময়ে আমি দেখতে পাই যে, বাস্তুহারাদের খাদ্য ও আশ্রয় দেবার জন্য আমরা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছি; কিন্তু এই বিপুল ব্যয় যে কখনও বন্ধ হবে, এমন সম্ভাবনা নেই। বাস্তুহারাদের মধ্যে যারা কৃষিজীবী, তাদের পুনর্বাসিত করা মোটামুটি সহজ কাজ। ভারত থেকে যে-সব মুসলিম পাকিস্তানে চলে গিয়েছে, তাদের পরিত্যক্ত জমি যদি এদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়, এবং হালের বলদ আর কয়েকটা মরসুমের বীজ কেনার ব্যাপারে যদি এরা সরকার থেকে কিছু সাহায্য পায়, তাহলেই এরা চটপট পুনর্বাসিত হতে পারে। সেই তুলনায় বাস্তুহারাদের মধ্যে যারা শহরাঞ্চলের মানুষ, তাদের পুনর্বাসিত করা অনেক শক্ত। বিশেষ করে যারা ফড়ে শ্রেণীর লোক, অর্থাৎ যারা উৎপাদন করে না, একের কাছ থেকে পণ্য কিনে অন্যকে বিক্রি করে, এবং এইভাবে কিছু পয়সা রোজগার করে জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের পুনর্বাসিত করাই সবচাইতে কঠিন ব্যাপার। দিল্লির কুড়ি মাইল দক্ষিণে দিল্লি-আগ্রা সড়কের উপরে ফরিদাবাদ গ্রাম; সেখানকার শিবিরে এই রকমের প্রায় চল্লিশ হাজার বাস্তুহারা এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এরা উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ থেকে আগত হিন্দু আর শিখ পাঠান; স্বভাবে খুব তেজী। শিবিরের কমানডান্টের সঙ্গে প্রায়ই এদের বিরোধ বাধত। কমানডান্ট ছিলেন একজন আর্মি কর্নেল। তিনি মাথাপিছু এদের দৈনিক এক টাকার মতন সাহায্য দিতেন; চিকিৎসা আর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে যেটুকু না করলেই নয় সেটুকুর ব্যবস্থা করতেন; এবং লক্ষ্য রাখতেন যাতে শিবিরে মোটামুটি শৃঙ্খলা বজায় থাকে। শিবিরে গণ্ডগোল বাধলেই আমার ডাক পড়ত; সেখানে গিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এই তেজী পাঠানদের শান্ত করতুম আমি। মানুষ হিসেবে তাদের আমার ভালই লাগত।

শ্রীনেহরুকে বললাম, এই চল্লিশ হাজার বাস্তুহারাকে নিয়ে আমি একটা সামাজিক পরীক্ষায় ব্রতী হতে চাই, তিনি কি তাতে সম্মতি দেবেন? সরকার থেকে এদের খাদ্য আর আশ্রয় বাবদ মাথাপিছু রোজ এক টাকার মতন খরচা করা হয়। তার মানে দৈনিক এদের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা খরচা হচ্ছে; মাসে খরচা হচ্ছে বারো লক্ষ টাকা। বার্ষিক ব্যয়ের অঙ্কটা সেক্ষেত্রে হয় এক কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ টাকা। সেই হিসাবে স্রেফ এদের খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তিন বছরে সরকারের মোট চার কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকা খরচা হবে। সরকার তো খয়রাত হিসেবেই এ-টাকা এদের জন্য ব্যয় করতে দায়বদ্ধ। সেক্ষেত্রে আমি প্রস্তাব করছি যে, এদের পক্ষ থেকে ঋণ হিসেবে এই টাকাটা আমি গ্রহণ করব। এদের কাজ দেবার ব্যবস্থা করব আমি, এবং সেই কাজে এই টাকাটাকে মূলধন হিসেবে এমনভাবে বিনিয়োগ করব যাতে সেই কাজের মাধ্যমেই নতুন একটি শহর গড়ে ওঠে। সেই শহরই হবে এদের স্থায়ী বাসভূমি। সেখানে শিল্প থাকবে; সেই শিল্প থেকেই এদের জীবিকার্জনের স্থায়ী ব্যবস্থা হবে। অতঃপর এই শিল্প-নগরকে কেন্দ্র করে তার

চারপাশে গড়ে উঠবে দুশো গ্রামের এক পল্লী-কৃষিজীবী সমাজ-ব্যবস্থা। এই বিনিযুক্ত মূলধন থেকে বার্ষিক যে-টাকা আয় হবে, তা থেকে কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যেই সরকারী ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া যাবে। পরীক্ষাটা যদি সফল হয়, তাহলে আমরা একে হাজারগুণ বাড়িয়ে তুলব।

প্রস্তাব শুনে শ্রীনেহরু তো দারুণ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন বিপ্লবী; তার জন্য রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবার প্রয়োজন তাঁর হয়নি। অন্য দেশের বিপ্লবে তিনি, তাতে তাঁর কোনও ভূমিকা না থাকা সত্ত্বেও, উৎসাহ বোধ করতেন। রাশিয়া আর চীনের বিপ্লবে যে তাঁর চিত্তের সায় ছিল, এইটেই তার কারণ। অথচ নিজে তিনি ছিলেন অত্যন্তই সূক্ষ্ম অনুভূতির স্পর্শকাতর মানুষ; রুশ আর চীনা বিপ্লবের যেটা নিষ্ঠুর দিক, তাঁর চিত্তকে তা পীড়িতই করেছে।

শ্রীনেহরুকে আমি বললাম যে, এই ধরনের পরিকল্পনাকে সরকারের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সফল করে তোলা সম্ভব নয়। ফরিদাবাদ উন্নয়ন বোর্ড নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমি তাঁর সমর্থন চাইলাম। বললাম, স্বয়ংশাসিত সংস্থা হিসেবে এটিকে কাজ করতে দিতে হবে; এটি হবে টেনেসি ভ্যালি অথরিটিরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণের মতো। শ্রীনেহরু শুধু যে এই প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন, তা নয়; ফরিদাবাদ উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও পুরো তিন বছর ধরে এর প্রতিটি মাসিক বৈঠকে তিনি উপস্থিত থেকেছেন। হাতে-কলমে কাজ করে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপনের যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম আমি, তাতে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এই ছোট্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান-পদ গ্রহণ করতে সম্মত হলেন। ১৯৫০ সনের জানুয়ারি মাসে তিনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি হন। অতঃপর বোর্ডের চেয়ারম্যান হলেন ডঃ এইচ. এন. কুঞ্জরু। শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়কে এবং সেবাগ্রামে গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা সংস্থার কর্মী দেবী আর্যনায়কমকেও আমরা বোর্ডের সদস্য হিসেবে পেয়েছিলাম। ফরিদাবাদের কাজে এঁদের দুজনেই সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। এঁদের কাছে শুধুই নৈতিক সমর্থন নয়, আত্মিক প্রেরণাও আমি পেয়েছি। আমার সহকারী ছিলেন লক্ষ্মী জৈন। তরুণ বয়সী এই মানুষটির মধ্যে মমতা ও পরিচালন-দক্ষতার এক অসাধারণ সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি ছিলেন এক অমূল্য সম্পদ।

নয়াদিল্লির শীততাপনিয়ন্ত্রিত দপ্তর থেকে অতএব বেরিয়ে এলাম আমি; সস্ত্রীক ফরিদাবাদে চলে এলাম। সাড়ে তিন হাজার একর খাঁ-খাঁ শূন্য মাঠ; একটিও দালান-কোঠা তার উপরে চোখে পড়ে না। আর্মি ডিসপোজাল থেকে যুদ্ধকালীন চারটে টিনের চালা কিনে নিয়ে সেই মরুভূমির তুল্য প্রান্তরে গিয়ে কাজ শুরু করলাম আমরা। সেই টিনের চালার মধ্যেই আমাদের সংসার, আমাদের দপ্তর। এ হল ১৯৪৯ সনের গ্রীষ্মকালের কথা। তার মাত্র তিন বছর বাদে, ১৯৫২ সনের ২রা মার্চ তারিখে, ফরিদাবাদ প্রকল্পের কাজ দেখে এসে, মিসেস ইলিনর রুজভেল্ট তাঁর বিখ্যাত কলাম 'মাই ডে'-তে লেখেন :

"ফরিদাবাদের এই অভিনব প্রকল্প যদি সফল হয়, তাহলে নেহাত শতগুণে নয়, সহস্রগুণে একে প্রসারিত করে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এইভাবে কাজ করতে হবে। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, এর যেটা নির্মাণের দিক, তার প্ল্যান করেছেন একজন মার্কিন স্থপতি, মিঃ অ্যালবার্ট মায়ার। তিনি নিউ ইয়র্কে কাজ করেন, এবং

মাঝে-মধ্যে ভারতবর্ষে যান। পরিকল্পনাটির লক্ষ্য অতি বিরাট; অথচ খুবই সহজ-সরলভাবে একে রূপায়িত করে তোলা হচ্ছে। লোকজনরা এখানে নিজেরাই নিজেদের ঘরবাড়ি বানিয়ে নেন। বাড়ি বলতে দুটি ঘর আর একটি রান্নাঘর। সেইসঙ্গে আরও একটি ঘর রয়েছে, যেটা একদিন হয়ত বাথরুম হয়ে উঠবে; আপাতত সেটি কলতলা। স্যানিটারি প্রিভির ব্যবস্থা করা হয়েছে, টিউবওয়েলও বসানো হয়েছে। জল ভাল; সাড়ে তিন শো ফুট নীচে থেকে সে-জল উঠে আসছে।

মাঝখানে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা; তাকে ঘিরে বিন্যস্ত হয়েছে এই শহর। বাড়িগুলির পিছনেই যাতে গৃহপালিত পশুর আশ্রয় গড়ে তোলা যায়, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশুপালনের জন্য যে আলাদা জায়গা রাখা হয়েছে, সেখানেও এই আশ্রয় বানিয়ে নেওয়া যেতে পারে। প্রতিটি এলাকাই যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ছোট্ট গ্রাম। তাতে দুটি করে স্কুল, একটি করে স্বাস্থ্যকেন্দ্র আর একটি বাজার রয়েছে। কারিগররা সেখানে জায়গা কিনে তাদের পণ্য বানাতে পারে, ব্যবসায়ীরা বিক্রি করতে পারে তাদের জিনিসপত্র। দেড়শো শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালটি যে শুধুই শহরবাসীদের প্রয়োজন মেটাবে তা নয়; পার্শ্ববর্তী দু লক্ষ একর জমিতে যে ২ লক্ষ গ্রামবাসী কৃষিকর্ম করে, তাদেরও এতে উপকার হবে। সেইভাবেই এই হাসপাতালটি পরিকল্পিত।

শহরের একপ্রান্তে কারখানা-এলাকা। যে-কোনও ঘনবসতি জনপদে জীবনধারণের সুবিধার জন্য যে-সব সারভিসের ব্যবস্থা রাখতে হয়, কিছু লোক তারই কাজে ব্যস্ত থাকবে; বাকী লোককে কাজ দেওয়া হবে এই কারখানা এলাকায়। কিছু কারখানার মালিকানা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের। সেগুলি ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। এর একটি অংশ সংরক্ষিত রয়েছে সমষ্টি-মালিকানায় পরিচালিত একটি ডিজেল ইনজিন কারখানার জন্য। সেখানে ডিজেল যন্ত্র এবং ছোট ছোট প্রাইমাস স্টোভ তৈরী হচ্ছে। এটি একটি সমষ্টি-প্রকল্প; শহরের স্বাস্থ্য আর শিক্ষার পিছনেই এর লভ্যাংশ ব্যয়িত হবে। শহরের বিভিন্ন সারভিসের পরিচালনা-ব্যয় নির্বাহ এবং ঋণ পরিশোধ বাবদে প্রতিটি ব্যক্তিকে এখানে মাসিক দশ টাকা করে দিতে হয়। এখানে যাঁরা বসতি স্থাপন করেছেন, তাঁদের সাহায্য করবার জন্য তিন বছরে সরকারকে যে-টাকা ব্যয় করতে হত, একটি সংস্থা গঠন করে সেই টাকাটা সরকারের কাছ থেকে ঋণ হিসেবে নেওয়া হয়। সেই সংস্থার থেকেই এই প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে।

আগে যারা দোকানী কিংবা কেরানীর কাজ করত, উপকরণ কিনে দিয়ে আর বেতন দেবার ব্যবস্থা করে সংস্থা তাদের কাজে লাগালেন; তারা যাতে আপন হাতে নানাবিধ পণ্য উৎপাদন করতে পারে তার ব্যবস্থা করলেন। দায়িত্বটা সহজ ছিল না। এদের অনেকেই বংশানুক্রমিকভাবে দার্ঘদিন ধরে একই বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল; তদুপরি দোকানীদের ধারণা, খেটে-খাওয়া মানুষদের চাইতে তাদের বৃত্তি অনেক ভাল। এত সব বিঘ্ন সত্ত্বেও এদের কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে।

পার্শ্ববর্তী একটি গ্রাম আমরা দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানকার মোড়লস্থানীয় লোকদের সঙ্গে আমার কথা হল। তাঁরা বললেন, তাঁদের সবচাইতে বড় প্রয়োজন হচ্ছে জল। অবস্থা দেখেই সেটা টের পাওয়া গেল। সেচের ব্যবস্থা হলে এদের শস্যের পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়বে; ভারতবর্ষের খাদ্য-সমস্যার সমাধানে তাতে সাহায্য হবে। গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়ালাম কিছুক্ষণ। দেখলাম, ঘরগুলি মাটির তৈরী,

দেওয়ালও তাই। ঘরের ভিতরকার অবস্থাও আমি দেখেছি। তাদের গো-মহিষ আর সাধারণ জীবন-বিন্যাসও দেখলাম। গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে-সব ব্যবস্থা করা দরকার, তা করতে সময় লাগবে। ছোট্ট স্বাস্থ্য-কেন্দ্রটির কথা যখন চিন্তা করলাম আমি, এবং যখন ভেবে দেখলাম, স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে তালিম দেবার জন্য একজনমাত্র স্বাস্থ্য-পরিদর্শিকা তাঁর সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে কীভাবে এখানে এসে কাজ করেন, তখন বুঝতে পারলাম ভবিষ্যতের শিক্ষা-সমস্যা এখানে কী দুরূহ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে, আমার মনে হত যে, আমাদের বেকার-সমস্যা খুবই মারাত্মক। কিন্তু এখানে যাঁরা কর্মনিরত, তার চাইতেও বৃহৎ সমস্যার তাঁরা মোকাবিলা করছেন। আশার কথা এই যে, এই প্রকল্পের নিয়ন্তা ডঃ সুধীর ঘোষ এ-কাজের সম্পূর্ণ যোগ্য। প্রেরণাদায়ক আদর্শনিষ্ঠ যে-সব শ্রেষ্ঠ মানুষ এ-যাবৎ আমি দেখেছি, তিনি তাঁদেরই একজন।"

ফরিদাবাদ আজ পাঞ্জাব রাজ্যের বৃহত্তম শিল্প-নগর। সেখানকার লোকসংখ্যা আজ আশি হাজারে গিয়ে পৌঁছেছে। বৃহৎ ও জটিল বহু শিল্প গড়ে উঠেছে সেখানে। গড়ে উঠেছে পাঁচ শো একর জমির উপরে রবারের টায়ার তৈরির একটি কারখানা। সেইসঙ্গে আধুনিক কালের উপযোগী ট্র্যাকটর, মোটর-সাইকেল, স্কুটার, বৈদ্যুতিক মোটর, ট্রান্স্ফর্মার ইত্যাদির কারখানাও গড়ে উঠেছে। যা ছিল সাড়ে তিন হাজার একর জমির উপরে একটি উদ্বাস্তু-বসতি মাত্র, তাকে ঘিরেই দ্রুত বিকশিত হয়েছে এই শিল্প-নগর। এত দ্রুত যে এখানে শিল্পের প্রসার সম্ভব হল, এর কারণ কী? কারণ আর কিছুই নয়, যে উদ্বাস্তু-জনপদের এখানে পত্তন করা হয়েছিল, শ্রমিকদের একটি সমাজকে সেখানে তৈরী অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। সেখানে তারা আপন হাতে ঘরবাড়ি বানিয়ে নিতে পেরেছিল; সেখানে তাদের স্বাস্থ্য আর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ছিল বিদ্যুৎ-শক্তি আর জল সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা, এবং শিল্প-গঠনের অন্যান্য যাবতীয় আয়োজন। যে ফরিদাবাদকে আজ আমরা দেখছি, অর্থনৈতিক বিচারে তাকে এক বিরাট সাফল্য বলেই গণ্য করতে হয়; কিন্তু এ আমার স্বপ্নের ফরিদাবাদ নয়। যে বৈপ্লবিক পরিকল্পনা নিয়ে এই কাজে আমি হাত দিয়েছিলাম, তার কোথায় ছিল ত্রুটি আর কোথায় ছিল সাফল্যের অঙ্কুর, এর ব্যর্থতা আর সাফল্যের কারণই বা কী, উত্তরকালের কাছে তার কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী আজ বিবৃত করা দরকার। উত্তরকালের তাতে উপকার হবে। তাঁদের জানা দরকার যে, এই উদ্যোগে হাত দিয়ে আমি ব্যাপকভাবে এমন কতকগুলি শক্তির সম্মুখীন হয়েছিলাম, নবভারত গঠনের উদ্যমকে যারা ধীরে ধীরে শ্বাসরোধ করে মারছে।

আমাদের পরিকল্পনা ছিল এই যে, এই চল্লিশ হাজার নরনারীর মধ্যে যারা কর্মক্ষম, আমরা তাদের কাজ দেবার ব্যবস্থা করব। তারাই ইঁট বানাবে; তারাই দরজা, জানালা, নাট, বলটু তৈরী করবে; তারাই নিকটবর্তী পাহাড় থেকে পাথর নিয়ে আসবে। মাটি খোঁড়া, রাস্তা বানানো, বসত-বাড়ি আর সরকারী বাড়ি নির্মাণ করা—এ-সবও তারাই করবে। তখনকার যা বাজার-দর, সেই অনুযায়ী প্রত্যেককে তার কাজের মজুরি দিয়ে দেওয়া হবে। এবং সকলের এই কাজের মাধ্যমে যা গড়ে উঠবে, তা হবে তাদেরই সামবায়িক প্রয়াসের ফল। দোকানীরা প্রায় প্রত্যেকেই হচ্ছেন স্বাতন্ত্র্যবাদী মানুষ। সমবায়-সংস্থার সদস্য হতে তাঁদের রাজী করানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তবে নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকলে অসম্ভব সম্ভব হয়। আমি যখন প্রথম তাদের বললাম, "এসো, আমরা সবাই মিলে একটা

শহর গড়ে তুলি", তখন তারা ভেবেছিল যে, আমার মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গিয়েছে। প্রথম ছটা মাস আমি শুধু তাদের বুঝিয়েছি যে, এটা একটা অসম্ভব প্রস্তাব নয়। বোঝাতে বোঝাতে আমার মুখ ব্যথা হয়ে যেত। তাদের মধ্যে যারা নেতাস্থানীয়, সকালে দুপুরে রাত্রে অর্থাৎ প্রায় সর্বক্ষণ এ নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হত। বোঝাতে হত যে, সরকারের দাক্ষিণ্যের উপরে নির্ভর করে বেঁচে থাকায় কোনও লাভ নেই; বোঝাতে হত যে, নিজের হাতে কাজ করে জীবিকার্জন করতে হবে। উত্তরে তারা বলত যে, তারা তো কাজ করতেই চায়, কিন্তু করবে কীভাবে, এ-সব কাজ তো তারা জানে না, তারা দোকানী। শুধু কি তারা, তাদের বাপ-ঠাকুর্দাও দোকানী ছিল, তারা কীভাবে শহর বানাবে? শহর বানাবে ঠিকাদার-বাবুরা, শহর বানাবে ইনজিনিয়ার-বাবুরা। আমি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গিয়েছি; তা নইলে আর দোকানীদের দিয়ে আমি শহর বানাতে চাইব কেন?

শহর বানাবার জন্য কয়েক কোটি ইঁট দরকার। সেই ইঁট বানাতে তাদের রাজী করানোই হল আমার প্রথম কাজ। ধৈর্য না-হারিয়ে শান্তভাবে তাদের বুঝিয়ে বললাম যে, ইঁট বানানো মোটেই শক্ত কাজ নয়। মাটিতে জলে মিশিয়ে কাদার তাল তৈরী করতে হবে, তাকে কাঠের ছাঁচে ফেলে ইঁটের চেহারা দিতে হবে, সেই নরম ইঁটকে রোদ্দুরে শুকিয়ে নিতে হবে, তারপর গোল করে মাটি খুঁড়ে সেই গর্তটাকে রোদে-শুকোনো ইঁট দিয়ে ভর্তি করতে হবে, গর্তটাকে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে, তারপর তার উপরে গোটা দুই চিমনি বসিয়ে দিতে হবে, যাতে গর্তের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিলে চিমনি দিয়ে তার ধোঁয়া বেরিয়ে যেতে পারে। গর্তের এক প্রান্তে কয়লার আগুন ধরিয়ে দিলেই হল, সেই আগুনই ধীরে ধীরে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হবে। আগুন নিভে যাবার পর ইঁটগুলিকে ঠান্ডা হতে দাও; ঠান্ডা হয়ে গেলে সেগুলি সেখান থেকে সরিয়ে নাও; তারপর নতুন করে আবার সেই গর্তের মধ্যে রোদে-শুকোনো ইঁটের পাঁজা সাজিয়ে তোলো। ইঁট বানাবার কাজ এইভাবে চলতেই থাকবে, থেমে থাকবে না।

কিন্তু কাকে এ-সব কথা বলা। যত বোঝাই, দোকানীরা ততই মাথা নাড়ে আর বলে, এমন কাজ তারা জীবনে কখনও করেনি। অগত্যা কী আর করা, ইঁট বানানো যাদের পেশা, গ্রাম থেকে এমন কিছু লোককে আমরা নিয়ে এলাম। (সংখ্যায় তারা বেশী নয়, মোট লোকসংখ্যার পাঁচ শতাংশ মাত্র।) অন্যদের তারাই হাতে-কলমে দেখিয়ে দিল, কী করে ইঁট বানাতে হয়। কিন্তু বংশানুক্রমে যারা দোকানী, স্বচক্ষে সব দেখেও তারা উৎসাহিত হল না। ফলে আমি মহা সমস্যায় পড়ে গেলাম। পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম যে, শহর বানাতে যত ইঁট দরকার হবে, কুড়িটি ইঁটের পাঁজা থেকে আড়াই বছরের মধ্যেই তার সমস্ত ইঁট আমরা তৈরী করে নেব। তাই দিয়েই তৈরী হবে ছ হাজার বাড়ি, বড় একটি হাসপাতাল, কয়েকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পাওয়ার হাউস এবং অন্যান্য সরকারী ভবন। গড়তে হবে কুড়িটি সমবায়-সংস্থা; তার এক-একটির সদস্য হবে পঞ্চাশটি করে পরিবার। ইঁট বানাবার জন্য প্রায় দশ লক্ষ টাকা মূলধন দরকার; বোর্ড তাঁদের মূলধন হিসেবে যে আড়াই কোটি টাকা ঋণ পেয়েছেন, তার থেকেই অগ্রিম হিসেবে এই দশ লক্ষ টাকা সমবায়-সংস্থাগুলির হাতে তুলে দেওয়া হবে। সমবায়-সংস্থাগুলি সেই টাকা বিনিয়োগ করে ইঁট বানাবেন, এবং সমষ্টি-প্রকল্পের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে সে-ইঁট আমি কিনে নেব। বাইরে থেকে যাদের কাজে নেওয়া হয়েছে, ইঁট বিক্রির টাকা থেকেই মেটাতে হবে তাদের

প্রাপ্য; কিস্তিবন্দীভাবে মূলধনী ঋণ পরিশোধের জন্য কিছু টাকা আলাদা করে রাখতে হবে; অবশিষ্ট টাকা সমবায়-সংস্থাগুলি তাঁদের সদস্যদের মধ্যে বেঁটে দেবেন; এবং এইভাবেই ৫০ × ২০ = ১০০০ পরিবার তাদের জীবিকা অর্জন করবে।

শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে রাজী করানো গেল তাদের। কথাগুলি যে তাদের বিশ্বাস হয়েছে, এমন মনে হল না; তবে দ্বিধা সত্ত্বেও তারা বলল যে, তারা একবার চেষ্টা করে দেখবে। চোখের সামনে যখন একটা বিরাট কাজের উদ্যোগ চলেছে, তখন মনে যতই দ্বিধা-সংশয় থাক, সাধারণত কেউ তার থেকে দূরে থাকতে চায় না। তারা তখন ভাবে যে, কী জানি, ফল যদি ভাল হয়, তো তার অংশ থেকে তারা বাদ পড়বে। তেমনভাবে বাদ পড়তে কেউ চায় না। আর তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারা কাজে হাত লাগাল। প্রথম পাঁজাটিতে কাজ শুরু হবার পর দেখা গেল, ইঁট বানাতে যে খরচা পড়েছে এবং যে-দামে সেই ইঁট আমরা কিনছি, তাতে প্রতি হাজার ইঁটে তাদের দশ টাকা করে লাভ থাকে। পেশাদার শ্রমিকদের প্রাপ্য মিটিয়ে দেবার পরেও এতটাই তাতে লাভ রইল যে, বুঝতে পারা গেল, ইঁটের ব্যবসায় পয়সা আছে। কুড়িটি পাঁজায় অতঃপর সমানে ইঁট তৈরী হতে লাগল। সেই কোটি কোটি ইঁট দিয়েই গড়ে উঠেছে ফরিদাবাদ শহর।

কাঠের কাজ করবার জন্য যে সমবায়-সংস্থা গড়া হল, তার ইতিহাসও একই রকমের। প্রতিটি বাড়িতে যদি আট জোড়া দরজা-জানালার দরকার হয়, তাহলে শুধু ছ হাজার বসত-বাড়ির জন্যই আটচল্লিশ হাজার জোড়া দরজা-জানালা লাগবে। তা ছাড়া অন্যান্য যে-সব অট্টালিকা তৈরী হবে, তার জন্যও প্রয়োজন হবে বহু দরজা-জানালা। সেগুলি তৈরী করবার জন্য আমরা বড়-বড় দুটি সমবায়-সংস্থা প্রতিষ্ঠা করলুম; তার প্রতিটির সদস্য করা হল আড়াই শো পরিবারকে। শুধু কাঠের কাজেই অতএব পাঁচ শো পরিবারের জীবিকার্জনের ব্যবস্থা হয়ে গেল। এই বিশেষ কাজের জন্য অবশ্য বাইরে থেকে আরও বেশী অনুপাতে কারিগর আনতে হল। তার কারণ, এ-কাজে রীতিমত দক্ষতা চাই। সৌভাগ্যবশত, এই বাস্তুহারাদের মধ্যে অনেকেই ছিল শিখ। কাঠের কাজে তাদের আগ্রহ প্রায় সহজাত। চটপট তারা কাঠমিস্ত্রীর কাজ শিখে নিল।

একে তো লোকসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার; তার উপরে তাদের জীবিকার জন্য গড়ে তুলতে হ'ল বহু কল-কারখানা। সুতরাং প্রচুর জল চাই। ফরিদাবাদের ধারেকাছে নদী কিংবা খাল নেই। যমুনা সেখান থেকে আঠারো মাইল দূরে। পাইপলাইন বসিয়ে যমুনা থেকে জল আনতে গেলে তাতে বিস্তর খরচ পড়বে। অত টাকা আমরা কোথায় পাব। জলই অতএব একটা মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। একমাত্র ভরসা ভূগর্ভের জল। টিউবওয়েল বসিয়ে সেই জল তুলতে হবে। কিন্তু সরকারী ইনজিনিয়াররা সে-ব্যাপারেও আমাদের নিরাশ করলেন। তাঁরা বললেন, ফরিদাবাদ-এলাকার ভূগর্ভে জল নেই, সুতরাং সেখানে টিউবওয়েল বসিয়ে কোনও লাভ হবে না, বৃথাই আমরা একটা নির্জলা জায়গায় শহর গড়বার চেষ্টা করছি; এ একটা অবাস্তব পরিকল্পনা। হতাশ হয়ে আমি শ্রীনেহরুকে সব জানালুম। শুনে তিনি বললেন, গুজরাটে নবনগরের জামসাহেব তাঁকে বলেছিলেন যে, তাঁর রাজ্যে একজন সাধু আছেন, তিনি জলের হদিশ বাতলে দিতে পারেন, এ-ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতা নাকি অসামান্য। শ্রীনেহরু বললেন, "তুমি বরং আমার নাম করে তাঁকে একখানা চিঠি লেখো।" মরিয়া হয়ে আমি তাই করলুম; কাথিয়াবাড়ের রাজার কাছে চিঠি

লিখে দিলুম। তার দিনকয়েক বাদেই ঢ্যাঙা মতন একজন মানুষ এসে হাজির। মাথায় বিরাট পাগড়ি। তিনি বললেন, জামসাহেব তাঁকে পাঠিয়েছেন, তিনিই হচ্ছেন 'পানিওয়ালা মহারাজ'।

সৈন্যবাহিনীর সেই কর্নেলটি তখনও ফরিদাবাদে ছিলেন; বাস্তুহারা-শিবিরের তিনি দেখাশোনা করতেন। সাধু এসে জলের সন্ধান বাতলে দেবে, এই খবর শুনে তো তিনি হেসেই অস্থির। বললেন, এ একেবারে ঘোর অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার।

যাই হোক, পানিওয়ালা মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে তো আমরা সেই সাড়ে তিন হাজার একর জমির উপরে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। পাগড়িধারী মানুষটি মাঝে-মাঝে এক-এক জায়গায় থেমে দাঁড়ান, মাটির উপরে লাথি মারেন, আর বলেন, "এখানে জল আছে।" মোট দশটি জায়গা এইভাবে তিনি দেখিয়ে দিলেন। লোকজন আর ড্রিলিংয়ের যন্ত্র আনিয়ে সেখানে আমি নল বসাবার ব্যবস্থা করলুম। আশ্চর্য, মাটি খুঁড়তেই প্রতিটি জায়গায় জল বেরিয়ে এল। অফুরন্ত জল। প্রথম টিউবওয়েলটি দিয়ে যখন গলগল করে জল বার হতে লাগল, বাস্তুহারাদের তখন আর আনন্দ ধরে না।

হিসেব করে দেখলুম, এক-একটা টিউবওয়েল থেকে ঘণ্টায় তিরিশ হাজার গ্যালন জল পাওয়া যাচ্ছে। দিনে দশ ঘণ্টা করে চালালে টিউবওয়েলপিছু জল পাওয়া যাবে তিন লক্ষ গ্যালন। দশটি টিউবওয়েলের প্রতিটিই যদি মোট দশ ঘণ্টা করে চলে, তাহলে আমরা মোট তিরিশ লক্ষ গ্যালন জল পাব। ধরা যাক, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য মাথাপিছু রোজ তিরিশ গ্যালন জল দরকার হবে। সেই হিসেবে চল্লিশ হাজার বাস্তুহারার রোজ জল দরকার হবে মোট বারো লক্ষ গ্যালন। বাকী জল দিয়ে কল-কারখানার কাজ অনায়াসে চলবে, কিছু অসুবিধে হবে না। বারো থেকে চৌদ্দ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপ দিয়ে মোট বারোটি টিউবওয়েল আমরা বসালুম। প্রতিটির গভীরতা সাড়ে তিন শো ফুট। আমাদের পরিকল্পনা ছিল, প্রত্যেকটি টিউবওয়েলের সঙ্গে থাকবে টারবাইন কিংবা সেন্ট্রিফ্যুগাল পাম্প্; ইলেকট্রিক মোটর কিংবা ডিজেল ইনজিন দিয়ে সেগুলি চালানো হবে। ফরিদাবাদে যে সুবৃহৎ শিল্প-নগর গড়ে উঠেছে, আজ পর্যন্ত এই টিউবওয়েলগুলিই সেখানে জলের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জল আর কল-কারখানার জল, সবই আসছে ওই টিউবওয়েল থেকে। (পরে অবশ্য বড় বড় কয়েকটি বেসরকারী শিল্প-সংস্থা সেখানে আরও গুটিকয়েক টিউবওয়েল বসিয়েছেন।) অথচ বিজ্ঞানে যাঁদের অচলা ভক্তি, সেই ইনজিনিয়াররা আমাদের বলে দিয়েছিলেন যে, ফরিদাবাদের ভূগর্ভে জল নেই, সুতরাং সেখানে শহর গড়া যাবে না।

রাস্তা ছাড়া শহর হয় না। নগর-প্রকল্পেরই অঙ্গ হিসাবে আমরা ঠিক করেছিলুম যে, পঞ্চাশ মাইল পিচের রাস্তা বানাতে হবে। এই রাস্তার প্রতিটি পাথরকুচি সেই বাস্তুহারারাই আপন হাতে ভেঙেছে। কাছের পাহাড়গুলিতে পাথরের যে-সব কোয়ারি ছিল, পাঁচ শো পরিবারকে সেখানে কাজে লাগানো হল। এই পরিবারগুলিও ছিল কয়েকটি সমবায়-সংস্থার অন্তর্ভূক্ত। শহর গড়বার ব্যাপারে পরিবহণের ভূমিকাও কম নয়। পরিবহণের প্রয়োজন মেটাবার জন্য গড়া হল সত্তরটি সমবায়-সংস্থা; তাদের প্রত্যেকটিতে রইল পনরটি করে পরিবার; এবং বোর্ড থেকে সেই সত্তরটি সংস্থাকে সত্তরটি মোটর ট্রাক কিনবার জন্য মূলধন হিসেবে অগ্রিম টাকা দেওয়া হল। মোট এক হাজার পঞ্চাশটি পরিবারের জীবিকার্জনের ব্যবস্থা হল এইভাবে। ঠিক

হয়েছিল, রাস্তার ধারে ধারে এবং ফাঁকা জায়গায় মোট পঞ্চাশ হাজার গাছ লাগাতে হবে। চারা তৈরী করবার ব্যবস্থা আমরা নিজেরাই করে নিলুম। এই দারুণ গরম জায়গায় বাস্তুহারারা যাতে গাছ লাগাতে উৎসাহিত হয়, তার জন্য বিনামূল্যে হাজার-হাজার চারা তাদের মধ্যে বিতরণ করা হল।

ইঁট, পাথর, সিমেন্ট, বালি। উপকরণ জোগাড় হল। এবারে সেই উপকরণের সাহায্যে পরিপাটি এক-একটি ছোট্ট বাড়ি গড়ে তুলতে হবে। বাড়ির প্ল্যান সহজ-সরল। তবু, অল্প-কিছু মজুর-মিস্ত্রী আমরা বাইরে থেকে আনিয়ে নিলুম। আমাদেরই সেনট্রাল স্টোর থেকে বাস্তুহারাদের সমবায় গোষ্ঠীগুলিকে সিমেন্ট, ইঁট, বালি এবং কিছু-পরিমাণে ইস্পাত সরবরাহের ব্যবস্থা করা হল। ঠিক হল, বাড়ির নির্মাণ-ব্যয় থেকে তার দাম বাদ দিয়ে যা উদ্বৃত্ত থাকবে, সেটাকে এই সমবায়-গোষ্ঠীগুলির আয় বলে গণ্য করা হবে। বাড়িগুলি কত দ্রুত তৈরী হবে, কিংবা কত ধীরে, সেটা সমবায়-গোষ্ঠীগুলিই বুঝবে। কোনও সমবায়-গোষ্ঠী যদি কুড়িটি বাড়ি বানায়, তাহলে মালমশলার দাম বাদ দিয়ে বাড়ি-পিছু ১,৯৩৩৲ টাকা হিসেবে কুড়িটি বাড়ির জন্য তারা মোট ৩৮,৬৬০৲ টাকা পাবে। বাড়ি তৈরির কাজ তারা তিন মাসে শেষ করবে, না চার মাসে, সেটা তারাই স্থির করবে। তবে যত তাড়াতাড়ি তারা কাজ চুকিয়ে দিতে পারবে, তাদের আয়ের অংকও ততই বাড়বে।

সমষ্টি-প্রকল্পের আট হাজার কর্মীর কর্মজীবনের বিন্যাসটা কেমন ছিল, সেটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিচ্ছি। সামবায়িক কর্মনীতির ভিত্তিতে তারা কয়েক শ গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। এক-একটি গোষ্ঠীর ন্যূনতম সদস্য-সংখ্যা হল দশ। ঊর্ধ্বতম সংখ্যাটা বেঁধে দেওয়া ছিল না, তবে দশ-পঁচিশের উপরে সেটা কখনও ওঠেনি। গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্য থেকেই একজন হত গোষ্ঠীনেতা। সে-ই বোর্ডের ইনজিনিয়ারের কাছে গিয়ে গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে মালমশলা আর মজুরি নিত। প্রতিটি গোষ্ঠীর রোজগার তার সদস্যদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হত। অসুস্থতা কিংবা দুর্ঘটনার জন্য যারা কাজে যোগ দিতে পারত না, অনুপস্থিতির সময়ে বোর্ড থেকে তাদের সাহায্য দেবার ব্যবস্থা ছিল।

গোষ্ঠীর সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কটা প্রথম দিকে ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। কাজ যতই এগোতে লাগল, রোজগারের ভাগাভাগির ব্যাপারটা নিয়ে ততই আপত্তি গুঞ্জরিত হতে থাকল। গোষ্ঠীর মধ্যে যারা তরুণবয়সী, স্বভাবতই তারা বেশী খাটত। প্রবীণরা তত খাটতে পারত না। তবু যে তাদের সঙ্গে রোজগারটা সমান হিস্যায় ভাগ করে নিতে হচ্ছে, তরুণদের মধ্যে এই নিয়ে অসন্তোষ দেখা দিল। তার ফলে গোষ্ঠীর বিন্যাসও পালটে যেতে লাগল, সেই প্রীতির সম্পর্কটা আর রইল না। যুবকরা বুড়োদের সঙ্গে কাজ করতে চায় না। ফলে কয়েকটা গোষ্ঠীতে শুধু বুড়োরাই পড়ে রইল। তাদের পক্ষে তো এমন কোনও কাজ নেওয়া সম্ভব নয়, যাতে বেশী পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। অন্যদিকে তাদের কাজ পাওয়াও তো দরকার। ফলে যে সমস্যা দেখা দিল, তার সমাধানের জন্য আমরা একটা নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করলুম। এই নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী হাল্‌কা ধরনের কিছু কাজ শুধু বৃদ্ধবয়সীদের জন্যই সংরক্ষিত করে রাখা হল। ঠিক হল, সে-কাজ অন্যদের দেওয়া হবে না।

কাজের প্রথম বছরে গোষ্ঠীগুলি কিছু নিয়ম স্থির করে নিয়েছিল। মাঝে-মাঝে সেইসব নিয়মের অদলবদলও ঘটত। তা ছাড়া ছিল কিছু রীতিনীতি। সেই অনুযায়ী

তারা কাজ করত, এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ ঘটলে সেই অনুযায়ীই সেগুলি মিটিয়ে নিত। কিন্তু ক্রমে-ক্রমে এমন একটা লক্ষণ দেখা দিল, সামবায়িক গোষ্ঠী গঠনের মূল নীতিই যার ফলে বিপন্ন হয়ে উঠল। দেখা গেল, গোষ্ঠী-নেতাদের অধিকাংশই তাদের ক্ষমতার অন্যায় সুযোগ নিয়ে নিজ-নিজ গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের উপর অত্যধিক প্রভাব খাটাচ্ছে। সদস্যরা এ নিয়ে গোষ্ঠী-নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে লাগল। মুশকিল হল এই যে, অভিযোগকারীরা নিজেদের নাম প্রকাশ করতে চায় না, আত্ম-পরিচয় তারা গোপন রাখতে চায়। ওদিকে গোষ্ঠী-নেতাদের কিছু বলতে গেলেই তারা বলে, প্রমাণ কই? অর্থাৎ এটা একটা পাপচক্র হয়ে দাঁড়ল। তবে একটা কথা বুঝতে মোটেই অসুবিধে হল না। সেটা এই যে, একই লোক যদি দীর্ঘদিন ধরে গোষ্ঠীর নেতৃপদে বসে থাকে, গোষ্ঠী-প্রথা তাহলে আজই হোক আর কালই হোক ভেঙে পড়তে বাধ্য।

আমরা প্রস্তাব করলুম, প্রতিটি গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের নেতা নির্বাচন করবে। কিন্তু নির্বাচনের ব্যবস্থা করেও দেখা গেল, শতকরা নব্বইজন নেতাই বহাল-তবিয়তে তাদের নিজের নিজের আসনে দখল বজায় রেখেছে। বোঝা গেল, এ-ব্যবস্থায় কাজ হবে না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, লটারি করে নেতা নির্বাচন করা হবে। এবারে কিন্তু শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রেই নতুন লোক নেতৃপদে বসল। পুরনো নেতারা তাতে চটে গিয়ে যে যার গোষ্ঠী ছেড়ে চলে গেল, এবং নেতা-নির্বাচনের এই নতুন পদ্ধতির বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাতে লাগল। তাদের কিছু-কিছু যুক্তি ছিল যথেষ্টই জোরালো। কিন্তু উপায় কী, নেতৃত্ব সৎ হলে তবেই সমষ্টি-জীবনের কাঠামোটিকে বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে। গোষ্ঠী ছেড়ে গিয়ে নেতাদের অবশ্য সুবিধা হল না। সাধারণ সদস্যদের সহানুভূতি পেল না তারা। ফলে, বিশেষ অধিকারের বায়না ছেড়ে দিয়ে তারা আবার যে যার গোষ্ঠীতে এসে যোগ দিল এবং সাধারণ কর্মী হিসেবেই কাজ করতে লাগল।

একটা বছর কাটতে-না-কাটতেই দেখা গেল, সেই দ্বিধা-সংশয়ের ভাবটা আর একেবারেই নেই, ফরিদাবাদের মানুষরা প্রত্যেকেই কর্মব্যস্ত। সেই সঙ্গে পরিকল্পনা আর তার রূপায়ণের প্রতিটি পর্যায়েই তাদের সঙ্গে আরও বেশী করে আমরা পরামর্শ করতে লাগলাম। বাস্তুহারা সমাজ তার ফলে অনুভব করতে পারল যে, এই সমষ্টি-প্রকল্পের নীতি, প্রশাসন, জনকল্যাণমূলক সংস্থাগুলির পরিচালন-ব্যবস্থা ইত্যাদি, অর্থাৎ তাদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত প্রতিটি ব্যাপারে তাদেরই প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ পরামর্শ করে কাজ করা হচ্ছে। প্রকল্পের কাজের সঙ্গে তাদের যোগবন্ধন তাতে আরও দৃঢ় হল। আমরা দেখলুম, এই হচ্ছে শুভলগ্ন। বাস্তুহারা সমাজ যাতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি প্রতিনিধি পরিষদ নির্বাচন করে, তার প্রস্তাব এবারে দেওয়া যাক। প্রস্তাবটি তারা সানন্দে গ্রহণ করল।

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা এ-দেশে প্রথম ফরিদাবাদেই হয়েছিল। দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সনের শেষাশেষি। তার আঠারো মাস আগে, ১৯৫০ সনের জুন মাসেই, ফরিদাবাদে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। প্রথমেই তৈরী করা হল ভোটার তালিকা। লোকসংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার। তার মধ্যে ভোটারের সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় আঠারো হাজার। এবং সেই আঠারো হাজার ভোটারের মধ্যে

প্রায় ষোল হাজারই এসে ভোট দিলেন। প্রতিনিধি পরিষদের আসন সংখ্যা এগারোটি ; তার জন্যে প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলেন প'য়ত্রিশজন। যাঁরা নির্বাচিত হলেন, তাঁদের মধ্যে একজন শিক্ষিকাও ছিলেন। ভোটদান শেষ হবার পর ব্যালট-বাক্সগুলিকে সিল করে একটা ঘরের মধ্যে রাখা হল, ঘরের দরজায় পড়ল তালাচাবি। ঠিক হল, পরদিন সকালে ভোটগণনা করা হবে। প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেরই সে-রাত্রে ঘুম হল না, রাত জেগে তাঁরা ব্যালট-বাক্স পাহারা দিতে লাগলেন! বুঝতে বাকী রইল না, আমাদের উদ্যোগ সফল হয়েছে। মাত্র কয়েক মাস আগেও যে বিপুল জনসমষ্টির মধ্যে সামাজিক চেতনার বিশেষ পরিচয় মেলেনি, তারাই আজ কর্মনিষ্ঠ দায়িত্বশীল একটি সমাজ গড়ে তুলতে চলেছে। বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল আর ইস্কুল দিয়ে ফরিদাবাদের প্রকৃত সাফল্যের বিচার চলে না। সবাই মিলেমিশে নিজেদের হাতে নিজেদের কাজ করতে করতে সেখানকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে বিপুল সামাজিক চেতনার সঞ্চার হয়েছিল, ফরিদাবাদের প্রকৃত সাফল্য সেইখানেই।

প্রকল্পের বিদ্যুৎ-সমস্যা কীভাবে মিটল, সেই কাহিনীও কৌতূহলোদ্দীপক। বসত-বাড়িতে বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যবস্থা তো করতেই হবে, সেইসঙ্গে শহরবাসীদের স্থায়ী জীবিকার জন্য যে কল-কারখানা গড়ে তোলা হবে, তার কাজ চালাবার জন্যেও চাই বিদ্যুৎ-শক্তি। প্রকল্পের মূলধনী ঋণের পরিমাণ তো মাত্র আড়াই কোটি টাকা। তার উপরে নির্ভর করে তো আর আনকোরা নতুন বৃহৎ একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন প্ল্যান্ট কেনার কথা ভাবা চলে না। ঠিক করলুম, পুরনো একটি জারমান প্ল্যান্ট আমরা জোগাড় করব। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের অংশ হিসেবে সেটি জারমানি থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল। যুদ্ধের চার বছর আগে হামবুর্গের এক জাহাজ-নির্মাণ কারখানায় ছ-হাজার কিলোওয়াটের এই প্ল্যান্টটি বসানো হয়েছিল। এর টারবো সেট দুটি। যুদ্ধের সময় হামবুর্গের সেই জাহাজ-কারখানায় বোমা পড়ে, এবং বিদ্যুৎ-প্ল্যান্টটি তাতে আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুদ্ধের পরে মারকিন সৈন্যবাহিনী এটির যন্ত্র-সরঞ্জাম খুলে ফেলে। অতঃপর যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে এটি পড়ে ভারতবর্ষের ভাগে। হামবুর্গ থেকে এর যন্ত্রসরঞ্জাম দেড়শো ক্রেটে বোঝাই করে কলকাতায় পাঠানো হয়। কলকাতার ডকে এটি পুরো দেড় বছর পড়ে ছিল। তখন এটির উপর দিয়ে বিস্তর ঝড়বাদল গিয়েছে। সরকারের প্রায় প্রতিটি দপ্তরকেই অনুরোধ করা হয়েছিল, এটিকে তাঁরা যেন কাজে লাগান। কিন্তু সরকারী ইনজিনিয়ারদের মনে এটির ব্যবহারযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। তাই তাঁদের কেউই এতদিন এটিকে কাজে লাগাতে উৎসাহ বোধ করেননি। যন্ত্র-সরঞ্জামের মধ্যে কী কী আছে, এবং কী কী নেই, তার কোনও বিবরণ এর সঙ্গে ছিল না। সরঞ্জামগুলিকে জোড়া দিয়ে কীভাবে আবার প্ল্যানটটি গড়ে তুলতে হবে, তার কোনও নকশা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবু আমার মনে হল, একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী। শ্রীনেহরুকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের বাস্তুহারা-সমাজের কাজে লাগাবার জন্যে কি এটিকে আমরা পেতে পারি? সরকারী দপ্তরগুলির কোনওটিই তো এটিকে নিতে রাজী হচ্ছিল না। তাই শ্রীনেহরু নির্দেশ দিলেন, প্ল্যান্ট্‌টি যেন আমাকে দেওয়া হয়। ঠিক হল, ডিসপোজালের দরে বোর্ড থেকে এটির দাম দিয়ে দেওয়া হবে।

অতঃপর শুরু হল আমার অনুসন্ধানের পালা। বার্লিনে যে ভারতীয় মিলিটারী মিশন তখন মোতায়েন ছিল, তার মারফতে আমি এমন একজন মেক্যানিক্যাল ইনজিনিয়ারকে খুঁজে বার করলুম, হামবুর্গের ব্লম অ্যানড ভস জাহাজ-কারখানার

এই বিদ্যুৎ-উৎপাদন-প্ল্যান্টে যিনি কাজ করতেন। মিলিটারী মিশনের কর্তা তাঁর যোগ্যতা আর অভিজ্ঞতার বিবরণ আমাকে জানালেন। সেইসঙ্গে এমন আরও কয়েকজন জারমান ইনজিনিয়ারের যোগ্যতার বিবরণ তিনি আমাকে জানালেন, যাঁরা ভারতে এসে কাজ করতে ইচ্ছুক। ১৯৪৯-৫০ সনে জারমানদের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। দক্ষ এইসব ইনজিনিয়ার এত কম বেতনে কাজ করতে রাজী হলেন যে, আমি রীতিমত বিস্ময় বোধ করলুম। যাই হোক, দক্ষতা আর অভিজ্ঞতার বিবরণ পড়ে মনে হল, জোহানেস ডলকেই আমাদের পাওয়া দরকার। ভারতীয় মিলিটারী মিশন কিন্তু তাঁকে সুপারিশ করলেন না। তাঁরা বললেন, ইংরেজী এ'র একেবারেই জানা নেই; সেক্ষেত্রে অন্যেরা সবাই ইংরেজী জানেন। ফরিদাবাদের টিনের চালাঘরে বসে আমার কিন্তু মনে হল, এই জোহানেস ডলকেই আমাদের চাই। তার কারণ একমাত্র তিনিই এই প্ল্যান্টটির সঙ্গে পরিচিত। তাঁর ইংরেজী জ্ঞান থাক আর না-ই থাক, তাতে বয়ে গেল। ঠিক করলুম, তাঁকেই আমি নিযুক্ত করব। ভারতীয় মিলিটারী মিশন অগত্যা কী আর করেন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও ডলকেই তাঁরা পাঠিয়ে দিলেন। এই বিদেশী বন্ধুকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে সস্ত্রীক আমি পালাম বিমানবন্দরে গিয়েছিলুম। আমাদের কথার এক বিন্দুও তিনি বুঝলেন না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারলেন যে, তিনি আসায় আমরা খুব খুশী হয়েছি। ভাষার ব্যবধানকে ভালবাসা দিয়ে খুব সহজেই জয় করে নেওয়া যায়। অতঃপর চটপট আমরা জারমান-জানা একটি তরুণকে জোগাড় করে ফেললুম। সে-ই হল দোভাষী। তার মারফতে ডল-এর সঙ্গে আমাদের দিব্যি কথাবার্তা চলতে লাগল।

ভেবেছিলুম, দিল্লির একটি হোটেলে আমরা এই জারমান ইনজিনিয়ারের থাকার ব্যবস্থা করে দেব। সেখান থেকে রোজ তাঁকে ফরিদাবাদে নিয়ে আসবার জন্যে এবং ফরিদাবাদ থেকে আবার দিল্লিতে পেঁছে দেবার জন্যে একটি গাড়ির ব্যবস্থাও থাকবে। দিল্লিতে থাকলে তিনি আরামে থাকবেন, সেইজন্যেই এই ব্যবস্থা। ডল্ কিন্তু তাতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, যেখানে কাজ হচ্ছে, সেখানেই তিনি থাকবেন। আমি যে-রকম টিনের চালাঘরে রয়েছি, তাঁরও সেইরকমের একটা চালাঘর পেলেই চলবে; তিনি কাজ করতে এসেছেন, আরাম ভোগ করতে আসেননি। তা ডল সত্যি কাজ করতেই এসেছিলেন বটে। দৈত্যের মতন খাটতেন তিনি। জনা ছয়েক তরুণ ভারতীয় ইনজিনিয়ারকে আমি ডলের হাতে সমর্পণ করলুম। তাদের একজনের নাম নাঙ্গিয়া। ডলের সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললুম, "মিঃ ডল্, এর নাম নাঙ্গিয়া। ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ারিংয়ে এ-ছেলেটি ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। আপনার সঙ্গে কাজ করবে।" ডল্ কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস ডিগরীর কথা শুনে বিচলিত হবার পাত্র নন। গম্ভীর ভাবে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "দেখা যাক।" তরুণ ইনজিনিয়ারের দল দু-দিনেই টের পেয়ে গেল যে, ছোট্টখাট্ট এই জারমান ইনজিনিয়ারটি নিজে যেমন দৈত্যের মতন খাটেন, তেমনি অন্যদেরও খাটিয়ে নেন; তাঁকে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। ফাঁকি অবশ্য কেউ দিতও না। বয়লার টারবাইন, জেনারেটর ইত্যাদি প্রতিটি ব্যাপারে ডল্ তাদের প্রত্যেককেই খুঁটিনাটি প্রতিটি কাজ হাতে-কলমে শিখিয়ে দিতে লাগলেন। এমন লোককে গুরু হিসেবে পেলে কে না খুশী হয়। খুশী হয়ে কাজ করতে লাগল তারা। ডলকে তারা খুবই ভালবাসত। কাঠের বাক্সগুলি খুলে বার করা হল সেই প্ল্যান্টের হাজার রকম অংশ। তার প্রত্যেকটির মাপজোক কষে সবাই মিলে প্ল্যান্টের একটি নকশা তৈরী করে ফেলল।

গোটা ব্যাপারটাই যেন একটা ধাঁধার মত। একটার পর একটা অংশ জোড়া দিয়ে সেই ধাঁধার উত্তর খুঁজে বার করতে হবে। ছোটখাটো কয়েক শ অংশ তো পাওয়াই গেল না। সৌভাগ্যের বিষয়, প্ল্যানটের যেটা প্রধান অংশ, সেই টারবাইন আর জেনারেটর দুটিকে নিখুঁত অবস্থায় পাওয়া গেল। ওয়াটার-টিউব বয়লারের টিউব-গুলির উপরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন দেখলুম আমরা। মারকিন সৈন্যদের নির্দেশে জারমান কারিগররা যখন বিদ্যুৎ-প্ল্যান্ট্টিকে খুলে ফেলতে বাধ্য হয়, তখন স্বভাবতই কাজটা তাদের ভাল লাগেনি। নিজের দেশের একটা দামী জিনিস, অন্যেরা সেটাকে জোর করে কেড়ে নিচ্ছে, কার এটা ভাল লাগে। জারমান কারিগরদেরও লাগেনি। প্ল্যান্ট্টার বিভিন্ন অংশকে তাই তারা নষ্ট করে দিতে চেয়েছিল, যাতে অন্যরাও সেটাকে সহজে কাজে লাগাতে না পারে। টিউবগুলির দশা দেখে বোঝা গেল, খুব ভাল করে ওয়েলডিংয়ের ব্যবস্থা না-করলে সেগুলিকে কাজে লাগানো যাবে না। অত দক্ষ ওয়েলডার ভারতবর্ষে তখন নেই। ডলকে দিয়ে তাই হামবুর্গের এক ওয়েলডারের কাছে চিঠি লেখালুম। ডল্ তাকে ভারতবর্ষে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করলেন। আর প্ল্যানটের খুচরো যে-সব অংশ পাওয়া যাচ্ছিল না, কলকাতা, বোমবাই, এমন-কী ব্রিটেনেরও নানা স্থানে লোক লাগিয়ে তল্লাসি চালিয়ে সেগুলিকে জোগাড় করবার ব্যবস্থা হল।

অতঃপর সমস্যা বাধল বয়লার ড্রাম নিয়ে। ড্রামগুলির ওজন পঞ্চাশ টন; নব্বই ফুট উঁচুতে তুলে তাদের বসাতে হবে। ক্রেনের সন্ধান করা বৃথা; ও-তল্লাটে যে পঞ্চাশ টন ওজন তুলবার মতন ক্রেন নেই, তা আমরা জানতুম। জারমান ইনজিনিয়ারকে প্রশ্ন করলুম, "এবারে তাহলে কী করবেন আপনি?" তাতে মাথা চুলকে তিনি বললেন, "কিছু একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে।" তা ব্যবস্থা তিনি করলেন বটে। তাঁর কথামত আমি ছটা স্ক্রু জ্যাক আর প্রচুর কাঠের স্লিপার আনিয়ে দিলুম। স্লিপারগুলিকে পরপর সাজিয়ে জেদী সেই জারমান ইনজিনিয়ার পঞ্চাশ টন ওজনের সেই ড্রামগুলিকে একটু-একটু করে নব্বই ফুট উঁচুতে তুলবার ব্যবস্থা করলেন। অতঃপর তার তলায় বসালেন ইস্পাতের 'পায়া'। তরুণ ভারতীয় ইনজিনিয়ারদের সহযোগিতায় 'পায়া'গুলিকে তিনি ফরিদাবাদের কারখানাতে বানিয়ে নিয়েছিলেন। পায়া বসিয়ে দেওয়ার পর স্লিপারগুলিকে সরিয়ে নেওয়া হল। চেয়ে দেখলুম, মাটি থেকে নব্বই ফুট উঁচুতে বয়লার ড্রামগুলি দিব্যি বিরাজ করছে; ওই ড্রাম থেকেই জল আসবে ওয়াটার টিউব বয়লারে। পঞ্চাশ-টনী ক্রেন ছাড়া যিনি কাজ করতে পারেন না, এবং কাজে হাত লাগিয়ে যিনি প্রতিপদে বলতে থাকেন যে, দরকারী প্রতিটি যন্ত্র তাঁর চাই, তেমন ইনজিনিয়ার দিয়ে তো আর অনগ্রসর দেশের কাজ চলে না। এ-দেশের পক্ষে ডলের মতন ইনজিনিয়ারই হচ্ছেন আদর্শ।

নগর-প্রকল্পের কাজ যতই এগোতে লাগল, ততই আমরা অনুভব করতে লাগলুম যে, আমাদের একটা ভালমতন ইনজিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ থাকা দরকার। প্রয়োজনীয় লেদ-যন্ত্র এবং অন্যান্য সরঞ্জামের আমি খোঁজ করতে লাগলুম। খোঁজ করতে করতে জানা গেল, বোমবাইয়ের ডকইয়ার্ডে প্রচুর মেশিন-টুল স্তূপাকার হয়ে আছে। এগুলিও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদে জারমানি থেকে এসেছিল। এইসব যন্ত্র-সরঞ্জামের ৩৬১টি ইউনিট আমরা কিনে নিলুম; বুঝতে পারলুম যে, এগুলিকে কাজে লাগিয়ে আমরা ডিজেল ইনজিন তৈরী করতে পারি। এইসব যন্ত্র দিয়ে আগে

কলোনের এক বিরাট কারখানার কাজ চলত। সেই কারখানায় তৈরী হত ডিজেল ইনজিন। ভারতে তখন ডিজেল ইনজিনের প্রচুর চাহিদা। বিদেশ থেকে প্রতি বৎসর এখানে বিভিন্ন সাইজের প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডিজেল ইনজিন আমদানি করতে হত। সেচকার্যের প্রয়োজনে টিউবওয়েল থেকে জল তুলতে, কিংবা যেখানে বিদ্যুৎ যাবার উপায় নেই সেখানে যন্ত্র চালাতে চাই ডিজেল ইনজিন। শুধু ভারতবর্ষ কেন, গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়েই তখন ডিজেল ইনজিনের চাহিদা ছিল ব্যাপক। এ যখনকার কথা বলছি, ভারতবর্ষে তখন বছরে ৫,৩০০ ডিজেল ইনজিন উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল; সেক্ষেত্রে শুধু আভ্যন্তর প্রয়োজন মেটানোর জন্যই বার্ষিক চাহিদা ছিল আরও পঁয়তাল্লিশ হাজারের। ফরিদাবাদে যে যন্ত্র-সরঞ্জাম আমরা জোগাড় করলুম, দেখা গেল যে, তার সাহায্যে (নতুন কিছু যন্ত্র বসিয়ে নিতে পারলে) বছরে আমরা ১২-অশ্বশক্তিবিশিষ্ট চার হাজার ডিজেল ইনজিন তৈরী করতে পারব। গোষ্ঠী-প্রকল্পের মূলধনী ঋণ থেকে লাভজনক বিনিয়োগ হিসেবে তাই কুড়ি লক্ষ টাকা পৃথক করে রাখা হল। একটি জারমান ডিজেল ইনজিনের সরঞ্জাম খুলে খুলে তার প্রতিটি অংশের আমরা নকশা করে নিতে লাগলুম, তারপর সেই অংশগুলিকে আবার জোড়া দিয়ে দেখলুম, দিব্যি কাজ চলছে। প্রকল্পের কর্মীরা ছ মাসের মধ্যেই বুঝে গেলেন যে, জারমান ডিজেল ইনজিনটির প্রতিটি অংশই আমাদের কারখানায় তৈরী করে নেওয়া সম্ভব।

১৯৫১ সনের জানুয়ারি মাসে ফরিদাবাদের কারখানায় প্রথম ডিজেল ইনজিনটি তৈরী হল। সেদিন আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না। একটি ট্রাকের উপরে ইনজিনটিকে বসিয়ে আমরা পারলামেন্ট হাউসে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সামনে গিয়ে হাজির হলুম; ফরিদাবাদের প্রথম ইনজিনটিকে আমরা তাঁরই হাতে তুলে দেব। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে আমার যাতায়াত তখন ছিল অবাধ; আগে থাকতে অ্যাপয়েন্ট-মেন্ট না-করেও যখন-ইচ্ছে আমি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে পারতুম। প্রধানমন্ত্রী তাঁর দপ্তর থেকে বেরিয়ে এলেন, এবং ফরিদাবাদে-তৈরী ইনজিনটিকে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য শিশুর মতন উৎসাহে সেই ট্রাকের উপরে গিয়ে উঠলেন। বাস্তুহারাদের যে-সব প্রতিনিধি আমার সঙ্গে এসেছিল, ইনজিনে স্টার্ট দিয়ে তারাই দেখিয়ে ছিল, কীভাবে এটির কাজ চলে। শ্রীনেহরু তো দারুণ খুশী। ফরিদাবাদ প্রকল্পের কাজ চলছিল উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের অধীনে। আমার অনুরোধে শ্রীনেহরু সেই সময়ে পুনর্বাসন-মন্ত্রীর কাছে যে-সব চিঠি দিয়েছিলেন, তার একটি এখানে তুলে দিচ্ছি। এমন চিঠি তখন ইচ্ছে হলেই যে-কোনও সময়ে শ্রীনেহরুকে দিয়ে আমি লিখিয়ে নিতে পারতুম।

নয়াদিল্লি,
২৪শে জানুয়ারি, ১৯৫১

"প্রিয় অজিত প্রসাদ,

ফরিদাবাদের ডিজেল ইনজিন প্রকল্পে যে আমার আগ্রহ খুবই গভীর, তা তুমি জানো। এর প্রয়োজনটা এতই প্রশ্নাতীত যে, বিলম্ব মাত্রেই এক্ষেত্রে দুঃখদায়ক। যে-কোনও কারণেই হোক্, বিলম্ব ঘটেছে। এই ব্যাপারটা আমাদের হাতে আসবার পর প্রায় ন-দশ মাস অতিক্রান্ত হতে চলল।

ব্যবসায়ী এবং বিশেষজ্ঞ মহলের পরামর্শ আমরা নিয়েছি। আমাদের নিজেদের কমিটীর সদস্যদের সঙ্গে ছাড়াও রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান এফ সি বাধওয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখা হয়েছে, এবং টাটা কোম্পানির কে. এ. ডি. নওরোজির সঙ্গে তিনি একমত হয়েছেন।

এখন জানতে পারলাম যে, ফরিদাবাদে কাজের অগ্রগতি দেখে দপ্তর খুবই খুশী হয়েছেন, এবং ডিজেল ইনজিন নির্মাণের প্রচুর যন্ত্রপাতি তাঁরা আমাদের দিতে প্রস্তুত। এইসব যন্ত্রপাতি এখন বোমবাইয়ে পড়ে আছে। জারমানির কাছ থেকে পাওয়া ক্ষতিপূরণের অংশ হিসেবে এই নতুন যন্ত্রগুলি পাকিস্তানের প্রাপ্য, তবে এগুলি তারা এখনও নেয়নি। ডিসপোজালের দরে এই প্ল্যানটের দাম অবশ্যই আমাদের মিটিয়ে দিতে হবে, কিন্তু তার ব্যবস্থা তো সহজেই করা যেতে পারে।

দপ্তর অবশ্যই স্পষ্ট করে আমাদের জানিয়েছেন যে, প্ল্যানটটির কাজ তাড়াতাড়ি চালু হবে এবং এ-ব্যাপারে জারমান ফার্মটির সঙ্গে আমাদের একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা হয়েছে এ-কথা জানতে পারলে তবেই এই যন্ত্রপাতি তাঁরা আমাদের দিতে পারেন। যন্ত্রগুলি এসেছে ডয়শ কারখানা থেকে।

এ-ব্যাপারে এখনই একটা সিদ্ধান্ত করা দরকার। অব্যবসায়ীসুলভভাবে অনন্তকাল ধরে এ নিয়ে আমরা আলোচনা চালাতে পারি না। শুনলাম, জারমানির ডয়শ কারখানার ডিরেকটর জেনারেল খুব শিগগিরই দিল্লির পথে অসট্রেলিয়া যাচ্ছেন। দিল্লিতে তাঁর উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে এ-সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করে ফেলা উচিত। কী শর্তে চুক্তি হবে, তা কে. এ. ডি. নওরোজি, এফ. সি. বাধওয়ার এবং অন্যেরা মিলে ইতিমধ্যেই ঠিক করে ফেলেছেন। ফরিদাবাদ বোর্ড এই প্রকল্পটিকে পুরোপুরি অনুমোদন করেছেন, এখন প্রকল্পের কাজ আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার।

যদি প্রয়োজন হয় তাহলে দিল্লিতে আমরা ডয়শ কারখানার ডিরেকটর জেনারেলের সঙ্গে একটা বৈঠকের ব্যবস্থা করতে পারি এবং আমিও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি।

আন্তরিকভাবে তোমার
(স্বাঃ) জওহরলাল নেহরু"

মাননীয় শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন,
রাষ্ট্রমন্ত্রী, পুনর্বাসন দপ্তর,
নয়াদিল্লি।

এ যখনকার কথা বলছি, ফরিদাবাদ প্রকল্পকে সাহায্য করবার জন্য শ্রীনেহরু তখন শুধু কলোনের ক্লাকনার-হামবোল্ট-ডয়শ প্রতিষ্ঠানের ডিরেকটর কেন, আমার অনুরোধে যে-কোনও লোকের সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রকল্পটিকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য এতই আগ্রহ ছিল তাঁর।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ সনের মধ্যে বিদেশ থেকে যত গণ্যমান্য অতিথি নয়াদিল্লিতে এসেছেন তাঁদের প্রত্যেককেই একবার ফরিদাবাদে পাঠিয়ে দেওয়া হত। অর্ধদিবস

সেখানেই কাটাতেন তাঁরা; আমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখতেন, অল্প-কিছু মূলধন এবং নেতৃত্বের ব্যবস্থা করে দিলে নিতান্ত সাধারণ একদল নরনারীও স্বয়ংনির্ভর সমষ্টি-প্রকল্পের মাধ্যমে কীভাবে নবজীবন গড়ে নিতে পারে। মিঃ ইউজেন ব্ল্যাক প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তখন পরিচয় হয়েছিল আমার। সমালোচক হিসেবে এসেছিলেন তাঁরা; কাজ দেখে সমর্থক হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। একদিন সকালে অর্থদপ্তর থেকে ফোন করে আমাকে জানানো হল যে, ফরিদাবাদ-পরিদর্শনের জন্য বিশ্ব-ব্যাংকের সভাপতির কাছে প্রস্তাব করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মিঃ ব্ল্যাক তখন নয়াদিল্লি সফরে এসেছেন। সমষ্টি-প্রকল্পের ডিজেল ইনজিন কারখানা এবং অন্যান্য শিল্পোদ্যোগ সম্পর্কে মিঃ ব্ল্যাকের বিশেষ আস্থা ছিল না; এইসব উদ্যোগের পিছনে সরকারী টাকা ঢালা উচিত কিনা, তা নিয়েও তাঁর সন্দেহ ছিল। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এ-সব কাজের দায়িত্ব নেয় না কেন? উত্তরে আমি বললুম, এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করতে আমরা চেষ্টা করছি, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে সেখানে আসতে উৎসাহিত হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে মূলধন হিসেবে সরকারের কাছ থেকে যে-টাকা আমরা ঋণ নিয়েছি, তা দিয়ে শুধু ঘরবাড়ি আর সমাজকল্যাণকর কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ব কেন? তার সাহায্যে গুটিকয়েক লাভজনক শিল্পও যদি আমরা সামবায়িক ভিত্তিতে গড়ে তুলতে পারি, তো তার আয় দিয়েই স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য সমাজকল্যাণকর কাজের ব্যয় নির্বাহ করা যাবে, সরকারী দাক্ষিণ্যের উপরে আর নির্ভর করে বসে থাকতে হবে না। মিঃ ব্ল্যাক ব্যাংকার মানুষ, লাভ-লোকসানের হিসেব বোঝেন, আমার উত্তর শুনে তিনি খুশী হলেন। টাকাটা কীভাবে বিনিয়োগ করা হচ্ছে, এবং তার থেকে কীভাবে আয় হচ্ছে, তার বিস্তারিত বিবরণ দেখবার পর তাঁর আপত্তি তিনি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। অতঃপর যখনই আমি ওয়াশিংটন গিয়েছি, নিজের অসুবিধে ঘটিয়েও তখনই তিনি সৌজন্যভরে আমার দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। একবারও এর অন্যথা হয়নি।

কিন্তু বড্ড তাড়াতাড়ি আমি বিখ্যাত হয়ে পড়ছিলাম। তার ফল যা হবার হল। যে-কাজে আমি হাত দিয়েছিলাম, তা সমাপ্ত করবার সুযোগ আমি পেলাম না। শুরু হল গণ্ডগোল। সে-কথায় একটু পরে আসছি। ১৯৫২ সনের গোড়ার দিকেই ঘরবাড়ি এবং জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানগুলি সমেত শহরের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। শুরু হয়েছিল বাটা শু ফ্যাক্টরি এবং আরও কয়েকটি কারখানায় উৎপাদনের কাজ। তাতে অনেকের কর্মসংস্থানেরও সুবিধে হয়েছিল। কিন্তু চার-পাশের গ্রামগুলির জন্য যে-কাজ আমাদের করবার কথা, তা তখন সবে শুরু হয়েছে।

মাত্র আড়াই বছর। তার মধ্যে, নিতান্ত মরুভূমির মধ্যে, গড়ে উঠেছিল ছোট্ট একটি শিল্প-শহর। ফরিদাবাদ। কল্পনা করুন, তারই চারপাশে রয়েছে তিনশো গ্রাম। তার লোকসংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ; জমির আয়তন দু লক্ষ একর। সেই জমিতে কৃষিকর্ম করাই তাদের জীবিকার্জনের একমাত্র উপায়। জলের অভাবে ভালভাবে তারা চাষবাস করতে পারত না। বছরে মাত্র একটি ফসল ফলত। সেক্ষেত্রে জলের যদি ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে বছরে দু-বার ফসল ফলানো যে শক্ত হবে না, তা আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। প্রশ্ন হচ্ছে, জলের ব্যবস্থা কীভাবে করা যায়। গ্রামগুলিতে হাজার পাঁচেক কুয়ো ছিল। ঠিক করলাম, এখানে চার শো নলকূপ বসাতে হবে। অন্তত

তিন শো ফুট গভীর করে টিউবওয়েল না বসালে সেখানে জল পাবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু উপায় কী, তা-ই করতে হবে। হিসেব করে দেখলাম, প্রতি টিউবওয়েল ঘণ্টাপিছু মোটামুটি পঁয়ত্রিশ হাজার গ্যালন জল তুলতে পারবে; এবং দিনের মধ্যে সেটাকে চালু রাখা যাবে বড়জোর কুড়ি ঘণ্টা। সেক্ষেত্রে চার শো টিউবওয়েলকে প্রতিদিন যদি আমরা পনর ঘণ্টা করেও চালু রাখি তাহলে প্রতিদিন আমরা ৩৫,০০০ × ১৫ × ৪০০ = একুশ কোটি গ্যালন জল পাব।

গ্রামগুলিতে যে পাঁচ হাজার কুয়ো ছিল, মান্ধাতার আমলের পন্থায় উট কিংবা বলদের সাহায্যে চাকা ঘুরিয়ে তা থেকে জল তোলা হত। উট আর বলদকে রেহাই দিয়ে মোটর বসিয়ে পাম্পের সাহায্যে এবারে জল তোলা দরকার। কাজটা যেখানে বিদ্যুতের সাহায্যে করা সম্ভব, শিল্প-নগরের কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র থেকে সেখানে বিদ্যুৎ নিয়ে আসতে হবে; আর বিদ্যুতের আশীর্বাদ যেখানে পৌঁছয়নি, সেখানে ডিজেল ইনজিন বসিয়ে কাজ চালাতে হবে। তার জন্য যত ডিজেল ইনজিন দরকার, তা ফরিদাবাদেই তৈরী করে নেওয়া যাবে।

আমরা হিসেব করে দেখেছিলাম যে, চার শো টিউবওয়েল আর পাঁচ হাজার কুয়োর জল দিয়ে যদি সেচের ব্যবস্থা করা যায়, বছরে দুটো ফসল ফলানো তাহলে শক্ত হবে না। তা ছাড়া, সেচের সুবিধে পেলে গ্রামবাসীরা শুধু গম ইত্যাদির চাষ করেই ক্ষান্ত থাকবে না, তামাক, তুলো, আখ, কড়াইশুঁটি ইত্যাদি বাণিজ্যিক কৃষি-পণ্যও উৎপাদন করতে পারবে। গ্রামবাসীদের অভাব অবশ্য শুধু জলেরই ছিল না; অভাব ছিল ভাল বীজ আর সারেরও। উপরন্তু, তারা যাতে ভাল জাতের গরু-মোষ কিনতে পারে, তার জন্যও যে তাদের কিছু সাহায্য করা দরকার, তাও আমরা বুঝেছিলাম। এর জন্য একরপিছু যদি এক শো টাকা বিনিয়োগ করা হয়, আড়াই লক্ষ একরে তাহলে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াবে আড়াই কোটি টাকা। এ-টাকায় জলের ব্যবস্থা তো করা যাবেই, বীজ সার আর গো-মহিষ ক্রয় ও বণ্টনের জন্য একটা ঋণ-তহবিলও গড়ে তোলা যাবে। একরপিছু বছরে যদি দশ টাকা ও সেইসঙ্গে ন্যায্য সুদ ফেরত পাওয়া যায়, পুরো টাকাটা তাহলে মোটামুটি দশ বছরে উঠে আসবে। একরপিছু ফলন যদি দ্বিগুণ করে দেবার ব্যবস্থা হয়, চাষীরাও তাহলে বছরে দশ টাকা ও তৎসহ কিছু সুদ দিতে দ্বিধা করবে না। কেননা ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের লাভটাই থাকবে অনেক বেশী।

জমি থেকে আয় বাড়ছে। কিন্তু কৃষকরা শুধু সেইটুকুতেই খুশী থাকবে কেন। তারা চাইল, শিল্প-নগর ফরিদাবাদে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার যে-ব্যবস্থা হয়েছে, গ্রামেও তার সম্প্রসারণ হোক। তার জন্য তিন শো গ্রামকে দশটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা দরকার; প্রতি গোষ্ঠীতে থাকবে দশটি করে গ্রাম। তার মধ্যে একটি হবে কেন্দ্র-গ্রাম; সেইখান থেকেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য গ্রামে শিক্ষা আর স্বাস্থ্য-বিষয়ক কাজকর্ম পরিচালনা করা হবে। ফরিদাবাদের কেন্দ্রীয় শিল্প-এলাকার পাঁচটি ইউনিটে জনসাধারণের সেবার জন্য বিভিন্নমুখী যে-ব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলেছিলাম, গ্রামাঞ্চলের এ দুটি প্রয়োজন মেটাবার জন্যও সেই একই ব্যবস্থা সংগঠিত করা হবে বলে আমরা ঠিক করলাম। অর্থাৎ প্রতিটি কেন্দ্র-গ্রামে ছোটখাটো অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসার জন্য একটি করে স্বাস্থ্য-কেন্দ্র এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দুটি করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। হাসপাতালে রেখে যাদের চিকিৎসা

করা দরকার, শিল্প-নগরের হাসপাতালে তারা ভর্তি হবার সুযোগ পাবে। মাধ্যমিক ও কারিগরী শিক্ষার ব্যাপারেও সেই একই ব্যবস্থা হল। শহরে একাধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি কারিগরী বিদ্যালয় ছিল। ঠিক হল, গ্রামের ছেলেরা সেখানে গিয়ে ভর্তি হতে পারবে। গ্রামের স্বাস্থ্য-পরিকল্পনায় জন্ম-নিয়ন্ত্রণকেও অন্তর্ভুক্ত করা হল।

চার শো টিউবওয়েল ও পাঁচ হাজার কুয়োর তত্ত্বাবধান এবং সার বীজ ও গো-মহিষ ক্রয় ও বণ্টনের দায়িত্ব নেবার জন্য আমরা ঠিক করলাম যে, মোট দশটি সর্বার্থসাধক সমবায়-সংস্থা গড়ে দেওয়া হবে। প্রতিটি সমবায়-সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হবে তিরিশটি করে গ্রাম। ঋণ হিসাবে প্রাপ্ত মূলধন বিনিয়োগের কাজ এবং প্রকল্প রূপায়ণের কাজ শেষ হবার পর সমবায়-সংস্থাগুলিই যাবতীয় সম্পত্তি ও দায় গ্রহণ করবে। গ্রামগুলি তো আর নিজেদের চেষ্টায় সমবায়-সংস্থা গড়ে তুলতে এবং ঋণ হিসাবে প্রাপ্ত মূলধনকে সবচাইতে লাভজনকভাবে খাটাতে পারবে না; দায়িত্ব ছেড়ে দিলেও নিজেদের চেষ্টায় তা তাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। সূচনায় তাই বাইরে থেকে নেতৃত্ব দিতে হবে। তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যেই সেই নেতৃত্বের কাজ ফুরনো চাই; তারপর যেন আর বাইরে থেকে নেতৃত্ব দিতে না হয়।

এর থেকে যে চিত্রটা স্পষ্ট হয়ে উঠল, তা হচ্ছে এই। গ্রামাঞ্চলে একটি জনগোষ্ঠীর জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই গ্রামীণ মানুষ (তিন শো গ্রাম, জনসংখ্যা আড়াই লক্ষ); আর যে-অঞ্চলে তারা থাকে, তার কেন্দ্রে রয়েছে কিছু শিল্পনির্ভর নাগরিক (সংখ্যায় তারা পঞ্চাশ হাজার)। এই দুই অংশের সমবায়ে গড়ে তুলতে হবে একটি সমন্বিত ইউনিট। এখন বলাই বাহুল্য, গ্রামীণ এলাকার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য শহরের ভাগ তার মধ্যে কতটা রাখা দরকার, তা নিয়ে বিতর্ক তোলা যেতে পারে। ফরিদাবাদের ক্ষেত্রে নাগরিক শিল্পাঞ্চলটিকে একটু বেশী পরিমাণেই বৃহৎ রাখবার দরকার হয়েছিল আমাদের। তার কারণ বাস্তুহারাদের আশ্রয় ও জীবিকার ব্যবস্থা করাই ছিল আমাদের আশু সমস্যা; তার সমাধানের জন্যই এ-কাজে আমরা হাত দিয়েছিলাম। পক্ষান্তরে তিন শো গ্রাম নিয়ে যে দশটি গোষ্ঠী গড়বার পরিকল্পনা করলাম আমরা, সেখানে নতুন করে কাউকে আশ্রয় দেবার কোনও সমস্যা ছিল না। এক্ষেত্রে, তিন শো গ্রামের উন্নয়নের ব্যবস্থা আগে করে নিয়ে তারপর তার কেন্দ্র হিসেবে ছোটখাটো একটি শিল্পাঞ্চল হিসেবে ফরিদাবাদ শহরকে গড়ে তুললে সেটাই হত এই ধরনের প্রকল্প রূপায়ণের যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি। বলাই বাহুল্য, সেই শিল্পাঞ্চলে এমন কিছু পণ্য উৎপাদন করতে হবে এবং জনসেবার এমন কিছু ব্যবস্থা রাখতে হবে, গ্রামগুলি যার দ্বারা উপকৃত হয়। গ্রামীণ মানুষরা সেক্ষেত্রে অনুভব করতে পারবে যে, তাদের জীবন-ব্যবস্থার সত্যিই কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তা নইলে তারা কৃষি-সম্পদ উৎপাদনের কাজে স্থায়িভাবে নিযুক্ত থাকতে উৎসাহিত হবে না। কৃষিজীবী ও শিল্পনির্ভর, এই দুই রকমের মানুষের সমন্বয়ে গঠিত এই জনগোষ্ঠীকে যথাসাধ্য কাজে লাগাতে হবে। কাজ সৃষ্টির জন্য চাই মূলধন। জনসমষ্টির পক্ষ থেকেই যেখান থেকে হোক ঋণ হিসাবে সেটা সংগ্রহ করা চাই। জনসাধারণের সোৎসাহ প্রয়াস ও তার অতিরিক্ত কিছু সঙ্গতির সমবায়ে সৃষ্টি হল সম্পদ। তার থেকে একটা বার্ষিক আয়েরও ব্যবস্থা হল। প্রতি বছর সেই আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ দিয়ে মূলধনী ঋণ পরিশোধ করে যেতে হবে। বাকীটা দিয়ে জনকল্যাণকর নানা ব্যবস্থার ব্যয়ভার নির্বাহ করতে

হবে এবং পৌনঃপুনিক খরচা মেটাতে হবে। এখানে দয়াদাক্ষিণ্যের কোনও প্রশ্নই নেই। দান হিসেবে কেউ কিছু দিচ্ছেও না, কেউ কিছু নিচ্ছেও না। একটা প্রকল্পের দায়িত্ব নিয়ে হাতেকলমে যদি এটাকে প্রমাণ করে দেখিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে এশিয়া, আফরিকা আর দক্ষিণ আমেরিকার অনগ্রসর দেশগুলির সমস্যার সমাধান তারই মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। দ্বিপাক্ষিক চুক্তির সাহায্যেই হোক আর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমেই হোক, শুধু ধনী দেশগুলির কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করলে আর দরিদ্র দেশগুলিতে তা ছড়িয়ে দিলে তার দ্বারা কারও সমস্যার কোনও প্রকৃত সমাধান হয় না।

১৯৫১ সনের শেষাশেষি দেখা গেল, আমরা আমাদের লক্ষ্যে প্রায় পৌঁছে গেছি। অর্থাৎ যে-উদ্দেশ্যে কাজ শুরু করা হয়েছিল, তা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। জনসাধারণ এতদিন শহর নির্মাণের কাজে নিযুক্ত ছিল। সে-কাজ তখন সমাপ্তপ্রায়। কিন্তু শহর গড়ার কাজ শেষ হবার পর অন্য কাজ তো তাদের দিতে হবে; শিল্পগুলিতে সেই বিকল্প কাজ ইতিমধ্যে যথেষ্টপরিমাণে সৃষ্ট হয়নি। ফরিদাবাদে কারখানা স্থাপনের জন্য জায়গা চেয়ে বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান আমাদের কাছে দরখাস্ত করেছিল। দরখাস্তের সংখ্যা প্রায় পাঁচ শো। হিসেব করে দেখলাম, আট হাজার লোকের কর্মসংস্থানের জন্য এক শো কারখানাও দরকার হবে না। কিন্তু আমাদের যিনি অর্থনৈতিক উপদেষ্টা—অর্থদপ্তরের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি আমাদের বোর্ডের অন্যতম সদস্য ছিলেন—তিনি কারখানা-প্লটগুলির এমন উঁচু দাম হেঁকে বসলেন যে, বাটা শু কোম্পানির মতন ধনী গুটিকয় প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যদের পক্ষে তা নেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াল। দরখাস্তকারীদের অধিকাংশই হচ্ছেন বাস্তুহারা শিল্পপতি। যাবতীয় মূলধন পাকিস্তানে রেখে তাঁরা ভারতবর্ষে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। থাকবার মধ্যে আছে শুধু নতুন করে এখানে শিল্প গড়ে তুলবার উৎসাহ আর যোগ্যতা। তাঁদের হয়ে আমি যথাসাধ্য লড়লাম। বললাম, এঁরা তো এ-জমি লীজ হিসেবে নিচ্ছেন, এখন এঁদের কাছ থেকে বেশী টাকা আদায় করবার দরকার নেই; যে-পরিমাণ ন্যায্য হয়, সেই পরিমাণ টাকা এঁদের কাছ থেকে নেওয়া হোক। আমাদের ফরিদাবাদের লোকরাই এঁদের কারখানায় কর্মনিযুক্ত হবে। এঁরা কারখানা খুলুন, লাভ করতে থাকুন, তারপরে আমরা জমির বার্ষিক ভাড়া বাড়াতে পারব, তা ছাড়া দশ কিংবা পনর বছর পর-পর লীজের শর্তও আমরা পালটাতে পারব। আমি আরও বললুম যে, শুধু বাটা শু ফ্যাকটরিতেই রোজ পঞ্চাশ হাজার জোড়া জুতো তৈরী হয়, এবং তার আভ্যন্তর শুল্ক বাবদেই প্রত্যহ এঁরা সরকারকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে থাকেন। শিল্পের কাছ থেকে এইভাবে টাকা পেতে হয়, একেবারে সূচনা-পর্বে তাঁদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করতে যাওয়া ঠিক নয়। কিন্তু আমার যুক্তিতে কর্ণপাত করা হল না। তার ফল হল এই যে, ফরিদাবাদে বেসরকারী শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠতে দেরি হল। তার ফলে দেখা দিল কর্মসংস্থানের অসুবিধা। ফরিদাবাদে কাজ না পেয়ে আমাদের কর্মীরা তখন অন্যত্র কাজের সন্ধান করতে লাগল; কাজের জন্য দিল্লি পর্যন্ত ধাওয়া করল অনেকে। সাময়িকভাবে অনেকে বেকার হয়ে পড়ল। তাদের জন্য আবার সেই 'ডোল' হিসেবে টাকা দেবার ব্যবস্থা না করে উপায় রইল না। চারপাশের গ্রামগুলির উন্নয়নকার্যে তখন আমরা সবে হাত দিয়েছি; তিরিশটি কেন্দ্র-গ্রামের মধ্যে মাত্র একটিতে তখন কাজ শুরু হয়েছে।

এইসব সমস্যায় যখন আমরা হিমসিম খাচ্ছি, ফরিদাবাদের খ্যাতিই তখন আমাদের দুর্ভাগ্যের হেতু হয়ে দাঁড়াল। আমাদের এই সমষ্টি-প্রকল্পের সুনাম যে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, সুইজারল্যানডের এক গ্রাম থেকে লেখা অখ্যাত এক মহিলার চিঠি পড়লেই তা বোঝা যাবে। ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে ভদ্রমহিলা চিঠি লিখেছিলেন। এখানে তার বাংলা তর্জমা দেওয়া হল :

মাদাম আর শারার
লে আইরিস

শেরনে ১০-১২-১৯৫১

মিঃ সুধীর ঘোষ,
ফরিদাবাদ, দিল্লির কাছে

"প্রিয় মহাশয়,

নিজের চেষ্টায় যে শহর আপনি গড়ে তুলেছেন, সুইজারল্যানডের এক সচিত্র সংবাদপত্রে তার সম্পর্কে একটি চমৎকার প্রবন্ধ পড়লাম। স্বপ্নে যে শহরকে আপনি দেখেছিলেন, পঞ্চাশ হাজার লোককে আশ্রয় দেবার জন্য তাকে আপনি বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। আপনার শহরে সকলেই সুখী, সকলেই কাজে নিযুক্ত। তাদের স্বাস্থ্য ভাল; তারা বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ পায়। আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনি একটা অসাধারণ কাজ করেছেন। সর্বান্তঃকরণে কামনা করছি, আপনি সুস্থ থাকুন, যাতে আপনার দেশের আপনি আরও সেবা করতে পারেন। আপনার দেশকে আমিও ভালবাসি। ভগবান আপনাকে ও আপনার সহায়কদের আশীর্বাদ করুন। ইতি।

আন্তরিকভাবে আপনার
(মিসেস) আর শারার"

আমাদের কাজের তাৎপর্য শুধু যে এই অখ্যাত মহিলার মতন সরলচিত্ত কিছু নরনারীর প্রাণে সাড়া জাগিয়েছিল, তা নয়, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রীতিমত পোড় খাওয়া সূক্ষ্মবুদ্ধি বহু মানুষের চিত্তও এতে আলোড়িত হয়েছিল। ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ চেসটার বোল্‌স-এর লেখা একটি চিঠি থেকেই সে-কথা বুঝতে পারা যাবে। প্রথম যে-বার তিনি রাষ্ট্রদূত হয়ে এ-দেশে আসেন, সেবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি আমার জন্য এই চিঠিখানি রেখে যান :

মার্কিন দূতাবাস,
নয়াদিল্লি, ভারতবর্ষ, ১০ই মার্চ, ১৯৫৩

"প্রিয় সুধীর,

তুমি দেশে ফিরে আসবার আগেই আমাকে ভারত ছাড়তে হচ্ছে, এই চিন্তাটা আমার পক্ষে বেদনাদায়ক। তবে এ সম্পর্কে আমাদের কিছু করবার নেই। ২০শে

মার্চ নাগাদ আমরা রওনা হব। যাচ্ছি প্রশান্ত মহাসাগরের পথে। নানান জায়গায় থামব। মে-র আগে যে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরতে পারব, এমন মনে হয় না।

তোমার ও শান্তির সম্পর্কে আমার ও স্টেবের শ্রদ্ধা যে কত গভীর, আশা করি তা তুমি জান। সেই যে প্রথম ফরিদাবাদে গিয়েছিলাম, চিরকাল সে-কথা আমাদের স্পষ্ট মনে থাকবে। বস্তুত, ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে যে কী বিরাট সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে, সেইদিন থেকেই তা আমি বুঝতে শুরু করি। তখন থেকেই আমি অবিচ্ছিন্নভাবে তোমার সাহায্য পেয়েছি এবং প্রচ্ছন্ন নানা বিঘ্ন থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছি।

যে-ধরনের কাজে তোমার প্রতিভাকে ঠিকমত লাগানো সম্ভব, দেশে ফিরে সেই ধরনের কাজের দায়িত্ব তুমি পাবে বলেই আশা করি। আমার তো মনে হয় রাষ্ট্রপুঞ্জের কোথাও কিছু একটা দায়িত্ব পেলেই সবচাইতে ভাল হয়। তাই না? নিউ ইয়র্কে থাকতে এই ধরনের সম্ভাবনার কথা তুমি হয়ত চিন্তা করে দেখেছ।

অবসর পেলে চিঠি লিখো। আমাদের ঠিকানা হবে এসেক্স্, কনেকটিকাট।

নিবিড় প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

আন্তরিকতাপাশে বন্ধু
চেট
(চেসটার বোল্স্)"

কিন্তু এই মারকিন আগ্রহই ফরিদাবাদের পক্ষে একটা সমস্যা সৃষ্টি করল। রাষ্ট্রদূত বোল্স্ যখন ১৯৫১ সনের অকটোবর মাসে ভারতে আসেন, ভারত-মারকিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে তখন একটা নতুন হাওয়া বইতে থাকে। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিঃ কেসি তখন অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র-মন্ত্রী। অকটোবরের শেষাশেষি তিনি অন্যত্র যাবার পথে নয়াদিল্লিতে নেমেছিলেন। তিনি আমাকে বলেন যে, নবাগত মারকিন রাষ্ট্রদূতকে তিনি চেনেন; তাঁকে তিনি বলেছেন যে, আমাদের পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হওয়া দরকার। ইতিপূর্বে কখনও রাষ্ট্রদূত বোল্সের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। মিঃ কেসির সঙ্গে সেই কথা হওয়ার দিনকয়েক বাদেই রাষ্ট্রদূত বোল্স আমাকে ফোন করে জানান যে, সস্ত্রীক তিনি ফরিদাবাদে এসে একটা দিন কাটাতে চান। রাষ্ট্রদূতের কথাবার্তায় এতটুকু আনুষ্ঠানিকতার আড়ষ্টতা ছিল না। তাঁর প্রস্তাবের খোলামেলা ভাবটা ভারী ভাল লাগল। তাঁর যে চিঠিখানি উদ্ধৃত করেছি, তার থেকেই বোঝা যাবে, ফরিদাবাদ তাঁর কেমন লেগেছিল। মিঃ বোল্স্ও আমারই মতন উৎসাহী মানুষ। তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব দ্রুত দানা বাঁধতে লাগল। এ-দেশে তিনি তখন নবাগত। কাজের সেই প্রারম্ভিক পর্যায়ে তাঁকে আমার সাধ্যমত নানা পরামর্শ দিয়েছি আমি। মিঃ কেসিও তা-ই চেয়েছিলেন।

ফরিদাবাদে যে কাজটাকে আমি হাতে-কলমে প্রমাণ করে দেখাচ্ছিলাম, কায়েমী-স্বার্থসম্পন্ন কিছু মানুষের সেটা ভাল লাগেনি। আমার কাজকর্মে ইতিমধ্যে তাঁরা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। ফরিদাবাদের যখন সূচনাপর্ব, সরকারের শক্তিশালী আমলা-মহল এবং অন্যান্য জনকল্যাণ-বিভাগ তখন আমার কাজ নিয়ে বিশেষ মাথা

ঘামাননি। তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন, এই যে আমি বাস্তুহারাদের নিয়ে তাদের আপন হাতে একটা শহর গড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছি, এ চেষ্টা কখনও সফল হবে না। এইসব বাস্তুহারার খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে তিন বছরে সরকারের যা ব্যয় হবার কথা, সেই টাকাটাই আমি সরকারের কাছে চেয়েছিলাম। ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে, আমি সব ভণ্ডুল করে ছাড়ব এবং অপদস্থ হব। তাঁদের আশা পূর্ণ হল না। মাত্র দু বছরের চেষ্টাতেই আমি ও আমার সহকর্মীরা ফরিদাবাদ প্রকল্পে এতটাই সাফল্য অর্জন করলাম যে, দেশে-বিদেশে এ নিয়ে কথা হতে লাগল; সবাই ভাবতে লাগল, এশিয়া ও আফরিকার সুবিস্তীর্ণ অনগ্রসর গ্রামাঞ্চলগুলিকে বিনিয়োগের ব্যাপারে কীভাবে স্বয়ংনির্ভর করে তোলা যায়। হাতে-কলমে আমি প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে, মাত্র ১,৯৩৩৲ টাকা ব্যয় করেই কলঘর-পায়খানা সমেত দু-কামরার একটি ছোট্ট পাকাবাড়ি নির্মাণ করা যায়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারের আমলারা এতে আমার উপরে দারুণ চটে গেলেন।

ফরিদাবাদে কী করা হয়েছিল, সেটা বড় কথা নয়; কীভাবে করা হয়েছিল, সেটাই হচ্ছে উল্লেখযোগ্য। আমি যে শুধু নামেমাত্র স্বয়ংশাসিত একটি সংস্থা গড়ে তুলেছিলাম তা নয়; শ্রীনেহরুকে ব্যক্তিগতভাবে এর সঙ্গে যুক্ত রেখে এই সংস্থার স্বাধীনতাকে বাস্তব করে তুলেছিলাম। আমাদের ছোট্ট সেই বোর্ডে যে-সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হত, দেশের প্রাধানমন্ত্রী স্বয়ং তার সঙ্গে যুক্ত থাকায় কোনও আমলা, এমন কী কোনও মন্ত্রীও, তা নিয়ে আপত্তি তুলতে সাহসী হতে না। সরকারী আমলাতন্ত্র (ভারতবর্ষের মতন দেশে আমলারাই হচ্ছেন প্রকৃত শক্তিধর) সচরাচর যে পন্থায় কোনও স্বয়ংশাসিত সংস্থার কাজের স্বাধীনতা নষ্ট করে দেন, তা হচ্ছে এই। সংস্থাটির মধ্যে তাঁরা অর্থ-দপ্তরের একজন প্রতিনিধিকে ঢুকিয়ে দেন। অতঃপর সেই প্রতিনিধিটি দাবি করতে থাকেন যে, সংস্থার আর-পাঁচজন সদস্যের মত তিনি একজন সাধারণ সদস্য নন,—টাকাপয়সার প্রশ্ন যার সঙ্গে জড়িত এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কিনা, সেটা তিনিই ঠিক করবেন। অর্থাৎ কিনা, তাঁর দাবিটা এই যে, সংস্থার অর্থনৈতিক যে-কোনও সিদ্ধান্তকে ভেটো প্রয়োগ করে তিনি নাকচ করে দিতে পারবেন। সেই ক্ষমতাটা তাঁর নাকি থাকাই চাই, তার কারণ, তিনি তো আর একজন সাধারণ মনুষ্য নন, তিনি হচ্ছেন, সরকারী অর্থের রক্ষী। ধরেই নেওয়া হয় যে. সংস্থার অন্যান্য সদস্যরা যা-ই বলুন না কেন. তাঁদের সকলের সম্মিলিত জ্ঞানের চাইতেও এই একটি লোকের জ্ঞানবুদ্ধি অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। ফরিদাবাদ-প্রকল্পের ব্যাপারেই এই প্রথম দেখা গেল যে. আমলাতন্ত্র বিশেষ এঁটে উঠতে পারলেন না। আমাকে তার জন্য তাঁরা ক্ষমা করেননি।

ব্রিটিশ আমলে এই মূল অনুমানের উপরে ভিত্তি করে সরকারী টাকার বিলি-ব্যবস্থা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী রচনা করা হয়েছিল যে, প্রত্যেকটি মানুষই চোর; নিয়মাবলীকে অতএব চৌর্য-নিরোধক করে তোলা চাই, অর্থাৎ কিনা নিয়মাবলীর ফাঁসে ব্যাপারটাকে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখা চাই। কিন্তু সরকারের কাজ তখন ছিল যৎসামান্য। তাঁরা নেহাতই রাজস্ব আদায় করতেন, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখবার ব্যবস্থা করতেন, এবং ছিটেফোঁটা কিছু-কিছু জনকল্যাণমূলক কাজ করতেন। সুতরাং খরচও সে-আমলে বেশী ছিল না। সেক্ষেত্রে জনকল্যাণই যে-রাষ্ট্রের লক্ষ্য, এবং জনসাধারণের জন্য যেখানে এক নবজীবন গড়ে তুলবার আপ্রাণ প্রয়াস চলেছে, ব্রিটিশ

আমলের তুলনায় সেখানে ব্যয়ও অনেক বেশী হতে বাধ্য। ভারতবর্ষে প্রশাসন-ব্যবস্থার লক্ষ্য ও আদর্শ আমূল পালটে গিয়েছে; অথচ তার কাজ চলছে সেই উনিশ শতকের নিয়ম অনুযায়ী। ফলে সমস্যা দেখা দিয়েছে। যে-সব কাজের প্রকৃতি আর-পাঁচটা সাধারণ সরকারী কাজের মত নয়, এবং আরও দুরূহ, তার দায়িত্বভার যদি স্বয়ংশাসিত সংস্থার উপরে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, স্বয়ংশাসিত সংস্থাগুলিকে সত্যিকারের স্বাধীন করে তুলবার চেষ্টা অদ্যাবধি একটি ক্ষেত্রেও সফল হয়নি। ফরিদাবাদ-প্রকল্পকে আমি স্বাধীন রাখতে চেয়েছিলাম, এবং প্রায় বছর তিনেক তাকে স্বাধীন রাখতে পেরেছিলাম। সরকারী আমলারা তো কাজকে সফল করে তুলবার দায়িত্ব নেন না, তাঁরা চান শুধু ক্ষমতা। একদিকে ছিলেন তাঁরা। অন্যদিকে ছিলেন সেই কর্মী-দল, ফরিদাবাদ-প্রকল্পকে সার্থক করে তুলবার জন্য যাঁরা প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন। আর এই দুই দলের মধ্যে ছিলাম আমি; সারাক্ষণ লক্ষ্য রেখেছিলাম, আমলারা যেন কর্মীদের কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে না পারেন। ফরিদাবাদে আমি এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছিলাম, কর্মীদের পক্ষে যাতে উদ্যম-সহকারে কাজ করা সম্ভব হয়। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক শাসনযন্ত্রের জড়তা এতই প্রবল যে, তার বিরুদ্ধে যে একবার রুখে দাঁড়াবে, তার আর রক্ষা নেই। রক্ষা আমিও পেলুম না। অসুবিধেটা ছিল এইখানে যে, শ্রীনেহরুর উপরে সর্বাংশে আমাকে নির্ভর করতে হত। যতদিন তিনি নির্ভর করতে দিয়েছেন, ততদিন আমি কাজ করতে পেরেছি। তাঁর স্নেহচ্ছায়া অপসৃত হবার পর আর আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব ছিল না।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, ফরিদাবাদ প্রকল্পের ব্যাপারে আমার মারকিন বন্ধুরা যে আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন, তারই সূত্রে এই স্নেহচ্ছায়া অপসৃত হল। ১৯৫২ সনের জানুয়ারি মাসে মারকিন সেনেটর ওয়েন ব্রুস্টার ভারত-সফরে এসেছিলেন। মারকিন সেনেটের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কমিটীর তিনি সদস্য। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রাষ্ট্রদূত বোলসের প্রতিপক্ষ। রাষ্ট্রদূত হিসেবে বোলসের এই নিয়োগের তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। রাষ্ট্রদূত বোল্স ভারতের একজন উৎসাহী বন্ধু; ভারতের জন্য ব্যাপকভাবে মারকিন অর্থনৈতিক ও কারিগরী সাহায্যের প্রস্তাব করে তিনিই প্রথম যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে একটি পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। সেনেটের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কমিটীর কাছে যখন সেই প্রস্তাবটি পেশ করা হল, কমিটী তখন সরেজমিনে ব্যাপারটা বুঝবার জন্য একজন সদস্যকে ভারতে পাঠালেন। সেই সদস্যটিই হচ্ছেন ব্রুস্টার। ভারতকে ব্যাপকভাবে সাহায্য দেবার জন্য যে প্রস্তাব করেছিলেন মারকিন রাষ্ট্রদূত, মারকিন কংগ্রেসের সমর্থন তা পাবে কিনা, সেনেটের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কমিটীর সুপারিশের উপরেই সেটা নির্ভর করছিল। আবার কমিটীর সুপারিশ কী হবে, সেটা নির্ভর করছিল ওয়াশিংটনে ফিরে গিয়ে সেনেটর ব্রুস্টার কী রিপোর্ট দেন তার উপরে।

রাষ্ট্রদূত বোল্সের প্রধান আগ্রহ ছিল সমষ্টি-উন্নয়নে। সমষ্টি-উন্নয়ন বলতে তিনি এই বুঝেছিলেন যে, কৃষি-ব্যবস্থার প্রসার ঘটাতে হবে, এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতের গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-সংক্রান্ত সুবিধার ব্যাপক আয়োজন করতে হবে। মারকিন সাহায্য ছাড়াই এ-ব্যাপারে ভারতীয়রা তাদের

আপন চেষ্টায় জনসাধারণের এক নূতন জীবনব্যবস্থা গড়ে তুলবার জন্য যে কাজ করছে, স্বচক্ষে দেখে তার তাৎপর্য বুঝবার জন্য সেনেটর ব্রুস্টারকে তিনি ফরিদাবাদে পাঠিয়ে দিলেন। শীতের এক উজ্জ্বল সকালে ঝকঝকে এক বিরাট গাড়িতে চড়ে সেনেটর ব্রুস্টার ফরিদাবাদে এসে হাজির। আমার সেই টিনের চালাঘরে তাঁকে বসালাম আমি; উৎসাহভরে বোঝাতে লাগলাম, ফরিদাবাদের গোষ্ঠী-জীবনকে আমরা কীভাবে গড়ে তুলতে চাই। কিন্তু সেনেটর যে আমার কথায় বিশেষ উৎসাহিত বোধ করছেন, তা মনে হল না। রাষ্ট্রদূত বোল্‌স অবশ্য আগেই আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ইনি একজন ঝানু ব্যক্তি, তেলের টাকায় লাল হয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু দৈব-যোগাযোগই বলতে হবে, শীতের সেই সকালবেলায় আমার সেই টিনের ঘরে এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। সেনেটরকে যখন আমি ফরিদাবাদ-প্রকল্পের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি, এবং চেষ্টা করতে-করতেই বুঝতে পারছি যে, আমার কথাগুলি তাঁর কানেই যাচ্ছে না, তখন হঠাৎ আমাকে থামিয়ে দিয়ে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো একটি ফোটোগ্রাফের দিকে আঙুল তুলে ধরলেন তিনি। বললেন, "উনিই তো গান্ধী, তাই না? আর ওই যে গান্ধীর পাশে যে যুবকটিকে দেখতে পাচ্ছি, উনিই তো আপনি? গান্ধীর সঙ্গে তাহলে আপনার পরিচয় ছিল, কেমন?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ, সেনেটর, ছিল। আমি তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। তিনি ছিলেন আমার পিতার মত।"

দেখলুম, সেনেটরের মুখের ভাব একেবারে পালটে গিয়েছে। গান্ধীজীর সম্পর্কে অসীম তাঁর আগ্রহ। ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলেন "কেমন মানুষ ছিলেন তিনি?" একটার-পর একটা প্রশ্ন তিনি করে যেতে লাগলেন। ফরিদাবাদের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অতঃপর গান্ধীজীর কথাই আমি তাঁকে শোনাতে লাগলুম। নানা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে গান্ধীজী তাঁর আপন হাতে যে-সব চিঠি আমাকে লিখেছিলেন, তার কয়েকটিও দেখালুম তাঁকে। আলোচনা শেষ হবার পর সেনেটর বললেন, "পৃথিবীর যে-অংশে আমরা থাকি, সেখানেও তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব আমরা অনুভব করছি।"

ঝানু একজন মারকিন ব্যবসায়ীও যে এমন কথা বলবেন, তা আমি আশা করিনি। তাঁর কথা শুনে আমার খুব ভাল লাগল।

ফরিদাবাদ-প্রকল্পে সেনেটর ব্রুস্টারের প্রথমে বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না। কিন্তু নিমেষে তিনি যেন পালটে গেলেন। সারাটা দিন ফরিদাবাদে কাটালেন তিনি। আমাদের ওখানেই মধ্যাহ্নভোজ আর চায়ের পর্ব সমাধা করলেন। আমার সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে সাগ্রহে আমাদের প্রকল্পের সমস্ত কাজ দেখলেন। আমার স্ত্রীর সঙ্গে অনেক গল্পসল্প করলেন। তারপর দিনের শেষে বিদায় নেবার সময় বললেন, "আপনাকে আমার ভাল লেগেছে। আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে। আপনার কাজ আমার খুব পছন্দ হয়েছে।" কেন পছন্দ হয়েছে, সেনেটরকে তা আমি জিজ্ঞেস করলাম। তাতে তিনি বললেন, "দেখুন, আমি একজন ব্যবসায়ী-মানুষ। আমি আপনার বন্ধু বোলসের মতন নই। পৃথিবীর সর্বত্র সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে আমেরিকার টাকা বিলিয়ে দেবার পক্ষপাতী নই আমি। কিন্তু কথাটা তা নয়। দেখছি, নেহাত দাক্ষিণ্য হিসেবে যে-টাকাটা এখানকার এই মানুষগুলির পিছনে ব্যয় করাই হত, সরকারের কাছ থেকে সেই টাকাটা আপনি ঋণ হিসেবে নিয়ে

এদেরই কাজে তাকে বিনিয়োগ করেছেন, এবং এদেরই সাহায্যে এমন একটি শহর গড়ে তুলেছেন, নেহাত জমি হিসেবেও যার দাম এখন সেই ঋণের অঙ্কের চাইতে বহুগুণ বেশী। আমার বিশ্বাস, যে-কাজে আপনি হাত দিয়েছেন, তা আপনি সমাপ্ত করতে পারবেন। যদি পারেন, তাহলে এর থেকে যে বার্ষিক আয় হবে, তার একটা অংশ দিয়ে আপনি সেই ঋণ শোধ করে দিতে পারবেন, এবং বাকীটা দিয়ে এখনকার জনকল্যাণকর কাজগুলিকে চালু রাখা যাবে। সরকারের কাছ থেকে যে ঋণ আপনি নিয়েছেন, আমাদের হিসেবে তার পরিমাণ হচ্ছে পঞ্চাশ লক্ষ ডলার। তা এই ভিত্তিতে পঞ্চাশ কোটি ডলার নিয়ে যদি কেউ এ-দেশে কিংবা উন্নয়নশীল যে-কোনও দেশে এমন একশোটা ইউনিট গড়ে তুলতে পারে, তবে আমি, ব্রুস্টার, বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সেই পঞ্চাশ কোটি ডলার ঋণদানের প্রস্তাব সমর্থন করব। আমি দয়া-দাক্ষিণ্যে বিশ্বাস করি না। ও-সব জিনিসকে আমি অর্থহীন বলে গণ্য করি।"

সেনেটর ব্রুস্টার অতঃপর দিল্লিতে ফিরে গেলেন; এবং রাষ্ট্রদূত দেখে বিস্মিত হলেন যে, একদিন ফরিদাবাদে কাটিয়েই তাঁর মনের ভাব একেবারে পালটে গেছে। যিনি বিদ্রূপ করতে এসেছিলেন, তিনি অনুরাগী হয়ে উঠলেন। সেনেটর ব্রুস্টার স্বদেশে ফিরে গেলেন, এবং ওয়াশিংটনে গিয়ে সেনেটের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কমিটীর সদস্যদের বললেন যে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই ধরনের আত্মনির্ভর উন্নয়ন-কর্মের কীভাবে ব্যাপক বিস্তার ঘটানো যায় তা নিয়ে ঘরোয়াভাবে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য আমাকে ওয়াশিংটনে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। অতঃপর মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সহায়তায় ১৯৫২ সনের এপ্রিল মাসে তাঁরা আমাকে যুক্তরাষ্ট্রে আমন্ত্রণ জানাবার ব্যবস্থা করলেন। ঠিক হল, সেখানে গিয়ে আমি কৃষি-উন্নয়নের আধুনিক ব্যবস্থা এবং টেনেসি ভ্যালি সংস্থা ইত্যাদির কাজ দেখব, এবং ওয়াশিংটনে সেনেটের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কমিটীর সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।

কিন্তু শ্রীনেহরু এতে অসন্তুষ্ট হলেন। এমন নয় যে, মার্কিন সাহায্য গ্রহণে তাঁর আপত্তি ছিল। তা নয়। ভারতবর্ষের উন্নয়নের জন্য যে প্রভূত মার্কিন সাহায্য দরকার, তা তিনি জানতেন। কিন্তু তাঁর সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনও ভারতীয় ভারতকে সাহায্যদানে আমেরিকানদের উৎসাহিত করবার জন্য কোনওপ্রকারে চেষ্টা করুক, এটা তিনি চাইতেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজে থেকে এগিয়ে এসে যদি সাহায্যের প্রস্তাব করে, তবে ভারত সরকার তা গ্রহণ করবেন, এই পর্যন্ত। তার জন্য তিনি ধন্যবাদ জানাতেও রাজী ছিলেন। ভারতে মার্কিন সাহায্য দানের ব্যাপারে আমেরিকান ও ভারতীয়রা যে কেন পরস্পরের সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কের মতন কথা বলতে পারেন না, তা কখনও আমার বোধগম্য হয়নি। সরকারীভাবে ভারতের বক্তব্য এই যে, ভারত সরকার কখনও মার্কিন সাহায্য প্রার্থনা করেন না; এবং সরকারীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য এই যে, ভারত সরকার যতক্ষণ না সরকারীভাবে সাহায্য চাইছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ভারতবর্ষকে এক ডলার দেওয়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে বে-আইনী ব্যাপার। অথচ এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে, তার পরিমাণ দুশো কোটি ডলারের উপরে। এ এক মজার খেলা। আমেরিকান ও ভারতীয়রা পরস্পরের সঙ্গে এই খেলা খেলে থাকেন।

যাই হোক, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র আমাকে আমন্ত্রণ করায় এবং সেই আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করায় ফল হল এই যে, ফরিদাবাদ প্রকল্প বিনষ্ট হল। ইতিপূর্বেই আমি বেশ কিছু সংখ্যক ক্ষমতাশালী আমলা এবং বাস্তুহারা দপ্তরের মন্ত্রী-মহোদয়ের অপ্রীতিভাজন হয়েছিলাম। মন্ত্রিত্বের চাইতেও যেন ফরিদাবাদ পরিকল্পনার মহিমা আরও বেশী বলে তখন প্রতিভাত হচ্ছিল। তিনি আমাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু পারছিলেন না। এবারে আমি মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবার সিদ্ধান্ত করায় মন্ত্রী-মহোদয় এবং আমলারা তাঁদের সুযোগ পেয়ে গেলেন। এই আমন্ত্রণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শ্রীনেহরুর সংশয়টা আমার ভাল লাগেনি। সে-কথা আমি জানিয়েছিলামও। তার ফলে শ্রীনেহরুর সঙ্গে আমার কিছু কথা-কাটাকাটি হল, এবং শেষপর্যন্ত তিনি আমাকে জানালেন যে, একমাত্র বেসরকারী ব্যক্তি হিসেবেই এই ধরনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আমি মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে যেতে পারি; সেক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক থাকা চলবে না। (পরবর্তী কালে অবশ্য এই ধরনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে শত শত সরকারী কর্মচারী মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছেন।) ঝোঁকের মাথায় আমি আমার কাজে ইস্তফা দিলাম, এবং বেসরকারী ব্যক্তি হিসেবে ১৯৫২ সনের ১৮ই এপ্রিল তারিখে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে গেলাম। সে-যাত্রায় শুধু ওয়াশিংটনে নয়, মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু জায়গায় বহু বৃত্তির বহু বিশিষ্ট মানুষের সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্র, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ—নানান সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল আমার। এবং মারকিন জনমতের উপরে এই সফর যে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল, তাতেও সন্দেহ নেই। ১৯৫২ সনের ১৩ই মে তারিখে নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স পত্রিকায় যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, তার থেকেই সেটা বুঝতে পারা যাবে। সেই নিবন্ধটিকে এখানে তরজমা করে দেওয়া হল :

ভারতবর্ষের জন্য সাহায্য

"অন্যান্য দেশের জন্য ব্যয়বরাদ্দ, সাহায্য এবং ঋণের পরিমাণ নির্ধারণের সময় যখন উপস্থিত হয়, তখন চতুর্দিক থেকে কংগ্রেসকে এতই নিন্দা করা হতে থাকে যে, যেখনে সত্যিই প্রশংসা প্রাপ্য সেখানে প্রশংসা না-করাটা অন্যায় হবে। ভারতবর্ষের প্রসঙ্গে বলতে পারা যায় যে, দুটি পরিষদই এবং ব্যক্তিগতভাবে বহু কংগ্রেস-সদস্য এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলী সম্পর্কে এবং মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এ-ব্যাপারে যে ভূমিকা নিতে পারে সে সম্পর্কে সমীচীন সচেতনতার পরিচয় দিচ্ছেন। এই সহানুভূতি ও উপলব্ধির বাস্তব প্রয়োগ এখনও অবশ্য ঘটেনি, তবে কী করা দরকার এবং কেন তা করা দরকার, প্রশাসন-কর্তৃপক্ষ এবং এত বেশী সংখ্যক কংগ্রেস-সদস্য যখন তা বুঝতে পেরেছেন, তখন আশাবাদী হবার নিশ্চয়ই কারণ আছে।

বৃহত্তর বিচারে পশ্চিম আজ কমিউনিজম্‌-এর সেই চ্যালেন্‌জ্‌-এরই সম্মুখীন, চীনে যার মোকাবিলা করতে আমরা সবাই ব্যর্থ হয়েছিলাম। গত বুধবার ওভারসীজ প্রেস ক্লাবে পল জি. হফম্যান যে বক্তৃতা দেন, তাতে তিনি এই মর্মে মতপ্রকাশ করেছেন

যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর মারকিন যুক্তরাষ্ট্র চীনে শুধু অস্ত্রশস্ত্র-বাবদেই তো বহু বিলিয়ন ডলার খরচ করেছিল, তার বদলে সেখানকার গ্রামাঞ্চলের সাহায্য বাবদে যদি এক বিলিয়ন ডলার খরচ করা হত, চীনকে তাহলে হয়ত রক্ষা করা যেত।

ভারতবর্ষকে সাহায্য করবার সময় এখনই। এবং সেই সাহায্যের স্থান হচ্ছে গ্রামাঞ্চল। ফরিদাবাদ-প্রকল্পের চাঞ্চল্যকর সাফল্য সম্পর্কে এই পত্রিকায় গতকাল একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে; এই ধরনের গ্রামোন্নয়ন-প্রকল্পের জন্যই সাহায্য দেওয়া দরকার। তরুণ গান্ধীবাদী সুধীর ঘোষ এখন যুক্তরাষ্ট্রে; তিনি তাঁর প্রকল্পের কথা সবাইকে ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, অল্প-কিছু সাহায্য এবং ভারতীয়দের কঠিন পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাস—এই দুইয়ের সমন্বয়ে পাঁচ-ছ বছরের মধ্যেই গ্রামীণ ভারতবর্ষের চেহারা পালটে দেওয়া যেতে পারে।

পারস্পরিক নিরাপত্তা আইনের বিলটি এখন বিবেচনাধীন; কংগ্রেস এতে ভারতবর্ষের জন্য সাড়ে এগারো কোটি ডলার সাহায্য বরাদ্দ করছে। এই অংকটা বরাদ্দ করবার প্রয়োজন এতই বেশী যে, শতকরা বারো ভাগ ছাঁটাইয়ের যে প্রস্তাব করা হয়েছে, এক্ষেত্রে সেটা প্রয়োগ করা ঠিক হবে না। পক্ষান্তরে খাদ্যশস্য বাবদ এ-বছরে বাড়তি আরও সাড়ে বারো কোটি ডলার বরাদ্দ করবার গুরুত্ব আরও অনেক বেশী। একটানা খরার দরুন দক্ষিণ ভারতে—কমিউনিজম যেখানে সবচাইতে বেশী প্রসার লাভ করেছে—আবার দুর্ভিক্ষের আশংকা দেখা দিয়েছে। এখান থেকে যদি কয়েক মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য সেখানে পাঠানো হয়, তাহলে এই বছরের মতন জনসাধারণ সেখানে সংকট উত্তীর্ণ হতে পারবে। আবার তার বিক্রয়লব্ধ টাকা দেওয়া যাবে গ্রামীণ উন্নয়নের কাজে।

এই হচ্ছে পরবর্তী লক্ষ্য। কংগ্রেসের অধিবেশন জুন মাসে মুলতুবী হবে; তার আগেই এই খাদ্যশস্যের জন্য একটি বিশেষ বিল পাশ করা দরকার। সরকার নিশ্চয়ই অনুরূপ ব্যবস্থাকে সমর্থনই করবেন। এই ধরনের সমীচীন স্বার্থবোধ ও আদর্শবাদই যুদ্ধের পরবর্তী কালে সঠিক ইতিহাস রচনা করেছে, এবং এতে লাভও হয়েছে।"

আমার চেষ্টা অবশ্যই এই রকমের একটা জনমত গড়ে তুলতে সহায়তা করেছিল, যা ভারতকে সাহায্যদানের অনুকূল। মারকিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাহায্য বাবদে প্রথমে পাঁচ কোটি ডলার ভারতবর্ষ লাভ করল। কিন্তু ১৯৫২ সনের জুন মাসে ভারতবর্ষে ফিরে দেখলাম যে, ফরিদাবাদের উপরে এবং আমার নিজের জীবনে এর ফল হয়েছে মারাত্মক। আমার উপর থেকে শ্রীনেহরুর স্নেহচ্ছায়া অপসৃত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই ফরিদাবাদ ধসে পড়ল। ফরিদাবাদের হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে দেবার জন্যে বোমবাই থেকে আমদানি করা হল একজন পাকা আমলাকে। কীরকম কার্যকরভাবে যে ফরিদাবাদকে 'লিকুইডেট' করা হল, নীচের সংক্ষিপ্ত হিসেব থেকেই তা বুঝতে পারা যাবে :

ব্যয়ের চূড়ান্ত হিসাব ও ফরিদাবাদ বোর্ডকে প্রদত্ত ঋণের লিকুইডেশন

ব্যয়ের খাত	প্রাথমিক হিসাব	চূড়ান্ত হিসাব
(১) জরিপ, সীমা নির্ধারণ ও জমি দখল	১৫,৬৫,০০০	৩২,০২,০০০
(২) গৃহনির্মাণ	১,০৮,০০,০০০	১,২৩,৭৪,০০০
(৩) বিদ্যুৎ (উৎপাদন ও বণ্টন)	২৩,৬৮,০০০	৫২,৫৫,০০০
(৪) রাস্তাঘাট ও বৃক্ষ রোপণ	৯,২৫,০০০	১৬,৩৪,০০০
(৫) জল সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালী	৩৫,০২,০০০	৩৭,২৫,০০০
(৬) অস্থায়ী দপ্তর ও অন্যান্য কাজের জন্য নিসেন চালা	৩,৩০,০০০	৬,৬০,০০০
(৭) দপ্তরের পরিচালন ব্যয় ও অন্যান্য সম্ভাব্য ব্যয়	৯,৯৫,০০০	১৪,৬৩,০০০
(৮) শ্রমিকদের ইনসেনটিভ বোনাস (সাহায্যস্বরূপ)	১৪,০০,০০০	১৬,০০,০০০
(৯) রেলওয়ে সাইডিং ও লেভেল ক্রসিং	৩,৬৫,০০০	১১,৪৫,০০০
(১০) কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র	১৫,৪৭,০০০	৪১,৬১,০০০
(১১) যন্ত্রপাতি	১,১৫,০০০	২,৪৭,০০০
(১২) গৃহের জন্য জমির উন্নয়ন (উদ্বাস্তুদের বাড়ি ছাড়া অন্যান্য)	...	১,৬৯,০০০
(১৩) সমবায়-সংস্থাকে ঋণ	১৪,৫০,০০০	২৪,০০,০০০
(১৪) স্টক সাসপেন্স্	...	১৬,০০,০০০
(১৫) অব্যবহৃত জমির উন্নয়ন	...	৫,৮৩,০০০
(১৬) অপ্রত্যাশিত ব্যয়	...	৫০,০০০
(১৭) অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র	...	৩,০০,০০০
মোট	২,৫৪,৫১,০০০	৪,০৬,২৮,০০০

ঋণ হিসাবে প্রদত্ত ৪,০৬,২৮,০০০৲ টাকার লিকুইডেশন

(ক)	সরকারকে পরিশোধ (পাকিস্তানে পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে উত্থাপিত দাবির সঙ্গে যে-অঙ্ক অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে তৎসহ)	২,৫৬,৮৪,০০০
(খ)	সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রাপ্য (পাঞ্জাব রাজ্য সরকারকে যে পাওয়ার হাউসটি বিক্রি [অংশত প্রদত্ত] করা হয়েছে ও বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ যে ডিজেল ইনজিন প্ল্যান্ট ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি বিক্রি করা হয়েছে, তার বাবদে)	৩৯,২২,০০০
(গ)	সরকারী সাহায্য হিসাবে যে-অঙ্ক প্রদর্শন করা হয়েছে (রাস্তা ও পয়ঃপ্রণালী, জল-সরবরাহ ব্যবস্থা, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, পাওয়ার হাউস [অংশত বিনামূল্যে প্রদত্ত], অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র, কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদি। পাঞ্জাব সরকারের কাছে হস্তান্তরিত)	১,১০,২২,০০০
	মোট :	৪,০৬,২৮,০০০

বাস্তুহারারা পাকিস্তানে যে ঘরবাড়ি ও জমিজমা ফেলে রেখে চলে এসেছিলেন, তার জন্য তাঁদের অনেকেই সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারী ছিলেন। সরকার এই বাড়িগুলি তাঁদের দিয়ে বাড়ির দামটাকে তাঁদের প্রাপ্যের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট্ করে নেন। প্রতিটি বাড়ির দাম ধরা হয় পাঁচ হাজার টাকা। (প্রাপকদের তাতে ক্ষতি হয়নি; ও-বাড়ির দাম নিশ্চয়ই পাঁচ হাজার টাকা ধরা যেতে পারে।) বাড়িপিছু নির্মাণব্যয় অবশ্য ১,৯৩৩৲ টাকা পড়েছিল। সরকারী বিদ্যুৎ-উৎপাদন প্ল্যান্টটি অংশত বিনামূল্যে ও অংশত মূল্যের বিনিময়ে পাঞ্জাব রাজ্য সরকারকে দেওয়া হয়। সমষ্টি-প্রকল্পের ডিজেল ইনজিন কারখানাটি বিক্রি করা হয় এক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে। হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিদ্যালয়-ভবন, জল-সরবরাহ ব্যবস্থা—এসবই পাঞ্জাব রাজ্য সরকারকে বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ফরিদাবাদ জায়গাটি পাঞ্জাবের মধ্যেই পড়ে। ৪,০৬,২৮,০০০ টাকার ঋণকে সামগ্রিকভাবে এইভাবে 'লিকুইডেট' করবার পরে (এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, বাস্তুহারাদের শুধু খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তিন বছরে সরকারের ব্যয় হত মোট ৪,৩২,০০,০০০ টাকা) ভারত সরকারের হাতে আরও আড়াই হাজার বাড়ি (যে-সব বাস্তুহারা ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারী ছিলেন না, এগুলি তাঁদের দেওয়া হয়) ও আড়াই শো একর অব্যবহৃত জমি রয়ে গেল। শুধু তারই দাম আড়াই লক্ষ টাকার উপরে।

পিছনে তাকিয়ে মাঝে-মাঝে আমি ভাবি যে, আমেরিকানদের সম্পর্কে যে উৎসাহ আমি দেখিয়েছিলাম, তার সত্যিই কোনও প্রয়োজন ছিল কিনা। ভারতবর্ষের বৈষয়িক উন্নয়নে মার্কিন আগ্রহ অবশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এবং অনাগ্রহের অবসান ঘটাতে আমার চেষ্টাতেও যে কিছুটা কাজ হয়েছিল, তাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু চোদ্দ বছর বাদে আজ পিছনে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছে যে,

আমেরিকানদের সম্পর্কে শ্রীনেহরুর সন্দেহ যতই অযৌক্তিক হোক, এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়াটাই আমার ভুল হয়েছিল। তার কারণ, মারকিন সাহায্যের গুরুত্বকে অস্বীকার না-করেও বলা যায় যে, আমার কাছে ফরিদাবাদ-প্রকল্পই ছিল অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার; তাকে সফল করে তোলাই আমার উচিত ছিল। আর তা ছাড়া শ্রীনেহরুর এই কথাটাও সম্ভবত ঠিকই যে, আমেরিকা থেকে অর্থনৈতিক ও কারিগরী সাহায্য পাবার জন্য ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে পীড়াপীড়ি করবার কোনও দরকার নেই; পীড়াপীড়ি ছাড়াই তা পাওয়া যাবে। আমার সিদ্ধান্তে শ্রীনেহরু খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন। সমষ্টি-উন্নয়ন প্রকল্পের একজন পথিকৃৎ হিসেবে আমি খুবই প্রশংসা পাচ্ছিলাম। সেই প্রশংসার মায়া ত্যাগ করে যে আমি পদত্যাগ করে বসব, তা তিনি ভাবতে পারেননি। আর আমি ভাবতে পারিনি যে, তাঁর ক্রোধ এতদিন স্থায়ী হবে। আমি ভেবেছিলাম, মাস দুয়েক বাদে আমি যখন দেশে ফিরব, তখন আবার তিনি আমাকে ফরিদাবাদের কাজে ব্রতী হতে দিয়ে কাজটা শেষ করবার সুযোগ দেবেন। কিন্তু তা না-দিয়ে তিনি যে বরং ফরিদাবাদ প্রকল্পকে (যার জন্য তিনি প্রচুর সময় দিতেন, এবং যার প্রতি তাঁর গভীর মমতা ছিল) ভাসিয়ে দিতেও প্রস্তুত আছেন, এতটা আমার কল্পনায় ছিল না। শ্রীনেহরু ছিলেন একজন অসাধারণ মহদাশয় মানুষ; কিন্তু কোনও-কিছুই তিনি ভুলে যেতেন না। মানুষমাত্রেই তো নানা ধাতুর সমাবেশে গড়া। তিনিও তার ব্যতিক্রম নন।

তিন-তিনটে বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে কোনও কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। কী করে হবে। সবাই জেনে গিয়েছিলেন যে, কর্তা আমার উপরে অপ্রসন্ন। অগত্যা কী আর করা, সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের কাজ নিয়ে, সমষ্টি-উন্নয়ন 'বিশেষজ্ঞ' হিসেবে, আমি দক্ষিণ আমেরিকায় চলে গেলাম। তা ছাড়া আরও পাঁচ-রকমের কাজ তখন আমি করেছি। ১৯৫৪ সনে জাপানী শান্তিবাদীদের আমন্ত্রণে টোকিওয় অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তিবাদী সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য আমি জাপান যাই। দক্ষিণে কিয়ুশু দ্বীপ থেকে উত্তরে হোক্কাইডো পর্যন্ত সমগ্র জাপান জুড়ে কীভাবে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ চলছে, তা দেখবার সুযোগ তখন হয়েছিল। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে সেনেটর হিউবার্ট হামফ্রি (বর্তমানে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেনট) ও মারকিন সেনেটের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কমিটীর অন্যান্য কয়েকজন সদস্যের আমন্ত্রণে আমি ওয়াশিংটনে যাই। ১৯৫২ সনে তাঁদের সঙ্গে যে সাক্ষাৎ হয়েছিল আমার, তাতে আমার সম্পর্কে তাঁদের চিত্তে একটা আস্থার ভাব সঞ্চারিত হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে বুঝতে পারলাম যে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মারকিন অর্থ বণ্টনের ব্যাপারে আমেরিকার কংগ্রেস-সদস্যদের মধ্যে একটা অনিচ্ছার ভাবই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এমন নয় যে, তাঁরা অত্যধিক কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশী। আসলে, এই বাপারটা দেখে তাঁরা নিরুৎসাহিত বোধ করছিলেন যে, ভারতবর্ষসমেত উন্নয়নশীল সকল দেশই মারকিন অর্থসাহায্য পাবার জন্য ব্যগ্র বটে, কিন্তু তাদের কেউই এই সাহায্যকে কাজে লাগাবার এমন কোনও পন্থা উদ্ভাবন করতে পারেনি, তাদের সমস্যা যাতে মিটতে পারে। এ-বিষয়ে আমার কি কিছু বলবার আছে? আমি কি তাঁদের কোনও পরামর্শ দিতে পারব?

বললাম, তাঁদের এই বৃহৎ প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমার জানা নেই; শুধু চারটি প্রকল্পকে রূপায়িত করলেই আমি খুশী হব। একটি ল্যাটিন আমেরিকায়, একটি আফরিকায়, আর দুটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। বিশেষ করে ভিয়েতনাম-লাওস-

কামবোডিয়ায়। এই প্রকল্প হবে বহুসংখ্যক গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নের জন্য। এর মূলধন এর কাজের মধ্যে থেকেই উঠে আসবে, এবং একবার চালু করে দিলে আপনা থেকেই এই প্রকল্পের কাজ চালু থাকতে পারবে। পরীক্ষামূলকভাবে এই রকমের চারটি প্রকল্প রূপায়ণের জন্য কি তাঁরা রাষ্ট্রপুঞ্জের কারিগরী সাহায্য পরিষদকে আরও দু কোটি ডলার সাহায্য দিতে রাজী আছেন? কারিগরী সাহায্য পরিষদ এই অর্থকে একটা অক্ষয় তহবিল হিসাবে কাজে লাগাবেন। প্রকল্পগুলিকে এই তহবিল থেকেই মূলধনী ঋণ জোগাবেন তাঁরা; সেই মূলধনকে এমনভাবে বিনিয়োগ করতে হবে যাতে সমষ্টি-প্রকল্পগুলি তাদের জমি ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে সম্পদ তো বৃদ্ধি করতে পারবেই, উপরন্তু ঋণ-হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ সামান্য সুদসহ কিংবা বিনা-সুদে আবার কেন্দ্রীয় তহবিলে ধীরে-ধীরে ফিরিয়ে দিতে পারবে; তহবিল তার ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না, এবং একই তহবিলের অর্থকে বারবার কাজে লাগানো যাবে। আমার বক্তব্য তাঁরা শুনলেন। কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জের কারিগরী সাহায্য পরিষদ যে প্রদত্ত অর্থকে এইভাবে কাজে লাগাতে পারবেন, এতটা আশান্বিত তাঁরা হলেন না। তাঁরা বললেন যে, জাতীয় আমলাতন্ত্রের চাইতে আন্তর্জাতিক আমলাতন্ত্র আরও অকর্মণ্য। রাষ্ট্রপুঞ্জের কারিগরী সাহায্য তহবিলে তখন বছরে মাত্র ছ কোটি ডলার সংগৃহীত হত। তার শতকরা ষাট ভাগ দিত মারকিন যুক্তরাষ্ট্র। উন্নয়নশীল দেশ-গুলির মধ্যে সেই ছ কোটি ডলার টুকরো-টুকরো করে বণ্টন করা হত। রাষ্ট্রপুঞ্জের ছাপ থাকায় এই তহবিলের একটা মহিমা ছিল বটে, কিন্তু তাঁদের কারিগরী সাহায্য পরিকল্পনা ছিল এতই ত্রুটিযুক্ত যে, বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থার রোগ-নিবারক গুটিকয় প্রকল্প ছাড়া, অন্যান্য কোনও প্রকল্পই কোথাও স্থায়ী কোনও রেখাপাত করতে পারেনি। সে যাই হোক, আমি বললাম যে, দান করা ভাল, কিন্তু দাতা হিসেবে নিজেকে জাহির করা ভাল নয়। মারকিন বন্ধুদের এই সহজ সত্যটা উপলব্ধি করা দরকার।

দেখে বিস্মিত হলাম, মারকিন সেনেটের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কমিটী প্রকল্পের প্রস্তাবে একমত তো হলেনই, উপরন্তু ১৯৫৩ সনের পারস্পরিক নিরাপত্তা আইন সম্পর্কে তাঁরা যে রিপোর্ট দিলেন, তার একটি অনুচ্ছেদে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট্‌কে অনুরোধ জানানো হল যে, চারটি প্রকল্পকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের কারিগরী সাহায্য তহবিলে (স্বাভাবিকভাবে যে-অর্থ দেওয়া হয়, তা ছাড়াও) যেন বাড়তি আরও দু কোটি ডলার দেওয়া হয়। এই প্রকল্প-চতুষ্টয়ের কথা আমিই তাঁদের কাছে বলেছিলাম। সেনেটর আলেকজানডার স্মিথ এই প্রস্তাবের উদ্যোক্তা। এ-বিষয়ে তিনি আমাকে এই চিঠি লিখলেন :

মারকিন যুক্তরাষ্ট্র সেনেটের
পররাষ্ট্র সম্পর্কীয় কমিটী
১৮ই জুন, ১৯৫৩

"প্রিয় মিঃ ঘোষ,

আপনার প্রস্তাবিত স্বনির্ভর গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কমিটী কী ব্যবস্থা নিয়েছেন, ইতিমধ্যে তা আপনি জেনেছেন।

আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ আশা করেছিলেন যে, আইনের মধ্যেই এই প্রকল্প-গর্লির একটা বিশেষ উল্লেখ রাখার ব্যবস্থা হবে, তবে আমার ধারণা, ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণরূপে পারস্পরিক নিরাপত্তা অ্যাডমিনিসট্রেটরের হাতে ছেড়ে দেবার এবং কমিটীর রিপোর্টে সাধারণভাবে এই সামগ্রিক প্রকল্পের উল্লেখ করবার সিদ্ধান্তটাই সমীচীন হয়েছে। এর ফলে, আপনি যে ধরনের পরীক্ষায় উৎসাহী, অ্যাডমিনিসট্রেটর সেই ধরনের কিছু পরীক্ষায় হাত দিতে পারবেন, এর একটা কার্যসূচী স্থির করে নেওয়া যাবে বলে আমি আশা করি।

প্রীতিপাশে আবদ্ধ
এইচ. আলেকজানডার স্মিথ"

কিন্তু এর ফল হল এই যে, মারকিন পররাষ্ট্র দপ্তরের আমলারা আমার উপরে চটে গেলেন। ক্ষমতাশালী এইসব মারকিন সেনেটরের মাথায় কি আমি কতকগুলি বদ খেয়াল ঢুকিয়ে দিচ্ছি না? এই প্রকল্পগুলি যদি সফল হয়, এবং তাঁদের রাজনৈতিক কর্তারা যদি রাষ্ট্রপুঞ্জের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে অর্থসাহায্য করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন, তাহলে মারকিন আমলা-মহলের রচিত অর্থদান-পরিকল্পনাগুলির অদৃষ্ট কী হবে? মারকিন আমলারা অর্থদাতার ভূমিকায় নিজেদের জাহির করতে বড়ই ভালবাসেন। বিচিত্র ব্যাপার এই যে, আমার 'অমিত্রসুলভ' কার্যকলাপে বিচলিত এই মারকিন আমলারা তাঁদের ভারতীয় দোসরদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। (এক বছর আগেই কিন্তু আমার কার্যকলাপকে তাঁরা মিত্র-সুলভ বলে মনে করেছিলেন; তার কারণ ভারতবর্ষকে আরও অর্থসাহায্য দেবার জন্য তাঁদের রাজনৈতিক কর্তাদের তখন আমি অনুরোধ করেছি; আমলারা তাতে এইজন্য খুশী হয়েছিলেন যে, এর ফলে তাঁরা দাতা সাজতে পারবেন।) রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতবর্ষের স্থায়ী প্রতিনিধি একজন অসামান্য যোগ্যতাসম্পন্ন সিভিল সারভ্যান্ট; তিনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটেন। নিউ ইয়র্কে তিনি আমাকে বললেন, "এ তুমি কী করছ সুধীর? মারকিন সেনেটররা যদি রাষ্ট্রপুঞ্জকে এইভাবে সাহায্য দিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন, তাহলে আর একটি কানাকড়িও তাঁদের কাছে আমরা পাব না। কথাটা বুঝতে পারছ?"

ভারত-মারকিন সম্পর্কের এই একটি কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার যে, ভারত সরকারের আমলারা যে শুধুই মারকিন অর্থ-সাহায্য চান, তা নয়, সেই সাহায্যকে তাঁরা সরাসরি মারকিন আমলাদের কাছ থেকেই পেতে চান। আমেরিকার অর্থ রাষ্ট্রপুঞ্জের মারফতে আসবে এটা তাঁরা পছন্দ করেন না। তার কারণ, মারকিন আমলাদের বলা চলে, "দূরে থাকো।" সাহায্যের টাকাটা কীভাবে খরচা করা হচ্ছে, মারকিন আমলারাও সে-ব্যাপারে নাক গলাতে সাহসী হন না। কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জের মারফতে সাহায্য এলে তো সেই স্বাধীনতা থাকবে না। রাষ্ট্রপুঞ্জ দাবি করতে পারেন যে, ব্যয়ের ব্যাপারে তাঁদেরও একটা ভূমিকা থাকা চাই। প্রাপ্ত সাহায্য কীভাবে ব্যয় করা হচ্ছে, সেটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে বিশ্বব্যাংক থেকে কি প্রতি শীতকালে একদল অফিসারকে এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয় না? তাঁরা এসে কি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন না যে, সাহায্যের টাকাটা কীভাবে বিনিয়োগ করা হল, কতটা সাহায্য অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রইল, এবং তার কারণ কী? সে এক

মহা ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। তার চাইতে সরাসরি সাহায্য পাওয়া ভাল। মারকিন আমলাদের সেক্ষেত্রে স্পষ্ট বলে দেওয়া যায় যে, এ-সব ব্যাপারে তাঁরা যেন নাক গলাতে না আসেন। নাক গলাতে তাঁরা সাহসও পান না। দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে সরাসরি অর্থসাহায্যের ব্যবস্থায় অতএব দাতা আর গ্রহীতা দুই পক্ষেরই স্বার্থ রয়েছে। মারকিন পররাষ্ট্র দপ্তরের আমলারা যে আমার উপরে খেপে গেলেন, তাতে তাই বিস্ময়ের কিছু নেই!

মারকিন জনমত কিন্তু আমার প্রস্তাবের অনুকূলতাই করেছে। ১৯৫৩ সনের ২৯শে অগস্ট, বহুলপ্রচারিত 'মিনিয়াপলিস স্টার' পত্রিকায় যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তা উৎসাহব্যঞ্জক। নিবন্ধটিকে এখানে তরজমা করে দেওয়া হল :

"মারকিন সমর্থন লাভের যোগ্য একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অর্থনৈতিক প্রগতি সাধনের জন্য (এবং ঠান্ডা লড়াইয়ে গণতান্ত্রিক দেশগুলি যাতে জয়লাভ করে তার জন্য) জনৈক তরুণ ভারতীয় একটি পরিকল্পনা দিয়েছেন। পূর্বে ইনি গান্ধীজীর একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। তাঁর এই পরিকল্পনাটি পরিপূর্ণভাবে পরখ করে দেখা দরকার। জনসাধারণের আয় যেখানে অত্যন্ত কম, সেইসব অঞ্চলে—যথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, মধ্যপ্রাচ্যে, আফরিকায় আর ল্যাটিন আমেরিকায়—তিনি সমষ্টি-উন্নয়নের জন্য পরীক্ষামূলক-ভাবে কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প নিয়ে কাজ শুরু করার পক্ষপাতী।

পরিকল্পনার উদ্ভাবক সুধীর ঘোষ প্রমাণ পেয়েছেন যে, এই ধরনের প্রকল্প ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। তিন বছর আগে ভারতবর্ষের ফরিদাবাদ শহরের জন্য তিনি একটি উন্নয়ন-প্রকল্প গড়ে তোলেন। তার অগ্রগতি খুবই উল্লেখযোগ্য। নয়াদিল্লির দক্ষিণে ফরিদাবাদ হচ্ছে তিরিশ হাজার উদ্বাস্তুর এক শিবির-শহর। প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে ঘোষ বলেন যে, বাস্তুহারাদের শুধুই দাক্ষিণ্য-বাবদে টাকা না-দিয়ে টাকাটা এমনভাবে ব্যয় করা দরকার যাতে তারা স্বনির্ভর হতে পারে।

ভারত সরকারের কাছ থেকে তিনি পঞ্চাশ লক্ষ ডলার পরিমাণ টাকা ঋণ নেন। সেই টাকায় ঘরবাড়ি, বিদ্যালয়, হাসপাতাল আর কারখানা গড়া হয়েছে। সমষ্টি-প্রকল্প সেই ঋণ ইতিমধ্যে শোধ করতেও শুরু করেছে। পরবর্তী পর্যায়ে, চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকায় শস্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য, জল-সরবরাহ-ব্যবস্থার উন্নয়নকর্মে হাত দেওয়া হবে।

ঘোষ চান যে, মারকিন সেনেট এই ধরনের প্রকল্পের জন্য পারস্পরিক নিরাপত্তা সংস্থার তহবিল থেকে কিছু অর্থ বরাদ্দ করুন। তাঁর এই পরিকল্পনায় কয়েকজন সেনেটর আগ্রহ দেখিয়েছেন। আইওয়ার সেনেটর হিকেনলুপার ও জিলেট এ-ব্যাপারে খুবই উৎসাহী। হিকেনলুপার ও জিলেট দুজনেই গত বছর ভারত-সফরে গিয়েছিলেন; ফরিদাবাদের অগ্রগতি তাঁরা দেখে এসেছেন।

ঘোষের পরিকল্পনা এই যে, বিনিয়োগের অর্থ রাষ্ট্রপুঞ্জের কারিগরী সাহায্য পরিষদের মারফতে বণ্টন করতে হবে। বিভিন্ন জনসমষ্টির জন্য প্রায়-স্বাধীন বোর্ড গঠন করা হবে, এবং প্রকল্পের পরিচালন-ভার থাকবে সেই বোর্ডের হাতে। প্রতিটি

বোর্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং প্রকল্পের কাজ যেখানে চলবে সেই দেশের সরকারের প্রতিনিধিকে গ্রহণ করতে হবে।

আমেরিকার কারিগরী সাহায্য পরিকল্পনার (পয়েন্ট্ ফোর) কাজ শ্লথ গতিতে এগোচ্ছে। তার প্রধান কারণ, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যে শিল্পকৌশল সফল হবার সম্ভাবনা, তার সন্ধান সহজে মিলছে না। পয়েন্ট ফোর-এর কর্তারা মোটামুটি মার্কিন পদ্ধতি বিশেষত ফেডারেল-স্টেট সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় অবলম্বিত পদ্ধতি অনুযায়ী অন্যান্য জায়গায় কাজ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বহু স্থানেই এই পদ্ধতিতে কাজ করে সুফল পাওয়া যায়নি।

সাধারণ সম্প্রসারণ-পদ্ধতিতে বণ্টিত এই বৈদেশিক কারিগরী সাহায্যের পরিমাণ কোথাও-কোথাও এতই কম যে, স্থানীয় মানুষরা তার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হয়নি। ঘোষ-পরিকল্পনার গুণ এই যে, প্রয়োগ করলে এতে দ্রুত ফল পাওয়া যাবে, এবং অন্যান্য জন-সমষ্টি তাতে উৎসাহিত হবে।

অতিরিক্ত মূলধন-বিনিয়োগের ব্যবস্থা না রেখে শুধুই কারিগরী সাহায্য দিলে তাতে কাজ খুবই শ্লথগতিতে এগোয়। ঘোষ-পরিকল্পনায় এমন একটা পথের সন্ধান দেওয়া হয়েছে, যাতে শিক্ষার সঙ্গে নূতন মূলধন প্রয়োগের ব্যবস্থা সমন্বিত; পরন্তু একে 'সাম্রাজ্যবাদী শোষণ'ও বলা চলবে না।'

রাষ্ট্রপুঞ্জের মাধ্যমে এই কার্যসূচীকে রূপায়িত করা হলে এই অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হবে। 'ঔপনিবেশিকতাবাদ'-এর বিরুদ্ধে মনোভাব খুবই প্রবল। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বৈষয়িক উন্নয়নের কাজ চালাবার পথে সেটা একটা বৃহৎ বাধা। কমিউনিস্ট্ প্রচারকার্যের এতে খুবই সুবিধে হয়। এই কারণেই ঘোষের পরিকল্পনার আবেদন এত শক্তিশালী। এ-পরিকল্পনা একজন ভারতীয়ের পরিকল্পনা; রাষ্ট্রপুঞ্জের মাধ্যমে এটি রূপায়িত হবে; সুতরাং 'ডলার সাম্রাজ্যবাদ'-এর দুর্নাম একে ভোগ করতে হবে না।

আমরা আশা করি, কংগ্রেস ও শাসন-কর্তৃপক্ষ, পরীক্ষামূলকভাবে, পারস্পরিক নিরাপত্তা সংস্থা তহবিলের কিছু অংশ ঘোষ-পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ করবেন। জাতীয় নিরাপত্তার জন্য কত রকম ভাবেই তো আমরা অর্থ বিনিয়োগ করছি; সেই তালিকায় এইটিই হয়ত শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ বলে প্রমাণিত হবে।"

যে-পরিকল্পনা আমার ছিল, বিহারের চম্পারণ জেলায় সেই অনুযায়ী যাতে আমাকে কাজ করতে দেওয়া হয়, রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তার জন্য শ্রীনেহরুকে অনুরোধ জানান। ১৯৫৩ সনের ২৭শে অগস্ট্ তারিখে শ্রীনেহরুকে তিনি একটি চিঠি লেখেন। চিঠিখানি এখানে উদ্ধৃত হল :

রাষ্ট্রপতি ভবন,
নয়াদিল্লি,
২৭শে অগস্ট্, ১৯৫৩

"প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

কিছুদিন আগে সুধীর ঘোষ আমার কাছে একটি পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। আমাদেরই একটি রাজ্যের এক গ্রামীণ জেলায় তিনি এই পরিকল্পনা অনুযায়ী

কাজ করতে চান। সেখানে শিল্প ও কৃষির সমন্বিত উন্নয়নই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। এতে আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছুটা উৎসাহ বোধ করেছি। গ্রামীণ জন-সমষ্টির উৎপাদন-ক্ষমতা ও জীবনমানের উন্নয়নসাধনের এই ব্যবস্থাকে যে স্বয়ংনির্ভর ও স্বয়ংজীবী করে তোলা যায়, হাতে-কলমে সেটা দেখিয়ে দেওয়াই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। ধরা যাক, আমরা একটা জেলায় পাঁচ শো গ্রাম নিয়ে এই কাজ শুরু করব। তার লোকসংখ্যা মোটামুটি পাঁচ লক্ষ, চাষের জমির আয়তনও মোটামুটি পাঁচ লক্ষ একর। বাইরে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে, এবং গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন ও নিবিড় কৃষি-ব্যবস্থার জন্য মূলধন সরবরাহ করে তিন-চার বছরের মধ্যেই সেখানে এমনভাবে সম্পদসৃষ্টির ব্যবস্থা করা যায়, যাতে সেই জনসমষ্টির বর্ধিত আয় থেকেই (রাজ্য সরকারের উপর নির্ভর না-করে) সেখানকার স্বাস্থ্য শিক্ষা ইত্যাদি জনকল্যাণকর কাজের ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হবে এবং এই উদ্দেশ্যে গঠিত তহবিলের মূলধনী ঋণও ধীরে-ধীরে পরিশোধ করা যাবে।

পাঁচশো গ্রামের একটি ইউনিটের জন্য সংগঠনের এই পরিকল্পনা করা হয়েছে :

(১) পাঁচ লক্ষ একর জমির জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জল যাতে পাওয়া যায় তার জন্য সমবায়-সংস্থা গঠন। এই সংস্থাগুলি খাল খনন ও টিউবওয়েল বসাবার ব্যবস্থা করবেন; কুয়ো থেকে জল তুলবার জন্য পাম্প্ বসাবেন, ও অন্যান্য ব্যবস্থা করবেন। অধিকাংশ অঞ্চলেই এখন বছরে একটিমাত্র ফসল পাওয়া যায়। জলের ব্যবস্থা হলে দুটি করে ফসল পাওয়া যাবে, ফসলের বৈচিত্র্যও বাড়ানো যাবে।

(২) ভাল বীজ ক্রয় ও বন্টন, এবং কয়েকটি বীজতলার ব্যবস্থা করে ভাল বীজ উৎপাদনের সমবায়-সংস্থা গঠন।

(৩) ছোট একটি কারখানায় সার উৎপাদন, এবং সার ক্রয় ও বন্টনের জন্য সমবায়-সংস্থা গঠন।

(৪) জেলার কয়েকটি কেন্দ্র-গ্রামে পশু-প্রজনন ফার্ম প্রতিষ্ঠা করে এবং আধুনিক পশুচিকিৎসা-বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুযায়ী গ্রামগুলির গো-সম্পদ উন্নয়নের জন্য সমবায়-সংস্থা গঠন।

(৫) উন্নত ধরনের কৃষি-যন্ত্রাদি নির্মাণের উদ্দেশ্যে এক অথবা একাধিক ছোট কারখানা স্থাপনের জন্য সমবায়-সংস্থা গঠন।

(৬) গ্রামের ছেলেদের কারিগরী শিক্ষা দেবার জন্য এক কিংবা একাধিক ছোট ইনজিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ স্থাপনের উদ্দেশ্যে সমবায়-সংস্থা গঠন।

(৭) আসবাবের কারখানা, কাঠের কারখানা, তাঁত, মৃৎশিল্পের কারখানা ইত্যাদি ছোট-ছোট গ্রামীণ শিল্পকে সংগঠিত করবার জন্য, এবং উদ্বৃত্ত কর্মীদের যাতে কাজ দেওয়া যায় এই উদ্দেশ্যে, যেখানে যেখানে সম্ভব, চিনিকল, রাসায়নিক কারখানা ও অন্যান্য কিছু বৃহৎ শিল্প সংগঠিত করবার জন্য সমবায়-সংস্থা গঠন।

(৮) উপযুক্ত এলাকায় বনাঞ্চল সৃষ্টির জন্য এবং এই উদ্দেশ্যে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের পরামর্শকে কাজে লাগাবার জন্য সমবায়-সংস্থা গঠন।

(৯) স্থানীয় মালমশলা কাজে লাগিয়ে গ্রামাঞ্চলে আরও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ঘরবাড়ি বানাবার জন্য সমবায়-সংস্থা গঠন।

(১০) একটি সাধারণ হাসপাতাল ও কয়েকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য রক্ষার সুব্যবস্থা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যসূচী অনুযায়ী ব্যাপকভাবে কাজ

চালাবার উদ্দেশ্যে গ্রামবাসীদের সমবায়-সংস্থা গঠন।

(১১) কয়েকটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও বৃত্তিশিক্ষা-বিদ্যালয় স্থাপন করে তার মাধ্যমে গ্রামের ছেলেমেয়েদের জন্য গ্রামের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করবার উদ্দেশ্যে গ্রামবাসীদের সমবায়-সংস্থা গঠন।

(১২) গ্রামজীবনে যা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, সেই লোকসংস্কৃতি—অর্থাৎ লোক-নৃত্য, লোকসংগীত, লোকনাট্য, লোকশিল্প ইত্যাদির সংরক্ষণ ও পুষ্টির জন্য সমবায়-সংস্থা গঠন।

কোন্ জেলায় কাজ শুরু হবে, সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর বিচক্ষণ শিল্পপতিদের সাহায্যে সহজেই স্থির করা যাবে যে, কী কী শিল্প সেখানে সংগঠিত হতে পারে। সুধীর ঘোষের ইচ্ছা, উত্তর বিহারে চম্পারণ জেলার একটি বৃহৎ অংশের উন্নয়ন-কার্যে তিনি হাত দেবেন। সেখানে কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন-সাধনের যথেষ্টই অবকাশ রয়েছে। সেখানকার স্থানীয় মানুষদের জীবন বেকার-সমস্যা ও অন্যান্য বহু সমস্যায় আজ পীড়িত। সেখানে যদি এইরকমের একটি প্রকল্প অনুযায়ী কাজে হাত দেওয়া হয়, তাহলে তারা খুবই উপকৃত হবে।

প্রকল্পের মূলধন কিংবা বার্ষিক পৌনঃপুনিক ব্যয়ভারের একাংশও কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা সংশ্লিষ্ট রাজ্য-সরকারকে দিতে হবে না। সুধীর ঘোষ আমাকে জানাচ্ছেন, প্রকল্পের জন্য যত মূলধনই দরকার হোক, রাষ্ট্রপুঞ্জের কারিগরী সাহায্য পরিষদই তা দেবার ব্যবস্থা করবেন। তাঁরা সে-অর্থ পাবেন মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সাহায্য তহবিল থেকে। তবে এই প্রকল্পের প্রয়োগ-ব্যবস্থায় তাই বলে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র আদৌ কোনও অংশ নেবে না। যে-এলাকায় প্রকল্পের কাজ হবে, সেখানে এই অর্থ দিয়ে একটি তহবিল সৃষ্টি করা হবে, এবং একটি ট্রাস্টের হাতে তার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে। ট্রাস্ট গঠিত হবে নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে :

(১) রাজ্য-সরকারের মনোনীত একজন সদস্য। তিনিই হবেন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান। (চেয়ারম্যান হিসেবে ডঃ সৈয়দ মামুদের নাম প্রস্তাব করা হচ্ছে।)
(২) উপযুক্ত একজন শিল্পপতি। রাজ্য-সরকারই তাঁকে মনোনীত করবেন।
(৩) রাষ্ট্রপুঞ্জের কারিগরী সাহায্য পরিষদের মনোনীত একজন সদস্য (ভারতীয়)।

এই ট্রাস্ট একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা হিসেবে কাজ করবেন। আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নয়, ব্যবসায়সুলভ পদ্ধতিতে প্রকল্প-রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় পন্থা উদ্ভাবনের স্বাধীনতা তাঁদের থাকবে। সংস্থাটির উপরে এই অর্থে রাজ্য-সরকারের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকবে যে, ট্রাস্টের সদস্যত্রয়ের মধ্যে দুজনই হবেন তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধি; স্বয়ংশাসিত এই সংস্থাটির কাজকর্ম যদি রাজ্য-সরকারের মনঃপূত না হয়, তাহলে তাঁদের মনোনীত সেই সদস্য দুজনকে রাজ্য-সরকার অপসারিতও করতে পারবেন। আর এই সংস্থার নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রপুঞ্জ কারিগরী সাহায্য পরিষদেরও অংশ থাকবে এই অর্থে যে, ট্রাস্টের সদস্যত্রয়ের একজন হবেন তাঁদেরই মনোনীত প্রতিনিধি, এবং তাঁরা তাঁকে অপসারিতও করতে পারবেন। তবে, এই সংস্থার দৈনন্দিন কাজকর্ম যাতে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে

মুক্ত থাকে, তার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। স্বয়ংশাসিত এই সংস্থা তাঁদের কাজের জন্য যে-সমস্ত লোক নিয়োগ করবেন, স্বভাবতই তাঁদের প্রায় সকলেই হবেন ভারতীয়; তবে অন্যান্য দেশ থেকেও কিছু-কিছু কর্মী, যথা স্ক্যানডিনেভিয়া ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে সমবায়-বিশেষজ্ঞদের, আনিয়ে নেওয়া হতে পারে।

দয়া-দাক্ষিণ্যের উপরে নির্ভর না করে, সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংনির্ভর ব্যবস্থায় যে একটি গ্রামীণ জেলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সম্ভব, হাতে-কলমে এটা প্রমাণ করা সম্ভব হলে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুশী হব। এমন প্রকল্পকে উৎসাহ দিতে কোনও আপত্তি হতে পারে বলে আমার মনে হয় না। এ-বিষয়ে আপনার কী মত?

আন্তরিকভাবে আপনার
রাজেন্দ্র প্রসাদ"

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু,
প্রধানমন্ত্রী।

এই প্রকল্প অনুযায়ী কাজ হলে তাতে ভারত সরকার কিংবা বিহার সরকারের এক কপর্দকও খরচা হত না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং বিহারের প্রাক্তন মন্ত্রী ও শ্রীনেহরুর ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের অন্যতম ডঃ সৈয়দ মামুদের সম্মিলিত প্রয়াস সত্ত্বেও শ্রীনেহরুর চিত্ত দ্রবীভূত হল না।

প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান সার ভি. টি. কৃষ্ণমাচারীকে এ-দেশে সমষ্টি-উন্নয়ন-পরিকল্পনার জনক বলা হয়ে থাকে। তিনি ছিলেন আমার বক্তব্যের ঘোর বিরোধী। তাঁর অভিমত ছিল এই যে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গ্রামীণ জনসমষ্টির এই ধরনের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন-প্রকল্প কখনও স্বয়ংনির্ভর হতে পারে না। পারে কি পারে না, বাস্তব পরীক্ষার সুযোগ দিয়ে তারই ফলাফলের ভিত্তিতে যে তার বিচার হওয়া উচিত,—এ-কথা তাঁকে বলে কোনও ফল হল না। যদি কাউকে বাস্তব পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হত, তবে তাতে ক্ষতিটা হত কী? তাঁর মনে কি এমন আশংকা ছিল যে, পরীক্ষাটা হয়ত সফলও হতে পারে? কর্তা আমার পক্ষে না বিপক্ষে, এই প্রশ্নটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৯৫২-৫৩ সনে সার্ ভি. টি. কৃষ্ণমাচারী তাঁর সমষ্টি-উন্নয়ন-পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই সেই বৈপ্লবিক পরিকল্পনা, ভারতবর্ষের সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামের চেহারা একেবারে পালটে দেওয়াই ছিল যার লক্ষ্য। এই সেই পরিকল্পনা, যার পিছনে আমরা আজ পর্যন্ত সাত শো কুড়ি কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছি। শ্রী বি. জি. খের একজন সাধু-প্রকৃতির রাজনীতিক। তিনি তখন বোমবাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী। ভারতবর্ষের জন্য সার্ ভি. টি. যে-ধরনের সমষ্টি-উন্নয়ন-পরিকল্পনার পক্ষপাতী, তার বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের জন্য শ্রীখের আমার সঙ্গে সার্ ভি. টি.-র কাছে গেলেন। শ্রীখের তাঁকে বললেন যে, রাজ্য-সরকারের স্বাভাবিক প্রশাসন-যন্ত্রের সাহায্যে এই ধরনের কার্যসূচীর প্রতি সুবিচার করা যাবে না। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বোমবাইয়ের সিভিল সারভিস সম্ভবত দক্ষতর; কিন্তু তৎসত্ত্বেও শ্রীখেরের মনে হয়েছিল যে, সেখানেও এই ধরনের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। তিনি বললেন যে, ভারত সরকারের পক্ষে এই কাজের

জন্য একটা মন্ত্রক সৃষ্টি করা অনুচিত; তার কারণ মন্ত্রক মাত্রেই রাজনীতিক ও আমলাদের কায়েমী স্বার্থের একটা চক্র হয়ে দাঁড়ায়। একবার একটা মন্ত্রক গড়লে সেটাকে ভেঙে দেওয়া শক্ত। সর্বোপরি, আসল কাজ তো হবে বিভিন্ন রাজ্যে; কেন্দ্রের কাজ তো আর কিছুই নয়;—তাঁরা শুধু সাহায্য বণ্টন করবেন ও কার্যসূচীর উপরে লক্ষ্য রাখবেন।

শ্রীখের ও আমি প্রস্তাব করলাম যে, আমাদের উচিত একটি তহবিল সৃষ্টি করা। তহবিলের পরিচালন-ভার একটি ট্রাস্ট অথবা ফাউনডেশনের উপরে ন্যস্ত থাকবে; এবং কুড়ি থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে মূলধন পরিশোধ করতে হবে এই কড়ারে সারা ভারতে বিভিন্ন প্রকল্পকে সেই তহবিল থেকে মূলধন সরবরাহ করা হবে। সামান্য সুদে কিংবা বিনা সুদে এই মূলধনী ঋণ দেওয়া যেতে পারে। জেলা-স্তরে একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা থাকবে। সংসদের একজন সদস্য, জেলার কালেকটর ও প্রকল্প-অফিসার তার সদস্য হবেন; এবং প্রকল্পের কাজ তাঁরাই পরিচালনা করবেন। এই সংস্থাগুলি রাজ্য-উন্নয়ন-মন্ত্রীর মাধ্যমে রাজ্য-বিধান-মণ্ডলীর কাছে কিংবা পরিকল্পনা-মন্ত্রীর মাধ্যমে সংসদের কাছে দায়ী থাকবেন। সংসদের কাছে দায়ী থাকবার ব্যবস্থা হলেই ভাল হয়। পরিকল্পনা-মন্ত্রীর পক্ষে এই সংস্থাগুলির স্বাধীনতায় হস্তেক্ষেপ করা তো উচিত হবেই না, পরন্তু তাঁকেই সেই স্বাধীনতার প্রহরী হতে হবে। স্বয়ংশাসিত এই সংস্থাগুলির কাজের অগ্রগতির উপরে লক্ষ্য রাখবার জন্য সংসদ থেকে একটি কমিটী গঠনের ব্যবস্থা হোক। গণতন্ত্রকে গড়ে তোলাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে নয়াদিল্লিতে মাত্র জনাকয়েকের হাতে ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করবার প্রবণতাকে আমাদের বাধা দেওয়া উচিত। আমাদের উন্নয়ন-পরিকল্পনায় রাষ্ট্রই ক্রমে ক্রমে সর্বময় হয়ে দাঁড়াচ্ছে; অথচ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণই হচ্ছে গণতন্ত্রের আদর্শ। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বাবলম্বন,—এই দ্বৈত দর্শনের ভিত্তিভূমির উপরেই গ্রামীণ ভারতবর্ষে গান্ধীজী এক সামবায়িক কমনওয়েল্থ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতবর্ষের জনসাধারণ সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে যে-পরিমাণে নিজেদের কাজ নিজেরাই করে নিতে পারবে, বুঝতে হবে যে, ভারতবর্ষ সেই পরিমাণে স্বাধীন।

সার্ ভি. টি. কৃষ্ণমাচারী ছিলেন ভারতবর্ষের দক্ষতম ও বিশিষ্টতম ব্যুরোক্র্যাট। আমাদের এই সমস্ত যুক্তি তাঁর চিত্তে কোনও রেখাপাত করল না। তাঁর সেই এক কথা : রাজ্য-সরকারের স্বাভাবিক প্রশাসন-যন্ত্রের সাহায্যে যদি এইসব প্রকল্পকে বাস্তবে রূপায়িত করা না যায় তো বুঝতে হবে যে, সেগুলি রূপায়ণের যোগ্যই নয়। আভ্যন্তর সম্পদের সাহায্যেই যার বিকাশ হবে, গ্রামোন্নয়নের এমন কার্যসূচী রচনার পরিবর্তে সরকার যা গড়ে তুললেন, মূলত তা কৃষি-সম্প্রসারণ-সংস্থার মারকিনী ধাঁচেরই একটা অনুকরণ মাত্র। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে 'কাউন্টি এজেন্ট'কে কেন্দ্র করে একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়; তার প্রতিনিধিরা মারকিন কৃষকদের কাছে নতুন-নতুন এবং সুফলপ্রসূ নানা কৃষি-ব্যবস্থার জোর প্রচার চালান। কোনও কৃষক যদি সেই নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ করতে চায়, তো তার জন্য কোনও সমস্যায় তাকে পড়তে হয় না। ইচ্ছে হলেই সে অতি সহজে প্রচুর ঋণ ও সরবরাহ পেতে পারে। ভারতীয় কৃষকের তা পাবার উপায় নেই। সে চায়, তার জন্যে এমনভাবে মূলধন সংগঠন করা হোক (দাক্ষিণ্য হিসেবে এটা দেবার কোনও দরকারই নেই), যাতে সে সুবিধাজনক শর্তে সেচের জল, সার, ভাল বীজ ও ভাল গরু-মোষ পেতে

পারে। নতুন ধরনে জীবন গড়ে তুলবার ফাঁকা উপদেশ সে শুনতে চায় না। টুকরো-টুকরো যে-সব কল্যাণকার্যের আয়ু দু দিনেই ফুরিয়ে যায়, তাতেও তার আস্থা নেই।

গ্রামবাসীরা যাতে সুবিধাজনক শর্তে পর্যাপ্তপরিমাণ সুসংগঠিত মূলধনের সুবিধা পায় কিংবা তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি তাকে যাতে সরবরাহ করা হয়, সরকার তার ব্যবস্থা করলেন না। তার বদলে ভারতবর্ষের চেহারা পালটে দেবার বৈপ্লবিক পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে তিন শো গ্রাম নিয়ে এক প্রকল্প রূপায়ণে উদ্যোগী হলেন। ঠিক হল, সেখানে তাঁরা ছ শো মাইল কাঁচা রাস্তা বানিয়ে দেবেন (বর্ষা এলেই যার বেশির ভাগ জলে ধুয়ে যাবে), আশিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পাঁচটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করবেন, এবং তিনটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও দশ-শয্যার একটি ছোট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু সরকারী সাহায্যের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর ডাক্তার, নার্স, শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মীদের বেতন দেবে কে, এবং জনকল্যাণকর এইসব প্রতিষ্ঠানকে চালু রাখবার টাকাই বা আসবে কোথা থেকে,— এ প্রশ্নের কোনও জবাব নেই। এ ছাড়া একটি প্রেরণামূলক কর্মসূচীর কথাও বলা হল। এই কর্মসূচী অনুযায়ী কৃষকদের গিয়ে বলতে হবে, কী করে তাদের শস্যের উৎপাদন আরও বাড়ানো যায়, কী করে তাদের কুটির-শিল্প আর গ্রামীণ চারু ও কারুকলার উন্নতি করা যায় ইত্যাদি। দেখা গেল যে, তিন শো গ্রামের (লোকসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ) এক সমষ্টি-উন্নয়ন-প্রকল্পের জন্য যে পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তার মধ্যে নবজীবন সম্পর্কে গ্রামবাসীদের জ্ঞান বিতরণ করতেই সাড়ে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা খরচা হয়ে যাবে। আর শস্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ছোটখাটো সেচ-ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করা হবে বাকী সাড়ে উনত্রিশ লক্ষ টাকা। রাজ্য সরকার বারো বছরের মধ্যে ৩½% সুদসহ এই টাকাটা কেন্দ্রকে পরিশোধ করবেন। রাজ্য সরকার আবার এজন্য জনসাধারণের কাছ থেকে নেবেন ৫% সুদ। ভারতবর্ষের সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামের মধ্যে সাড়ে ষোল হাজার গ্রামের জন্য যে পঞ্চান্নটি প্রকল্প করা হল, এই হচ্ছে তার ব্যবস্থা।

আঠারো মাস কাজ চলবার পর দেখা গেল, প্রকল্প রূপায়ণের ভার যাঁদের হাতে সেই সংস্থা উক্ত সময়ের জন্য বরাদ্দ অর্থের শতকরা সাঁইত্রিশ ভাগের বেশী খরচ করে উঠতে পারেননি। ব্যবস্থাটা অতঃপর আরও তরলীকৃত হল। পরবর্তী পর্যায়ে আরও যে আঠারোটি প্রকল্পে হাত দেওয়া হয়, তাতে তিন শো গ্রামের এক-একটি প্রকল্পের জন্য ব্যয় বরাদ্দ হল মাত্র পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকা। তার মধ্যে পঁচিশ লাখ টাকা দাক্ষিণ্য। বাকী কুড়ি লাখ পরিশোধ করতে হবে। ভারতবর্ষের সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামের মধ্যে তেইশ হাজার ন শো গ্রামের সম্পর্কে এই হল ব্যবস্থা।

বাকী পাঁচ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার এক শো গ্রামকে জাতীয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হল। একশোটি গ্রাম (লোকসংখ্যা মোটামুটি এক লক্ষ) নিয়ে গড়া হল এক-একটি ব্লক। ঠিক হল, ব্লকপিছু মোটামুটি বারো লক্ষ টাকা খরচ করা হবে। তার মধ্যে পরিচালন-ব্যয়ই চার লক্ষ টাকা। বাকী আট লক্ষ টাকা এক শো গ্রামে বিনিয়োগ করা হবে। তার মধ্যে অর্ধেকটা হল দাতব্য; বাকী অর্ধাংশ পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ হিসেবে মাথাপিছু চার টাকা আর জনকল্যাণকর্মের জন্য দাতব্য হিসাবে মাথাপিছু চার টাকা। আমার বাড়ি পুরুলিয়া জেলায়। সম্প্রতি সেখানকার এক তরুণ ব্লক ডেভেলোপমেন্ট

অফিসারের অনুরোধে আমি তাঁর ব্লকের কাজ দেখতে যাই। তাঁর সহকর্মিবৃন্দ ও গ্রাম-পঞ্চায়েতের সদস্যদের সঙ্গেও আমার কথাবার্তা হল। পুরুলিয়া জেলার প্রাণচঞ্চল তরুণ এইসব তরুণ বি-ডি-ওদের সঙ্গে (পুরুলিয়ায় আছেন কুড়িজন বি-ডি-ও) প্রায়ই আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়। জেলা উন্নয়ন পরিষদের আমি চেয়ারম্যান; গত পাঁচ বছরে এই তরুণ অফিসারদের সহায়তায় গ্রামাঞ্চলের কর্মহীন কিংবা অংশত বেকার মানুষদের কাজে লাগিয়ে আমি পাঁচ শোরও বেশী পুকুর কাটিয়েছি। শীতকালে যাতে একটি বাড়তি ফসল ফলানো যায়, তার জন্য জল চাই। সেই সেচের জলের জন্যই এইসব পুকুর।

যে-কথা বলছিলাম। এক শো গ্রামের জন্য যে আট লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে, তা দিয়ে কল্যাণকর কী কী কাজ এ-যাবৎ করা গিয়েছে, ব্লক ডেভেলাপমেন্ট অফিসার ও পঞ্চায়েতের সদস্যরা আমাকে তার সবিস্তার বিবরণ দিলেন। এই কার্যসূচীতে কি তাঁরা সন্তুষ্ট? শুনে তাঁরা হাসলেন। বললেন, "উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।" প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য টাকা, বিরাট একটি এলাকা জুড়ে তাকে যদি ছিটেফোঁটা করে বরাদ্দ করা হয়, তবে তাতে কোনও স্থায়ী সুফল মেলে না, দেখতে-না-দেখতে তা শূন্যে মিলিয়ে যায়। তবে এ-কাজ করা হয় কেন? করা হয় রাজনৈতিক কারণে। স্রেফ এইটে দেখাবার জন্যে যে, ভারত জুড়ে প্রত্যেকের জন্যই 'যা হক কিছু' করা হচ্ছে। এতে হয়ত ভোট পাবার সুবিধে হয়, কিন্তু এতে সমস্যার কোনও সমাধান হয় না। তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমষ্টি-উন্নয়নের জন্য খরচ করা হয়েছে মোট সাত শো কুড়ি কোটি টাকা। অতঃপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাতে কাজের কাজ বিশেষ কিছুই হয়নি। ইতস্তত এক-আধজন উৎসাহী কর্মী হয়ত এরই মধ্যে যতটা সম্ভব করেছেন। কিন্তু মোটামুটিভাবে ব্যর্থই হয়েছে এই কার্যসূচী। টাকা নষ্ট হয়েছে, সেটাও বড় কথা নয়। তার চাইতেও বড় ক্ষতি এই যে, সরকার যে গ্রামীণ ভারতবর্ষের চেহারা পালটে দেবার ইচ্ছা অথবা যোগ্যতা রাখেন, জনসাধারণের এই বিশ্বাসটাই নষ্ট হয়েছে। সংসদে মাঝে-মাঝে দাবি তোলা হয়েছে যে, সমষ্টি-উন্নয়ন মন্ত্রকই তুলে দেওয়া হোক। ১৯৬৬ সনের জানুয়ারিতে তা-ই হল। পৃথক অস্তিত্ব ঘুচিয়ে দিতে কৃষি-মন্ত্রকের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল এটিকে। এইভাবেই সমাপ্তি সূচিত হল বৈপ্লবিক এক আন্দোলনের। ঢক্কানিনাদে যার সূচনা, এখন তার আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। ১৯৬২ সনে অবসর নেবার পর সার্ ভি. টি. কৃষ্ণমাচারী রাজ্যসভার সদস্য হন। ১৯৬৪ সনে তাঁর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে সংসদের লবিতে তাঁর সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। সমষ্টি-উন্নয়নের একটি বৈঠক থেকেই তিনি তখন ফিরছিলেন। আমাকে থামিয়ে তিনি বলেন, "সুধীর, সমষ্টি-প্রকল্প নিয়ে ১৯৫৩ সনে তোমার সঙ্গে আমার একদিন তুমুল তর্ক হয়েছিল, মনে আছে?"

নিরীহভাবে বললুম, "তা মনে আছে সার্ ভি. টি.।"

সিভিল সারভ্যান্টদের কুলচূড়ামণি সেই প্রবীণ মানুষটি তখন বললেন, "কী জানো, গোটা ব্যাপারটাই বড্ড আমলাতান্ত্রিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

শুনে বললুম, বিখ্যাততম ব্যুরোক্র্যাটের মুখ থেকে এই মন্তব্য শুনতে আমার ভাল লাগছে বটে।

প্ল্যানিং কমিশনের অভিমত সর্বদাই এই ছিল যে, গ্রামোন্নয়নের এইসব প্রকল্প স্বয়ংনির্ভর হতে পারে না, হবার দরকারও নেই। সামগ্রিকভাবে দেশ যদি স্বয়ংনির্ভর

হয়, তাহলেই হল। জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যে আয় হবে, তারই সাহায্যে চালানো যাবে সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামের কল্যাণকর্ম। শুনে মনে হয়, কথাটা নেহাত অযৌক্তিক নয়। আসলে কিন্তু এই কথার মধ্যে ফাঁকি রয়েছে। প্রথমত, 'সামগ্রিকভাবে দেশ'-এর অর্থভাণ্ডার খুব শিগগির এতটা স্ফীত হয়ে উঠবার সম্ভাবনা নেই, যাতে দেশ জুড়ে অনির্দিষ্ট কাল ধরে এই ধরনের জনকল্যাণকর কাজের টাকা জুগিয়ে যাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, তা যদি সম্ভবও হত, তার পরিণামে ক্ষমতা প্রভূতভাবে কেন্দ্রীভূত হত। সমগ্র ভারতীয় জনসাধারণ নয়াদিল্লির দাক্ষিণ্যের উপরে বেঁচে থাকবে, এ-চিন্তা একমাত্র আমলাতন্ত্রের পক্ষেই সুখকর হতে পারে, আর কারও পক্ষে হবে না।

আমাদের মারকিন বন্ধুরা এ-দেশে সমষ্টি-প্রকল্প নিয়ে আসবার অনেক আগেই প্রগতিশীল জনাকয়েক ব্রিটিশ সিভিল সারভ্যান্ট এ-ব্যাপারে পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলে চমৎকার কাজ করেছিলেন। এ-যুগে তাঁরাই এক্ষেত্রে পথিকৃৎ। গুরগাঁও জেলায় ব্রেন এতই সুন্দরভাবে গ্রামোন্নয়নের কাজ চালিয়েছিলেন যে, স্বয়ং গান্ধীজী 'ইয়াং ইনডিয়া'য় তার প্রশংসা করেন। আজ বইয়ের দোকানে ব্রেনের বই কিনতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যে-কাজ তিনি করেছিলেন, গুরগাঁওয়ের গ্রামাঞ্চলে তার কোনও চিহ্নও আর আজ চোখে পড়ে না। আসলে এমনভাবে কাজ করা চাই, কাজটা যাতে ধোপে টেঁকে, তার সুফল যাতে স্থায়ী হয়। ১৯৫২ সন থেকে ১৯৫৫ সন পর্যন্ত এই কথাই শ্রীনেহরুকে আমি বোঝাতে চেয়েছি। কিন্তু পারিনি। না-পারবার কারণ এই যে, তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কটাই বিগড়ে গিয়েছিল।

নেহরু-যুগ : সমাজতান্ত্রিক সমাজ

প্রায় বছর তিনেক চলেছিল আমার অজ্ঞাতবাসের পালা। তারপর শ্রীনেহরু আবার নরম হলেন, এবং ১৯৫৫ সনের অগস্ট্-এ আমিও আবার সরকারী কাজে ফিরে এলাম। রৌরকেলা, ভিলাই ও দুর্গাপুরে সরকার যে ইস্পাত কারখানা গড়ে তুলছিলেন, তার দায়িত্বের একটা বড় অংশ দেওয়া হল আমার হাতে। শ্রীনেহরু যাকে বলতেন সমাজতান্ত্রিক সমাজ, তাকে গড়ে তুলবার কাজে আমি হাত মেলালাম।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক ভিতটাকে যদি পাকা করে তুলতে হয়, তাহলে সরকারী উদ্যোগগুলির পক্ষে শুধুই বিনিয়োগকারীর ভূমিকা নিলে চলে না, প্রয়োজনীয় সঙ্গতি সৃষ্টির দায়িত্বও তাদের নেওয়া চাই। কিন্তু ভারতবর্ষে কোনও মন্ত্রী কিংবা আমলাকে যদি এ-কথা বলা যায়, তো তিনি চটে যাবেন। তার কারণ, তাঁর একটা বদ্ধমূল ধারণাকেই এর দ্বারা টলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মন্ত্রী আর আমলাদের বিশ্বাস, পণ্য উৎপাদনে ব্যয় কতটা পড়ছে, জনসাধারণের কাছে কী দামে সেটা বিক্রি করা যাচ্ছে, কিংবা বিনিয়োগ থেকে কী-পরিমাণ আয় হচ্ছে, সেটা ধর্তব্য নয়; স্রেফ বড়-বড় কতকগুলি শিল্পকে যদি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসা হয় এবং তার পরিচালন-ভার যদি আমলাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তাহলেই খুব সমাজতন্ত্র হল। ভারতবর্ষ এ-পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিতে (ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে পাওয়া রেলপথগুলির কথা এখানে ধরা হচ্ছে না) দু হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। তার থেকে গড়পড়তায় আয় হয় শতকরা আড়াই টাকা। বেসরকারী শিল্পোদ্যোগে সেক্ষেত্রে গড়পড়তায় শতকরা তেইশ টাকা আয় হয়ে থাকে। আপনি যদি বলেন যে, এই আড়াই পারসেন্টকে অন্তত পনর পারসেন্টে তুলতে না পারলে ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়া যাবে না, তাহলে রাজনীতিকরা আপনার উপরে অসন্তুষ্ট হবেন এবং আমলারাও খুশী হবেন না। তাঁরা ভাববেন যে, আপনি বড়ই বেয়াড়া লোক। ভারতবর্ষের অনেক 'প্রগতিশীল' রাজনীতিক এমন কথাও বলে থাকেন যে, সরকারী উদ্যোগগুলিতে তো লাভ করাই উচিত নয়। পৌর-প্রতিষ্ঠান থেকে যেমন বিনা-মুনাফায় জলসরবরাহ ইত্যাদি ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিও তাঁদের বিবেচনায় তেমনি ব্যাপার, মুনাফার কোনও প্রশ্নই এক্ষেত্রে উঠতে পারে না। এমন কী, সোভিয়েট রাশিয়াতেও শিল্পোদ্যোগের ভারপ্রাপ্ত কোনও কমিশনার যদি এমন কথা বলেন তো তাঁকে বিপদে পড়তে হবে। তার কারণ, সাম্যবাদী সমাজেও সেই একই মাপকাঠিতে—অর্থাৎ লাভ-লোকসানের মাপকাঠিতে—শিল্প-বিনিয়োগের বিচার হয়ে থাকে; দ্বিতীয় কোনও মাপকাঠি সেখানেও নেই। আমাদের সমাজ-দার্শনিকেরা সম্ভবত তাঁদের চাইতেও প্রগতিশীল!

১৯৫৫ থেকে ১৯৬০, এই পাঁচ বছর আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সরকারী ইস্পাত-উদ্যোগের জন্য পরিশ্রম করেছি। এই ধরনের সমাজ-দর্শনের সঙ্গে তখন প্রায়ই আমার পরিচয় ঘটত। আসলে এটা বড় বড় বুলির আড়ালে অযোগ্যতাকে চাপা দেবার চেষ্টা মাত্র। এটা আমার আদপেই ভাল লাগত না; এই ধরনের কথা শুনলে আমি দমে যেতুম। কিন্তু একইসঙ্গে একথাও বলব যে, যা ছিল ফাঁকা মাঠ, তার

উপরে একটু একটু করে মিলিয়ন-টনের বিরাট ইস্পাত-কারখানা, আর সেই কারখানাকে কেন্দ্র করে লক্ষ লোকের নতুন শহর গড়ে উঠছে,—এই বিপুল কর্মযজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত থাকার মধ্যে আনন্দ আর উত্তেজনাও ছিল অনেকখানি। একইসঙ্গে স্বতন্ত্র তিন দল বিদেশী কর্মীদের সঙ্গে তখন কাজ করেছি আমি। ওড়িশায় রৌরকেলা ইস্পাত-কারখানায় জারমানদের সঙ্গে, মধ্যভারতে ভিলাই ইস্পাত-কারখানায় রুশদের সঙ্গে, আর পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুর ইস্পাত-কারখানায় ব্রিটিশদের সঙ্গে। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এই তিন দল কর্মীর মধ্যে আদৌ কোনও মিল ছিল না।

রৌরকেলায় জারমানদের কাজে নানান রকমের ঝঞ্ঝাট দেখা দিয়েছিল। প্রথমে কাজ শুরু করেছিল তারাই। জারমানির বিখ্যাত ইস্পাত-উৎপাদক ক্রাপ্‌স প্রতিষ্ঠান এবং যন্ত্র-নির্মাতা ডেমাগ প্রতিষ্ঠান, এই দুয়ে মিলে একটি কোমপানি প্রতিষ্ঠা করে, এবং ভারত সরকারের ইস্পাত করপোরেশন হিন্দুস্থান স্টীলের সঙ্গে সেই কোমপানির একটি চুক্তি হয়। চুক্তির শর্ত ছিল এই যে, প্ল্যান্ট ও যন্ত্রাদি সংগ্রহ এবং কারখানা নির্মাণের ব্যাপারে যা কিছু কারিগরী পরামর্শ প্রয়োজন, জারমান কোম্পানিটিই তা দেবে। অতঃপর পুরো শিল্পোদ্যোগটি গড়ে তুলবার দায়িত্ব তেত্রিশটি পৃথক-পৃথক জারমান শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়, এবং তারা প্রত্যেকেই হিন্দুস্থান স্টীলের সঙ্গে পৃথক চুক্তি সম্পাদন করে। কেউ-বা কোক ওভেন গড়ে দেবে, কেউ-বা ব্লাস্ট ফারনেস; কেউ-বা স্টীল মেলটিং শপের এবং কেউ-বা রোলিং মিলের নির্মাণ-দায়িত্ব গ্রহণ করবে; কেউ বা বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করবে, কেউ-বা জলের। বিভিন্ন অংশের নির্মাণে বেশ বিলম্ব ঘটতে লাগল, এবং সেই অংশগুলিকে জোড়া দিয়ে কাজ শুরু করতে গিয়ে দেখা গেল যে, হাজার রকমের ঝঞ্ঝাট দেখা দিচ্ছে।

ইস্পাত-উৎপাদনের ব্যাপারটাকে রান্নার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। এ-কাজ আপনা থেকে হবার নয়। কারখানা চালু করে দিলেন, আর হুড়হুড় করে নানান আকার আর নানান প্রকারের ইস্পাত বেরিয়ে আসতে লাগল,—তা কখনও হয় না। ঠিক রান্নারই মতন, এটাও একটা অভ্যাসের ব্যাপার। বারবার চেষ্টা করতে হয়, হাল ছেড়ে দিলে চলে না; চেষ্টা করতে-করতে দেখা যায় যে, প্ল্যান্ট আর যন্ত্রপাতির কাজকর্মের ধরনধারণ রপ্ত হয়ে এসেছে; উৎপাদনের কাজটা তখন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। পুরো উৎপাদন-ক্ষমতায় পৌঁছতে এক-একটা ইস্পাত-উদ্যোগের পাঁচ বছর পর্যন্ত সময় লেগে যায়। কতটা সময় লাগবে, কারখানার নির্মাণ-কৌশলের উপরে তা যেমন নির্ভর করছে, তেমনি তার পরিচালন-ভার যাঁদের উপরে ন্যস্ত হচ্ছে তাঁদের যোগ্যতার উপরেও সেটা নির্ভরশীল।

রৌরকেলা ইস্পাত কারখানায় যে-সব ঝঞ্ঝাট দেখা দিয়েছিল, তার দোষ গিয়ে পড়েছিল ক্রাপ-ডেমাগ প্রতিষ্ঠানের উপরে। তাঁরা খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন এতে। রৌরকেলায় কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৫২ সনে; আর ভিলাইয়ে রুশ-কারখানাটির কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৫৫ সনে। অথচ একইসঙ্গে, ১৯৫৯ সনে, তাদের উৎপাদন শুরু হল। উৎপাদন যেদিন শুরু হয়, সেদিন থেকেই ভিলাইয়ের কারখানা ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৫৬ সনে; ১৯৬০ সনে সেখানে উৎপাদন শুরু হয়। রৌরকেলায় জারমানদের কাজে যে-সব ঝঞ্ঝাট দেখা দিয়েছিল, সেই তুলনায় দুর্গাপুরের ব্রিটিশ নির্মাতাদের অনেক কম ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়েছে। রুশদের কাজ খুবই সফল হয়েছিল, এবং তার জন্য তারা অনেক বাহাবাও

পেয়েছিল। জারমান আর ব্রিটিশরা সেই তুলনায় বিশেষ খ্যাতি পায়নি। এর কারণ কী? প্রশ্নটা কৌতূহলজনক। জারমানি, ব্রিটেন অথবা মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে যে ব্ল্যাস্ট ফারনেস তৈরী হয়, সোভিয়েট রাশিয়াতেও সেই একই রকমের ব্ল্যাস্ট ফারনেস তৈরী হয়ে থাকে। পশ্চিম জারমানি থেকে যে প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছিল, তা প্রথম শ্রেণীর ও আধুনিক কালের উপযোগী। তার চাইতে আধুনিক উপকরণ পৃথিবীর কুত্রাপি ব্যবহার করা হয় না। বস্তুত, ভিলাই ও দুর্গাপুরের মিলের তুলনায় জারমানরা অনেক আধুনিক ধাঁচের মিল সরবরাহ করেছিল। ঠিক ছিল যে, রৌরকেলায় আমরা যাবতীয় ফ্ল্যাট প্রোডাক্ট, প্লেট আর শীট উৎপাদন করব; সেই অনুযায়ী জারমানরা সেখানে এশিয়ার মধ্যে সবচাইতে আধুনিক পদ্ধতির হট স্ট্রিপ মিল আর কোল্ড্ রোলিং মিল তৈরী করে দেয়। দুর্গাপুরে আর ভিলাইয়ে লৌহপিণ্ড গলাবার ব্যবস্থা পুরনো ধাঁচের; সেখানে খোলা-চুল্লির ব্যবস্থা হয়েছে। রৌরকেলায় সেক্ষেত্রে অভিনব অস্ট্রীয়ান এল.ডি. (লিন্ট্স্ অ্যান্ড্ ডনাউইট্স্) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

আসলে, ইস্পাত-শিল্পের এই উদ্যোগটিকে গড়ে তুলবার দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন তেত্রিশটি জারমান প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেঁটে দেওয়া হয়েছিল, ঝঞ্চাটের হেতুটা ছিল তারই মধ্যে নিহিত। পৃথক-পৃথক ভাবে তাদের কাছ থেকে কাজ বুঝে নেওয়া, এবং সেই কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবার দায়িত্ব ছিল ভারতীয় ম্যানেজিং ডিরেকটরের উপরে। তিনি সে-দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেননি। অথচ দেশের মধ্যে এই ধারণা দেখা দিয়েছিল যে, জারমানরাই আমাদের ডুবিয়েছে। ক্রাপ প্রতিষ্ঠানের বড়কর্তা মিঃ অ্যালফ্রেড ক্রাপের সঙ্গে একদিন এই নিয়ে আমার কথা হচ্ছিল। কথাপ্রসঙ্গে তিনি সক্ষোভে আমাকে বললেন যে, যে দায়িত্ব তাঁরা পালন করেননি বলে আমরা দোষারোপ করছি, সেই দায়িত্ব আদৌ তাঁদের দেওয়া হয়নি। আসলে ক্রাপ-ডেমাগ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের চুক্তির শর্ত ছিল এই যে, কারখানা গড়বার ব্যাপারে যাবতীয় কারিগরী পরামর্শ তাঁরা দেবেন; তেত্রিশটি জারমান ঠিকাদারের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনের দায়িত্বও যে তাঁদেরই, চুক্তিতে এমন কোনও কথাই ছিল না। কাজটাকে টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন জারমান প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেঁটে দিয়ে অবশ্য ভুল করা হয়নি। বরং অর্থ সাশ্রয়ের বিচারে এই বণ্টন-ব্যবস্থা প্রশংসা লাভেরই যোগ্য। আমাদের সমন্বয়সাধন ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা সুষ্ঠু হলে এ-যুক্তি আরও অর্থবহ হত। দুঃখের বিষয়, সমন্বয়সাধনে আর তত্ত্বাবধানে ত্রুটি ছিল। তারই ফলে বাধল ঝঞ্চাট, আর তার দোষ গিয়ে পড়ল জারমানদের উপরে। জারমানদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েছিল ব্রিটিশরা। কাজের দায়িত্ব তারা আংশিকভাবে নেয়নি। একটি অখণ্ড কাজ হিসেবে ইস্পাত-শিল্পের পুরো উদ্যোগটা তারাই গড়ে দেবে, এই শর্তে দুর্গাপুরের কাজের দায়িত্ব নিয়ে অতঃপর —আভ্যন্তর ব্যবস্থা হিসেবে—একটি ব্রিটিশ কনসরটিয়ামের সদস্যদের মধ্যে কাজটা তারা নিজেরাই বেঁটে দিয়েছিল। অর্থাৎ কাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধনের দায়িত্বও এক্ষেত্রে তাদেরই হাতে ন্যস্ত ছিল।

সেই তুলনায় ভিলাইয়ের ব্যবস্থা ছিল একেবারেই স্বতন্ত্র। কাজ করবার ঠিকা এক্ষেত্রে নিয়েছিলেন স্বয়ং সোভিয়েট সরকার। একটি অখণ্ড দায়িত্ব হিসেবেই এতে তাঁরা হাত দেন। প্রকল্পের প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে শুরু করে প্ল্যান্ট ও যন্ত্র-সরঞ্জামের প্রতিটি অংশ নির্মাণ এবং সমস্ত কাজ মিলিয়ে তুলে উৎপাদনের

কাজ শ্র্ করা—এই সমস্ত কিছ্র অখণ্ড দায়িত্ব ছিল সর্বোচ্চ একজন র্শ টেকনিক্যাল বস্-এর হাতে। ভিলাইয়ের কাজ করবার জন্য ভি. আই. দিমসিৎসের মতন মান্ষকে এ-দেশে পাঠানো হয়েছিল। ভিলাইয়ের কাজ শেষ হবার পর তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার অন্যতম ডেপ্টি প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেছিলেন। ভিলাইয়ের কাজটাকে যে সোভিয়েট সরকার কী পরিমাণ গ্র্ত্ব দিয়েছিলেন, এর থেকেই তা বোঝা যাবে। এটা ছিল তাঁদের কাছে একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার। রাশিয়ানরা তাদের শ্রেষ্ঠ কর্মী, শ্রেষ্ঠ প্ল্যান্ট, শ্রেষ্ঠ যন্ত্রপাতি এবং শ্রেষ্ঠ সরঞ্জাম ভিলাইয়ে পাঠিয়েছিল। রাশিয়ার ইস্পাত-কর্মীদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়ে সেরা এগারো শো ইনজিনিয়ার আর টেকনিশিয়ানকে ভারতে পাঠানো হয়। ভিলাইয়ের শ্ন্য প্রান্তরে এগারো শো র্শ পরিবারের জন্য ঘরবাড়ি বানিয়ে দেওয়া হল। গ্রীষ্মকালে মধ্যভারতে দ্ঃসহ গরম পড়ে। কিন্তু এই র্শরা তা নিয়ে কখনও অভিযোগ করেননি। তাঁদের আচরণ ছিল খ্বই সংযত ও সৌজন্যসম্মত; জীবন ছিল অনাড়ম্বর। তাঁদের নিয়ে কখনও কোনও অপ্রীতিকর অবস্থার স্ষ্টি হয়নি। পক্ষান্তরে, রৌরকেলার আদিবাসী নারীদের দিকে নজর দিতে গিয়ে জারমানরা মাঝে-মাঝেই ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে বসত। দ্র্গাপ্রে ব্রিটিশ কর্মীরা সেক্ষেত্রে অতিশয় ভদ্রভাবে জীবনযাপন করতেন। শ্ধ্ অস্বিধে ঘটত তাঁদের রেসিডেন্ট ডিরেকটরকে নিয়ে। ব্রিটিশ কনসরটিয়ামের প্রতিনিধি এই রেসিডেন্ট ডিরেকটর একজন অবসরপ্রাপ্ত আর্মি ব্রিগেডিয়ার। আগে তিনি ভারতবর্ষের মিলিটারি ইনজিনিয়ারিং সারভিসে কাজ করতেন। কল্পনাশক্তি-রহিত র্ক্ষ স্বভাবের মান্ষ। ভারতীয়রা তাঁকে বরদাস্ত করতে পারতেন না। শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনারকে এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে হয়, এবং এখান থেকে তাঁকে ফিরিয়ে নেবার জন্য ব্রিটিশ কনসরটিয়ামকে তিনি রাজী করান। রেসিডেন্ট ডিরেকটরের কাজের মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে তখনও দ্ বছর বাকী। সেই দ্ বছরের বেতন চুকিয়ে দিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নিতে হয়েছিল। অতঃপর, খাঁটি ব্রিটিশ পদ্ধতিতে, সেই ব্রিগেডিয়ারটিকে নাইট-উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

র্শ কর্মীদের নিয়ে মাত্র একবারই আমরা অস্বিধেয় পড়েছিলাম। তার ম্লে ছিল ভাষা-বিভ্রাট। এই ভিলাইয়েই সোভিয়েট রাশিয়ার একজন শ্রেষ্ঠ ধাতু-বিশেষজ্ঞ ইনজিনিয়ারের ম্ত্যু ঘটেছিল। তাঁর নাম ক্রানটেনকো। ইউক্রেনের বিশালকায় মান্ষটি ১৯৫৬ সনে ভিলাইয়ে এক শোকাবহ দ্র্ঘটনায় মারা যান। শীতের এক অপরাহ্ন-বেলায়, কারখানার কাজের পর, মিঃ ক্রানটেনকো তাঁর বাচ্চা ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে একটি স্টেশন-ওয়াগনে উঠে ভিলাইয়ের কাছেই এক জলাভূমিতে হাঁস শিকার করতে গিয়েছিলেন। শট গানের সাহায্যে বেশ কিছ্ হাঁস তিনি শিকার করেন। সেগ্লিকে ঝোলায় প্রবার পরে তিনি দেখতে পান যে, নিহত একটি হাঁস জলার ঠিক মাঝখানে ভাসছে। মিঃ ক্রানটেনকো ঠিক করলেন যে, সেটিকে ফেলে রেখে তিনি ফিরবেন না। জলায় নেমে সাঁতার দিয়ে তিনি হাঁসটির কাছে গিয়ে পৌঁছলেন; তারপর আবিষ্কার করলেন যে, যতটা গভীর ভেবেছিলেন, জলাটি তার চাইতে অনেক বেশী গভীর, এবং পিচ্ছিল আগাছায় ভরা। যতই তিনি তার থেকে নিজেকে ম্ক্ত করবার চেষ্টা করেন, ততই আরও সেই মারাত্মক আগাছায় তিনি আষ্টেপ্ষ্ঠে জড়িয়ে যেতে লাগলেন। মিঃ ক্রানটেনকো ছিলেন পাকা সাঁতার্; তা ছাড়া তাঁর দৈহিক শক্তিও কম ছিল না। কিন্তু জলজ আগাছার সেই সর্বনাশা আলিঙ্গন থেকে নিজেকে তিনি ম্ক্ত করতে পারলেন না। তাঁর বাচ্চা ছেলেটি পাড়ে বসে

সাতঙ্কে সব দেখছিল। স্বচক্ষেই সে দেখতে পেল যে, তার বাবা ধীরে ধীরে জলার তলায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। প্রাণপণে দৌড়ে সে তখন কাছাকাছি একটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছল। ছেলেটি মাত্র গুটিকয়েক ইংরেজী শব্দ শিখেছিল। তারই সাহায্যে গ্রামবাসীদের সে বোঝাতে চেষ্টা করল যে, তার বাবা জলে নেমে বিপদে পড়েছেন। 'পাপা ইন ওয়াটার!' 'পাপা ইন ওয়াটার!' বারবার শুধু এই কথাটাই বলতে লাগল সে। গ্রামবাসীরা তৎক্ষণাৎ তাকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়ে সেই জলার কাছে আসে, এবং অনেক চেষ্টা করে জলার মধ্য থেকে মিঃ ক্রানটেনকোকে পাড়ে তুলে আনে। কিন্তু তাঁর দেহে তখন প্রাণ নেই। মিঃ ক্রানটেনকোর এই শোকাবহ মৃত্যুতে আমরা সকলেই অত্যন্ত বেদনা বোধ করেছিলাম।

এই মৃত্যুর ব্যাপারে আইনগত যা-কিছু ব্যবস্থা নেবার দরকার ছিল, তা নেওয়া হল। স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট এ সম্পর্কে তদন্ত করে দেখলেন, এবং যাবতীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ পরীক্ষার পর রায় দিলেন : "আই অ্যাম স্যাটিসফায়েড দ্যাট মিঃ ক্রানটেনকো ডায়েড ইন অ্যান অ্যাকসিডেন্ট।" (অর্থাৎ "এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, মিঃ ক্রানটেনকো দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন।") তাঁর এই রায় শুনে ভিলাইয়ে উপস্থিত রুশ প্রতিনিধিরা খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁরা বললেন, "রাশিয়ার যিনি একজন শ্রেষ্ঠ ধাতু-বিশেষজ্ঞ ইনজিনিয়ার, ভারত-রুশ বন্ধুত্বের বেদীতে তিনি প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। ভারত আমাদের বন্ধু-রাষ্ট্র। আর সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে উনি কিনা বলছেন যে, এতে উনি স্যাটিসফায়েড! এ কি একটা অমানবিক ব্যাপার নয়?" অনেক কষ্টে আমরা আমাদের রুশ বন্ধুদের সেদিন বোঝাতে পেরেছিলাম যে, মিঃ ক্রানটেনকোর মৃত্যু এই ভারতীয় ম্যাজিসট্রেটের পক্ষে মোটেই সন্তোষের ব্যাপার নয়। 'স্যাটিসফায়েড' হওয়ার অর্থ এখানে 'সন্তুষ্ট' হওয়া নয়, 'নিশ্চিত' হওয়া। অর্থাৎ উনি বলছেন যে, এটা যে একটা দুর্ঘটনার ব্যাপার, এ-বিষয়ে উনি নিশ্চিত। অনেক কষ্টে সেদিন একটা আন্তর্জাতিক ভুল-বোঝাবুঝির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছিল!

ভিলাইয়ে যে-সব রুশ কর্মী আমাদের কারখানা গড়ে দেন, ভারতে পাঠাবার আগে রাশিয়ায় তাঁদের নিখুঁত তালিমের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একে তো তাঁদের বিধি-বিধান অত্যন্তই কড়া, কমিউনিস্ট দেশে যা-কিনা খুবই স্বাভাবিক; তদুপরি তাঁরা যেন সর্বদাই সচেতন ছিলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ার মান-মর্যাদা এর উপরে নির্ভর করছে। তাঁরা জানতেন, যথাসাধ্য ভালভাবে তাঁরা দায়িত্ব পালন করবেন, তাঁদের কাছে এইটেই প্রত্যাশা করা হচ্ছে। তাঁদের কর্তারাও কৃতসংকল্প ছিলেন যে, যেমন করেই হোক, উদ্যোগটাকে ষোল-আনা সফল করতে হবে। তাঁদের কর্মসূচী ছিল অত্যন্তই কড়া; তার একচুল এদিক-ওদিক হবার উপায় ছিল না। ফলে আমরাও শশব্যস্ত থাকতুম। উপকরণ কিংবা লোকজন, যখন যেটা আমাদের সরবরাহ করবার কথা, ঠিক তখনই সেটার জোগান দেবার ব্যবস্থা করতে হত। এ-ব্যাপারে এতটুকু ত্রুটি ঘটলে দিল্লিতে রুশ রাষ্ট্রদূত অমনি সরাসরি শ্রীনেহরুর কাছে গিয়ে অভিযোগ করতেন।

এই রকমেরই একটা অভিযোগের সূত্রে শ্রীনেহরু একবার রুশ রাষ্ট্রদূত ও তাঁর সঙ্গীদের সম্মুখীন হবার জন্য ইস্পাত-মন্ত্রী, আমাদের সংস্থার চেয়ারম্যান ও আমাকে ডেকে পাঠান। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে ঢুকে দেখি, বড় বড় আট-দশজন বিশেষজ্ঞকে সঙ্গে নিয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত আগেই সেখানে গিয়ে আসন নিয়েছেন। আমরা গিয়ে আসন নেবার পর তিনি তাঁর পকেট থেকে একটি লিখিত স্মারকলিপি

বার করলেন ও গম্ভীরভাবে সেটা পড়ে শোনাতে লাগলেন। "ইয়োর একসেলেন্সি, আমাদের দুই সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী যে-সময়ে (উপকরণ কিংবা লোকজন যা-ই হোক) সরবরাহ করবার কথা, সেই সময়ে সরবরাহে আপনাদের সংস্থার ব্যর্থতা যে হতাশার সঞ্চার করেছে, সংযুক্ত সোভিয়েট সোস্যালিস্ট্ রিপাবলিকের সরকার সেই হতাশার কথা আপনাকে জ্ঞাপন করবার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন; এবং সংযুক্ত সোভিয়েট সোস্যালিস্ট্ রিপাবলিকের সরকার এ-কথাও আপনাকে জ্ঞাপন করবার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ভিলাইয়ে আপনাদের সংস্থা যদি না এইসব শর্ত মান্য করেন, তাহলে সোভিয়েট সরকার ধরেই নেবেন যে, আপনার সরকারের কাজ যথাসময়ে সম্পাদন করবার যে প্রতিশ্রুতিতে তাঁরা আবদ্ধ, সেই প্রতিশ্রুতি পালনের দায়িত্বও তাঁদের আর রইল না।"

প্রধানমন্ত্রী খুবই মধুরভাবে এ-কথার জবাব দিলেন। তিনি বললেন, সোভিয়েট সরকারের প্রতিনিধিরা যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ইস্পাত-কারখানার নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত করতে বদ্ধপরিকর, এ-কথা জেনে তিনি খুবই খুশী হয়েছেন। আমাদের দুই পক্ষেরই তো এ-ব্যাপারে একই লক্ষ্য। তবে কিনা তাঁর পক্ষে যে রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যের প্রতিটি খুঁটিনাটির মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব নয়, তা তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। খুঁটিনাটি নিয়ে যা-কিছু আলোচনা করবার, তা ইস্পাত-মন্ত্রী আর সিনিয়র অফিসাররাই করবেন; কাজের ব্যাপারে যদি কিছু অসুবিধে দেখা দিয়েই থাকে, তবে শিগগিরই যে তা মিটে যাবে, তাতে সন্দেহ নেই। শুনে মহামান্য রাষ্ট্রদূত এবং তাঁর সঙ্গী বিশেষজ্ঞরা দপ্তর থেকে বিদায় নিলেন। ঘর থেকে তাঁরা বেরিয়ে যাবার পর প্রধানমন্ত্রী তো আমাদের নিয়ে পড়লেন। "কোনও ওজর আমি শুনতে চাই না। ইনি যা বলে গেলেন, তা নিশ্চয়ই সত্যি। অভিযোগ ভিত্তিহীন হলে এক বিদেশী রাষ্ট্রদূত নিশ্চয়ই আমার সামনে বসে এত সব কথা বলতে পারতেন না। দয়া করে তোমরা এখন যাও; ওঁরা যা চাইছেন তা দেবার ব্যবস্থা করো। নয়ত তোমাদের সবাইকে আমি মজা টের পাইয়ে দেব।" কী আর করা। মন্ত্রী, চেয়ারম্যান আর আমি অধোবদনে বেরিয়ে এলুম। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, জারমান রাষ্ট্রদূত কিংবা ব্রিটিশ হাইকমিশনার কিন্তু রৌরকেলা কিংবা দুর্গাপুরের ব্যাপার নিয়ে, প্রধানমন্ত্রী তো দূরের কথা, এমন কী ইস্পাত-মন্ত্রীর কাছে গিয়েও এই ধরনের কোনও অভিযোগ তুলতে ভরসা পেতেন না। মাঝে-মধ্যে এক-আধবার তাঁদের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কিংবা ট্রেড কমিশনার হয়ত আমাদের সঙ্গে এসে দেখা করতেন; দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলতেন, কারখানা-নির্মাণের কাজে কিছু অসুবিধে ঘটছে, এ-ব্যাপারে আমরা হয়ত কিছু সাহায্য করতে পারি।

বিদেশীরা যে-সব যন্ত্র গড়ে তুলতে লাগলেন, সেগুলির দায়িত্ব গ্রহণ ও পরিচালনার জন্য কর্মী সংগ্রহ করা ও তাঁদের তালিম দেবার ব্যবস্থা করাই ছিল আমাদের প্রধান কাজ। ছ হাজারেরও বেশী দরখাস্ত এসেছিল তরুণ ইনজিনিয়ারদের কাছ থেকে। তার থেকে বাছাই করে আড়াই হাজার ইনজিনিয়ার আমরা নেব। তা ছাড়া নিতে হবে আঠারো হাজার অধস্তন টেকনিসিয়ান। কাজটা সহজ নয়, সে-কথা বলাই বাহুল্য। বড় যে দুটি ইস্পাত-কারখানা আমাদের ছিলই, সেই টাটা ও ইনডিয়ান আয়রন থেকে আড়াই শো অভিজ্ঞ ইস্পাত-কর্মীকেও আমাদের নিয়ে আসবার দরকার হয়েছিল। কর্মসূত্রে যখনই আমি জামসেদপুরে যেতুম, টাটা ইস্পাত কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেকটর সার্ জাহাঙ্গীর গান্ধী তখনই আমাকে

বলতেন, "কী স‍ুধীর, এবারে কাকে-কাকে কেড়ে নিতে এসেছ?" কেড়ে নেবার কোনও প্রশ্নই অবশ্য ওঠে না, কেননা সর্বতোভাবে আমাদের সাহায্য করবার জন্য টাটা-প্রতিষ্ঠান ছিলেন সদাপ্রস্তুত। তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা না-পেলে সরকারী ইস্পাত-কারখানার জন্য উপয‍ুক্ত কর্মী সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে কিছ‍ুতেই সম্ভব হত না। বন্ধ‍ুত্বপ‍ূর্ণ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁরা আমাদের এক শোরও বেশী অভিজ্ঞ ইস্পাত-কর্মী দিয়েছিলেন। তা ছাড়া, যে আঠারো হাজার টেকনিসিয়ান নিয়েছিলাম আমরা, তাঁদেরও অধিকাংশকেই তাঁরা ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করেন। মহীশ‍ূরের ছোট্ট ইস্পাত-কারখানাটিতে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব‍ৃহৎ কয়েকটি ইনজিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানেও কিছ‍ু টেকনিসিয়ানকে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মেক্যানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, মেটালারজিক্যাল আর কেমিক্যাল ইনজিনিয়ারিংয়ে ডিগরী-পাওয়া আড়াই হাজার তর‍ুণ ইনজিনিয়ার ছাড়া আরও প্রায় হাজারখানেক টেকনিসিয়ানকে বিদেশে পাঠাবার প্রয়োজন হয়। ভারতবর্ষের যে ছটি ইনজিনিয়ারিং কলেজে ধাতুবিদ্যা পড়ানো হয়, চটপট আমাদের জন্য কিছ‍ু ধাতুবিদ্যা-জানা গ্র্যাজ‍ুয়েট তৈরী করে দেবার জন্যে তাদের প্রত্যেকেরই সাহায্য নিয়েছিলাম আমরা। আমাদের তখন অন্তত ছ শো ধাতুবিদ্যায়-ডিগরী-পাওয়া গ্র্যাজ‍ুয়েট দরকার। কিন্তু তেমন গ্র্যাজ‍ুয়েট ভারতবর্ষে তখন মাত্র দ‍ুশো ছিলেন। ইনজিনিয়ারিং কলেজগ‍ুলির সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থাক্রমে আমরা তাই মেক্যানিক্যাল অথবা কেমিক্যাল ইনজিনিয়ারিংয়ের ডিগরীধারী তর‍ুণ গ্র্যাজ‍ুয়েটদের সেখানে পাঠাতে লাগলাম; এবং মেটালারজি অর্থাৎ ধাতুবিদ্যায় এক বছরের সংক্ষিপ্ত কোর্স পড়িয়ে তাঁরা সেই ছেলেদের 'ইমারজেনসি মেটালারজিস্ট' বানিয়ে তুলতে লাগলেন।

এইসব তর‍ুণ কর্মীকে ট্রেনিং দেবার ব্যাপারে রাশিয়ানদের আগ্রহ ছিল উল্লেখ-যোগ্য। এঁদের মধ্যে এক হাজারেরও বেশী কর্মীকে সোভিয়েট রাশিয়ায় নিয়ে সেখানকার ইস্পাত-কারখানাগ‍ুলিতে ট্রেনিং দিতে ইচ্ছ‍ুক ছিলেন তাঁরা। সেই অন‍ুযায়ী তাঁরা আমাদের সঙ্গে ব্যবস্থাক্রমে একটা কার্যস‍ূচী তৈরী করে ফেললেন। ঠিক হল, ভারতীয় ইনজিনিয়াররা রাশিয়ায় গিয়ে ইউক্রেনে কৃষ্ণসাগরের কাছে জাপোরোশে, ঝদানভ ও আজভস্তালের ইস্পাত-কারখানায় ট্রেনিং নেবেন। সেখানকার জলবায়‍ু নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মান‍ুষদের উপযোগী। ভারতীয়দের তাঁরা রাশিয়ার অন্যত্র পাঠাতে চাইলেন না এই আশঙ্কায় যে, শীতকালে সেখানে তাঁরা হয়ত ঠাণ্ডায় দার‍ুণ কষ্ট পাবেন। তর‍ুণ এইসব ভারতীয় কর্মী যাতে ঠিকমত কাজ শিখতে পারেন, এবং বিদেশে তাঁদের জীবনযাত্রা যাতে মোটাম‍ুটি স্বচ্ছন্দ থাকে, রাশিয়ানরা সেদিকে সতর্ক দ‍ৃষ্টি রেখেছিলেন। এ-ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহ ছিল আন্তরিক। বস্তুত যত লোককে আমরা রাশিয়ায় পাঠাতে চেয়েছিলাম, তার চাইতেও বেশী লোককে তাঁরা ট্রেনিং দিতে রাজী ছিলেন। তবে, বলাই বাহ‍ুল্য, আমাদের অন্য দ‍ুটি ইস্পাত কারখানার জন্য তাঁরা কাউকে ট্রেনিং দিতে ইচ্ছ‍ুক ছিলেন না। তার কারণ, সে-দ‍ুটি কারখানা জারমান আর ব্রিটিশদের গড়া। ব্রিটেনের ইস্পাত-শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতা মোটাম‍ুটি দ‍ু কোটি টন; পশ্চিম জারমানির ইস্পাত-শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতা এক কোটি আশি লক্ষ টন। রাশিয়ার উৎপাদন-ক্ষমতা সেক্ষেত্রে সাড়ে ছ কোটি টন। ব্রিটেন ও পশ্চিম জারমানির পক্ষে স‍ুতরাং স্বভাবতই আমাদের খ‍ুব বেশী কর্মীকে ট্রেনিং দেওয়া সম্ভব ছিল না; এ-ব্যাপারে তাদের সাধ্য ছিল সীমিত। অগত্যা আমরা চেষ্টা করতে লাগলাম যাতে হাজার খানেক তর‍ুণ ভারতীয়

ইনজিনিয়ারকে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ট্রেনিং দিয়ে আনানো যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র বছরে চোদ্দ কোটি টন ইস্পাত উৎপাদন করবার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু আমেরিকার ইস্পাত কারখানায় আমাদের কর্মীদের জন্য ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা শক্ত হয়ে দাঁড়াল। আমরা এ-ব্যাপারে সেখানকার ইস্পাত কারখানাগুলির ফেডারেশনকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু উত্তরে তাঁরা বললেন, "না।" ১৯৫৭ সনের শীতকালে তাঁদের চেয়্যারম্যান মিঃ বেনজামিন ফেয়ারলেস ভারত-সফরে আসেন। মারকিন রাষ্ট্রদূতের ব্যবস্থাপনায় আমাদের স্টীল করপোরেশনের চেয়ারম্যান মিঃ ফেয়ারলেসের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বললেন। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হল না। মিঃ ফেয়ারলেস বললেন, বিদেশী কর্মীদের ট্রেনিং দেবার ব্যাপারে মারকিন ইস্পাত-শিল্পের অভিজ্ঞতা মোটেই মধুর নয়। ভেনেজুয়েলায় আমেরিকানরা একটি ইস্পাত-কারখানা নির্মাণ করেছিল। অতঃপর সেখান থেকে পঞ্চাশজন তরুণ কর্মীকে যুক্তরাষ্ট্রে এনে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতা এই যে, কাজ শিখতে এই তরুণ ভেনেজুয়েলানদের মোটেই উৎসাহ ছিল না; বান্ধবী জুটিয়ে ফূর্তি করতেই তাদের আগ্রহ ছিল। কারখানার কাজকে তারা নোংরা কাজ বলে মনে করত; সে-কাজে তারা পারতপক্ষে হাত লাগাতে চাইত না। তারা ছিল বিলাসী ফূর্তিবাজ ছেলে। না, বিদেশীদের ট্রেনিং দিতে গিয়ে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে তাঁদের; আর তাঁরা তাঁদের ইস্পাত-কারখানার মধ্যে কোনও বিদেশী কর্মীকে ঢোকাতে চান না।

ব্যাপার দেখে আমরা তো মহা সমস্যায় পড়ে গেলাম। আমেরিকার ইস্পাত-সম্রাট মিঃ বেনজামিন ফেয়ারলেসকে যে কী করে এই ট্রেনিংয়ের ব্যাপারে রাজী করাব, সেটা আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত আমি একটা উপায় ঠাওরালাম। সেই সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম আমি; তাঁর সেক্রেটারিকে গিয়ে বললাম, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। প্রধানমন্ত্রীর স্নেহচ্ছায়া ইতিমধ্যে আমি আবার ফিরে পেয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার কোনও অ্যাপয়েনট্‌মেন্‌ট ছিল না। কিন্তু দেখা করবার দরকারটা ছিল জরুরী। আমি খবর পেয়েছিলাম যে, পরদিন সকাল দশটায় মিঃ বেনজামিন ফেয়ারলেস গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। তার আগেই আমি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে রাখতে চাইছিলাম যে, ট্রেনিংয়ের ব্যাপার নিয়ে অসুবিধে দেখা দিয়েছে। "প্রধানমন্ত্রীকে আপনি কি সত্যিই জরুরী কিছু জানাতে চান?" সেক্রেটারি আমাকে এই প্রশ্ন করলেন, এবং যেন কিছুটা অনিচ্ছাভরেই ভিতরে একটা চিরকুট পাঠিয়ে দিলেন। তাতে লেখা ছিল : "সুধীর ঘোষ এসেছেন।"

চিরকুট নিয়ে যে ভিতরে ঢুকেছিল, চটপট সে বেরিয়ে এসে জানাল, প্রধানমন্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। শ্রীনেহরুর ঘরে ঢুকতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপার কী সুধীর? তুমি এখন এখানে কেন?" বললাম, হাজার খানেক তরুণ ইনজিনিয়ারকে আমরা ট্রেনিং নেবার জন্য আমেরিকায় পাঠাতে চাই। কিন্তু তাতে অসুবিধে দেখা দিয়েছে। পরদিন সকালে তো মিঃ বেনজামিন ফেয়ারলেস তাঁর সঙ্গে এসে দেখা করবেন; তখন কি তাঁর পক্ষে মিঃ ফেয়ারলেসকে এ-বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব হবে? এক হাজার শিক্ষার্থীকে আমেরিকায় পাঠানোর বিষয়ে একটা স্মারকলিপি আমার সঙ্গেই ছিল। সেটা আমি শ্রীনেহরুর হাতে তুলে দিলাম, এবং বললাম যে, ফোর্ড ফাউনডেশন এ-ব্যাপারে সমস্ত খরচা দিতে রাজী হয়েছেন,

এখন শুধু ট্রেনিংয়ের সুবিধেটা পেলেই হয়। সেইটে পাওয়া নিয়েই সমস্যা বেধেছে। স্মারকলিপি ছিল দীর্ঘ। অতটা পড়ে দেখবার সময় নিশ্চয় তাঁর হবে না। তাই বললাম, স্মারকলিপির সারমর্মটা আমি তাঁকে মিনিট দুয়েকের মধ্যেই বলতে পারি। শ্রীনেহরু কিন্তু পুরো স্মারকলিপিটিই পাঠ করলেন। তারপর বললেন, "তা এতে অসুবিধেটা কী? তুমি বলছ, এই ফেয়ারলেস লোকটি এদের ট্রেনিংয়ের সুবিধে দিতে রাজী নন? বেশ, তুমি বরং এই কাগজগুলি আমার কাছে রেখে যাও।"

আমাদের বোর্ডের চেয়ারম্যান সাধারণত ঘুম থেকে একটু দেরি করে উঠতেন। পরদিন খুব ভোরবেলায় কিন্তু টেলিফোনের শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ভেবেছিলেন, টেলিফোন তুলে তিনি ধমক লাগাবেন। কিন্তু তা আর হল না। আর কেউ নন, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীই তাঁকে ডাকছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বললেন, এক হাজার তরুণ কর্মীকে ট্রেনিংয়ের জন্যে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাবার ব্যাপার নিয়ে অসুবিধের সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি খবর পেয়েছেন। তা বেলা দশটায় মিঃ ফেয়ারলেস তো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন; চেয়ারম্যান তার মিনিট কয়েক আগে যদি প্রধানমন্ত্রীর কাছে যান তো ভাল হয়। সেই অনুযায়ী আমাদের চেয়ারম্যান তো প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে গেলেন। গিয়ে দেখেন, মিঃ ফেয়ারলেস আর মারকিন রাষ্ট্রদূত তাঁর আগেই সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন; প্রধানমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারির ঘরে বসে অপেক্ষা করছেন তাঁরা। প্রধানমন্ত্রী প্রথমেই আমাদের চেয়ারম্যানকে ডেকে পাঠালেন। ভিতরে ঢুকে মিনিট কয়েক বাদেই আবার বেরিয়ে এলেন তিনি। মিঃ ফেয়ারলেসের উপরে তাঁর এই আগমন-নির্গমনের যে প্রভাব অতঃপর দেখতে পাওয়া গেল, তা বিস্ময়কর। যেন মন্ত্রের মতন কাজ হল এতে। শ্রীনেহরুর ঘর থেকে ডাক পড়বার পর সেখানে ঢুকেই মিঃ ফেয়ারলেস যা বললেন, তা হচ্ছে এই : "মিঃ প্রাইম মিনিসটার, আপনাদের তরুণ ইস্পাত-ইনজিনিয়ারদের ট্রেনিং নিয়ে আপনার সরকার কিছুটা সমস্যায় পড়েছেন শুনতে পেলাম। এ সম্পর্কে আমি ভেবে দেখেছি। এ-ব্যাপারে আপনার সরকারকে আমরা সানন্দে সাহায্য করতে প্রস্তুত।" মিঃ ফেয়ারলেসের কথা শুনে প্রধানমন্ত্রী অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। এ-ব্যাপারে নিজে থেকে তাঁকে কিছুই বলতে হল না।

প্রথম দফায় দুশো ভারতীয় ইনজিনিয়ারকে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়। তাঁরা সেখানে ছ মাস ট্রেনিং নেবার পরে আমেরিকা থেকে আমাদের জানানো হয় যে, বাকী আট শো ইনজিনিয়ারকেও সেখানে পাঠিয়ে দিলে তাঁরা খুশী হবেন। তরুণ এইসব ইনজিনিয়ারকে কয়েকটি গোষ্ঠীতে ভাগ করে পিট্‌স্‌বার্গ, ইয়াংস্‌-টাউন, ক্লীভল্যানড আর শিকাগোতে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করা হয়। মারকিন ইস্পাত-নির্মাতোরা আমাদের জানালেন যে, ভারতীয় তরুণরা কাজ শিখতে খুবই উৎসাহী, কোনও কাজকেই তাঁরা নোংরা বলে গণ্য করেন না, হঠাৎ যদি কোনও মেরামতির কাজে সাহায্য করবার জন্যে ডাক পড়ে তাহলে রাত দুটো-তিনটের সময়েও কারখানায় ছুটতে তাঁদের এতটুকু আপত্তি নেই। যা-কিছু তাঁদের করতে বলা হয়, তা-ই তাঁরা হাসিমুখে করেন, এবং নিজে থেকেই আরও কাজ চেয়ে নেন। ট্রেনিং-কর্মসূচীর যেদিন সূচনা, তার বছর খানেক বাদে আমেরিকার বিভিন্ন শিল্প-ক্ষেত্রে গিয়ে আমাদের এইসব তরুণ ইনজিনিয়ারের সঙ্গে আমি দেখা করি। ভারতীয় শিক্ষার্থী ও মারকিন শিক্ষকদের সঙ্গে বেশ-কিছুটা সময় আমি কাটিয়েছিলাম। সেখানে বিভিন্ন ইস্পাত-কারখানার ম্যানেজার আমাকে জানালেন যে, এই ধরনের দক্ষ

তরুণদের হাতে যদি আমাদের ইস্পাত-শিল্পের ভার পড়ে, তাহলে কোনও চিন্তাই আমাদের নেই। তাঁরা এও বললেন যে, বছর পাঁচেক যদি এইসব ছেলেকে আমরা আমেরিকায় রাখতে রাজী হই, তাহলে এ'দের প্রত্যেককেই তাঁরা তাঁদের কারখানাতেই চাকরি দিতে রাজী আছেন। শুনে তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম যে, তা হবার নয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ'দের আমি এখন দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আমাদের বোর্ডে যে-সব অবসরপ্রাপ্ত সরকারী অফিসার ছিলেন, তাঁরা সকলেই কিন্তু বলেছিলেন যে, এইসব তরুণ ইনজিনিয়ারকে আমেরিকায় পাঠিয়ে লাভ নেই, কারখানার কাজে হাতে কালি মাখতেই এ'রা রাজী হবেন না, এ'রা সবাই 'ভদ্র' কাজের পক্ষপাতী। তাঁদের আশঙ্কাটা যে সর্বৈব ভিত্তিহীন, আমাদের তরুণ ইনজিনিয়াররা তা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন।

ভারত ও আমেরিকার যে-সব যৌথ উদ্যোগ সবচাইতে সফল হয়েছে, ভারতবর্ষের তরুণ এক হাজার ইস্পাত-ইনজিনিয়ারকে ট্রেনিং দেবার এই কর্মসূচী তার অন্যতম। কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখা গেল, ভারতবর্ষ সম্পর্কে রাশিয়ার আচরণ আর পশ্চিমী আচরণের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়। এ-ব্যাপারে রাশিয়ানদের আচরণ অনেক সূক্ষ্ম। সেক্ষেত্রে আমেরিকানদের আচরণে ঔদার্য যতই থাক সূক্ষ্মতা নেই। ১৯৫৮ সনের শরৎকালে আমি আমেরিকায় গিয়ে সেখানকার বিভিন্ন ইস্পাত-কারখানা পরিদর্শন করেছিলাম। আমাদের তরুণ ইনজিনিয়ারদের ট্রেনিং কীরকম চলছে, সেইটে দেখাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যেই আমেরিকা থেকে ফেরবার পথে আমি প্রথমে পশ্চিম জারমানি ও ব্রিটেনে কিছুদিন কাটিয়ে তারপর সোভিয়েট রাশিয়ায় যাই। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে যত খাদ্যের প্রাচুর্য, রাশিয়ায় তা নেই। তৎসত্ত্বেও, ভারতীয় ইনজিনিয়াররা এ-ব্যাপারে যাতে বিন্দুমাত্র অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করেন, রুশ কর্তৃপক্ষ সেদিকে তীক্ষ্ম নজর রেখেছিলেন। ভারতীয়দের আরামে রাখবার জন্য তাঁদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তরুণ এইসব ইনজিনিয়ারের মধ্যে অনেকেই ছিলেন দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। তাঁরা কট্টর নিরামিষাশী। এমন কী, ডিম পর্যন্ত তাঁরা ছোঁন না। সেক্ষেত্রে রাশিয়ার প্রধান খাদ্য হচ্ছে রুটি আর মাংস। এ দুটি খাদ্যের সেখানে কিছুমাত্র অপ্রাচুর্য ছিল না। কিন্তু তীব্র অভাব ছিল টাটকা সবজি আর ফলের। দেখে আশ্চর্য হলাম, নিরামিষাশী ভারতীয় ইনজিনিয়াররা এর জন্যে যাতে অসুবিধেয় না পড়েন, সেদিকেও নজর রাখা হয়েছে; পার্শ্ববর্তী আর একটি অঙ্গরাজ্য থেকে বিমানযোগে সপ্তাহে দুবার করে টাটকা সবজি এনে খাওয়ানো হচ্ছে ভারতীয় ইনজিনিয়ারদের। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষই তাঁদের জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু কি তাই, ভারতীয়রা যে-সব হস্টেলে থাকতেন, শুধু তাঁদের আহার-ব্যবস্থার উপরে নজর রাখবার জন্যেই সেখানে বিশেষ একদল কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল।

সর্বোপরি তাঁদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থাও ছিল নিখুঁত। তরুণ এইসব ভারতীয় ইনজিনিয়ারের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল যথেষ্ট; কিন্তু হাতে-কলমে কাজ করবার সুযোগ ইতিপূর্বে পাননি তাঁরা। বস্তুত ইস্পাত-কারখানার অভ্যন্তর যে কেমন, তা-ই তাঁরা ইতিপূর্বে জানবার সুযোগ পাননি। দেশে ফিরে যে-কাজ তাঁদের করতে হবে, হাতে-কলমে সেইটে তাঁদের করতে দেওয়াই হচ্ছে প্রকৃষ্ট ট্রেনিং, কাজ শেখাবার এর চাইতে ভাল ব্যবস্থা আর কিছুই হতে পারে না। কথা ছিল, ন মাস থেকে এক বছর তাঁরা ট্রেনিং দেবেন। উৎপাদন আর পরিচালনায় কাকে কোন্ কাজ করতে হবে, সেটা স্থিরীকৃত হয়েই ছিল। ব্যবস্থাটা ছিল এই যে, দেশে

ফিরেই সেই কাজের দায়িত্ব তাঁকে নিতে হবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্যের কাজ না-দেখে, সেই বিশেষ কাজটা তিনি যদি হাতে-কলমে করতে পারেন, তবেই তাঁর ট্রেনিং সার্থক হয়।

রাশিয়ানরা ঠিক সেই ব্যবস্থাই করেছিলেন। বেতন না পেলে কী হয়, সোভিয়েট রাশিয়ার ইস্পাত-কারখানাগুলিতে এমনভাবে তাঁদের কাজে লাগানো হল যেন তাঁরা শিক্ষার্থী নন, সেখানকারই কর্মী। রুশ কর্মীদের বলে দেওয়া হয়েছিল, ভারতীয়রা যাতে কাজে অভ্যস্ত হতে পারেন, তার জন্য তাঁরা যেন সর্বতোভাবে তাঁদের সাহায্য করেন, এবং সহকর্মী বলেই তাঁদের গণ্য করেন। ব্যবস্থাটা বেশ ফলপ্রসূ হল। রুশ কারখানা থেকে যাঁরা কাজ শিখে এলেন, স্পষ্টই বোঝা গেল যে, তাঁদের ট্রেনিংটা বেশ কার্যকর হয়েছে।

শুধু একটা ব্যাপারে আমাদের কিছুটা সন্দেহ ছিল। এই যে এত তরুণ কর্মীকে আমরা একটা কমিউনিস্ট দেশে পাঠাচ্ছি, ট্রেনিং-পর্বের সুযোগ নিয়ে এঁদের দীক্ষাদান করা হবে না তো? পরে বুঝলাম, আমাদের সন্দেহটা ভিত্তিহীন। দীক্ষাদানের জন্য প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কোনওরকমের চেষ্টাই করা হয়নি। কমিউনিস্ট পারটির সঙ্গে যার কোনও যোগ আছে, এমন কোনও সভা, আলোচনা-বৈঠক কিংবা সেমিনারে যোগ দেবার জন্য ভারতীয় কর্মীদের সেখানে কখনও উৎসাহ দেওয়া হত না। ভারতীয়দের উপরে শুধু সৌজন্য বর্ষণ করেই তাঁরা ক্ষান্ত ছিলেন। কিন্তু কাজ হয়েছিল তাতেই বেশী। রাশিয়ায় গিয়ে যে সৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহার পেয়েছিলেন আমাদের কর্মীরা, তাতে রাশিয়া সম্পর্কে তাঁদের চিত্তে যথেষ্টই বন্ধুভাবের সঞ্চার হয়েছিল। প্রচারের দ্বারা, তা সে যতই সূক্ষ্ম হোক, এটা সম্ভব হত না।

পক্ষান্তরে মারকিন বন্ধুরাও আমাদের তরুণ কর্মীদের প্রতি যথেষ্ট ঔদার্য দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তার জন্য বিশেষ বাহবা তাঁরা পাননি। ভারতীয় ইস্পাত-কর্মীদের ট্রেনিংয়ের জন্য ফোর্ড ফাউনডেশন থেকে যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল, তার অংকটা মোটেই ছোট নয়। কিন্তু এইসব তরুণ ভারতীয়কে মারকিন ইস্পাত-কারখানার অস্থায়ী কর্মী হিসেবে গণ্য করবার উপায় ছিল না। করতে গেলে সেখানকার ইস্পাত-কর্মী ইউনিয়নই তাতে বাধা দিত। ভারতীয় কর্মীদের সত্যিকারের কাজ দিতে তাই সেখানে যথেষ্টই বেগ পেতে হয়েছিল। নিজে কাজ করা নয়, পাশে দাঁড়িয়ে অন্যের কাজ দেখা, মোটামুটি এই ছিল সেখানকার ট্রেনিং। মারকিন কর্মীরাই অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে ভারতীয় কর্মীদের হাতে-কলমে কাজ শিখবার ব্যবস্থা করে দিতেন। ভারতীয় কর্মীদের তাঁরা খুব পছন্দ করতেন; পাশে-দাঁড়ানো ভারতীয়কে মাঝে-মাঝেই তাঁরা বলতেন, "এসো ভাই, এবারে তুমি একটু হাত লাগাও, আর সেই ফাঁকে বরং আমি একটু জিরিয়ে নিই।" এটা হচ্ছে নিজেদের মধ্যে ব্যবস্থা। এই ধরনের ঘরোয়া ব্যবস্থায় আমাদের কর্মীরা খুবই উপকৃত হতেন; অনেক কাজে তাঁরা এইভাবেই রপ্ত হয়েছিলেন। তবে, কাজের সুযোগ রাশিয়ার কারখানায় যতটা পাওয়া যেত, আমেরিকায় ততটা মিলত না।

এইসব অসুবিধে ছাড়া আর-একটা জিনিসও লক্ষ্য করা গেল। দেখা গেল, ইস্পাত-কর্মীদের কীভাবে ট্রেনিং দিতে হয়, মারকিন বন্ধুদের সে-বিষয়ে কিছু নিজস্ব ধারণা রয়েছে। ভারতীয় শিক্ষার্থীরা সেখানে যে-সব ইস্পাত-কেন্দ্রে শিক্ষা নিতে গিয়েছিলেন, তার প্রতিটিতেই তাঁদের জন্য বিশেষ লেকচার-কোর্সের ব্যবস্থা

করা হত। স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেই আয়োজন হত এইসব বক্তৃতার। মারকিন সাহিত্য, মারকিন ইতিহাস, মারকিন জীবন-ব্যবস্থা, ইত্যাদি ছিল তার বিষয়। ভারতীয় কর্মীদের এইসব বক্তৃতা শুনতে বলা হত। এ-সব বক্তৃতা শুনলে যে কোনও ক্ষতি আছে, তা নয়, তবে কিনা ইস্পাত-বিষয়ক শিক্ষার সঙ্গে এর কোনও যোগ নেই। তবে কেন এ-সব বক্তৃতা শুনতে হবে? থিয়োরিটা এই যে, আজ যাঁরা কাজ শিখছেন, সেই তরুণ শিক্ষার্থীরা একদিন তো উচ্চপদে আসীন হবেন, সুতরাং নিতান্ত কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা না করে এঁদের জন্য একটা উদার শিক্ষা-ব্যবস্থার আয়োজন করা দরকার। কথাটা শুনতে ভাল; কিন্তু সমস্যা এই যে, ন মাস থেকে এক বছরের জন্যে এঁদের বিদেশে পাঠানো হয়েছে, সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে ইস্পাত-উৎপাদন সম্পর্কে যতটা সম্ভব কাজ এঁদের শিখে আসতে হবে। তার মধ্যে ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ কই। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে হাতে-কলমে কাজ শেখা। এর মধ্যে আরও পাঁচ-রকম বিষয় ঢোকাতে গেলে অকারণে সময় আর উদ্যমের অপচয় হবে মাত্র। মারকিন বন্ধুরা কিন্তু আমাদের যুক্তি মেনে নিলেন না। বললেন, যে শিক্ষা-ব্যবস্থার আয়োজন তাঁরা করেছেন, সেটাই ভাল। অগত্যা আমাদের চেয়ারম্যান আর কী করেন; তিনি বললেন, "যে-ভাবে ওরা ট্রেনিং দিতে চায় সেইভাবেই দিক। ভিক্ষের চাল কাঁড়া না আকাঁড়া তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।"

এমনিতে কমিউনিস্‌ট্‌রা দীক্ষাদানে আর প্রচার চালাতে বেশ তৎপর। কিন্তু এক্ষেত্রে সে-চেষ্টা তারা করেনি। ফলে তারা এই সুনাম অর্জন করল যে, তারা আমাদের নিঃস্বার্থ বন্ধু, অন্য দিকে নজর না দিয়ে আমাদের তরুণ কর্মীদের তারা ইস্পাত-উৎপাদনে যথাসাধ্য ট্রেনিং দিচ্ছে। পক্ষান্তরে, মারকিনদের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক আদর্শগত সংঘাত না থাকা সত্ত্বেও, তারা এই ধারণা সৃষ্টি করল যে, সুযোগ পেয়ে তারা মারকিনী প্রচার চালাচ্ছে। আমাদের কর্মীরা যে মারকিন ইস্পাত-কারখানায় গিয়ে ট্রেনিং নিলেন, কারখানাগুলি তার জন্য ফী বাবদে কোনও অর্থ দাবি করেনি; ফলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এ-বাবদে আদৌ অর্থব্যয় হয়নি। ব্যয় হয়েছিল অন্য বাবদে। সাহিত্য সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে যে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হল, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে তার জন্য বিস্তর অর্থ দিতে হল।

ব্রিটেন আর পশ্চিম জারমানিতে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা বেশ ভালই হয়েছিল। ব্রিটিশ কিংবা জারমান সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে বক্তৃতা শোনাতে সেখানকার কর্তৃপক্ষ আদৌ ব্যগ্র ছিলেন না। তবে ভারতীয় ইনজিনিয়ারদের তাঁরাও অস্থায়ী কর্মী হিসেবে গ্রহণ করতে পারেননি। বাধা এসেছিল ইউনিয়নগুলি থেকে। ফলে, কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা সত্ত্বেও ঠিক হাতে-কলমে কাজ শিখবার ব্যবস্থা করা গেল না। তবে ব্রিটিশ আর জারমান কর্মীরাও ছিলেন মারকিন কর্মীদের মতই সহৃদয়। নিজেদের মধ্যে ব্যবস্থা করে নিয়ে ভারতীয়রা তাই অনেক সময় হাতে-কলমে কাজ শিখবার সুযোগ পেতেন। কমিউনিস্‌ট দেশে ইউনিয়নের ঝঞ্ঝাট নেই। কর্তারা যে সিদ্ধান্ত নেন, সেই অনুযায়ীই সেখানে কাজ হয়।

এক সহস্রেরও বেশী ভারতীয় কর্মীকে হাতে-কলমে কাজ শেখানো হল সোভিয়েট রাশিয়ার বিভিন্ন ইস্পাত-কারখানায়। এ ছাড়া আর-একটা ব্যাপারেও রাশিয়ানরা ব্রিটিশ আর জারমানদের উপরে টেক্কা দিল। ভিলাইয়ের কারখানা গড়ে তুলতে তিন বছর সময় লেগেছিল। নির্মাণের কাজ যখন শেষ হয়ে এসেছে, তখন

সোভিয়েট কর্মী-দলের সর্বোচ্চ নেতা জি. এফ. মিচেলিভিচ্ একদিন আমার সঙ্গে এসে দেখা করলেন। উৎপাদন আর পরিচালনার নানা ব্যাপারে যাঁদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে, রাশিয়ার বিভিন্ন ইস্পাত-কারখানা থেকে বাছাই করে এমন সাড়ে তিন শো অভিজ্ঞ কর্মীর একটি তালিকা তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। সেটি তিনি আমাকে দেখালেন। তালিকায় যাঁদের নাম ছিল, তাঁরা সবাই নেহাত বিভাগীয় সুপারিনটেনডেন্ট কিংবা সহকারী-সুপারিনটেনডেনট নন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ফোরম্যান, সহকারী-ফোরম্যান ইত্যাদি। রাশিয়ানরা চেয়েছিলেন যে, ভিলাই-কারখানায় উৎপাদনের কাজটা যাতে প্রথম পর্যায় থেকেই সাফল্যমণ্ডিত হয়, তার জন্য উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রতি স্তরে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ভারতীয় কর্মীদের পাশে একজন করে অভিজ্ঞ রুশ কর্মীও থাকবেন। প্রস্তাব শুনে আমাদের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা বললেন, কারখানা পরিচালনার জন্য আমাদের একটি পুরো-দস্তুর সংস্থা তো রয়েছেই; তার উপরে আবার সাড়ে তিন শো বিদেশী কর্মী নিয়োগের কোনও যুক্তি আছে বলে তিনি মনে করেন না। এঁদের নিয়োগ করতে হলে আমাদের আরও পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হবে। অর্থনৈতিক উপদেষ্টার মতে, এটা নেহাতই অপব্যয় মাত্র। কিন্তু রাশিয়ানরা তবু অটল। তাঁরা বললেন, এ তো শুধুই ভারত সরকারের সুনাম-দুর্নামের ব্যাপার নয়, সোভিয়েট সরকারের মানমর্যাদাও এর উপরে নির্ভর করছে। সুতরাং ভিলাই কারখানার উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোনও গণ্ডগোলের ঝুঁকি তাঁরা নিতে পারবেন না। সাময়িকভাবে এই সাড়ে তিন শো অভিজ্ঞ রুশ ইস্পাত-কর্মীকে কাজে নেবার ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে। যখনই কোনও ভারতীয় কর্মীর মনে হবে যে, নিজের চেষ্টাতেই তিনি কাজ চালাতে সমর্থ, তখনই তাঁর রুশ-সহকর্মীটিকে রাশিয়ায় ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করা হবে। মোট কথা, সোভিয়েট সরকারের প্রতিনিধিরা কোনও ঝুঁকি নিতে রাজী নন।

ব্যবসায়িক লাভ-লোকসানের বিচারেও তাঁদের যুক্তিটা ছিল পাকা। তাঁরা বললেন যে, রৌরকেলার মতন ভিলাই কারখানাতেও যদি উৎপাদনের প্রথম পর্যায়ে কাজ ভাল না হয়, এবং সেই প্রাথমিক ঝঞ্ঝাটের জের কাটিয়ে উঠতে যদি দু-তিন বছর সময় লেগে যায়, তবে কম-উৎপাদনের দরুন যে-টাকা আমাদের লোকসান হবে, তা প্রায় একটা নতুন কারখানা নির্মাণের ব্যয়ের সমান হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেই তুলনায় সাড়ে তিন শো বিদেশী কর্মী নিয়োগের ব্যয় যৎসামান্য—মাত্র পঞ্চাশ লাখ টাকা। রাশিয়ানদের সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার এই নিয়ে যে দড়ি-টানাটানি চলল, অতঃপর আমি তার একটা রফা করে দিলুম। মিচেলিভিচ আর আমি—দুজনে মিলে পরীক্ষা করলুম সেই তালিকাটিকে; তারপর কর্মীর সংখ্যাকে সাড়ে তিন শো থেকে দুশো পঁচাশিতে নামিয়ে আনলুম। উৎপাদনের প্রথম পর্যায়ে এই রুশ-কর্মীরা যে ভিলাইয়ে উপস্থিত ছিলেন, ভিলাই-কারখানার সাফল্যের সেটাই মূল কারণ। রৌরকেলায় জারমানরা যে কারখানাটি বানিয়েছে, স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতায় পৌঁছতে তার সাত-আট বছর লেগে গিয়েছিল। দুর্গাপুরের ব্রিটিশ কারখানাটির লেগেছিল দু-তিন বছর। ভিলাইয়ের রুশ কারখানাটি সেক্ষেত্রে মাত্র এক বছরের মধ্যেই স্বাভাবিক উৎপাদন-ক্ষমতায় পৌঁছে যায়। কাজ শুরু হবার পর সেখানে আদৌ কোনও বিভ্রাট ঘটেনি। শুরু থেকেই সব নির্ঝঞ্ঝাট।

তবে বলাই বাহুল্য, ব্রিটিশ কিংবা জারমানদের পক্ষে তাদের নিজেদের দেশ থেকে আমাদের কারখানার জন্য শ পাঁচেক অভিজ্ঞ ইস্পাত-কর্মী আনিয়ে দেওয়া

সহজও ছিল না। জোর করে তো কাউকে সেখান থেকে আনাবার উপায় নেই; যাঁর ইচ্ছে তিনি আসবেন, যাঁর ইচ্ছে নয় তিনি আসবেন না। ভারতবর্ষে এসে একটা অস্থায়ী চাকরি নেবার জন্য সেখানকার কোনও ইস্পাত-কর্মী উৎসাহিতই বা হবেন কেন? দেশে তিনি যে বেতন পাচ্ছেন, তার চাইতে অনেক বেশী বেতন যদি দেওয়া হয়, তবে অবশ্য তিনি আসতে ইচ্ছুক হতে পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তাঁর স্ত্রীর যদি গরম-দেশে আসবার ইচ্ছে না থাকে, তাহলে তিনি আসবেন না। বিদেশে এসে ছেলেপুলেদের লেখাপড়া শেখানোটাও তো একটা সমস্যা। তা ছাড়া, এখানে আসবার আরও একটা অসুবিধে আছে। দেশে ফিরে তাঁকে হয়ত দেখতে হবে যে, আর-কাউকে তাঁর জায়গায় প্রোমোশন দেওয়া হয়েছে, এবং নিজে তিনি প্রোমোশন পাবার সুযোগ হারিয়েছেন। এ-সব দেশ থেকে একমাত্র তাঁরাই ভারতে আসতে ইচ্ছুক ছিলেন, চাকরি থেকে যাঁরা অবসর নিয়েছেন কিংবা অবসর নিতে যাঁদের আর সামান্যকাল বাকী। তরুণদের মধ্যেও একদল অবশ্য আসতে রাজী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা নেহাতই দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী। তাঁদের আনিয়ে বিশেষ লাভ হত না।

মারকিন, ব্রিটিশ কিংবা জারমান বন্ধুরা যে আমাদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক ছিলেন না, তা নয়। আসলে সাহায্য করবার ব্যাপারে তাঁদের সত্যিই কিছু অসুবিধে ছিল। একটা বিষয়ে অবশ্য তাঁদের আচরণে আমরা হতাশ হয়েছি। ট্রেনিং নিতে যে-সব তরুণ ইনজিনিয়ারকে আমরা বিদেশে পাঠিয়েছিলাম, তাঁরা যখন ফিরে এলেন, কারখানা নির্মাণের কাজ তখনও শেষ হয়নি। স্বভাবতই আমরা ভেবেছিলাম যে, নির্মাণকার্য শেষ হবার পর এঁদের যাঁর যে-অংশের দায়িত্ব নেবার কথা, নির্মাণ-কার্য চলতে থাকাকালেই তিনি সেই বিশেষ অংশের নির্মাণকার্যের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, ফলে আপনাপন কাজের সঙ্গে আগে থাকতেই তাঁদের পরিচয় হয়ে থাকবে। এই ধরনের অগ্রিম পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য; যন্ত্রের প্রতিটি খুঁটি-নাটি ব্যাপার এর ফলে জানা হয়ে যায়, এবং পরে তাতে কাজের খুব সুবিধে হয়। যন্ত্র সরঞ্জামকে মেরামত করবার দায়িত্ব যাঁদের হাতে, তাঁদের পক্ষে তো এই পরিচয়ের প্রয়োজন আরও বেশী। কিন্তু বিদেশী কর্মীরা তখন তাড়াতাড়ি নির্মাণ-কার্য শেষ করতে ব্যস্ত; শয়ে শয়ে তরুণ ভারতীয় কর্মী কারখানায় ছড়িয়ে থাকুন, এটা তাঁরা পছন্দ করতেন না। তাঁরা বললেন, এতে তাঁদের কাজের অসুবিধে হয়, কাজ ঠিকমত এগোয় না। যে-কারখানার দায়িত্ব একদিন তাঁদেরই হাতে পড়বে, বিদেশী বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে তার কাজ আগে থাকতেই জেনে নিতে ভারতীয় তরুণরা খুবই আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু রৌরকেলা আর দুর্গাপুরে কারখানা-নির্মাতারা সেই আগ্রহকে বিশেষ আমল দেননি।

রুশ কর্মীরা এ-ব্যাপারে যে ধৈর্য আর সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা সত্যিই আদর্শ হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য। তরুণ ভারতীয় কর্মীদের সম্পর্কে এতটুকু বিরক্তি-ভাব তাঁরা কখনও দেখাননি। সত্যের খাতিরেই স্বীকার করতে হবে যে, কমিউনিজমের রাজনীতি যা-ই হোক, ভিলাইয়ের এই কারখানা নির্মাণের ব্যাপারে রুশরা তাঁদের যাবতীয় কারিগরী জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় তরুণদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। জারমান আর ব্রিটনদের কাছে এই কারখানা নির্মাণের কাজটা ছিল যেন নেহাতই একটা ব্যবসায়িক ব্যাপার, একটা ঠিকা মাত্র। দুর্গাপুরের কারখানার কথাই ধরা যাক। ব্রিটিশ কনসরটিয়ামটির

সঙ্গে এই কারখানার জন্য যে কনট্রাক্ট করা হয়েছিল (এগারো কোটি পাউণ্ডের উপরে), তত বড় কনট্রাক্ট ব্রিটিশ শিল্প-জগৎ আর কখনও পায়নি। আপন দেশের শিল্প-সামর্থ্য সম্পর্কে যেমন জারমানরা, তেমনি ব্রিটনরাও ছিল গৌরবান্বিত। যে-কাজের দায়িত্ব তারা নিয়েছিল, তাতে তারা ফাঁকিও দেয়নি। সে-কাজ তারা যথাসাধ্য ভালভাবেই করেছে। তবু একটা কথা ঠিক। সেটা এই যে, তাদের মূল প্রেরণা ছিল মুনাফা। সেটা অবশ্য অন্যায় কিছু নয়। তবে রাশিয়ানরা সেক্ষেত্রে 'না-মুনাফা না-লোকসান'-এর নীতিতে এ-কাজ করেছে। ভারতের চিত্তে রেখাপাত করাই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। সেদিক থেকে বিচার করলে বলতেই হয় যে, তাদের সাফল্য অসামান্য।

রাশিয়া জানত, শিল্পের ক্ষেত্রে ভারত প্রাগ্রসর নয় বটে, কিন্তু তার আত্মসম্মান খুব প্রবল। ভারতীয়দের সম্পর্কে রাশিয়ানদের মনোভাব ছিল মোটামুটি এই: "তোমরা ভারতীয়রা যে আমাদের কমিউনিজ্‌মকে বোঝ না, তা আমরা জানি। আমরাও তোমাদের ওই ডেমোক্রেসি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি না। কিন্তু তা হোক, পরস্পরের আমরা বন্ধু। সুতরাং ডেমোক্রেসি ভাল, না কমিউনিজ্‌ম ভাল, তা নিয়ে ঝগড়া করে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তার চাইতে বরং এসো, কাজে হাত দেওয়া যাক। শিল্পে তোমাদের দেশ এখনও অগ্রসর নয়; তোমাদের মূল শিল্পগুলিকে যতক্ষণ না গড়ে তুলতে পারছ, ততক্ষণ তোমরা যথার্থ স্বাধীন হতে পারবে না। বিনা-ইস্পাতে ভারতীয় অর্থনীতির প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর তাই দশ লক্ষ টন উৎপাদন-ক্ষমতার একটা ইস্পাত-কারখানা গড়ে দেবার জন্যে ভারতবর্ষে আমরা প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি আর আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম নিয়ে এসেছি। খাতায়পত্রে আমরা লিখে রাখছি যে, তোমাদের কাছে আমাদের এত কোটি রুবল পাওনা। কিন্তু কারখানায় উৎপাদন শুরু হবার প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে তার কণামাত্রও তোমাদের মেটাতে হচ্ছে না। সুদের হার মাত্র দু পারসেন্ট। সেটা নেহাতই সারভিস চার্জ্‌। অর্থাৎ তোমাদের কাছ থেকে আমরা কিছুই লাভ করছি না। ছ-সাত বছরের মধ্যেই তোমরা দেখতে পাবে যে, যে কারখানাটি আমরা গড়ে দিচ্ছি, তারই আয় থেকে তোমাদের পক্ষে আমাদের দেনা মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব। এর মধ্যে দয়া-দাক্ষিণ্যের কোনও প্রশ্ন নেই। আমরা তোমাদের দান হিসেবে কিছু দিচ্ছি না; তোমরাও আমাদের কাছ থেকে দান হিসেবে কিছু নিচ্ছ না।"

ভারতবর্ষ সম্পর্কে এই হচ্ছে রাশিয়ার মনোভাব। এর সঙ্গে মারকিন মনোভাবের একবার তুলনা করে দেখুন। বিহারের কয়লাখনি অঞ্চলে, বোকারোতে, ভারতবর্ষের চতুর্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত-কারখানা নির্মাণের ব্যাপারে আমেরিকানরা যাতে উৎসাহী হয়, তার জন্য আমিও কিছু চেষ্টা করেছিলাম। অধ্যাপক কেনেথ গলব্রেথ তখন ভারতে মারকিন রাষ্ট্রদূত। ভারতের তিনি একজন অকৃত্রিম বন্ধু। এই ইস্পাত-প্রকল্পের ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তখন মিঃ কেনেডি। ভারতবর্ষকে তিনিও গভীরভাবে ভালবাসতেন। বোকারো প্রকল্পে তিনিও ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। এমন কী, প্রকাশ্যেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারত সরকার যদি এটাকে রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাই করতে চান, তবে তাতেও এর ব্যয়ভার বহনে আমেরিকার রাজী না হবার কোনও যুক্তি নেই। রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎ-শিল্প গড়ে তুলবার জন্য মারকিন সরকার যদি কানাডাকে বিরাট অঙ্কের ঋণ দিতে পেরে থাকেন, তবে রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত-কারখানা নির্মাণের জন্য

ভারতকেই বা আমেরিকা ঋণ দিতে পারবে না কেন? এর উৎপাদন-ক্ষমতা হবে চল্লিশ লক্ষ টন, এশিয়ায় এটিই হবে বৃহত্তম ইস্পাত-কারখানা, এটা একটা সবাইকে-ডেকে-দেখাবার-মতো ব্যাপার হবে, আমেরিকার শিল্প-সামর্থ্যের এটি হবে একটি প্রকৃত নিদর্শন—বছর খানেক ধরে কত সাংবাদিক বৈঠকে কত কথাই না মারকিন রাষ্ট্রদূত বলেছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কী দেখলুম আমরা?

সূচনাতেই খিঁচ বাধল। আমেরিকানরা দাবি জানালেন, বোকারোতে আদৌ একটা ইস্পাত কারখানা করা 'সম্ভব' কিনা, তাঁরাই সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত করবেন। কই, ভিলাইতে একটা ইস্পাত কারখানা করা সম্ভব কিনা, রাশিয়ানরা তো এমন দাবি জানাননি যে, তাঁরাই সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। কাঁচামাল, জল, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য উপকরণ কতটা থাকলে ইস্পাত কারখানা করা সম্ভব হয়, তা বুঝবার মতন কারিগরী জ্ঞান ভারতবর্ষের আছে। ভারতবর্ষের ইস্পাত-উৎপাদন ক্ষমতা এখন ষাট লক্ষ টন; সেটাকে নব্বই লক্ষ টনে পৌঁছে দেবার কাজ চলেছে। ১৯৭০ সনের মধ্যেই ভারতবর্ষ এক কোটি নব্বই লক্ষ টন উৎপাদন-ক্ষমতার অধিকারী হতে ইচ্ছুক। যে-দেশের লোকসংখ্যা সাতচল্লিশ কোটি, এটা তার পক্ষে এমন-কিছু বিরাট লক্ষ্য নয়। এই অবস্থায় ভারত যদি সিদ্ধান্ত করে থাকে যে, বোকারোতে দশ লক্ষ টন উৎপাদন ক্ষমতার একটা ইস্পাত কারখানা করা সম্ভব, তাহলে সেই সিদ্ধান্তটা ঠিক হল না বেঠিক হল, আমেরিকার তো তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও দরকার ছিল না। এটা নেহাতই অনধিকার-চর্চা। বড়জোর তারা জানাতে পারত, কোন্ শর্তে তারা এতে সহযোগিতা করতে রাজী। এও তারা বলতে পারত যে, রাশিয়ানরা যেমন করেছে, তেমনি তারাও এক্ষেত্রে প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে শুরু করে উৎপাদন-পর্ব পর্যন্ত প্রতিটি কাজ তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে করবে। সেটা বলবার অধিকার তাদের অবশ্যই ছিল। কিন্তু সে-দিক দিয়ে তারা গেল না। তার বদলে 'সম্ভাব্যতার রিপোর্ট' দেবার জন্যে তিরিশ-চল্লিশ জন মারকিন ইস্পাত-বিশেষজ্ঞকে ভারতে পাঠানো হল। মাস কয়েক পরিশ্রম করে তাঁরা তো একটি পর্বতপ্রমাণ রিপোর্ট দাখিল করলেন। তাতে বলা হল যে, এটিকে যদি লাভজনক উদ্যোগ হতে হয়, কারখানাটির উৎপাদন-ক্ষমতা তবে চল্লিশ লক্ষ টন হওয়া চাই (সেক্ষেত্রে শুধু বৈদেশিক মুদ্রাই লাগবে এক শো কোটি ডলার)। কিন্তু উৎপাদন-ক্ষমতা দশ লক্ষ টন হলে যে উদ্যোগটা কেন লাভজনক হবে না, সেটা বোঝা গেল না। টাটা আর ইনডিয়ান আয়রনের দৃষ্টান্ত তো রয়েছে; তাঁদের উদ্যোগ তো যথেষ্টই লাভজনক। তবে? মারকিন বিশেষজ্ঞদের এই চল্লিশ-লক্ষ-টনী দাবির তাহলে অর্থ কী? শুধু তাই নয়, রিপোর্টে নেহাতই অযাচিতভাবে উপদেশ দেওয়া হল যে, এর পরিচালন-ভার কোনও বেসরকারী সংস্থার হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত।

একদিকে যখন এইসব চলছে, অন্যদিকে তখনও অর্থসাহায্য আসবার লক্ষণ নেই। বিশেষজ্ঞদের এই রিপোর্ট অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-কর্তৃপক্ষ কংগ্রেসকে জানালেন যে, মারকিন উদ্যোগে ভারতবর্ষে একটা ইস্পাত কারখানা গড়া হবে, তার জন্য এক শো কোটি ডলার চাই। ভারতীয় বন্ধুরা কিন্তু মারকিন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন যে, দশ লক্ষ টন উৎপাদনের ক্ষমতা সম্পন্ন একটা ইস্পাত-কারখানা গড়বার জন্য তাঁরা বরং কংগ্রেসের কাছে কুড়ি কোটি ডলার বরাদ্দ প্রার্থনা করুন। সেটা তাঁরা তিন বছরে গড়ে দিতে পারবেন। তারপর বরং আবার তাঁরা কুড়ি কোটি ডলার প্রার্থনা করুন। এইভাবে দফায়-দফায় বরাদ্দ মঞ্জুর করিয়ে দফায়-দফায় সেই

কারখানার সম্প্রসারণ ঘটানো যাবে। কিন্তু সে-কথায় তাঁরা কান দিলেন না। তার ফল হল এই যে, ১৯৬৩ সনের গ্রীষ্মকালে সেনেটর ও কংগ্রেস-সদস্যদের কমিটীতে যখন বৈদেশিক সাহায্য বিল পরীক্ষা করে দেখা হল, একটিমাত্র খাতে সাহায্য বাবদে এক শো কোটি ডলার মঞ্জুর করতে তাঁরা তখন রাজী হলেন না। বিদেশে আমেরিকার সাহায্যের ইতিহাসে সত্যিই এ এক অভিনব ঘটনা। একজন রাজনীতিক তো বিলের মধ্যে ভারতবর্ষের নাম না-করেই এই মর্মে একটি শর্ত ঢুকিয়ে দিলেন যে, কোনও উন্নয়নশীল দেশেই উন্নয়নের বিশেষ একটি খাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে দশ কোটি ডলারের বেশী বিনিয়োগ করা উচিত হবে না। বোকারোতে মার্কিন উদ্যোগে যে ইস্পাত কারখানা গড়বার কথা হয়েছিল, এইখানেই তার উপরে যবনিকা পড়ল। এবং পুনর্বার যবনিকা উঠতেই দেখা গেল যে, রাশিয়ানরা এসে মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্তটিকে বেছে নিয়েই যে তারা মঞ্চে ঢুকেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তারা বলল, আমেরিকানরা যদি বোকারোতে ইস্পাত কারখানা গড়তে রাজী না থাকে তো ভারতবর্ষের জন্যে তারাই সে-কারখানা সানন্দে গড়ে দেবে। তা তারা ঠিকই দেবে। এবং ভিলাইয়ের তুলনায় বোকারোর কাজের মাধ্যমে যে তারা আরও গভীর-ভাবে ভারতবর্ষের চিত্তে রেখাপাত করবে, তাতেও সন্দেহ নেই।

উন্নয়নশীল দেশের শিল্পায়নের প্রশ্নে রাশিয়ানদের ভূমিকা খুবই সূক্ষ্ম। ভারতীয় জনমতের উপরে তারা তাই গভীরভাবে রেখাপাত করতে পেরেছে। আমি তো কমিউনিজ্মে বিশ্বাসী নই। কিন্তু ভারতের মূল সমস্যা কী, তার উপলব্ধিতে যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে তারা, আমিও তাতে মুগ্ধ না হয়ে পারিনি। ভারতীয় ইনজিনিয়ারদের ট্রেনিং দেবার কী ব্যবস্থা হয়েছে, তা দেখবার জন্য, এবং একইসঙ্গে রুশ ইস্পাত শিল্পের পরিচালন-ব্যবস্থার বিন্যাস ও বিশেষ যান্ত্রিক দক্ষতার পরিচয় লাভের জন্য আমাদের স্টীল করপোরেশনের পক্ষ থেকে ১৯৫৮ সনের শরৎকালে আমি সরকারীভাবে রাশিয়া-সফরে গিয়েছিলাম। সেইসময়ে মস্কোয় এ সম্পর্কে তাদের সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল, তার থেকেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, সমস্যার বিচার তারা কীভাবে করে।

আমি গিয়ে মস্কোয় পেঁছবার পর মিঃ শেরমেটিয়েভের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। অন্যান্য দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা সংক্রান্ত স্টেট কাউনসিলের তিনি চেয়ারম্যান। সোভিয়েট রাশিয়ার ইস্পাত-শিল্প সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে প্রায় ঘণ্টা তিনেক আমার কথা হয়েছিল। রুশ ইস্পাত-শিল্পের সর্বোচ্চস্থানীয় পনর জন বিশেষজ্ঞও সেই আলোচনা-বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। একজন সোভিয়েট অফিসারের সঙ্গে তাঁরা আমাকে ইউক্রেনের ইস্পাত-কারখানাগুলি দেখতে পাঠান। সে-যাত্রায় কিরিভয় রগের লৌহখনি এবং স্তালিনো অঞ্চলের একটি কয়লাখনিও আমি দেখেছিলাম। মস্কোয় ফিরে সাক্ষাৎ হল প্রবীণ একদল মার্কিন ইস্পাত-বিশেষজ্ঞের সঙ্গে; রাশিয়া-সফরে এসে তাঁরা তখন সোভিয়েট ইস্পাত-শিল্পের কর্মপদ্ধতিটা বুঝতে পেরেছেন। দেখে তাঁরা বিস্মিত হয়েছিলেন যে, রুশ ব্লাস্ট ফারনেস আর ওপেন হার্থ ফারনেসের কর্মক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় শতকরা আরও পঁচিশ-তিরিশ ভাগ বেশী। যন্ত্রবিজ্ঞানে এই সাফল্যের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। আমি অবাক হয়েছিলাম রুশ ইস্পাত-কারখানাগুলির আবহাওয়া দেখে। ইউরোপ আর আমেরিকার ইস্পাত-কারখানার আবহাওয়ার সঙ্গে এর পার্থক্যটা একেবারে মৌলিক। প্ল্যান্টের ডিরেকটর থেকে শুরু করে সাধারণ একজন কর্মী পর্যন্ত প্রতিটি

স্তরেই যেন একটা আশ্চর্য উদ্দীপনা ছড়িয়ে আছে। সেই উদ্দীপনাই হচ্ছে এদের সাফল্যের চাবিকাঠি। জবরদস্তি কাজ করিয়ে নিয়ে সাফল্য অর্জনের ব্যাখ্যাটা এখানে খোপে টেঁকে না। মূল বেতন এবং অন্যান্য আকর্ষণের ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক দেশের মতই। এদের সমাজ শ্রেণীহীন নয়; তবে শ্রেণীর সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু সেটাও কোনও কথা নয়। সর্বোপরি একটা বাড়তি-কিছুর প্রেরণা এদের মধ্যে কাজ করছে। নেহাতই হুকুম তামিল করে কাজ করে যাচ্ছে এরা, এমন সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। বলা বাহুল্য, এদের বাক্-স্বাধীনতা নেই, ধর্মঘট করবার অধিকার নেই, মাইনে বাড়াবার জন্যে কর্তাদের সঙ্গে লড়াই করবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু কিছু-একটা আছে। তারই প্রেরণায় এরা কাজ করে।

ইস্পাত-কয়লা অঞ্চল থেকে মস্কোয় ফিরে আসবার পর রুশ ইস্পাত-কর্তারা একটি শৌখিন রেস্তোরাঁয় আমাকে মধ্যাহ্ন ভোজের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। রেস্তোরাঁটির নাম 'প্রাহা'। অতিথিদের এ-দেশে সাধারণত হোটেলে-রেস্তোরাঁতেই আপ্যায়ন করা হয়, বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় না। বিকেল তিনটেয় মধ্যাহ্নভোজ শুরু হল, চলল ছটা পর্যন্ত,—মস্কোতে এ অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। অসংখ্য কোর্স, তার মধ্যে ভারত আর সোভিয়েট রাশিয়ার শাশ্বত মৈত্রী কামনা করে কতবার যে টোস্ট করা হল, তারও হিসেব নেই। আলোচনার অন্ত্যপর্বে সোভিয়েট ইস্পাত-শিল্পের একজন বড়কর্তা—মেজর ভিনোগ্রাদভ—দোভাষীর মারফত আমাকে বললেন যে, তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করতে চান। প্রশ্নটাকে যদি আমার অস্বস্তিজনক বলে মনে হয়, তাহলে তার উত্তর দেবার দরকার নেই। শুনে আমি বললুম, উত্তর যদি আমার জানা থাকে, তাহলে নিশ্চয় দেব।

প্রশ্নটা সত্যি অস্বস্তিকর। মেজর ভিনোগ্রাদভ বললেন, সেরা এগারো শো রুশ কর্মী ভিলাইয়ে গিয়ে ভারতীয় কর্মীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একটি ইস্পাত-কারখানা গড়ে তুলছেন। কাজ কেমন চলছে, ভিলাই থেকে সে-বিষয়ে তাঁরা নিয়মিত রিপোর্ট পেয়ে থাকেন। রাশিয়ানরা চীনেও এই রকমের ইস্পাত কারখানা গড়ে তুলছেন, এবং অনুরূপ রিপোর্ট সেখান থেকেও পাওয়া যায়। ভিলাইয়ের রিপোর্টে ভারতীয় ইনজিনিয়ার আর সাধারণ কর্মীদের খুবই সুখ্যাতি থাকে। রুশ কর্মীরা তাঁদের আগ্রহ আর দক্ষতায় মুগ্ধ। ভারতবর্ষে যে ইনজিনিয়ারের ঘাটতি আছে, তাও নয়। বরং ইনজিনিয়ারের তুলনায় কাজেরই ঘাটতি ছিল এতদিন; উপযুক্ত কাজ তাঁদের দিতে পারা যায়নি। সে যাই হোক্, সোভিয়েট রাশিয়ার ইস্পাত কারখানাগুলিতে যে-সব ভারতীয় ইনজিনিয়ার ট্রেনিং নিচ্ছেন, তাঁদের কাজ তো তাঁরা দেখেছেন। সন্দেহ নেই যে, চীনা শিক্ষার্থীদের চাইতে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অনেক বেশী। অথচ তাজ্জব ব্যাপার এই যে, কাজটা যাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয়, ভারতীয় ইস্পাত-কর্তাদের তার জন্য যেন তাড়াই নেই। ভারতবর্ষে যে-সব রুশ কর্মী এখন কার্যনিরত, তাঁরাই বরং সবসময়ে ভারতীয় কর্তাদের তাড়া দিচ্ছেন। চীনে কিন্তু এমনটা হবার উপায় নেই। চীনা কর্তারাই সেখানে, কাজ যাতে যথাসময়ে শেষ হয়, তার জন্য রুশ কর্মীদের পিছনে সবসময় লেগে থাকেন। রাশিয়ানরা এটার অর্থ ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। ভারতবর্ষে না আছে যোগ্য কর্মীর অভাব, না কাঁচামালের। দুটি সম্পদই তার প্রচুর। তাহলে এমন হবার কারণ কী? "না না মিঃ ঘোষ, চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের এই যে পার্থক্য, এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলবেন না যে, আপনারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আর তারা সাম্যবাদে। এর

সঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শের কোনও সম্পর্কই নেই।"

ভারতবর্ষের মূল সমস্যাটা যে কী, দেখলাম যে, সেটা আঁচ করতে রাশিয়ানদের ভুল হয়নি। তাঁরা ঠিকই আন্দাজ করেছেন যে, লোকবল অর্থবল কিংবা যন্ত্রবলের অভাব আমাদের মূল সমস্যা নয়। সমস্যা আসলে নেতৃত্বের। আর তাই চীন যখন উদ্দীপনায় স্পন্দিত, ভারতবর্ষকে তখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোতে হচ্ছে। এই যে নেতৃত্বের অভাব, এই যে দিশেহারা অবস্থা,—এর জন্য গণতন্ত্রকে দায়ী করা অর্থহীন।

উন্নয়নশীল দেশে ইস্পাতের মতন একটা মূল শিল্পকে যে যথাসম্ভব রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, এ-নীতি যুক্তিযুক্ত। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাত-উৎপাদন-ক্ষমতা হচ্ছে বার্ষিক চোদ্দ কোটি টন। ইস্পাত-শিল্পকে সেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত করবার স্পষ্টতই কোনও প্রয়োজন নেই। তার কারণ, মারকিন সমাজের যতটা ইস্পাত দরকার, এ-শিল্প বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকলেও তারা তা পাবে, এবং যে-দাম তারা দিতে পারে সেই দামেই পাবে। সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষে আমাদের ইস্পাত-উৎপাদন-ক্ষমতাকে যদি ১৯৭০ সনের মধ্যেই আমরা এক কোটি নব্বই লক্ষ টনে পৌঁছে দিতে চাই (পরিকল্পনা সেইরকমই হয়েছে বটে, তবে কার্যত এটা হওয়া খুবই শক্ত), তাহলে ব্যাপারটাকে শুধু বেসরকারী উদ্যোগের হাতে ছেড়ে দিলে তা সম্ভব হবে না। এর জন্যে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রয়োজনীয় মূলধন জোগাড় করতে হবে, এবং তারই জন্যে চাই সরকারী উদ্যোগ। মুশকিল এই যে, আমাদের যাবতীয় তর্ক চলে মালিকানার প্রশ্ন নিয়ে। আমাদের রাজনীতিকরা অদ্যাবধি বুঝতে পারেননি যে, তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক সমাজের মূল সমস্যাটা নেহাত মালিকানার নয়, মূল-সমস্যা হচ্ছে পরিচালন-ব্যবস্থার এবং লক্ষ্যাভিমুখিতার।

যে আড়াই হাজার তরুণ ইনজিনিয়ারকে আমরা রাশিয়া, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন আর পশ্চিম জারমানিতে ট্রেনিং নিতে পাঠিয়েছিলাম, ফুলের মতন তাঁরা বিকশিত হয়ে উঠেছিলেন। সরকারী শিল্প-উদ্যোগের তাঁরাই হচ্ছেন মেরুদণ্ড। বোকারোয় আর অন্যত্র যখন ইস্পাত-শিল্পের সম্প্রসারণ হবে, তখন তার দায়িত্বও তাঁদেরই হাতে পড়বে। দেখে দুঃখ লাগে যে, উপরতলার অকর্মণ্যতার চাপে তাঁদের উৎসাহ কীভাবে পিষ্ট হচ্ছে। ভিলাইয়ের প্রধান রুশ কর্মকর্তা, রৌরকেলার প্রধান জারমান কর্মকর্তা, দুর্গাপুরের প্রধান ব্রিটিশ কর্মকর্তা, ইনডিয়ান আয়রনের চীফ ইনজিনিয়ার এবং টাটার জেনারল সুপারিনটেনডেনটকে নিয়ে একটি কমিটী গঠন করা হয়েছিল; সরকারী ইস্পাত-কারখানাগুলির প্রতিটি ইনজিনিয়ারের সঙ্গে (তরুণ ইনজিনিয়ারদের সঙ্গে তো বটেই, অন্যান্য ইস্পাত-কারখানা থেকে যে দেড় শো অভিজ্ঞ কর্মীকে নিয়ে আশা হয়েছিল তাঁদের সঙ্গেও) তাঁরা দেখা করেন, তাঁরা দক্ষতা বিচার করেন,—এবং এইভাবে একটা হিসেব নিয়ে ডিরেকটরদের জানান যে, কর্মীদের কাকে কতটা দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। কোন্ কোন্ কাজের জন্য মোট কতজন অভারতীয় কর্মী রাখা দরকার এবং কতদিনের জন্য রাখা দরকার তাও তাঁরা জানিয়েছিলেন। অথচ, বিশেষজ্ঞ কমিটীর (পৃথিবীর যে-কোনও দেশের যে-কোনও মানদণ্ড দিয়ে বিচার করলেও দেখা যাবে যে, ইস্পাত-উৎপাদনের ব্যাপারে অসামান্য এঁদের জ্ঞান) এই যে রিপোর্ট, হিন্দুস্থান স্টীলের তিন ডিরেকটরকে নিয়ে গঠিত এক কমিটী এটিকে অম্লানবদনে নাকচ করে দিলেন। কী তাঁদের পরিচয়? না তাঁদের একজন হচ্ছেন রেলওয়ের এক অবসরপ্রাপ্ত সিভিল ইনজিনিয়ার, আর-একজন হচ্ছেন এক রাজ্য-সরকারের পূর্ত-বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ইনজিনিয়ার, আর তৃতীয়জন

হচ্ছেন অর্থ-দপ্তরের এক অবসরপ্রাপ্ত আমলা। তরুণদের হাতে কাজের দায়িত্ব তুলে দিতে তাঁরা ভরসা পেলেন না।

ইস্পাত উৎপাদনের ব্যাপারে এ'দের একজনেরও 'ক' অক্ষর জানা ছিল না। কিন্তু তাতে কী, ক্ষমতা ছিল তাঁদেরই হাতে। আর এ'দেরই মতন সব মানুষের হাতে নেতৃত্ব তুলে দিয়ে আমরা কিনা ভারতবর্ষে এক সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলছি। ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তরের যিনি সেক্রেটারি ছিলেন, রৌরকেলা ইস্পাত কারখানায় তাঁকেই প্রথম জেনারেল ম্যানেজারের আসনে বসিয়ে দেওয়া হল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি, মৎস্য, পশুপালন আর বন-সংরক্ষণ দপ্তরের সেক্রেটারিকে বসানো হল দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার জেনারেল ম্যানেজারের আসনে; তিনিই সেখানকার প্রথম জেনারেল ম্যানেজার। আর ভিলাই কারখানায় এখন যিনি জেনারেল ম্যানেজার, তার পরিচয় কী? না, তিনি ভারতীয় অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট্স সার্ভিসের একজন সদস্য। তাঁকে যদি ইস্পাত-কারখানায় না-পাঠিয়ে কোনও রাজ্যের অ্যাকাউনটেন্ট জেনারেল করে দেওয়া হত, তবে সেইটেই হত স্বাভাবিক ব্যাপার।

আমাদের দর্শন হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক দর্শন; ব্রিটিশ প্রভুদের কাছ থেকে এই দর্শনের উত্তরাধিকার আমরা পেয়েছি। অক্সফোর্ড কিংবা কেমব্রিজ কিংবা অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি কিংবা প্রকৃতি-বিজ্ঞান কিংবা নৃতত্ত্ব কিংবা অন্য যা-হক একটা বিষয়ে একটা ভাল ডিগরী নিয়ে যে-ছেলে বেরিয়ে এসেছে, ব্রিটিশ সরকার তাকে নানান রকমের কাজে হয়ত লাগাতে পারেন। বাণিজ্য-দপ্তর কিংবা স্বরাষ্ট্র-দপ্তর কিংবা পেনশন-দপ্তরে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব হয়ত দিতে পারেন তাকে। বস্তুত, দক্ষ একজন সিভিল সারভ্যান্ট এত হরেক রকমের কাজ করতে পারেন যে, দেখে বিস্মিত হতে হয়। কিন্তু কথা এই যে, বছর কয়েক আগে ব্রিটিশ সরকার যখন ইস্পাত-শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করেছিলেন, তখন হোয়াইট হল থেকে কোনও আমলাকে ওয়েল্স কিংবা অন্য কোথাও কোনও ইস্পাত-কারখানার ম্যানেজার করে পাঠাবার দুর্বুদ্ধি তাঁদের হয়নি। এ-ব্যাপারে আমরা ব্রিটিশ প্রভুদের উপরেও টেক্কা দিয়েছি। আসলে ভারতীয় রাজনীতিকদের একটা কথা বোঝা উচিত ছিল। সেটা এই যে, কোনও একজন সিভিল সারভ্যান্টকে তাঁরা প্রথম বছরে ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় বছরে জজ, তৃতীয় বছরে সমবায় দপ্তরের রেজিসট্রার এবং চতুর্থ বছরে বন-সংরক্ষকের পদে হয়ত নিযুক্ত করতে পারেন, কিন্তু তাই বলেই যে তাঁকে পঞ্চম বছরে একটা ইস্পাত-কারখানার ম্যানেজার করে দেওয়া যাবে, এমন কোনও কথা নেই। এই সহজ কথাটাই আমাদের রাজনীতিকরা বুঝতে পারেননি। আর সেই নির্বুদ্ধিতার ফল ভুগতে হচ্ছে আমাদের। অস্ট্রেলিয়ার ইস্পাতের চাইতে ভারতীয় ইস্পাতের উৎপাদন-ব্যয় বেশী পড়ছে; ইস্পাতে যে-টাকা বিনিয়োগ করেছি আমরা, সামগ্রিকভাবে তাতে লাভ না-হয়ে লোকসান হচ্ছে; রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ থেকে আয় হচ্ছে শতকরা আড়াই ভাগ। আর আমরা স্বপ্ন দেখছি যে, এই হারেই আমরা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে পারব।

মূল দোষ অবশ্য আমলাদেরও নয়, সে-দোষ রাজনীতিকদেরই। সিভিল সারভ্যান্টরা দক্ষ মানুষ; কাজেকর্মে তাঁরা শৃঙ্খলানিষ্ঠও। ১৯৪৭ সনে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভ করে, ভারতীয় সিভিল সারভিসের ব্রিটিশ সদস্যরা তখন কাজে ইস্তফা দিলেন। ব্রিটিশ আমলে ট্রেনিং পাওয়া ভারতীয় আই-সি-এসের সংখ্যা

তখন দ্'শোরও কম। এই স্বল্পসংখ্যক মান্ষরাই আমাদের শাসন-ব্যবস্থার কাঠামোকে সেদিন দাঁড় করিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। তাঁরা যদি না শাসনব্যবস্থার হাল সেদিন ধরে থাকতেন, তাহলে ভারত-বিভাগের ফলে উদ্ভূত অবস্থার চাপ আমরা সামলাতে পারতুম না। কিন্তু ক্ষমতার লোভ এমনই ব্যাপার যে, রক্ষাকর্তারাই ক্রমে-ক্রমে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালেন। সংখ্যায় যাঁরা ছিলেন দ্ শোরও কম, কেন্দ্র আর রাজ্যে ক্ষমতার ম্ল ঘাটিগ্লি চলে গেল তাঁদেরই হাতে। গ্র্ত্বপ্র্ণ প্রতিটি পদ দখল করলেন তাঁরা। সংখ্যায় কম ছিলেন বলেই তাঁদের প্রত্যেকে সেদিন ডবল তে-ডবল প্রোমোশন পেয়েছেন। কিন্তু তাতেও তাঁরা খ্শী হলেন না। ইস্পাত-কারখানার ম্যানেজার-পদ ইত্যাদি নতুন নতুন ব্হৎ এক-একটা পদের স্ষ্টি হতে লাগল, আর এই ব্যুরোক্রাট-ইউনিয়ন (প্থিবীতে এমন সংঘবদ্ধ ট্রেড-ইউনিয়ন আর একটিও দেখা যাবে না) দাবি জানাতে লাগলেন যে, তাঁদেরই কাউকে ক্ষমতার সেই নতুন ঘাটিতে বসিয়ে দেওয়া হোক। সরকার যদি বেসরকারী-প্রতিষ্ঠান থেকে যোগ্য কাউকে এনে এ-সব পদে বসাবার চেষ্টা করেন, তো ব্রোক্রাট-ইউনিয়নের তাতে সায় মেলে না। মিলবে কী করে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মান্ষরা তো এ'দের বিচারে নেহাতই 'বহিরাগত'।

সমস্যার সমাধান করা যে খ্ব শক্ত ব্যাপার, তা কিন্তু নয়। দ্ষ্টান্ত হিসেবে বলতে পারি, রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত-শিল্পে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, রাতারাতি তার সমাধান করা যায়। তর্ণ ইনজিনিয়ারদের মধ্যে যাঁরা কিছ্টা অভিজ্ঞ, তাঁদের যদি যথাসম্ভব দায়িত্ব দেওয়া হয়; বেসরকারী উদ্যোগে (ইস্পাত কারখানায় কিংবা ব্হৎ কোনও ইনজিনিয়ারিং কারখানায়) পরিচালক-পদে যাঁরা বছর কুড়ির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তাঁদের থেকে বাছাই করে যদি জেনারেল ম্যানেজার পদে নিয়োগ করা হয়; এবং (অবসরপ্রাপ্ত কিংবা প্রায় সেই শ্রেণীর সরকারী চাকুরিয়াদের নিয়ে নয়) শিল্পে-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ মান্ষদের নিয়ে গঠিত বোর্ড অব ডিরেকটর্স-এর হাতে যদি যথাসম্ভব ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়, বিদেশ থেকে ম্যানেজার না-আনিয়েও তবে ইস্পাত-শিল্পের পরিচালন-সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। ভারতীয়দের মধ্যে যোগ্য-ব্যক্তির অভাব নেই; সমস্যাটা আসলে অন্যত্র। অত্যধিক কেন্দ্রীভূত আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ আর রাজনীতিকদের ভীর্তাই আমাদের সাফল্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁদের হাতে ক্ষমতা, সেই রাজনীতিকরা আমাদের পরিচালনা করবেন, এইটেই তো প্রত্যাশিত। কিন্তু তার বদলে তাঁরা নিজেরাই অন্যদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন।

সংসদ-সদস্যদের ধারণা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পোদ্যোগের দৈনন্দিন পরিচালন-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করাটাও তাঁদের সংসদীয় দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়, সার্বিক কর্মনীতি আর তার ফলাফলটাই যে তাঁদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত, তা আজও তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেননি। একজন মন্ত্রীর পক্ষে একইসঙ্গে স্বায়ত্তশাসিত একটি সংস্থার স্বাধীনতার সংরক্ষক হওয়া এবং বৎসরান্তে সেই সংস্থার সাফল্যের হিসেব দেখিয়ে সংসদকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব। আবার তা না-করে তিনি সংসদকেই একটা অছিলা হিসেবে কাজে লাগিয়ে সেই স্বয়ংশাসিত সংস্থার স্বাধীনতা হরণ করতে পারেন এবং সেই স্বয়ংশাসিত সংস্থার স্বাধীনতাকে একটা অছিলা হিসেবে কাজে লাগিয়ে সংসদকেও ফাঁকি দিতে পারেন।

ইস্পাত-শিল্পের স্ত্রে যে-সব কথা বললাম, তার থেকেই বোঝা যাবে যে, শিল্প-

সংগঠনের সমস্যাটা এ-দেশে কীরকম। ইস্পাত-শিল্প সম্পর্কে আমার জ্ঞান প্রত্যক্ষ; তাই তারই ভিত্তিতে সমস্যাটা আমি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। কৃষি-উৎপাদন বলুন, পরিবার-পরিকল্পনা বলুন, কিংবা অন্য যে-কোনও জরুরী বিষয়ের কথা বলুন, সর্বত্র এই একই সমস্যা। শক্তি কিংবা যোগ্যতার অভাব আমাদের নেই; অভাব সংগঠনের।

খাদ্যের উৎপাদন এবং বণ্টন-সমস্যার যদি মোকাবিলা করতে হয়, তাহলে চারটি জিনিস আমাদের চাই। (১) একটি বীজ করপোরেশন, (২) একটি সার করপোরেশন, (৩) ছোটখাটো সেচকার্যের প্রকল্পের জন্য একটি করপোরেশন, এবং (৪) একটি খাদ্য বাণিজ্য করপোরেশন। খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য আজ আমরা পুলিসের সাহায্য নিচ্ছি। কিন্তু পুলিসের সাহায্যে এ-কাজ করা যায় না। রাজনীতিকদের আবেদন-নিবেদনেও এ-কাজ হবার নয়। এক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষমতাই হচ্ছে আসল ক্ষমতা। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হয়। সেখানকার কেন্দ্রীয় পণ্য করপোরেশন সেই উদ্বৃত্ত পণ্যের দায়িত্ব নেন। ভারতবর্ষে আজ ন্যায্য মূল্যের আশ্বাস দিয়ে কৃষি-পণ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে। খাদ্য-বাণিজ্য-করপোরেশন এ-দেশে খাদ্যশস্যের একটা নিম্নতম মূল্যের গ্যারান্টি দিতে পারেন, এবং তার মাধ্যমে কৃষকরা যাতে সেচের জল, সার, কীটনাশক ওষুধ, গো-মহিষ আর কৃষি-সরঞ্জামের খরচা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকে তার ব্যবস্থা করতে পারেন। মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশ থেকে যে খাদ্যশস্য আমরা আমদানি করি, তার উপরে আভ্যন্তর উৎপাদনের শতকরা কুড়ি ভাগ যদি খাদ্য-করপোরেশন কিনে নেন, তাহলে ঘাটতি-এলাকায় খাদ্যশস্য বিক্রির ব্যবস্থা করে একদিকে এই করপোরেশন যেমন খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, অন্যদিকে তেমনি অধিকতর উৎপাদনের উদ্যোগকেও উৎসাহিত করতে পারেন।

বীজ, সার, আর সেচের জল সম্পর্কে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তার সমাধানের উদ্দেশ্যে যাতে সত্যিকারের কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয়, তার জন্য এই সংস্থাগুলিকে যথার্থই স্বাধীন, বাণিজ্যিক দৃষ্টিসম্পন্ন এবং তেজস্বী হতে হবে। পরিচালন-ব্যবস্থায় সুশিক্ষিত তরুণদের হাতে তুলে দিতে হবে এর দায়িত্ব-ভার। উপর থেকে মাত্র মূল কয়েকটি নীতিই এ'দের জানিয়ে দেওয়া হবে; প্রতিটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা চলবে না। লক্ষ্য রাখতে হবে, আমলাতান্ত্রিক নিয়মের নিগড়ে এ'দের যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বে'ধে রাখা না হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এমনভাবে করপোরেশন গড়ে এতটা স্বাধীনভাবে তাদের কাজ করতে দেবে কে? সরকারী উদ্যোগের দায়িত্ব নেবার জন্যে যখনই এ-দেশে কোনও করপোরেশন কিংবা কোম্পানি গড়া হয়েছে, লালফিতের ফাঁসে জড়িয়ে দিয়ে তখনই তাকে সরকারেরই বাড়তি আর-একটা আমলা-তান্ত্রিক দপ্তরে পরিণত করতে দেরি হয়নি। সমস্যা সেইখানেই।

ভারতবর্ষের জনসংখ্যা পঞ্চাশ কোটিতে পৌছতে চলল। আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে যদি না বৃদ্ধির হারকে যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে আনা হয়, জনসংখ্যার সমস্যা তাহলে আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে, এবং তারই চাপে কৃষি আর শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের যাবতীয় উন্নয়ন-প্রয়াস বিপর্যস্ত হবে। ভারতবর্ষের তিন শো কুড়িটি জেলাকে মোট পাঁচ হাজার চার শো ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। তার সঙ্গে শহরাঞ্চলকে যদি যুক্ত করি, ইউনিটের সংখ্যা তাহলে মোটামুটি ছ হাজার দাঁড়ায়। প্রতি ইউনিটে প্রতি মাসে যদি মাত্র একশোটি লুপ প্রয়োগের

ব্যবস্থা হয়, তাহলে প্রতি ইউনিট প্রতি বছরে বারো শো লুপ প্রয়োগ করতে পারবে; পাঁচ বছরে প্রয়োগ করতে পারবে ছ হাজার। ছ হাজার ইউনিটে পাঁচ বছরে সেক্ষেত্রে তিন কোটি ষাট লক্ষ লুপ প্রযুক্ত হবে। এদেশে সন্তানধারণক্ষম নারীর মোট সংখ্যার এটা শতকরা চল্লিশ ভাগ। রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে সম্প্রতি যে বিশেষজ্ঞ দল ভারত-সফরে এসেছিলেন, তাঁরা হিসেব করে বলেছেন যে, পাঁচ বছরে যদি এ-কাজ করা সম্ভব হয়, তাহলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার প্রতি বছরে পঁচাশি লক্ষ কমে যাবে; দেড় কোটির ক্ষেত্রে সংখ্যাটা সেক্ষেত্রে পঁয়ষট্টি লক্ষ করে বৃদ্ধি পাবে মাত্র। খাদ্য-উৎপাদন সংক্রান্ত সমস্যার সুরাহা একমাত্র তখনই সম্ভব হবে।

এর জন্য আমাদের ছ হাজার ভ্রাম্যমাণ মোটর ভ্যান চাই। তাতে সাধারণ ডিসপেনসারির ব্যবস্থা তো থাকবেই, তার সঙ্গে থাকবে জন্মনিয়ন্ত্রণের এই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। সেই ভ্যান নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরতে হবে। ঢক্কানিনাদ না করে, জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার কথা গ্রামীণ নারীসমাজকে বুঝিয়ে বলতে হবে। এর বাবদে কারও কাছ থেকে এক পয়সাও নেওয়া চলবে না। প্রতিটি ভ্যানে থাকবে পাশ-করা দুজন চিকিৎসক (একজন পুরুষ, একজন মহিলা), শিক্ষাপ্রাপ্ত দুজন নার্স, এবং চারজন মহিলা সমাজকর্মী। ভারতবর্ষে এখন আশি হাজার মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট রয়েছেন। তাঁদের সংখ্যা প্রতি বছর আরও ছ হাজার করে বাড়ছে। তাঁদের মধ্যে দু হাজার মহিলা, চার হাজার পুরুষ। এ-কাজের জন্য মাত্র দু বছরের ডাক্তার, অর্থাৎ মোট বারো হাজার ডাক্তার, আমাদের চাই। ন্যায্য বেতন যদি দিতে পারি, এবং গ্রামাঞ্চলে স্বচ্ছন্দভাবে তাঁদের জীবনধারণের ব্যবস্থা যদি করতে পারি, বারো হাজার ডাক্তার পাওয়া তাহলে শক্ত হবে না। অর্থ এ-ব্যাপারে সমস্যা নয়। লোকসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সব টাকা আমরা খরচ করে উঠতে পারি না। তা ছাড়া, পৃথিবীর প্রগতিশীল প্রতিটি দেশই এই সমস্যার মোকাবিলা করবার ব্যাপারে ভারতবর্ষকে সাহায্য করতে আগ্রহশীল। রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষক-দল যে হিসেব দিয়েছেন, তার মধ্যে অঙ্কের কিছু ভুলত্রুটি হয়ত থাকতে পারে। কিন্তু এই হিসেব থেকে একটা কথা অন্তত স্পষ্ট বোঝা যায়। তা এই যে, সংগঠনের ব্যবস্থা করতে পারলেই সমস্যাটাকে আমরা আয়ত্তে এনে ফেলতে পারব। কিন্তু যে সংগঠনের সাহায্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হারকে পাঁচ বছরের মধ্যেই দেড় কোটি থেকে পঁয়ষট্টি লক্ষে নামিয়ে আনা যায়, সেই সংগঠন আমাদের কোথায়?

সরকারের স্টীল করপোরেশনে পাঁচ বছর আমি কাজ করেছি। বিস্তর পরিশ্রম করেছি এই পাঁচ বছরে; কিন্তু এই সাংগঠনিক সমস্যার সমাধান অর্জনে আমাদের রাজনৈতিক কর্তাদের আমি উদ্বুদ্ধ করতে পারিনি। চাকরিটা ভাল ছিল; বেতনও ভালই পাচ্ছিলাম। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ১৯৬০ সনে সংসদে যোগ দিলাম আমি। ভেবেছিলাম, সংগঠন-সমস্যার সমাধানের জন্য যা আমি করতে চাই, এই নূতন ভূমিকায় তা করা হয়ত আরও সহজসাধ্য হবে।

আজও আমি গান্ধীজীর দূত

মাঝে-মাঝে আমার মনে হয় যে, অন্তত একটা ব্যাপারে চীনা কমিউনিস্টদের প্রতি আমার চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত। গান্ধীজীও যা পারেননি, চীনা কমিউনিস্টরা তা-ই পেরেছিল। শ্রীনেহরুর সঙ্গে আমার সম্পর্কটাকে আবার ভাল করে দিয়েছিল তারা। স্বাধীনতালাভের পর পনর বছর যাবৎ শ্রীনেহরু দেশের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের নীতি এবং বৈদেশিক ব্যাপারে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে আসছিলেন; ১৯৬২ সনের অকটোবর-নভেমবরে চীনা কমিউনিস্টরা ভয়ংকর-ভাবে ভারতবর্ষকে আক্রমণ করায় তিনি একটা প্রবল ধাক্কা খেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, চীনা সামরিক শক্তি যে সমস্যা সৃষ্টি করেছে, তার উত্তর তাঁর নেই। চীনা হামলার নিদারুণ অভিজ্ঞতা তাঁর চিন্তার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছিল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য আমাদের যা-কিছু পরিকল্পনা, এবং জন-জীবনকে নূতন করে গড়বার জন্য আমাদের যা-কিছু প্রয়াস—চীনা জঙ্গীবাদ তাকে তখন বিনষ্ট করতে উদ্যত। এই গুরুতর সমস্যার সমাধান অন্বেষণে শ্রীনেহরুকে আমি তখন যথাসাধ্য সাহায্য করতে চেয়েছি। আমার সাহায্য তিনি প্রত্যাখ্যান করেননি। এই প্রথম আমার উপরে তিনি পরিপূর্ণভাবে আস্থা রাখলেন।

আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে—নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে—চীনারা পশ্চাদপসরণ করবার পর শ্রীনেহরুর কাছে বেশ-কয়েকবার আমি আমার এই আশংকার কথা ব্যক্ত করেছিলাম যে, চীনারা যদি আবার আমাদের উপর আক্রমণ চালায়, তাহলে কার্যকরভাবে সেই অবস্থার মোকাবিলা করবার মতন প্রস্তুতি তাঁর নেই। শ্রীনেহরু যখন দেখলেন, এ নিয়ে আলোচনা করতে আমি বদ্ধপরিকর, তখন একদিন তিনি আমাকে বললেন যে, এ-ব্যাপারে তাঁর যা করণীয় বলে আমি মনে করি, একটি স্মারকলিপিতে তা যেন আমি পরিষ্কারভাবে জানাই, এবং বক্তব্যের সপক্ষে আমার যুক্তিগুলিও যেন আমি বিবৃত করি; লিখিতভাবেই তিনি তার উত্তর দেবেন।

স্মারকলিপিটির তারিখ ২রা জানুয়ারি, ১৯৬৩। প্রথম অনুচ্ছেদটিতেই তার সারমর্ম ব্যক্ত হয়েছিল। তাতে আমি বলেছিলাম :

“একদিকে ভারতবর্ষ, এবং অন্যদিকে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেন, অসট্রেলিয়া ও নিউজীল্যানড—এই পারলামেনটারী গণতন্ত্রগুলির মধ্যে এটি একটি কূটনৈতিক ব্যবস্থার প্রস্তাব। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতীয় স্থলবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সম্প্রসারণের জন্য এই দেশগুলি প্রয়োজনীয় সামরিক সম্ভার সরবরাহ করতে সম্মত হবে। এবং অন্তর্বর্তী দশ বৎসর কালের মধ্যে কমিউনিস্ট চীন যদি কখনও ভারতবর্ষের আঞ্চলিক অখণ্ডতা লঙ্ঘন করতে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়, তাহলে এই দেশগুলি ভারতবর্ষের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। এই কূটনৈতিক ব্যবস্থা শুধু চীনের সম্পর্কেই প্রযোজ্য, পৃথিবীর অন্য কোনও কমিউনিস্ট দেশ সম্পর্কে নয়। এই প্রস্তাবের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে এই যে, চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের আঞ্চলিক

অখণ্ডতার গ্যারান্‌টিস্বরূপ এই ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের জন্য সোভিয়েট রাশিয়াকেও আমন্ত্রণ জানাতে হবে। সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে এই গ্যারান্টি-ব্যবস্থায় অংশ-গ্রহণ করা যদি সম্ভব না-ও হয়, তবু খুবসম্ভব এই ব্যবস্থায় তার আপত্তিও হবে না; কমিউনিস্‌ট শিবিরের মধ্যেই এখন দল-বদলের পালা চলেছে। প্রেসিডেন্‌ট টিটো সম্প্রতি মস্‌কোয় গিয়েছিলেন। মিঃ ক্রুশ্চফের বৈদেশিক নীতি ও বিশেষ করে কিউবার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকাকে তিনি সমর্থন করেছেন। যারা বলে, 'আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ কাগুজে বাঘ', এবং ভুলে যায় যে, সেই বাঘের 'পরমাণবিক দাঁত' রয়েছে, মিঃ ক্রুশ্চফ তাদের বিদ্রূপ করেছেন। এইসব ঘটনা থেকে মনে হয় যে, চীনা গোঁড়ামির চাপ থেকে মিঃ ক্রুশ্চফ নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইছেন, এবং যে-ব্যবস্থায় চীনকে একঘরে করার ব্যাপারে সুবিধা হবে, তাতে তিনি আপত্তি না-ও করতে পারেন। তা ছাড়া অবস্থা এখন যে-রকম, তাতে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র যদি নিশ্চিত বুঝতে পারে যে, এ-রকমের একটা ব্যবস্থা হলে সোভিয়েট রাশিয়া অসন্তুষ্ট হবে না এবং বিশ্বযুদ্ধ বাধবার আশঙ্কাও থাকবে না, একমাত্র তাহলেই হয়ত মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এ-রকমের ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব।"

স্মারকলিপিতে শ্রীনেহরুর কাছে আমার বক্তব্যের সপক্ষে আমি এইভাবে যুক্তি অবতারণা করেছিলাম যে, রাশিয়ার সহায়তায় চীন তার সামরিক শক্তি গড়ে তুলেছে; চীনা বিমান-বাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি সরবরাহ করেছে রাশিয়া; চীন-সোভিয়েট সামরিক চুক্তি অনুযায়ী (গুরুতর মতানৈক্য সত্ত্বেও) রাশিয়া চীনকে সামরিক সাহায্য দিতে দায়বন্ধ। আইনগত ও নৈতিক এই দায় সত্ত্বেও সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে যদি ভারতবর্ষের বন্ধু থাকা সম্ভব হয় (বস্তুত রাশিয়া আমাদের প্রকৃত বন্ধু), তাহলে, ইঙ্গ-মারকিন পক্ষের সঙ্গে যে-ব্যবস্থার প্রস্তাব আমি করেছি, সেই ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের পক্ষে রাশিয়ার বন্ধু থাকা সমান সম্ভব হওয়া উচিত।

আমি এও বলেছিলাম যে, পাকিস্তান আর মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে-ধরনের সামরিক চুক্তি রয়েছে, এবং যার ফলে পাকিস্তানের ভূমিতে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ঘাঁটি বসিয়েছে, তেমন চুক্তির প্রস্তাব আমি করছি না, বা সিয়াটো সেনটোর মতন চুক্তি-ব্যবস্থায় প্রবেশ করতেও বলছি না। আমি শুধু প্রস্তাব করছি যে, একদিকে ব্রিটেন কানাডা অসট্রেলিয়া আর নিউজীল্যান্‌ডের প্রধানমন্ত্রী ও মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্‌ট এবং অন্যদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে এইমর্মে সাদামাঠা পত্র-বিনিময় হোক যে, ভারতবর্ষ অনুরোধ করছে ও এই দেশগুলি সেই অনুযায়ী সম্মত হচ্ছে যে, দশ বৎসরের মধ্যে চীন যদি কখনও ভারতবর্ষের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও স্বাধীনতাকে লঙ্ঘন করতে উদ্যত হয়, তাহলে এই দেশগুলি স্বতই ভারতবর্ষের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। সম্ভবত ভারতবর্ষের সাহায্যে এগিয়ে আসবার জন্য এই দেশগুলিকে আহ্বান করবারই প্রয়োজন কখনও ঘটবে না; কেননা, এই ধরনের একটা ব্যবস্থার অস্তিত্বই আক্রমণের আশঙ্কাকে নিবারিত করবে।

৫ই জানুয়ারি তারিখে শ্রীনেহরু এর যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা এখানে প্রকাশিত হল :

রাষ্ট্রীয় অতিথি নিবাস,
লখনউ,
৫ই জানুয়ারি, ১৯৬৩

"প্রিয় সুধীর,

তোমার ২রা জুন তারিখের চিঠি ও সেইসঙ্গে সংযোজিত নোট্‌টি পেলাম। নোট্‌-এ তুমি যে প্রস্তাব করেছ, তা সম্ভব বলে আমার মনে হয় না; বর্তমান অবস্থায় এর জন্য চেষ্টা করা আমাদের উচিতও নয়। সামরিক ও বিমান-ক্ষমতায় ভারতবর্ষের চাইতে চীন যে অনেক বেশী শক্তিশালী, তাতে সন্দেহ নেই। তবে ভারত-সীমান্তের প্রকৃত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই চীনের শক্তিকে বিচার করে দেখা দরকার। সেখানে শুধু এমন স্থল-বাহিনীই তারা নিয়োগ করতে পারে, যা চীন থেকে পাঠানো সম্ভব। সেনাবিন্যাসের সমস্যাও সেখানে খুবই দুরূহ। বিমান-ক্ষমতার প্রসঙ্গে বলি, তাদের বিমান-বাহিনী বৃহত্তর বটে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও কিছু-কিছু অসুবিধা তাদের আছে। তাদের অধিকাংশ বিমানই আধুনিক নয়; তা ছাড়া এমনিতেও সেই বিমান-বাহিনীর বেশির ভাগকেই তাদের নিযুক্ত রাখতে হয় চীনের পূর্ব উপকূলে।

আমি দৃঢ়নিশ্চিত যে, আমাদের স্থল ও বিমান-বাহিনীর কিছু উন্নতি ও সংযোজন ঘটলেই আমাদের সীমান্তে আমরা তাদের প্রতিরোধ করতে পারব। এমন কী, এখনও যে তারা আসামে ও অন্যত্র আমাদের সমতলভূমিতে নেমে আসতে সমর্থ, এমন কথা আমি মনে করি না। কিছুদিন বাদে এটা তাদের পক্ষে আরও বেশী শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। ইতিমধ্যে আমাদের বিমান-বাহিনীকে ঠিকমত গড়ে তুলবার ব্যাপারে যদি আমাদের সাহায্য করা হয়, তাহলে আর অল্প কিছুকাল বাদেই আমরা তাদের প্রতিরোধ করতে পারব বলে আমি মনে করি। স্থলে অথবা আকাশে চীনরা যে আমাদের কাবু করে ফেলবে, এমন কোনও বিশেষ আশঙ্কা আমার নেই। ইতিমধ্যে দুর্ভাগ্যবশত তারা যদি বিপুলভাবে আমাদের উপরে আক্রমণ চালায় এবং তাতে বিমান-শক্তিও ব্যবহৃত হয়, তাহলে শুধু ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র বিশ্বেই এক সম্পূর্ণ নূতন অবস্থার উদ্ভব হবে।

যে-প্রস্তাব তুমি করেছ, তা প্রায় সামরিক চুক্তির সামিল। ভারতবর্ষের পক্ষে এটা খারাপ হবে; খারাপ হবে বিশ্বশান্তির দিক থেকেও। সৌভাগ্যবশত, আমাদের স্থল-বাহিনীর পুনর্বিন্যাসে ও আমাদের বিমান-বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির ব্যাপারে বিশেষ করে আমেরিকা ও ইংল্যান্ড, এবং কিছু-পরিমাণে অন্যান্য দেশও, আমাদের যথেষ্টই সাহায্য করছে। আমরা যদি এ-ব্যাপারে আরও এগোই, তবে তাতে আমাদের প্রতিরক্ষা-বাহিনীর উন্নয়নের যে বিশেষ সুবিধে হবে তা নয়। এর দ্বারা ভবিষ্যতের জন্য একটা গ্যারানটি হয়ত মিলতে পারে। কিন্তু সেই গ্যারানটির মূল্য হিসেবে আমাদের মৌল নীতি গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতাকেই বিসর্জন দিতে হবে। এটা যে নেহাতই সুনীতির প্রশ্ন তা নয়; এরই ফলে আমাদের জনসাধারণ বুঝতে পারে যে, তাদের আত্মনির্ভর হতে হবে। তা ছাড়া বিশ্বের ভারসাম্য রক্ষায় ও আমাদের শান্তিসন্ধানী প্রয়াসেও এতে সাহায্য হয়। আমরা যদি এমন কিছু করি, এই নীতি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং যার ফলে আমাদের গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিতে হবে, তবে সেটা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

এর আরও অনেক দিক আছে। তার মধ্যে আমি এখন যাচ্ছি না। তবে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে, তোমার চিঠিতে তুমি যে চিন্তাধারার আভাস দিয়েছ, 'তা অনুসরণ করা আমাদের উচিত হবে না। ইতিমধ্যে, অন্যান্য দেশ থেকে যে সাহায্য আসবে বলে আমি আশা করি, তাই দিয়ে আমাদের প্রতিরক্ষা-বাহিনীকে যথাসাধ্য শক্তিশালী করে তোলাই আমাদের কর্তব্য।

আন্তরিকভাবে তোমার
জওহরলাল নেহরু"

এই চিঠি পাবার পরে শ্রীনেহরুর সঙ্গে, চিঠিতে তিনি যা বলেছিলেন ও আরও যে 'অনেক দিক' সম্পর্কে তিনি চিঠিতে কিছু লেখেননি, তা নিয়ে আমার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়। আলোচনাপ্রসঙ্গে তাঁকে আমি বলি, চীনের সামরিক শক্তি যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে, তার মোকাবিলা করবার আয়োজন পর্যাপ্ত নয়; এজন্য আমি অশান্তি বোধ করছি। আমি এও বলি যে, আমেরিকা আর রাশিয়া দুজনেই আমাদের—দুজনের ক্ষেত্রে কারণ যদিও দুই রকমের—বলছে যে, চীন ভারতবর্ষকে আক্রমণ করতে পারে বটে, কিন্তু করবে না। কিন্তু একটা সার্বভৌম রাষ্ট্রের পক্ষে এই আশ্বাসের উপরে নির্ভর করে বসে থাকা উচিত নয়; যদি আক্রমণ ঘটে, তাহলে আমরা তা প্রতিরোধ করতে পারব এ-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া চাই।

ইঙ্গ-মারকিন পক্ষের সঙ্গে যে-ধরনের বোঝাপড়ার প্রস্তাব আমি করেছিলাম, তার জন্য চেষ্টা করবার অনুমতি শ্রীনেহরু আমাকে দিলেন না। তবে তিনি জানালেন যে, এই রকম সরাসরিভাবে জড়িয়ে না গিয়ে অন্য কোনও ভাবে আমার পক্ষে যদি ভারত-চীন পরিস্থিতিতে সাহায্য করা সম্ভব হয়, তবে তাতে তাঁর আপত্তি নেই, তার জন্য আমি চেষ্টা করতে পারি। আমি তাঁকে বললাম যে, আমরা তাঁরই অনুগামী, তাঁর ইচ্ছার বৃত্তের মধ্যেই আমাদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব। ১৯৬৩-৬৪ সনে আমি তিনবার মস্কো আর ওয়াশিংটনে যাই। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয় আমার। অতঃপর ১৯৬৩ সনের ২৮শে মার্চ তারিখে প্রেসিডেন্ট কেনেডির সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করি। তাঁর কাছে আমি প্রস্তাব করি যে, মারকিন প্রেসিডেন্ট ও রুশ প্রধানমন্ত্রী এক যুক্ত ঘোষণা প্রচার করতে পারেন। তাতে তাঁরা ভারত-চীন বিরোধে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করবেন, এবং জানাবেন যে, ভারত সরকার ও চীন সরকার যদি সরাসরিভাবে অথবা দুই পক্ষেরই গ্রহণযোগ্য অন্য কোনও উপায়ের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় উপনীত হন, তবে সেই মীমাংসা-ব্যবস্থায় তাঁরাও যুক্ত থাকতে ও মীমাংসাটা যাতে কার্যকর হয় তার গ্যারানটি দিতে প্রস্তুত। আমি যখন এই প্রস্তাব করি, পরমাণবিক বিস্ফোরণ আংশিক নিষিদ্ধকরণের চুক্তি তখনও সম্পাদিত হয়নি। মারকিন প্রেসিডেন্ট আমার প্রস্তাবের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, এবং শ্রীনেহরুও আমার প্রস্তাবে খুশী হয়েছিলেন।

ভারত-চীন বিরোধ সম্পর্কে নয়াদিল্লি, মস্কো আর ওয়াশিংটনে আমি যে-সব আলোচনা চালিয়েছিলাম, তা কৌতূহলোদ্দীপক। ১৯৬৩ সনে লনডনে এ-ব্যাপারে আলোচনা চালিয়ে কোনও লাভ হত না। লনডনের গুরুত্ব তখন অনেক কমে গিয়েছিল; মিঃ জর্জ ব্রাউনের ভাষায় লনডন তখন 'এমন একটা জায়গামাত্র,

আন্তর্জাতিক রাজনীতিকরা যেখানে বিমান-বদল করেন।' ১৯৬২ সনের অকটোবর-নভেম্বরের চীনা হামলার কয়েক সপ্তাহ বাদে, ১৯৬৩ সনের জানুয়ারি মাসে, পূর্ব ইউরোপের বিশিষ্ট দুজন কমিউনিস্ট নেতা নয়াদিল্লিতে এসে শ্রীনেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ'রা হচ্ছেন যুগোস্লাভিয়ার ভাইস-প্রেসিডেন্ট মিঃ কারডেল্‌জ্‌ আর পোল্যানডের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মিঃ রাপাকি। বিশিষ্ট এই দুই কমিউনিস্ট নেতা চীনা হামলা সম্পর্কে শ্রীনেহরুর কাছে যে অভিমত প্রকাশ করেন, তা কৌতূহল-জনক। তাঁরা বললেন, চীন যে ভারত আক্রমণ করেছে, এর কারণ আর কিছুই নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতির দুটি মৌলিক আদর্শকে সে অপদস্থ করতে চায়। সেই আদর্শ দুটি হচ্ছে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা আর সহাবস্থান। ভারতকে আক্রমণ করে চীন বস্তুত গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতার নীতিকেই আক্রমণ করেছে। মিঃ কারডেল্‌জ আর মিঃ রাপাকি যা বললেন, তার মর্মার্থ এই বলে মনে হল যে, শ্রীনেহরু যার মহান প্রবক্তা, সেই গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতার আদর্শ যে অসার ও অক্ষম, মিঃ ক্রুশচফ ও অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতার কাছে চীন এইটেই প্রমাণ করতে চায়। তাদের এই হামলার মাধ্যমে চীনা কমিউনিস্টরা অন্যান্য কমিউনিস্টদের বলতে চাইছে, "এই যে আমরা ভারতীয়দের একটা ধাক্কা মারলাম, দ্যাখো এর ফল কী দাঁড়াল। ধাক্কা খেয়েই ভারতবাসীরা অমনি সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকানদের জড়িয়ে ধরল, আর গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতাও অমনি শিকেয় উঠল। এই তো গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতার মূল্য।"

ভারতের বন্ধু এই দুই কমিউনিস্ট নেতার মতে, ভারতের উপরে চীনের আক্রমণ আর কিছুই নয়, চীনা কমিউনিস্টদের সঙ্গে অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট-দের যে বিরাট বিতর্ক চলছিল, এটা তারই একটা অংশ। অন্যান্য কমিউনিস্টরা নিরপেক্ষ দেশগুলির গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতায় এবং কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্টদের সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী। সেক্ষেত্রে চীনের এতে কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই। তার অবিশ্বাসের যৌক্তিকতা প্রমাণ করবার জন্যই সে ভারতের উপরে আক্রমণ চালিয়ে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতার আদর্শকে অপদস্থ করতে চেয়েছে। তাঁরা বললেন, এই অবস্থায় ভারতের এ নিয়ে অত্যধিক উত্তেজিত হওয়া ঠিক হবে না; ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হওয়াও উচিত হবে না।

১৯৬৩ সনের ফেবরুয়ারি মাসে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবার পথে আমি স্বল্প-কালের জন্য মস্কোয় অবস্থান করেছিলাম; সেই সময়ে এই চিন্তাধারাকে আমি যাচাই করে নেবার সুযোগ পাই। আমি তখন দেখেছিলাম, পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির মস্কোস্থ যে কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা সেখান থেকে ভারত-চীন বিরোধকে লক্ষ্য করছেন, এ-ব্যাপারে তাঁরা সকলেই একমত যে, মিঃ ক্রুশচফ এবং অচীনপন্থী অন্যান্য কমিউনিস্ট-নেতারা সত্যিই ভারতের উপরে চীনের পুনরাক্রমণ ঘটতে না-দিতে আগ্রহশীল। তাঁরা দৃঢ়নিশ্চিত ছিলেন যে, মিঃ ক্রুশচফ চীনকে ঠেকিয়ে রাখতে চান। "ঠেকিয়ে রাখতে তিনি পারবেন কি?"—এইটেই ছিল প্রশ্ন। এবং এর উত্তর ছিল, "না।" যে-ক্ষমতাবলে চীনকে তিনি বাগে রাখতে পারতেন, এবং যার সাহায্যে পিকিংয়ের চিন্তার উপরে তিনি প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন, ১৯৬৩ সনের ফেবরুয়ারি মাসে তা আর তাঁর ছিল না।

মস্কো থেকে আমি মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে গেলাম। সেখানে সারা মার্চ মাস ধরে সেনেট, প্রতিনিধি-পরিষদ এবং শাসনবিভাগীয় যে-সব বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা হল, তাঁদের সংখ্যা চল্লিশেরও বেশী। সর্বশেষে আলোচনা

হল প্রেসিডেন্ট কেনেডির সঙ্গে। মারকিন রাজনীতিকদের সঙ্গে মাসব্যাপী এই যে আলোচনা, এ এক অভিজ্ঞতা। মারকিন সেনেটের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কমিটীর সদস্যরা ৪ঠা মার্চ তারিখে এক দ্বিপ্রাহরিক ভোজসভায় সম্মিলিতভাবে এই সমগ্র বিষয়টি নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করেন। আহারান্তে সেনেট-কক্ষে সেনেট-সদস্যদের মধ্যে বসে আমাকে কার্যধারা পর্যবেক্ষণ করতে দেওয়া হয়। দেখে অবাক হলুম যে, গোটা সভাই আনুষ্ঠানিকভাবে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। ভারতবর্ষের জন্যে তাঁদের সহানুভূতির অন্ত ছিল না। শ্রীনেহরুর বেসরকারী দূত হিসাবে আমার যা বক্তব্য ছিল, তা শুনতে তাঁরা যথেষ্টই আগ্রহ দেখালেন। মারকিন কংগ্রেসের কার্যক্রমের নথি থেকে আমার সম্পর্কে কয়েকজন সেনেটরের অভ্যর্থনাসূচক ভাষণের বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি :

সেনেটে মিঃ সুধীর ঘোষ, ভারতীয় সংসদের সদস্য

মিঃ হাম্‌ফ্রে : মিঃ প্রেসিডেন্ট, এবারে আমি সেনেটের মনোযোগ আকর্ষণ করে জানাচ্ছি যে, মহান রাষ্ট্র ভারতবর্ষের একজন বিশিষ্ট অতিথি আজ এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন। মিঃ সুধীর ঘোষের উপস্থিতির প্রতি আমি সেনেটের মনোযোগ আকর্ষণ করি। ভারতীয় সংসদের তিনি একজন বিশিষ্ট সদস্য, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার তিনি একজন অকৃত্রিম সুহৃদ। বহু আমেরিকানের, এবং এই পরিষদেরও বহু সদস্যের, তিনি বন্ধু। মিঃ ঘোষ তাঁর দেশের একজন বিশিষ্ট নেতা; স্বর্গত মহাত্মা গান্ধীর তিনি শিষ্য; প্রধানমন্ত্রী নেহরুর তিনি একজন বন্ধু ও পরামর্শদাতা। তাঁকে আমি সেনেটের এই সভায় স্বাগত অভ্যর্থনা জানাতে চাই।

(দাঁড়িয়ে উঠে সেনেটরদের আনন্দধ্বনি)

মিঃ স্পার্কম্যান : মিঃ প্রেসিডেন্ট, এই প্রসঙ্গে আমি জানাতে চাই যে, ১৯৫২ সনে যখন আমি ভারত-সফরে গিয়েছিলাম, তখন থেকেই মিঃ ঘোষকে আমি জানি। তারপর অনেকবার তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। আমি দেখেছি যে, তিনি একজন উদ্যমী, তৎপর, নিষ্ঠাশীল, দেশপ্রেমিক ভারতবাসী, এবং পশ্চিমেরও তিনি একজন চমৎকার বন্ধু। তাঁর সহজাত দক্ষতা কম নয়। স্বর্গত মহাত্মা গান্ধীর জীবনের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। মহাত্মার তিনি শিষ্য। মিঃ গান্ধীর চরিত্রের যা বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁর মধ্যেও সেইসব গুণের অনেকগুলি দেখতে পাওয়া যায়।

আমাদের কয়েকজনের আজই কিছুক্ষণ আগে পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কমিটীর কক্ষে তাঁর সঙ্গে দ্বিপ্রাহরিক ভোজে যোগ দেবার সৌভাগ্য হয়েছিল। দুই দেশের যাতে স্বার্থ রয়েছে, এমন অনেক প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। মিঃ ঘোষ যে এখানে আসতে পেরেছেন, তাতে আমরা আনন্দিত। যখনই তিনি এখানে আসবেন, তখনই তাঁকে অভ্যর্থনা জানাব।

মিঃ কুপার : মিঃ প্রেসিডেন্ট, ভারতীয় সংসদের একজন সদস্যকে অভ্যর্থনা জানাবার ব্যাপারে আমি সানন্দে সকলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি। মিঃ ঘোষকে জানবার

সম্মান ও আনন্দ আমি ভারতবর্ষেই পেয়েছিলাম। সেখানে তিনি খুবই সম্মানিত একজন মানুষ। সংসদেরও তিনি একজন নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসী সদস্য। ইতিপূর্বে আরও কয়েকবার তিনি এখানে এসেছেন। এই পরিষদের, এবং কংগ্রেসের অন্য পরিষদেরও বহু সদস্য তাঁর বন্ধু। এই উক্তিতে আমি একমত যে, গণতান্ত্রিক আদর্শের তিনি একজন মহান অনুরাগী ও সমর্থক।"

ভারত-চীন পরিস্থিতি সম্পর্কে যে জনা-চল্লিশেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে সেদিন আমার আলোচনা হয়েছিল, সেনেটের সশস্ত্র বাহিনী সংক্রান্ত কমিটী ও পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কমিটীর অধিকাংশ সদস্যই তাঁদের মধ্যে ছিলেন। তা ছাড়া ছিলেন প্রতিনিধি-পরিষদের কয়েকজন সদস্য। সেক্রেটারি রাস্‌ক্‌, সেক্রেটারি ম্যাকনামারা, মিঃ হ্যারিম্যান প্রমুখ শাসনবিভাগীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন সেই আলোচনায়। আমার কয়েকজন বন্ধুস্থানীয় সেনেটর বললেন, ভারতবর্ষে ফিরবার আগে প্রেসিডেন্‌ট কেনেডির সঙ্গে আমার দেখা হওয়া উচিত। মিঃ কেনেডি যখন সেনেটর, তখন তাঁর সঙ্গে আমার একবার দেখা হয়েছিল। তিনি প্রেসিডেন্‌ট হবার পরেও, ১৯৬১ সনের অগস্‌ট্‌ মাসে, তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমার মনে হয়েছিল যে, আমাকে তিনি পছন্দই করেন। সেনেটর জন শেরম্যান কুপার আমার বন্ধু। প্রেসিডেন্‌ট কেনেডির সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমি কথা বললুম। তাতে তিনি বললেন যে, এ-বিষয়ে প্রেসিডেন্‌ট কেনেডির কাছে তিনি লিখবেন। প্রেসিডেন্‌ট কেনেডি ব্যক্তিগতভাবে সেনেটর কুপারকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। সেনেটর কুপার তাঁকে একটি চিঠি লিখে জানালেন যে, নয়াদিল্লিতে ফিরে এই সফর সম্পর্কে মিঃ নেহরুকে আমি রিপোর্ট দেব; তার আগে প্রেসিডেন্‌ট কেনেডির সঙ্গে আমার দেখা হলে খুবই ভাল হয়। প্রেসিডেন্‌টের সাক্ষাৎকার-বিভাগীয় সেক্রেটারি মিঃ কেনেথ ও'ডোনেল তার উত্তরে জানালেন যে, মিঃ ঘোষের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হলে প্রেসিডেন্‌ট খুবই খুশী হতেন, কিন্তু ব্যাপারটা পররাষ্ট্র-দপ্তরকে জানানো হয়েছিল, তাঁরা এ-ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছেন। প্রেসিডেন্‌টের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা ত্যাগ করে অতঃপর ২৭শে মার্চ তারিখে আমি হোয়াইট হাউসে মিঃ ম্যাকজর্জ বান্‌ডির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

বন্ধুরা আমাকে আগে থাকতেই সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে, মিঃ বান্‌ডিকে ঈষৎ নিরুত্তাপ স্বভাবের বুদ্ধিজীবী মানুষ বলে মনে হবে। কিন্তু সেটা তাঁর বাইরের খোলস মাত্র। আসলে তিনি সহৃদয় ব্যক্তি। কথাটা জানতাম বলেই আমি ঠিক করে রেখেছিলাম যে, কথাবার্তায় তিনি যদি বিশেষ উৎসাহ না-ও দেখান, তাতে আমি দমে যাব না। ভেবেছিলাম, মিনিট পনর-কুড়ি কথা বলেই তিনি আমাকে বিদায় দেবেন। কিন্তু কার্যত তার উলটোটাই হল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই খোলসটা খসিয়ে দিলাম আমি; ভারত-চীন পরিস্থিতি সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ আলোচনায় আমরা মগ্ন হয়ে গেলাম। নয়াদিল্লিতে গিয়ে মিঃ কারডেল্‌জ্‌ আর মিঃ রাপাকি কী অভিমত প্রকাশ করেছেন, এবং মস্কোতে গিয়ে রুশদের কাছে আর পশ্চিমী কূট-নীতিকদের কাছে কী শুনেছি আমি, সব তিনি জানতে আগ্রহী। মিঃ বান্‌ডির কাছে আমি আশা প্রকাশ করে এলাম যে, তাঁর সঙ্গে যে আমার আলোচনা হল, মিঃ কেনেডিকে এ-সব কথা তিনি জানাবেন।

পরদিন সকালে শুনলাম, সারা ওয়াশিংটন জুড়ে মিঃ বান্‌ডি আমার খোঁজ চালাচ্ছেন। তাঁর দপ্তর থেকে ভারতীয় দূতাবাসে, আমার হোটেলে, এবং সম্ভাব্য

আরও নানান জায়গায় ফোন করা হয়েছে, কিন্তু কোথাও আমার খোঁজ মেলেনি। অতঃপর তাঁরা সেনেটর কুপারের অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁরা জানতেন যে, কংগ্রেস-সদস্য ফ্রেলিং হাইসেনের সঙ্গে মিঃ কুপার সেদিন সকালে আমার এক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছেন। শেষপর্যন্ত সেইখানেই মিঃ বান্ডি আমাকে পাকড়াও করলেন। তখন প্রায় বেলা বারোটা। মিঃ বান্ডি বললেন, আর-একটু আগে তিনি আমাকে খবর দিতে পারেননি, তার জন্য তিনি দুঃখিত। ব্যাপার এই যে, আমার সঙ্গে তাঁর আলোচনার বিবরণ তিনি প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে জানিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট তাতে বলেন যে, তাঁর সঙ্গে দেখা না করে তিনি আমাকে আমেরিকা থেকে চলে যেতে দিতে চান না। বেলা একটায় মরোক্কার রাজাকে তিনি মধ্যাহ্ন-ভোজের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন; তার আগে তিনি হাতে বিশেষ কাজ রাখেননি। সুতরাং এক্ষুনি যদি আমি হোয়াইট হাউসে যাই, তাহলে সানন্দে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন। মিঃ বানডির কথা শুনে তৎক্ষণাৎ হোয়াইট হাউসে গেলাম। সাক্ষাৎ হল প্রেসিডেন্ট কেনেডির সঙ্গে।

প্রেসিডেন্ট বললেন, সেনেটর আর কংগ্রেস-সদস্যদের সঙ্গে আমার যে-সব তর্ক-আলোচনা হচ্ছে, তার কথা তিনি শুনেছেন। কস্টা রিকার নতুন প্রেসিডেন্টের কার্যভার গ্রহণ উপলক্ষ্যে দিন কয়েক আগে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। যাত্রাপথে তাঁর সঙ্গী ছিলেন সেনেটের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কমিটীর কয়েকজন প্রবীণ সদস্য। একই প্লেনে তাঁরা কস্টা রিকায় যান। ভারত-চীন পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের সঙ্গে আমার আলোচনার কথা তাঁরা তখন প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে সবিস্তারে জানান। আলোচনা করে আমার কী মনে হয়েছে, প্রেসিডেন্ট সেটা জানতে চাইলেন। তাতে আমি বললাম যে, এমনিতে সবাই খুব সহানুভূতিশীল, কিন্তু ডেমোক্রাট আর রিপাবলিকান দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এবং সরকারী কর্মকর্তারাও যে মনোভাব দেখাচ্ছেন সেটা বিস্ময়কর। ভারতবর্ষ যাতে কার্যকরভাবে কমিউনিস্ট চীনকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়, তার জন্য ভারতবর্ষের সামরিক বল প্রচুর বাড়ানো দরকার; আমেরিকা তার ব্যবস্থা করতে এত অনিচ্ছুক কেন (টুকরো-টুকরো ভাবে সামরিক সরঞ্জাম দেওয়া অন্য কথা) তা আমি বুঝতে পারিনি। মিঃ কেনেডিকে আমি এও বললাম যে, চীন কর্তৃক আক্রান্ত হবার পরেও মারকিন সরকারের কাছ থেকে যা আমরা আদায় করতে পারছি না, মাত্র কয়েক বছর আগেও তাঁর পূর্বসূরী তা কিন্তু ঢালাওভাবে শ্রীনেহরুকে দিতে চেয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ও মিঃ ডালেস যখন পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করেন, তখন আইজেনহাওয়ার নিজের থেকেই বলেছিলেন যে, পাকিস্তানকে-দেওয়া প্রতিটি অস্ত্রের জন্য ভারতকে তিনি তিনটি করে অস্ত্র দিতে রাজী; শ্রীনেহরু কি তা নিতে রাজী আছেন? আইজেনহাওয়ার এও বলেছিলেন যে, সে-অস্ত্র যে ভারত কর্তৃক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে না, শ্রীনেহরুর কাছে এমন কোনও আশ্বাসও তিনি চান না। আসলে, আইজেনহাওয়ার যে এ-কথা বলেছিলেন, তার কারণ এই যে, শ্রীনেহরুকে তিনি ভালই চিনতেন; তিনি জানতেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শ্রীনেহরু কখনই সে-অস্ত্র ব্যবহার করবেন না। যাই হোক্, অস্ত্রসাহায্যদানের সেই প্রস্তাব শ্রীনেহরু তখন সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন, কেননা অনুরূপভাবে অস্ত্র-সাহায্য গ্রহণ করলে তাঁর গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার নীতি তাতে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হত। কিন্তু অবস্থা তারপর অনেক পালটেছে। দেখা যাচ্ছে, বছর কয়েক আগে আমেরিকার

কাছ থেকে অযাচিতভাবে যা পাওয়া সম্ভব ছিল, এখন আমরা চেয়েও তা পাচ্ছি না।

প্রেসিডেন্ট কেনেডি বললেন, আমার যুক্তিটা তিনি বুঝতে পেরেছেন। তবে আমি যা বলছি, রাজনৈতিক কারণে তা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ঠাট্টাচ্ছলে তিনি বললেন যে, ভারতবর্ষ আর মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের মতান্তরের মূলে রয়েছে দুটি 'কে'। কাশ্মীর আর কৃষ্ণ মেনন। ('দুই কে' কথাটা তখন খুব চালু হয়েছিল। এর দ্বারা কেনেডি আর ক্রুশ্চফকে বোঝানো হত।) আমি বললাম, কমিউনিস্ট চীন যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে, ভারতবর্ষ যাতে তার মোকাবিলা করতে পারে, তার জন্যই আমেরিকার উচিত ভারতবর্ষের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা; ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর-বিরোধের ফয়সলা না হওয়া পর্যন্ত আমেরিকা তা করতে পারবে না, এ-কথার যুক্তি কী, তা আমি বুঝতে পারছি না। চীনকে প্রতিরোধ করবার জন্য ভারতবর্ষকে তিনি কতটা সামরিক সাহায্য দেবেন না-দেবেন, এ-প্রশ্নের মীমাংসা এরই গুণাগুণের ভিত্তিতে হওয়া উচিত; কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসা তো ষোল বছরেও হয়নি, তার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না।

প্রেসিডেন্ট কেনেডি বললেন, কাশ্মীর-সমস্যার মীমাংসা এখুনি করতে হবে, এমন দাবি তিনি করছেন না। আমেরিকানরা যা ভাবছে, এ-সমস্যা সম্ভবত তার চাইতে জটিল। তিনি এও স্বীকার করলেন যে, চীনা হামলার পরমুহূর্তেই অধ্যাপক গলব্রেথের পক্ষে কাশ্মীর-সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য ভারত সরকারের উপরে চাপ দেওয়াটা ঠিক হয়নি। "তবে কাশ্মীর-সমস্যার চূড়ান্ত ফয়সলা হচ্ছে এক কথা; আর এ সম্পর্কে যে মনোভাব আপনাদের বিদেশী বন্ধুদের কাছে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হয়, সেই মনোভাব অবলম্বন করা হচ্ছে অন্য কথা। সমালোচকদের কথা না-হয় ছেড়েই দিচ্ছি। পাকিস্তানের কথা ভুলে যান। দীর্ঘকাল ধরে আপনাদের প্রধানমন্ত্রীকে যাঁরা সমর্থন করে আসছেন, এ-ব্যাপারে তাঁর মনোভাব তাঁদের কাছে অযৌক্তিক বলে মনে হয়।"

প্রশ্ন করলাম, এ-ব্যাপারে শ্রীনেহরু কী ধরনের মনোভাব অবলম্বন করলে তিনি ও আমাদের অন্যান্য বিদেশী বন্ধুরা সেটাকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করবেন, দয়া করে তিনি তা আমাকে বুঝিয়ে বলবেন কি? উত্তরে প্রেসিডেন্ট কেনেডি বললেন যে, মিঃ হিউজেন ব্ল্যাক তো ভারত আর পাকিস্তান, এই দুই দেশেরই বন্ধু; কিছুদিন আগে মিঃ ব্ল্যাককে তিনি কাশ্মীর বিরোধে মধ্যস্থতা করবার জন্য পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মিঃ নেহরু এ-প্রস্তাব তখন প্রত্যাখ্যান করেন। অবশ্য মিঃ কৃষ্ণ মেননের প্রভাব তখন খুব প্রবল ছিল। এখন তো আর মিঃ মেনন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নন, সুতরাং মিঃ নেহরুর কাছ থেকে হয়ত এখন আর-একটু সাড়া পাওয়া যেতে পারে। প্রেসিডেন্ট কেনেডি বললেন, এ-ব্যাপারে তিনি আবার চেষ্টা করে দেখবেন, খুব শিগগিরই তিনি সেক্রেটারি রাস্ক্‌কে নয়াদিল্লিতে পাঠাচ্ছেন। মধ্যস্থতার ব্যাপারে সম্মত হবার জন্য মিঃ নেহরুকে যেন অনুরোধ করি। মধ্যস্থের ভূমিকা তো বিচারকের মতো নয়; তাঁর কাজ হচ্ছে দুই পক্ষকে এনে বৈঠকে মেলানো, যাতে তাঁরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস এই বিষয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। আলোচনা করতে করতে মীমাংসার এমন একটা সূত্র হয়ত মিলে যেতে পারে, দুই পক্ষের কাছেই যা গ্রহণযোগ্য। পশ্চিম ইরিয়ান সংক্রান্ত ওলন্দাজ-ইন্দোনেশীয় বিরোধে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিযুক্ত মধ্যস্থ হিসেবে রাষ্ট্রদূত

বাংকারের ভূমিকার কথা তিনি প্রসঙ্গত উল্লেখ করলেন।

প্রেসিডেন্ট কেনেডি এর পর যা বললেন, তা তাৎপর্যময়: "তোমাদের প্রধানমন্ত্রীর অসুবিধা কী, তা আমি বুঝতে পারি। লাদখের নিষ্পাদপ পাহাড়ে তিনি কমিউনিস্ট চীনের শক্তির সম্মুখীন। এই গুরুতর অবস্থার তিনি যাতে মোকাবিলা করতে পারেন, তার জন্য ভারতের সামরিক শক্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করা দরকার; মিঃ নেহরু চাইছেন, আমেরিকা তার ব্যবস্থা করুক। কিন্তু আপনারা বলছেন, আমাদের বক্তব্য এই যে, কাশ্মীর-বিরোধের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত আমেরিকা তা করবে না। মীমাংসার অর্থ যদি এই হয় যে, মিঃ নেহরুকে কাশ্মীর উপত্যকা পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে হবে, তাহলে আমি অন্তত তাতে রাজী হতুম না। মিঃ নেহরুর বদলে আমাকে যদি সিদ্ধান্ত নিতে হত, তাহলে সবুজ ওই উপত্যকাটিকেই ধরে রাখতুম আমি, নিষ্পাদপ ওই পাহাড়গুলিকে ছেড়ে দিতুম। নিষ্পাদপ পাহাড়ের কথা ভেবে সবুজ উপত্যকাটিকে আমি ছেড়ে দিতুম না।" প্রেসিডেন্ট কেনেডির কথা থেকে আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলুম যে, কাশ্মীর বিরোধের এমন মীমাংসা তিনি চান না, ভারতকে যার ফলে কাশ্মীর উপত্যকা হারাতে হবে।

প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে অতঃপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, অন্য 'কে' সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যটা কি তিনি আর-একটু বুঝিয়ে বলবেন? উত্তরে তিনি সংক্ষেপে বললেন যে, একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী কাকে তাঁর মন্ত্রিসভায় নেবেন না-নেবেন, তা নিয়ে তাঁর কিছু বলবার নেই; তবে কথা এই যে, ডেমোক্রাট আর রিপাবলিকান, এই দুই দলেরই যে-সব সেনেটর আর কংগ্রেস-সদস্যের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে, মিঃ মেনন সম্পর্কে তাঁদের চিত্তে একটি মস্তবড় জিজ্ঞাসার চিহ্ন বর্তমান। সবাই জানে, মিঃ মেননের অভিমত এই যে, চীন নয়, পাকিস্তানই হচ্ছে ভারতবর্ষের পয়লা-নম্বর শত্রু। মিঃ নেহরু যদি মিঃ মেননকে আবার ক্ষমতার আসনে ফিরিয়ে আনেন, যা কিনা অসম্ভব নয়, তাহলে ভারতবর্ষের এই বর্ধিত সামরিক শক্তিকে মিঃ মেনন তখন কোন্ কাজে লাগাবেন? ঠিকই হোক আর ভুলই হোক, মার্কিন রাজনীতিকদের মনে এ নিয়ে গুরুতর সংশয় রয়েছে।

আলোচনা যখন এই পর্যায়ে পৌঁছেছে, তখন আমি প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে বললাম যে, ভারত-চীন সমস্যার ব্যাপারে রাশিয়া আর আমেরিকার মধ্যে বক্তব্যের যে মিল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তা বিস্ময়কর। দুই রাষ্ট্রই, প্রায় একইভাবে, বলছে যে, চীনা আক্রমণের পুনরাবৃত্তি ঘটবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত, এবং ভারতবর্ষের পক্ষে এ নিয়ে খুব উত্তেজিত হওয়া উচিত হবে না। আমি যেভাবে বলেছি, সেভাবে ভারতবর্ষের সামরিক শক্তিবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যখন তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তখন এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ অসামরিক একটা কূটনৈতিক উদ্যোগের সম্ভাব্যতার কথা কি তিনি বিবেচনা করে দেখতে পারেন না? এই প্রসঙ্গেই মার্কিন-সোভিয়েট যুক্ত বিবৃতির কথা বলেছিলাম আমি। বলেছিলাম, এইভাবে যদি একটা যুক্ত বিবৃতি প্রচারের ব্যবস্থা হয়, তাহলে সীমানা-বিরোধের বিষয়গুলিকে সবিস্তারে বিবেচনা করবার জন্য পরে একটা আন্তর্জাতিক কমিশন নিয়োগেরও ব্যবস্থা হয়ত হতে পারবে। এই যুক্ত বিবৃতিতে ভারত-চীন বিরোধে উদ্বেগ প্রকাশ করা হবে এবং শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা হবে। কিন্তু শুধু এইটুকুতেও কাজ নেহাত কম হবে না। বিবৃতি প্রচার করছে পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিমান দুটি রাষ্ট্র,

সুতরাং পৃথিবীর উপরে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। শুনে প্রেসিডেন্ট বললেন যে, আমার প্রস্তাবটা মন্দ নয়, এ-বিষয়ে তিনি ভাল করে ভেবে দেখবেন।

দেখলাম, প্রেসিডেন্ট কেনেডি বেশ খোলাখুলি এবং সহৃদয়ভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। কমিউনিস্ট চীনের সামরিক শক্তি যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে, সে-বিষয়ে ৫ই জানুয়ারি তারিখে শ্রীনেহরু আমাকে যে চিঠি লিখেছিলেন, প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে তা আমি দেখলাম। চিঠিখানি তিনি মনোযোগ দিয়ে ধীরে-ধীরে পড়লেন, তারপর ক্ষুব্ধভাবে বললেন, "গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার নীতিকে তিনি পরিহার করবেন না, এই তো? একদিকে যখন কমিউনিস্ট চীন আর অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষের জনসাধারণ কি তখনও গোষ্ঠীনিরপেক্ষ? এক্ষেত্রে একমাত্র কমিউনিস্ট আর তাদের সহযাত্রীরা ছাড়া ভারতবর্ষে যে আর কেউ গোষ্ঠীনিরপেক্ষ, এমন কথা আমি বিশ্বাস করি না।" অতঃপর তিনি এমন একটা কথা বললেন, যা হয়ত তাঁর বলবার ইচ্ছা ছিল না। ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বললেন যে, মাত্রই কয়েক মাস আগে কমিউনিস্ট চীনের দাপটে যখন ঘোর সংকট দেখা দিয়েছিল, বিমান-প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করবার জন্য মিঃ নেহরু তখন তাঁর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন, এবং, ভারতবর্ষ গোষ্ঠীনিরপেক্ষ হোক আর যা-ই হোক, প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে সে-আবেদনে সাড়াও দিতে হয়েছিল। ঠাট্টার সুরে তিনি বললেন যে, তার কয়েক দিন বাদেই মিঃ নেহরুর মতি আবার পালটে গেল; দ্রুত তিনি তাঁর সেই পুরনো জায়গাতেই আবার ফিরে গেলেন।

১৯৫০ সনের ১১ই নভেম্বর তারিখে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যে শেষ বাণী লিপিবদ্ধ করেছিলেন, প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে তা আমি দেখালাম। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন :

"মাওয়ের তিব্বত-অভিযানের মূল তাৎপর্য আর কিছু নয়, চীনের সীমান্তকে তিনি একেবারে ভারতবর্ষ পর্যন্ত এগিয়ে আনতে চান, এবং থাবা উঁচিয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে চান; তাড়াহুড়ি ভারতবর্ষ যদি না কমিউনিস্ট ব্লকে যোগ দিয়ে বসে, তাহলে সুযোগ বুঝে, প্রয়োজনীয় কৌশল অবলম্বন করে, ভারতবর্ষকে তিনি আক্রমণ করবেন। কিন্তু মাও আর স্তালিনের ক্রোধ থেকে রেহাই পাবার জন্যে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলে তাতে মঙ্গল হবে না। এতে করে আমাদের যাবতীয় আদর্শ আর অভীপ্সার ধ্বংসের পথকেই উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। আমাদের যদি রক্ষা পেতে হয়, তাহলে চীন সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন করতে হবে, তার জঘন্য মতলবকে প্রকাশ্যে ধিক্কার দিতে হবে, বিনা দ্বিধায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশে দাঁড়াতে হবে, এবং আমেরিকা যাতে আমাদের অনুকূলে হস্তক্ষেপ করতে পারে ও—তার চাইতেও যেটা বেশী জরুরী—ভারতবর্ষ সম্পর্কে মাওয়ের অসৎ উদ্দেশ্যকে আমেরিকা যাতে নিবারণ করতে পারে, তার সুবিধার জন্য আমাদের আত্মসম্মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। সামরিক বিচারে চীনের শক্তি আমাদের প্রায় দশগুণ; কিন্তু গণতন্ত্র রক্ষায় মার্কিন ব্যবস্থার অগ্রফলক হিসেবে ভারতবর্ষ অনায়াসেই মাওয়ের লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ। নিজেদেরকে সেই অগ্রফলক হিসেবে গড়ে তুলবার, এবং শুধুই নিজেদের প্রিয় মাতৃভূমিকে নয়, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে রক্ষা করবার মুহূর্ত আজ সমাগত; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমরাই হচ্ছি প্রধান শক্তি। এ-কথা আজ আমাদের নিঃসংশয়ে বুঝতে হবে যে, মাও যে তিব্বত আক্রমণ করেছেন, যথাসম্ভব শীঘ্র ভারতবর্ষকে বিপদগ্রস্ত করাই তার মূল উদ্দেশ্য।"

শ্রীঅরবিন্দ যে কে, প্রেসিডেন্ট কেনেডি তা জানতেন না। তাই সংক্ষেপে আমি তাঁর পরিচয় তাঁকে জানালাম। বললাম যে, তিনি ইঙ্গভাবাপন্ন একজন বাঙালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল, পুত্রকে তিনি শৈশব থেকেই ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন। সেই অনুযায়ী, ছেলের বয়স যখন মাত্র ছ বছর, তখন এক ইংরেজ মিশনারী বন্ধুর তত্ত্বাবধানে তিনি তাঁকে ইংল্যানডে পাঠিয়ে দেন; সেখানে তাঁকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হল। ছাত্র হিসেবে তিনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন; স্কলারশিপ পেয়ে তিনি লনডনের পাবলিক স্কুল সেন্ট্ পল্'স-এ আসেন। স্কুলের পাঠ সাঙ্গ হবার পর তিনি কেমব্রিজে যান; ফাউনডেশন স্কলার হিসেবে কিংস কলেজে পড়তে থাকেন। সেখানে তিনি প্রাচীন সাহিত্যে ট্রাইপস পান, ভারতীয়দের পক্ষে যা পাওয়া কিনা খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা। ১৮৮৮ সনে প্রাচীন সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর ট্রাইপস সহ সেখানকার পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন। একুশ বছর বয়সে ভারতে ফিরে এসে অধ্যাপক হিসেবে তিনি বরোদার এক কলেজে যোগ দেন। মাতৃভাষা বাংলা কিংবা অন্য কোনও ভারতীয় ভাষার 'ক' অক্ষরও তিনি তখন জানতেন না। অতঃপর একে-একে যাবতীয় ভারতীয় ভাষা তিনি শিক্ষা করলেন। আর শিখলেন আমাদের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত। আর সব ছেড়ে দিয়ে শুধু বেদ উপনিষদ গীতা ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর রচনা যদি কেউ পড়েন, এবং সেইসঙ্গে পড়েন তাঁর কবিতা আর অন্যবিধ সাহিত্যসম্ভার, তাহলেও তাঁর জ্ঞানের পরিধি দেখে বিস্ময় মানতে হবে। কিন্তু এ তো শুধু পাণ্ডিত্য আর ধীশক্তির ব্যাপার। এই শতকের প্রথম দশকে তিনি ছিলেন বাংলা দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা; ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ছিল সেই আন্দোলনের লক্ষ্য। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি সহিংস আন্দোলনের অসারতা বুঝতে পারেন এবং ভারতে ফরাসী উপনিবেশ পণ্ডিচেরীতে চলে যান। ১৯১০ থেকে ১৯৫০ সন পর্যন্ত সেইখানেই তিনি কাটিয়েছেন। সেখানে যে বাড়িতে তিনি থাকতেন, গত চব্বিশ বছরের মধ্যে একবারও তিনি তার বাইরে আসেননি। সেই বাড়ির মধ্যে শুধু ধ্যান, চিন্তা আর লেখাতেই তাঁর সময় কাটত। আত্মোন্নয়নের জন্য দশকের পর দশক ধরে যে চেষ্টা তিনি করেন, তার ফলে এমন একটা চেতনা ও শক্তি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, যা নেহাত মানসিক চেতনা কিংবা ধীশক্তি নয়। তা আরও বড় জিনিস।

শ্রীঅরবিন্দের শেষ বাণীর কথাগুলিকে বারকয়েক পাঠ করলেন প্রেসিডেন্ট কেনেডি। তারপর বললেন, "এটা নিশ্চয় ছাপার ভুল। সনটা নিশ্চয়ই ১৯৫০-এর জায়গায় ১৯৬০ হবে। কমিউনিস্ট্ চীন কী করবে না-করবে, ১৯৫০ সনেই ভারতবর্ষের এক প্রান্তে বসে ধ্যানযোগে একজন মানুষ তা জানতে পেরেছিলেন, এই কথাই কি আপনি বলতে চান নাকি?"

উত্তরে প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে আমি বললাম যে, এটা ছাপার ভুল নয়, শ্রীঅরবিন্দ ১৯৫০ সনেই দেহত্যাগ করেছেন।

শুনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, "তাহলেই দেখুন, দুজনেই তো মহান মানুষ। কিন্তু তাঁদের একজন—নেহরু—চীন আর আমেরিকার মধ্যে আপনাদের গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার পথ দেখিয়েছেন। সেক্ষেত্রে অন্যজন—অরবিন্দ—বাঁচবার জন্য অন্য পথ দেখিয়েছিলেন আপনাদের। পন্থা নির্বাচনের দায়িত্ব এখন ভারতবাসীদের।"

মরক্কোর রাজাকে মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন; প্রেসিডেন্ট কেনেডি

তাই উঠে দাঁড়ালেন। উপহার হিসেবে ভারতবর্ষ থেকে তাঁর জন্য তিনখানা বই নিয়ে এসেছিলাম আমি। সেই বই তিনখানা আমি তাঁর হাতে তুলে দিলাম। তিনখানাই শ্রীঅরবিন্দের লেখা। (১) দি আইডিয়াল অব হিউম্যান ইউনিটি, (২) দি হিউম্যান সাইক্‌ল্‌, (৩) ওয়র অ্যান্‌ড্‌ সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশন। দরজা পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিয়ে প্রেসিডেন্‌ট কেনেডি বললেন, "আবার যখন ওয়াশিংটনে আসবেন, তখন আমার সঙ্গে দেখা করবেন।"

ভারত-চীন সমস্যা এবং আমাদের অস্ত্রসাহায্য লাভের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমেরিকার রাজনীতিকদের সঙ্গে আমার যে-সব আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, ওয়াশিংটন থেকে শ্রীনেহরুকে আমি তার তিনটি লিখিত বিবরণ পাঠাই। এপরিলের মাঝামাঝি নয়াদিল্লিতে ফিরে এলাম আমি। ফিরবামাত্র শ্রীনেহরু আমাকে ডেকে পাঠালেন। এক রবিবারের বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে আমি তার সঙ্গে দেখা করি। বাড়িতে সেদিন লোকজন বিশেষ কেউ ছিলেন না, তাঁরও তখন হাতে কিছুটা সময় ছিল। চা এল। ধীরেসুস্থে তিনি কথা বলতে লাগলেন। "মসকো-ওয়াশিংটনের মহাসফর শেষ করে তাহলে ফিরেছ। এখন সব খুলে বলো দেখি।" মারকিন প্রেসিডেন্‌টের সঙ্গে আমার আলোচনার সময় তিনি যা-যা বলেছিলেন, দেখলাম শ্রীনেহরু তার সবিস্তার বিবরণ জানতে আগ্রহশীল। শ্রীনেহরুকে আমি সাহস করে বললুম যে, মারকিন প্রেসিডেন্‌টের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা যে ঈষৎ অস্বস্তিকর হয়ে রয়েছে, সেটা গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার জন্যও নয় কিংবা অন্য কোনও নীতিগত কারণেও নয়। আর সেইজন্যই, চীনারা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নেমে আসবার পর তিনি যখন বিমান-প্রতিরক্ষার আবেদন জানিয়েছিলেন, মারকিন প্রেসিডেন্‌ট তখন আমাদের গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাননি; আবেদন জানানো মাত্রই তাঁর মনে হয়েছিল যে, তাঁকে সাড়া দিতে হবে।

শ্রীনেহরুকে আমি বললুম, প্রেসিডেন্‌ট কেনেডির ঘনিষ্ঠতম মহলের একজন মানুষ আমাকে জানিয়েছেন যে, প্রেসিডেন্‌টের চিত্তে দুটি গোপন দুঃখ রয়েছে। যেদিন তিনি প্রেসিডেন্‌ট হন, সেইদিনই তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে তিনি 'জওহরলাল নেহরুর সুউচ্চ আদর্শবাদ' ও 'চার্ল্‌স দ্যগলের দৃঢ়তা'র উল্লেখ করেছিলেন; সত্যিই তাঁর চিত্তে এই আশা ছিল যে, এই দুজন মহান মানুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তিনি পাবেন; কিন্তু তা তিনি পাননি, যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও দুটি ক্ষেত্রেই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। ১৯৬১ সনের নভেমবরে আমেরিকায় গিয়ে প্রেসিডেন্‌ট কেনেডির সঙ্গে দেখা করেছিলেন শ্রীনেহরু। সেই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে প্রেসিডেন্‌টের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে আমি যা শুনেছি, শ্রীনেহরুকে তা আমি জানালাম। বললাম, শ্রীনেহরু যে ওয়াশিংটনে আসছেন, মিঃ কেনেডির চিত্তে এতে দারুণ উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। প্রায় বাচ্চা-ছেলেদের মতই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। শ্রীনেহরুর অভ্যর্থনা সংক্রান্ত প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে তিনি আর তাঁর স্ত্রী তখন নাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ-আলোচনা করতেন। শ্রীনেহরুর খাদ্য-তালিকায় কী কী রাখা হবে; তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য কাকে কাকে আমন্ত্রণ জানানো হবে; এবং শ্রীনেহরুর হয়ত ভাল না-লাগতে পারে, এই বিবেচনায় কাকে কাকে আমন্ত্রণ জানানো হবে না—প্রতিটি ব্যাপার নিয়ে তখন তিনি মাথা ঘামাতেন। অন্য কোনও অতিথির বেলায় এতসব ব্যাপার নিয়ে মারকিন প্রেসিডেন্‌টকে কখনও মাথা ঘামাতে দেখা যায়নি। কিন্তু শ্রীনেহরুর কথা স্বতন্ত্র। তাঁর ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহ

আর উৎসাহের সীমা ছিল না। অথচ শেষপর্যন্ত কী হল? এত আয়োজন সত্ত্বেও শ্রীনেহরু তাঁর নিজেরই মধ্যে গুটিয়ে রইলেন, ভাল করে নিজেকে তিনি প্রকাশই করলেন না। প্রেসিডেন্ট কেনেডি এতে বিস্ময় বোধ করেছিলেন; দমেও গিয়েছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল থেকেই এ-সব কথা শুনেছিলাম আমি। শ্রীনেহরুকে তা আমি জানালাম।

বললাম, "এত অসংখ্য মানুষের সঙ্গে এত মধুর আপনার আচরণ। সেক্ষেত্রে, বয়সে যিনি আপনার পুত্রস্থানীয়, সেই তরুণ মানুষটির প্রতি আর-একটু স্নেহ আর-একটু সহৃদয়তা আপনি দেখাতে পারলেন না কেন?"

উত্তরে শ্রীনেহরু বললেন, "আর কী করতে পারতুম আমি? তোমার নিশ্চয় মনে হয় না যে, তাঁকে আমার আলিঙ্গন করা উচিত ছিল?" একটু থেমে বললেন, "আমি যতদূর জানি, তাঁর সঙ্গে আমার কোনও ভুল-বোঝাবুঝি হয়নি।"

এই ধরনের কথা আমি শ্রীনেহরুকে এর আগেও বলতে শুনেছি। এবারে কিন্তু আমি সহজে হাল ছাড়লুম না। আমার বক্তব্যকে আরও লক্ষ্যাভিমুখী করে তুললুম। বললুম, "না স্যার্, আপনি তাঁকে আলিঙ্গন করবেন, এমন কথা আমি ভাবিনি। কিন্তু ভুল-বোঝাবুঝি না-হওয়া এক বস্তু, আর ঠিকমত বোঝাবুঝি হওয়া অন্য বস্তু। মানুষে-মানুষে যে-ধরনের বোঝাবুঝি হওয়া দরকার, আপনার সঙ্গে তাঁর তেমনই একটা বোঝাবুঝি কাম্য ছিল। আমার মনে হয়, সত্যিই তাঁর চিত্তে এই ধরনের একটা বিশ্বাস ছিল যে, জওহরলাল নেহরু আর জন কেনেডির মধ্যে যদি একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাহলে শুধু এই দুজন মানুষের চেষ্টাতেই পৃথিবীকে পালটে দেওয়া সম্ভব। আমার মনে হয়, আমেরিকানরা যা নিয়ে মাথা ঘামায়, তা গোষ্ঠীনিরপেক্ষতা নয়, কিংবা অন্য কোনও নীতিগত ব্যাপারও নয়। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে, আপনি যখন রাশিয়ায় গিয়েছিলেন, রাশিয়ানরা তখন আপনাকে বিপুল অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। সেই অভ্যর্থনার সঙ্গে তাদের হৃদয়ের যোগ ছিল বলেই আমি মনে করি; ব্যাপারটা মোটেই কৃত্রিম নয়। সফল সেই সফরের শেষে আপনি যখন সোভিয়েট রাশিয়া থেকে বিদায় নেন, তখন সম্পূর্ণ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মস্কো বিমান-বন্দরে আপনি বলেছিলেন যে, আপনার হৃদয়ের একটা অংশ সোভিয়েট রাশিয়াতেই রয়ে গেল। আর ওয়াশিংটন থেকে যখন আপনি দেশে ফেরেন, কায়রো বিমানবন্দরে জনাকয়কে মারকিন সাংবাদিক আপনাকে তখন জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আপনার সময় কেমন কাটল। উত্তরে, ঈষৎ রুক্ষভাবেই আপনি বলেছিলেন, "পৃথিবীতে যে-কোনও লোকের সঙ্গেই আমি সময় কাটাতে পারি।" মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের কাগজগুলিতে এ-উক্তি ফলাও করে ছাপা হয়। শুনেছি, আপনার সেই উক্তিতে প্রেসিডেন্ট কেনেডি বেদনা বোধ করেছিলেন। এই ধরনের কয়েকটি ব্যাপারের জন্যই আপনার আর আমেরিকানদের মধ্যে একটা ব্যবধান দেখা দিয়েছে। আপনার গোষ্ঠীনিরপেক্ষতা-নীতির সঙ্গে এই ব্যবধানের কোনও সম্পর্ক নেই। এ-ব্যাপারে আমার নিজের ধারণা এই যে, আমেরিকানদের আপনি—গ্রীক অর্থে—বর্বর বলে মনে করেন।"

শ্রীনেহরু আমার কথাটা বুঝলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর, যে ঔদার্য ছিল তাঁর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য, সেইটেই আবার পরিস্ফুট হয়ে উঠল। আমার কথায় তিনি ক্ষুণ্ণ হলেন না। স্মিত হেসে বললেন, "দ্যাখো, চীনেও আমি ওই একই কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম যে, আমার হৃদয়ের একটা অংশ

সেখানে রয়ে গেল। কিন্তু দ্যাখো আজ কী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে!" শুনে আমি হাসলুম। তিনিও হাসলেন। বললেন, "আরও কয়েকটা পকোড়া খাও; বেশ চমৎকার পকোড়া করেছে।" সুতরাং আরও কয়েকটি পকোড়া খেলুম আমি; তারপর চতুর্থ চায়ের পেয়ালাটি নিঃশেষ করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলুম।

কাশ্মীর বিরোধে একজন মধ্যস্থ নিয়োগের ব্যাপারে শ্রীনেহরুর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসবার জন্য ১৯৬৩ সনের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট কেনেডি সেক্রেটারি রাস্ক্‌কে নয়াদিল্লিতে পাঠিয়ে দেন। শ্রীনেহরুর কাছে এবারে যে সহৃদয় আচরণ পাওয়া গেল, আমেরিকানরা তাতে খুবই খুশী হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে বেসরকারীভাবে আমি দুই পক্ষের মধ্যে যোগ রক্ষা করেছিলাম; সিনিয়র অফিসাররা তাই এই প্রথম পরামর্শের জন্যে আমাকে ডেকে পাঠালেন। প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে একটা ডিনার-পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল; মারকিন অতিথিদের আপ্যায়নে সাহায্য করবার জন্য সস্ত্রীক আমি সেখানে আমন্ত্রিত হলুম। সমস্যা দেখা দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের কমনওয়েল্‌থ-সচিব মিঃ ডানকান স্যান্ড্‌সকে নিয়ে; সব ব্যাপারেই তাঁর মাথা গলানো চাই। বুদ্ধিমত্তার বিচারে মারকিন রাষ্ট্রদূত মিঃ গলব্রেথ একজন উল্লেখযোগ্য মানুষ; ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থ-সচিবকে তিনি সর্বদা রাশ টেনে রেখেছিলেন। কাশ্মীর সম্পর্কে পাক-ভারত বিরোধের ব্যাপারে মধ্যস্থতার প্রস্তাবে শ্রীনেহরু এবারে যে অনুকূল মনোভাব দেখিয়েছিলেন, মারকিন রাজনীতিকরা তাতে খুশী হয়েই দেশে ফিরে যান। অথচ এর আগে মিঃ কেনেডি যখন মিঃ ইউজেন ব্ল্যাককে মধ্যস্থ নিয়োগের প্রস্তাব করেন, শ্রীনেহরু তখন তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

মে, জুন, জুলাই—তিন মাস ধরে মধ্যস্থের খোঁজ চলল। আলোচনা চলতে লাগল নানান জনকে নিয়ে। মধ্যস্থ হিসেবে এক সময়ে লর্ড মাউন্ট্‌ব্যাটেনের নামও উঠেছিল, কিন্তু তিনি ভারতের বন্ধু বলে খ্যাত, পাকিস্তান তাই তাঁর নিয়োগে সম্মত হল না। রাষ্ট্রদূত বাংকারের কথাও বলাবলি করা হচ্ছিল। আসলে দু পক্ষেরই গ্রহণযোগ্য হতে পারেন, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া খুব সহজ ছিল না। মধ্যস্থের জন্য যখন খোঁজ চলছে, তখন—১৯৬৩ সনের অগস্ট মাসে—শ্রীনেহরু সংসদে একটি বক্তৃতা দেন। ভারতবর্ষের সদিচ্ছার প্রতীক হিসেবে ইতিপূর্বে পাকিস্তানকে তিনি যা-কিছু সুবিধে দিতে রাজী হয়েছিলেন, এই বক্তৃতায় তা প্রত্যাহৃত হল। আমি তখন ক্লারেন্‌সে। জায়গাটা জেনেভার কাছে। সেখানে ব্রিটিশ ও মারকিন কোয়েকারদের উদ্যোগে কূটনীতিকদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরামর্শদাতা হিসেবে আমি তাতে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সেইখানে সংবাপত্রে আমি শ্রীনেহরুর বক্তৃতার বিষয় জানতে পারলুম। সেখান থেকে আমি ওয়াশিংটন যাই।

ভারত ও চীনের মধ্যে শান্তিস্থাপনের জন্য মারকিন-সোভিয়েট যুক্ত ব্যবস্থা সম্ভব কিনা, সেটা দেখবার জন্যই আমি দ্বিতীয়বার ওয়াশিংটন গিয়েছিলাম; শ্রীনেহরু এই সফর অনুমোদন করেছিলেন। জুলাই মাসে স্বাক্ষরিত হয়েছিল পরমাণু বিস্ফোরণ আংশিক নির্বিন্ধকরণের চুক্তি; এবং এর ফলে আমার আশা হয়েছিল যে, ভারত-চীন বিরোধ সম্পর্কে যুক্ত বিবৃতি প্রচার করাই হবে বিশ্ব-শান্তির পথে এই দুই মহাশক্তিশালী রাষ্ট্রের পরবর্তী পদক্ষেপ। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে মার্চ মাসেই আমি এই প্রস্তাব দিয়েছিলাম। ওয়াশিংটনে গিয়ে ৪ঠা সেপটেম্বর তারিখে সেক্রেটারি রাস্কের সঙ্গে এ-বিষয়ে

আমার বিশদ আলোচনা হল। মার্কিন পররাষ্ট্র-সচিব রাস্‌ক আমার সঙ্গে খুবই সহৃদয়ভাবে কথা বললেন; এও বললেন যে, এ নিয়ে তিনি ভেবে দেখবেন; কিন্তু ভারত-চীন পরিস্থিতি সম্পর্কে যে কোনও কার্যকর ব্যবস্থা সত্যিই অবলম্বিত হবে, এমন আভাস কিন্তু পাওয়া গেল না। শিগগিরই আমি বুঝতে পারলাম যে, কাশ্মীর সম্পর্কে মধ্যস্থ নিয়োগের সম্ভাবনাকে একতরফা নাকচ করে দিয়ে সংসদে যে বিবৃতি দিয়েছেন শ্রীনেহরু, মার্কিন প্রেসিডেন্টের সেটা ভাল লাগেনি। মার্কিন পররাষ্ট্র-সচিবের ধারণা হয়েছিল যে, এটা একটা অঙ্গীকারের তুল্য ব্যাপার; ৪ঠা সেপটেমবর তারিখে আমাকে তিনি সেই কথাই বলেছিলেন। এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভেবেছিলেন যে, প্রত্যাহারমূলক এই বিবৃতি দেবার আগে শ্রীনেহরু তাঁকে ব্যাপারটা অন্তত জানাবেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নেহরু-কেনেডি সহযোগিতার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, এইভাবেই তার অবসান ঘটল।

ভারতবর্ষে ফিরে শ্রীনেহরুকে আমি বললুম যে, মধ্যস্থতার ব্যাপারটাকে এইভাবে একতরফা নাকচ করে দেওয়া সম্ভবত ঠিক হয়নি। তিনি বললেন, পাকিস্তানের ব্যাপারে আর কোনও চেষ্টা করা নিরর্থক; এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, একমাত্র নিজের শর্ত ছাড়া অন্য কোনও শর্তে কাশ্মীর-বিরোধের শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করে নেবার কোনও ইচ্ছাই পাকিস্তানের নেই। পূর্ব পাকিস্তানে এবং কাশ্মীরের যে-এলাকা পাকিস্তান দখল করে আছে সেখানে চীনা কমিউনিস্ট সমর-শিক্ষকদের জোর কর্মতৎপরতা চলেছে বলে তিনি গোপনসূত্রে খবর পেয়েছেন; পাকিস্তানীদের তারা ব্যাপকভাবে ভিয়েতকং-ধরনের গেরিলা-ট্রেনিং দিচ্ছে। সেই হচ্ছে সূচনা। তার দু বছর বাদে, ১৯৬৫ সনের অগস্ট মাসে, হাজার হাজার সশস্ত্র পাকিস্তানী কাশ্মীর উপত্যকার উপরে আক্রমণ চালায়। ভারতবর্ষকে অসুবিধায় ফেলবার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান নাগাভূমিতেও অস্ত্র সরবরাহ করছিল। তা ছাড়া, মার্কিন বন্ধুরা যাকে 'পাকিস্তান ও কমিউনিস্ট চীনের ফ্লারটেশন' বলে থাকেন, সেই ঢলাঢলিটা এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মধ্যস্থতার জন্য আর-কোনও চেষ্টা করে কোনও লাভ হত না। শ্রীনেহরুর যুক্তি যে খুবই জোরালো, তা আমি বুঝেছিলুম। তবু তাঁকে আমি বললাম যে, সংসদে এসম্পর্কে প্রকাশ্য বিবৃতি দেবার আগে তিনি প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে ব্যক্তিগতভাবে একটা চিঠি লিখলে ভাল হত।

কাশ্মীর বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার সম্ভাবনা তখন থেকে ক্রমেই আরও দূরে সরে যেতে থাকে। শুভার্থীদের পক্ষে এই অবস্থায় আর-কিছু করবার ছিল না। সকলেরই মনে হচ্ছিল যে, আর কোনও আশা নেই। শ্রীনেহরুর মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পূর্বে, ১৯৬৪ সনের মার্চ-এপরিল মাসে, আমি অবশ্য আর-একবার চেষ্টা করে দেখেছিলাম। তাঁর অনুমতি নিয়ে তৃতীয়বার আমি মসকো আর ওয়াশিংটন যাই। ভারত-পাকিস্তান সমস্যা সমাধানের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া যুক্তভাবে কিছু করতে পারে কিনা, সেটা দেখাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। চীন-ভারত বিরোধের ব্যাপারে আমি যে মার্কিন-সোভিয়েট যুক্ত প্রয়াসের প্রস্তাব করেছিলাম, তাতে অংশগ্রহণ করায় মার্কিন প্রেসিডেন্টের কোনও অসুবিধা ছিল না। অসুবিধা ছিল মিঃ ক্রুশ্চফের। তার কারণ, এই যুক্ত প্রয়াসকে উপলক্ষ করেই চীন রাশিয়ার নিন্দাবাদে মুখর হয়ে উঠবে, এমন সম্ভাবনা ছিল। সেক্ষেত্রে পাক-ভারত বিরোধের ব্যাপারে মার্কিন-সোভিয়েট যুক্ত-প্রয়াসে উৎসাহী হতে রাশিয়ার বাধা

ছিল না। তার কারণ কাশ্মীর-প্রশ্নে রাশিয়া বরাবর ভারতকে সমর্থন করে এসেছে। এক্ষেত্রে সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে হাত মেলাতে বরং মারকিন সরকারেরই অসুবিধা ছিল। তার কারণ, পাকিস্তান হচ্ছে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক চুক্তির অংশীদার। যাই হোক, মীমাংসার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াই আমার ধর্ম। হাল না ছেড়ে তাই এই সূত্রে তৃতীয়বার আমি বিদেশযাত্রা করলাম। ১৩ই মার্চ তারিখে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আমি মসকো যাত্রা করলাম। যখনই মসকো গিয়েছি, তখনই তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছি আমি। মারকিন যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েট রাশিয়াকে শান্তি-প্রয়াসে মেলাবার জন্য বেসরকারীভাবে যে অক্লান্ত চেষ্টা আমি চালিয়ে যাচ্ছিলাম, তাতে তাঁর যথেষ্টই বন্ধুসুলভ আগ্রহ ছিল। সেজন্য আমি তাঁর কাছে ঋণী।

মসকোতে অনেকের সঙ্গেই আমার আলোচনা হল। সোভিয়েট ডেপুটি পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মিঃ ফিরিয়ুবিনের সঙ্গে আলোচনাটাই তার মধ্যে সবচাইতে কৌতুহলোদ্দীপক। পাক্-ভারত বিরোধ সম্পর্কে যে মারকিন-সোভিয়েট যুক্ত বিবৃতির কথা আমি ভাবছিলাম, ১৯৬৪ সনের ১৮ই মার্চ তারিখে তার একটা খসড়া আমি মিঃ ফিরিয়ুবিনের হাতে তুলে দিলাম। খসড়াটি হচ্ছে এইরকম :

"পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলে ধাপে ধাপে উত্তেজনা প্রশমনের অভিপ্রায়ে, এবং পৃথিবীর সর্বত্র শান্তিরক্ষা ও শান্তির ভিত্তিকে দৃঢ় করে তুলবার জন্য সংযুক্ত সোভিয়েট সোস্যালিস্ট রিপাবলিক ও মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার

নিম্নোক্ত যুক্ত বিবৃতি প্রচারে সম্মত হয়েছেন :

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে উত্তেজনাময় অবস্থা দেখা দিয়েছে, সোভিয়েট সরকার ও যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাতে উদ্বিগ্ন। ভারত ও পাকিস্তানের মানুষরা শত শত বৎসর ধরে পরস্পরের প্রতিবেশী; তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক, জাতিগত ও বন্ধু-সুলভ অন্যান্য যোগবন্ধন রয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, স্বাধীনতালাভের পর তাদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে ওঠে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেদের ব্যাপকভাবে স্থানত্যাগ করতে হয়েছে, এটা আক্ষেপের কথা। ভারত ও পাকিস্তানের জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থে, এবং এশিয়ায় ও পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার স্বার্থে এই দুই দেশের পক্ষে শান্তি ও বন্ধুত্বের এমন একটা আবহাওয়া ও অবস্থা সৃষ্টি করা প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয়, যাতে উদ্বাস্তু-সমস্যা, কাশ্মীর সমস্যা, ও অন্যান্য যে-সমস্ত সমস্যা তাদের শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রতিবন্ধক হতে পারে, সেই সমুদয় সমস্যাসহ তাদের যাবতীয় বিরোধের একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা সম্ভব হতে পারে।

এই উদ্দেশ্যে যে-সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তা করবার জন্য, এবং, শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি হবার পরে, আপোসে ও বন্ধুভাবে এইসব বিরোধ মিটিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে সরাসরি আলোচনা শুরু করার জন্য ভারত-সরকার ও পাকিস্তান-সরকারের কাছে সোভিয়েট রাশিয়া ও মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার আবেদন জানাচ্ছেন।

সরাসরিভাবে, অথবা দুই পক্ষেরই গ্রহণযোগ্য অন্য কোনও উপায়ের মাধ্যমে, ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকার যে শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় উপনীত হবেন, সোভিয়েট সরকার ও যুক্তরাষ্ট্র সরকার সেই মীমাংসার সঙ্গে যুক্ত থাকতে ও সে সম্পর্কে গ্যারান্টি দিতে সানন্দে রাজী আছেন।

সোভিয়েট সরকার ও যুক্তরাষ্ট্র সরকার আশা করেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের

চিত্তে বর্তমানে যে অবিশ্বাস রয়েছে, এই ব্যবস্থা তার দূরীকরণের সহায়ক হবে এবং বর্তমান বিরোধগুলির শান্তিপূর্ণ মীমাংসাকে তরান্বিত করতে তাদের সাহায্য করবে।

সোভিয়েট সরকার ও যুক্তরাষ্ট্র সরকার আন্তরিকভাবে আশা করেন যে, এইসব বিরোধের মীমাংসার জন্য ভারত ও পাকিস্তান কখনও বলপ্রয়োগের পন্থা অবলম্বন করবে না।"

মিঃ ফিরিয়ুবিনের সঙ্গে নব্বই মিনিট আলোচনা চলেছিল আমার। তখন আমাদের মধ্যে যা-যা কথা হয়েছিল, মসকোতে ভারতীয় দূতাবাসের একজন অফিসার তা সযত্নে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। কাশ্মীর প্রসঙ্গে মিঃ ফিরিয়ুবিন বলেন যে, সোভিয়েট সরকারের বিশ্বাস, ইঙ্গ-মারকিনরা কাশ্মীর-বিরোধের সমাধান চায় না। অমীমাংসিত এই সমস্যাটি বস্তুত তাদের কাছে একটি হাতিয়ার; দক্ষিণ-এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাদের কূটনৈতিক কাজে তারা এই হাতিয়ার ব্যবহার করছে। মিঃ ফিরিয়ুবিনের মনে হয়েছিল, আমি নেহাতই সরল মানুষ, তাই আশা করছি যে, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই ধরনের একটা যুক্ত বিবৃতিতে অংশগ্রহণ করবেন। তিনি আরও বললেন, সোভিয়েট সরকার বরাবরই ভারতের বক্তব্য সমর্থন করে এসেছেন, এবং তাঁদের সেই নীতির কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। মিঃ ক্রুশ্চফ স্বয়ং বলেছেন যে, সোভিয়েট সরকার এই নীতি অনুসরণ করে যাবেন। সোভিয়েট সরকারের চিত্তে যে এ-ব্যাপারে কোনও দ্বিধাসংশয় নেই, এ-কথা জানিয়ে মিঃ ফিরিয়ুবিন বললেন, "আপনাদের কোনও দ্বিধাসংশয় থাকা উচিত নয়।" কাশ্মীরের প্রশ্নে আমেরিকার নীতি অবশ্য এর একেবারে বিপরীত। পাকিস্তান সিয়াটো আর সেনটোর সদস্য, আমেরিকার সে বন্ধুরাষ্ট্র; আমেরিকানরা তাকেই সমর্থন করে। মিঃ ফিরিয়ুবিন অবশ্য আমাকে নিরুৎসাহিত করতে চাইলেন না। তবে বললেন যে, আমেরিকানরা যে মারকিন-সোভিয়েট যুক্ত-বিবৃতির এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবে না, এ-বিষয়ে তিনি নিশ্চিত।

ভারত-পাকিস্তান সমস্যার ব্যাপারে প্রস্তাবিত এই মারকিন-সোভিয়েট যুক্ত বিবৃতির অনুকূলে কিন্তু ওয়াশিংটনের মুখ্য রাজনীতিকদের কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন পাওয়া গেল। এতটা সমর্থন পাওয়া যাবে, এ আমার প্রত্যাশায় ছিল না। সেনেটের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কমিটীর রিপাবলিকান সদস্য মিঃ মান্ড্ট্ এ-ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে কমিটীর চেয়ারম্যান সেনেটর ফুলব্রাইটকে ১৯৬৪ সনের ১১ই এপরিল তারিখে একটি চিঠি লিখলেন। চিঠির সঙ্গে প্রস্তাবিত যুক্ত-বিবৃতির খসড়ার একটি অনুলিপিও তিনি পাঠালেন, এবং চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করলেন যে, এর পরে যখন সেক্রেটারি রাস্ক কমিটীর সম্মুখে উপস্থিত হবেন, তখন এ সম্পর্কে যেন তাঁর সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা হয়। কমিটীর আর-দুজন সদস্য এ নিয়ে প্রেসিডেন্ট জনসনের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব করলেন। ওয়াশিংটনস্থ ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে শ্রীনেহরুর কাছে একটি কেব্ল্ পাঠিয়ে তাঁকে আমি জানালুম যে, এই ধরনের যুক্ত বিবৃতিতে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর না-করতে পারার কোনও কারণ আছে বলে সেনেটররা মনে করেন না। যতটা সমর্থন পাওয়া যাবে বলে আমার আশা ছিল, যুক্ত-বিবৃতির প্রস্তাবে সেনেটরদের কাছ থেকে যে তার চাইতে বেশী সমর্থন পাওয়া গিয়েছে, তাও আমি শ্রীনেহরুকে

জানালুম। তবে আমি জানতে পেরেছিলাম যে, পররাষ্ট্র দপ্তরের অফিসারদের এই যুক্ত-বিবৃতির ব্যাপারে প্রবল আপত্তি রয়েছে। মারকিন-সোভিয়েট যুক্ত-বিবৃতির তাঁরা পক্ষপাতী ছিলেন না; তাঁরা চেয়েছিলেন, এই একই বস্তুকে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের 'কনসেনশাস' হিসেবে প্রচার করবার ব্যবস্থা হোক। কিন্তু যে-উদ্দেশ্যে এই যুক্ত-বিবৃতির প্রস্তাব, সেক্ষেত্রে তা ব্যর্থ হত। আজও আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে, মারকিন বন্ধুরা যদি মারকিন-সোভিয়েট যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে রাজী হতেন, ১৯৬৫ সনের সেপটেমবরে তাহলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ হত না।

১৯৬৫ সনের সেপটেমবর মাসে যে পাক-ভারত যুদ্ধ হয়, তাতে দুই দেশেরই প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। আর-কোনও সমস্যার এতে মীমাংসা হয়নি; তবে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও পাকিস্তান এর ফলে নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছে যে, ভারতের কাছ থেকে অস্ত্রবলের সাহায্যে কাশ্মীরকে কেড়ে নেওয়া যাবে না। অস্ত্রবলের সাহায্যে পাকিস্তান যদি ভারতবর্ষের কাছ থেকে কাশ্মীরকে কেড়ে নিতে পারত, তাহলে মারকিন সরকার কিংবা ব্রিটিশ সরকার যে দুঃখিত হতেন, এমন কথা বিশ্বাসের যোগ্য নয়। কিন্তু আজ তাঁরা কাশ্মীরের ব্যাপারে জব্দ হয়ে আছেন। আমেরিকা যে-অস্ত্রসম্ভার পাকিস্তানকে দিয়েছিল, পাকিস্তান তা ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে। তাতে কমিউনিস্ট চীনেরই সুবিধে হয়েছে। আমেরিকার নির্বুদ্ধিতা আজ দিবালোকের মতই স্পষ্ট। সোভিয়েট ইউনিয়ন, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতবর্ষ আজ ক্রমেই এ-কথা আরও বেশী করে বুঝতে পারছে যে, মূল সমস্যা হচ্ছে কমিউনিস্ট চীনের শক্তি। কীভাবে তাকে প্রতিরোধ করা যায়, সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন। ১৯৬৫ সনের সেপটেমবরের পাক-ভারত যুদ্ধের পর আমার বন্ধু, মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট, মিঃ হিউবার্ট হামফ্রেকে আমি একটি চিঠি লিখি। তাতে সংক্ষেপে এই সমস্যার কথা তাঁকে আমি জানিয়েছিলাম। চিঠিখানি এখানে তুলে দিচ্ছি :

৯৫ সাউথ অ্যাভিনিউ,
নয়াদিল্লি,
২৫ সেপটেমবর, ১৯৬৫

হিজ একসেলেনসি হিউবার্ট এইচ. হামফ্রে,
ভাইস প্রেসিডেন্ট অব দি ইউনাইটেড স্টেট্স,
ওয়াশিংটন ডি. সি.

"প্রিয় হিউবার্ট,

ভারত-মারকিন সম্পর্কের অবস্থার বিষয়ে গত ফেব্রুয়ারি মাসে আপনাকে একটি চিঠি লিখেছিলাম; মার্চ মাসে আপনি অনুগ্রহ করে তার উত্তর দেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আপনার উপদেষ্টারা আপনাকে বুঝিয়েছেন যে, ভারত-মারকিন সম্পর্ক এর আগে কখনও এত ভাল ছিল না। ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মধ্যে অতঃপর অনেক কিছু ঘটেছে। তার মধ্যে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে পাকিস্তান কর্তৃক মারকিন প্যাটন ট্যাংক এবং অন্যান্য মারকিন সমর-সরঞ্জাম ব্যবহারের কথাটাই বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। প্রথমে কচ্ছে, এবং পরে—কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাক ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে —পাঞ্জাবে এই ট্যাংক ও অন্যান্য সরঞ্জাম ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। তার ফলে যে বিশাল তিক্ততা ও ক্রোধের সঞ্চার হয়, ভারতবর্ষ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে তা ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। আশা করি, আপনি আমাকে ভালই জানেন; সুতরাং বুঝতে আপনার অসুবিধে হবার কথা নয় যে, এই দিনগুলি আমার পক্ষে দুঃখের দিন।

আপনার নিশ্চয় মনে আছে যে, গত বছর এপ্রিল মাসে আমি যখন আপনার সঙ্গে দেখা করি, তখন, কাশ্মীর নিয়ে পাক-ভারত বিরোধের ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে একযোগে একটি যুক্ত বিবৃতি প্রচার করা সম্ভব কিনা, শাসন-কর্তৃপক্ষকে তা ভেবে দেখতে বলার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। বলেছিলাম, পাক-ভারত বিরোধ পৃথিবীর এই অংশে গুরুতর অশান্তির সৃষ্টি করতে পারে। যুক্ত বিবৃতির একটি খসড়া আমি আপনাকে দিয়েছিলাম। এই চিঠির সঙ্গে সেই খসড়ার, এবং আমাদের দুজনেরই বন্ধু সেনেটর মান্‌ড্‌ট্‌ কর্তৃক সেনেটের পররাষ্ট্র সম্পর্কীয় কমিটীর চেয়ারম্যানের কাছে লেখা একটি চিঠির, অনুলিপি আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এগুলি দেখলেই সে-সব কথা আপনার মনে পড়বে। ওয়াশিংটনে যাবার পথে আমি মসকোয় থেমেছিলাম; এবং প্রস্তাবিত যুক্ত বিবৃতির খসড়াটি নিয়ে কয়েকজন সোভিয়েট নেতার সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। আমার সঙ্গে এইসব রুশ বন্ধুর যে আলাপ-আলোচনা হয়, সে সম্পর্কে একটি নোট্‌ও আমি আপনাকে দিয়েছি। রুশ বন্ধুরা আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে এমন বহু মানুষ রয়েছে, ঠাণ্ডা যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে যারা নিজেদের কেরিয়ার তৈরী করে; সুতরাং আমার মার্কিন বন্ধুরা কখনই এই ধরনের বিবৃতিতে স্বাক্ষর করবেন না। তাঁরা ঠিকই বলেছিলেন। মার্কিন সেনেটরদের মধ্যে আমার যে-সব বন্ধু রয়েছেন, প্রস্তাবটি অবশ্য তাঁদের ভাল লেগেছিল। এ নিয়ে সেক্রেটারি রাস্‌কের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য সেনেটর মান্‌ড্‌ট্‌ সেনেটের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কমিটীকে অনুরোধও করেছিলেন। সেনেটর কুপার এ সম্পর্কে আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলেন; আপনার সঙ্গে প্রেসিডেন্‌ট্‌ জনসনের কাছে গিয়ে এই প্রস্তাবটি তাঁকে বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ জানাবার জন্য তিনি যে ব্যগ্র ছিলেন, তা হয়ত আপনার মনে আছে। প্রেসিডেন্‌ট্‌ জনসনের সঙ্গে সাক্ষাতের ফল কী হল, তা জানবার আগেই আমি ওয়াশিংটন পরিত্যাগ করি। তবে, আপনাদের পররাষ্ট্র দপ্তরের অফিসাররা যে এর ঘোর বিরোধী, এটা দেখে আমি দুঃখিত হয়েছিলাম। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে, এক বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার যদি এই যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে রাজী হতেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তাহলে এই যুদ্ধ হত না।

কাশ্মীরের প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া এ-যাবৎ পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। দুজনে তারা দুই পক্ষ নিয়েছে। রাশিয়ার বক্তব্য প্রায় এই যে, দোষী কিংবা নির্দোষ যাই হক, ভারতের পক্ষেই সে থাকবে; আর আপনাদের সরকারের বক্তব্য এই যে, যতই দোষ করুক না কেন, বন্ধুকে তো আর ছাড়া যায় না। আর আজ, ভারত-পাক যুদ্ধে—পৃথিবীকে যা প্রায় বিপর্যয়ের কিনারায় নিয়ে এসেছিল—এত রক্তক্ষয়ের পর আপনারা ও সোভিয়েট সরকার, অবস্থার চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে, কাশ্মীর নিয়ে এই পাক-ভারত বিরোধের ব্যাপারে একযোগে কাজ করতে

রাজী হয়েছেন। পৃথিবীর এতে ভাল হবে। কিন্তু যুদ্ধ না-বাধা পর্যন্ত তা আপনারা বুঝতে পারেননি। বিপর্যয়ের সম্ভাবনা অবশ্য চিরতরে লুপ্ত হয়নি; আপাতত সেটা মুলতুবী রয়েছে, এইমাত্র। যে-কোনও মুহূর্তে সেই সম্ভাবনা আবার দেখা দিতে পারে। চীনা কমিউনিস্টরা কী করবে না-করবে, তারই উপরে সেটা নির্ভর করছে।

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যে দুই ধরনের ভ্রান্তি দেখতে পাওয়া যায়, প্রসঙ্গত তার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি কি! এ দুইয়ের মধ্যে একটি ভ্রান্তি মার্কিন, অন্যটি ভারতীয়। মাত্রই কয়েক মাস আগে, ১৯৬৫ সনের ২২শে মার্চ তারিখে, সেনেটের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কমিটীর এক গোপন অধিবেশনে (যার বিবরণ পরে প্রকাশিত হয়েছিল) সাক্ষ্যদান করতে গিয়ে জেনারেল স্ট্রিকল্যান্ড্ ও মার্কিন সাহায্য সংস্থার ডিরেকটর মিঃ ডেভিড বেল বলেন, "আমাদের ধারণা, পাকিস্তানী আর কমিউনিস্ট্ চীনাদের মধ্যে যতই ঢলাঢলি চলুক, আসল সত্যটা তবু এই যে, পাকিস্তান সরকার হচ্ছেন ঘোর কমিউনিস্ট্-বিরোধী, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে পাকিস্তানে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সামরিক শক্তি রাখা দরকার, যার সঙ্গে সর্বদা আমাদের যোগ থাকবে ও বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় যাকে কাজে লাগানো যাবে।" এই হচ্ছে মার্কিন ভ্রান্তির একটি নমুনা। সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের পরেও আপনাদের পররাষ্ট্র-দপ্তর এই ধরনের ভ্রান্তির বিপদ সম্পর্কে অবহিত হবেন বলে মনে হয় না।

ভ্রান্তি আছে ভারতীয়দের মধ্যেও। আমরা ভারতীয়রা দীর্ঘদিন ধরে শান্তি আর সহাবস্থান সম্পর্কে বিশ্বপৃথিবীকে নৈতিক উপদেশ শুনিয়েছি। আজ সেক্ষেত্রে আমাদেরই নীতিবিষয়ক লেকচার শুনতে হচ্ছে। এটা আমাদের ভাল লাগছে না। কমিউনিস্ট চীন ও স্বাধীন বিশ্বের মধ্যেকার সীমান্ত কাশ্মীর থেকে কোরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। আমরা ভারতীয়রা সেক্ষেত্রে কাশ্মীর থেকে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত সীমান্ত বরাবর চীনকে প্রতিরোধ করতে চাই; সীমান্তের বাকী অংশকে চাই না। যেক্ষেত্রে একদিকে সোভিয়েট রাশিয়া ও অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষের গোষ্ঠীনিরপেক্ষ নীতির দ্বারা সেক্ষেত্রে এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল, এখনও সাধিত হচ্ছে; কিন্তু যেক্ষেত্রে একদিকে কমিউনিস্ট্ চীন ও অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সেক্ষেত্রে—এমন কী, ১৯৬২ সনের চৈনিক আক্রমণের পরেও—নিজেদের আমরা গোষ্ঠীনিরপেক্ষ বলে দাবি করে থাকি!

ভারতীয় চিন্তার এই যে ভ্রান্তি, সংসদে মাঝে-মাঝে আমার বন্ধুদের দৃষ্টি আমি এদিকে আকর্ষণ করে থাকি। মার্কিন ভ্রান্তির কথাও বলেছি আমি। আশা করি এই মার্কিন ভ্রান্তির হাত থেকে আপনার বন্ধুদের উদ্ধার করবার জন্য আপনি যথাসাধ্য করবেন।

নিবিড় শ্রদ্ধাসহ

আন্তরিকভাবে আপনার
সুধীর
(সুধীর ঘোষ)"

১৯৬৫ সনের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট এ-চিঠির উত্তর দিলেন। আমার বক্তব্য সম্পর্কে তাঁর মতামত জানালেন তিনি; লিখলেন, আমি

যে খোলাখুলিভাবে আমার বক্তব্য তাঁকে জানিয়েছি এজন্য তিনি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এই বিরাট ভ্রান্তির যেটুকু অংশের দায় ভারতবর্ষের, তার প্রতি যখন আমি অঙ্গুলি-নির্দেশ করলুম, সংসদে কংগ্রেস দলে আমার আপন সহকর্মীদেরই তা বিশেষ ভাল লাগল না। ভিয়েতনাম সংকট ও কমিউনিস্ট্ চীনের অভিপ্রায় সম্পর্কে আমাদের সংসদে, ১৯৬৫ সনের ১৫ই মার্চ তারিখে, আমি সংক্ষেপে একটি বক্তৃতা দিই। জনৈক শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে, কোরিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে, ১৯৫০ সনের ২৮শে জুন তারিখে, সত্যদ্রষ্টা ঋষি শ্রীঅরবিন্দ যা লিখেছিলেন, সংসদে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আমি তা উদ্ধৃত করি। শ্রীঅরবিন্দের সেই বাণী বস্তুত ভবিষ্যদ্বাণী। শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখেছিলেন :

"কোরিয়ার ব্যাপারটা ঠিকমতো অনুধাবনের জন্য তুমি আমার সাহায্য চাইছ কেন জানি না। সেখানকার ব্যাপারটা তো জলের মত সোজা। কমিউনিস্টরা যে আক্রমণ-পরিকল্পনা স্থির করে রেখেছে, এটা তার প্রথম চাল। প্রথমে তারা এই উত্তরাঞ্চলগুলিতে প্রভুত্ব বিস্তার করে সেখানকার দখল নিতে চায়; পরে দখল নেবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার। মহাদেশের অবশিষ্টাংশ সম্পর্কে তাদের মতলবের—তিব্বতের পথে ভারতে ঢুকবার—এটা প্রথম পর্যায়।

"যদি তারা সফল হয়, তাহলে ধাপে ধাপে সমগ্র বিশ্বে তাদের প্রভুত্ব বিস্তৃত না হবার কোনও কারণ নেই। এই পথেই তারা আমেরিকার মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হবে। কোরিয়া সম্পর্কে ট্রুম্যান যে নীতি অবলম্বন করেছেন, তাতে মনে হয়, অবস্থার তাৎপর্য তিনি বুঝেছেন। তবে ব্যাপারটার ফয়সলা করবার মতন শক্তি তাঁর আছে কিনা, এখনও সেটা বুঝতে পারা যায়নি। যে-সব ব্যবস্থা তিনি নিয়েছেন, তা অসম্পূর্ণ ও অসফল বলে মনে হয়; তার কারণ সমুদ্র ও বিমানপথে ছাড়া বাস্তব সামরিক হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। একটা কথা অবশ্য সুনিশ্চিত। সেটা এই যে, এ নিয়ে যদি অত্যাধিক টালবাহানা চলে, এবং আমেরিকা যদি কোরিয়াকে রক্ষা না করে এখন পিছিয়ে আসে, তাহলে ক্রমান্বয়ে তাকে হয়ত পশ্চাদপসরণ করতে হবে, এবং শেষপর্যন্ত সে আর কিছুই করতে পারবে না। কোথাও-না-কোথাও তাকে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে, এবং কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে হবে—তাতে যদি যুদ্ধের ঝুঁকি থাকে, তবু।"

সত্যদ্রষ্টা ঋষি যা বলেছিলেন, তিব্বতের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট চীন ঠিক তা-ই করেছে; ১৯৬২ সনে এই তিব্বতের পথেই সে ভারতবর্ষের উপরে আক্রমণ চালায়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে চীন অবশ্য স্বেচ্ছায় পশ্চাদপসরণ করেছিল। কিন্তু সামরিক বাস্তবতাটা এই যে, সুবিধামতন জায়গায় ও সুবিধামতন সময়ে চীন আবার ভারতকে আক্রমণ করতে পারে। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম যে, ভারতবর্ষের মাথার উপরে খাঁড়া ঝুলছে; এই অবস্থায় ভারতবর্ষের পক্ষে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভিয়েতনাম ছাড়তে বলাই যথেষ্ট নয়। আমেরিকানরা ভিয়েতনাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে, এটা দেখতে আমি কারও চাইতেই কিছু কম ব্যগ্র নই; কিন্তু একই সঙ্গে আফরো-এশীয় ও গোষ্ঠীনিরপেক্ষ বিভিন্ন দেশের সৈন্য নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীনে একটি বাহিনী গড়বার জন্য ভারতবর্ষ ও অন্যান্য গোষ্ঠীনিরপেক্ষ দেশগুলির চেষ্টা করা উচিত। এই রকমের একটি বাহিনী যদি ভিয়েতনামে যায় ও আমেরিকানরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসে, তাহলে কমিউনিস্ট্ চীনের পক্ষে সেক্ষেত্রে ভিয়েতনামকে গ্রাস করা সম্ভব হবে না এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মানুষরা তাদের আপন ভাগ্য

নির্ধারণের সুযোগ পাবে। আমি আরও বললাম যে, যেক্ষেত্রে একদিকে সোভিয়েট রাশিয়া ও অন্যদিকে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, সেখানে আমি ভারতের গোষ্ঠীনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী; কিন্তু যেক্ষেত্রে একদিকে চীন ও অন্যদিকে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, সেখানে যে ভারতবর্ষ কী করে গোষ্ঠীনিরপেক্ষ থাকতে পারে তা আমি বুঝি না। ১৯৬২ সনের অকটোবর-নভেমবরে কমিউনিস্ট চীনের দাপটে যখন আমরা বিপন্ন হয়ে পড়েছিলাম, গোষ্ঠীনিরপেক্ষ নীতির জনক স্বয়ং তখন মারকিন বিমান-প্রতিরক্ষার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন, এবং মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তাতে সাড়া দিয়ে একটি বিমানবাহী মারকিন জাহাজকে বঙ্গোপসাগরের দিকে অগ্রসর হতে আদেশ দিয়েছিলেন।

আমি জানতুম, আমার উক্তিতে বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে; কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখে আমি বিস্মিত হলাম যে, এই উক্তিকে কেন্দ্র করে এক প্রবল রাজনৈতিক ঝড় উঠল। সংসদের লবিতে ও সংবাদপত্রে দু সপ্তাহ ধরে তার জের চলেছিল। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় দিনের পর দিন এই বিতর্কিত বিষয়টির সংবাদ ছাপা হতে লাগল; লেখা হল সম্পাদকীয় নিবন্ধ। ১৯৬৫ সনের ২৪শে মার্চ তারিখে 'ইনডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকার সম্পাদক লিখলেন :

"বেচারা মিঃ সুধীর ঘোষ, জীবনে যিনি সরকারী ও বেসরকারীভাবে অনেকবার দৌত্যকর্ম করেছেন, একই সপ্তাহে দু-দুবার তিনি মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হলেন। ১৫ই মার্চ ও ২২শে মার্চ তারিখে সক্রোধে এই দাবি তোলা হয় যে, কংগ্রেস দল থেকে তাঁকে বহিষ্কৃত করা হোক। তাঁর অপরাধ এই যে, গুরুতর চৈনিক আক্রমণের সম্মুখে ভারতবর্ষ যখন বিপদাপন্ন, তখন অনন্যোপায় হয়ে মিঃ কেনেডির কাছে মিঃ নেহরু যে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে সংসদে তিনি সত্য কথাটা জানিয়েছেন। মিঃ সুধীর ঘোষের পক্ষে আরও ক্ষোভের ব্যাপার এই যে, ২২শে মার্চ তারিখে প্রধানমন্ত্রী তাঁর উক্তির প্রতিবাদ করেন। মিথ্যাবাদী বলে আখ্যাত হবার গ্লানি অবশ্য মিঃ ঘোষকে ভোগ করতে হয়নি।

আসলে, খুঁটিনাটি বিবরণের ক্ষেত্রে মিঃ সুধীর ঘোষের ভুল হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী তাই যথার্থই বলতে পারলেন যে, মিঃ নেহরু মারকিন বিমানবাহী জাহাজ পাঠাতে বলেননি, এবং চীনা আক্রমণের কালে তেমন কোনও জাহাজ ভারতীয় সমুদ্র-এলাকায় উপস্থিতও ছিল না। 'বিমান-প্রতিরক্ষা'-সংক্রান্ত কথাটাকেও সহজে ব্যাখ্যা করা গেল; স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল যে, একাধিক মহলের কাছেই ভারতবর্ষ সাহায্য প্রার্থনা করেছে। প্রধানমন্ত্রী যখন তাঁর উক্তির প্রতিবাদ করছেন, মিঃ সুধীর ঘোষ তখন রাজ্যসভায় উপস্থিত ছিলেন না; অনুপস্থিতির সিদ্ধান্তটি যে বিচক্ষণ, তাতে সন্দেহ নেই। মনে হয়, জন-অসন্তোষ থেকে আত্মরক্ষার জন্য নয়, নেতা যাতে নির্বিঘ্নে সরকারকে সমর্থন করতে পারেন, প্রধানত তারই জন্য তিনি তখন অনুপস্থিত ছিলেন।

কিন্তু কথা এই যে, ১৫ই মার্চ তারিখে মিঃ সুধীর ঘোষ যা বলেছিলেন, তার সারমর্মকে অস্বীকার করা যায় না। ১৯৬২ সনের ১৯শে নভেমবর তারিখে মিঃ নেহরু সত্যই মিঃ কেনেডির কাছে সাহায্যের জরুরী আবেদন জানিয়েছিলেন। ওয়াশিংটনস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সেটি যথাস্থানে পৌঁছে দেন। এটা একটা সাধারণভাবে সাহায্যের অনুরোধ নয়; সাহায্যের একটা বিশেষ আবেদন। এমন কী, সক্রিয় বিমান-স্কোয়াড্রনের সংখ্যাও উল্লেখিত হয়েছিল; সম্ভবত নয়াদিল্লিতে বিভিন্ন

বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষদের সঙ্গে পরামর্শ করেই এটা করা হয়। মিঃ কেনেডি তৎক্ষণাৎ এতে সাড়া দেন। ভূমধ্যসাগরে ষষ্ঠ মারকিন নৌবহর এবং প্রশান্ত মহাসাগরে সপ্তম মারকিন নৌবহরকে সজাগ করে দেওয়া হয়। আমেরিকানরা শুধুই মৌখিক সহানুভূতি জানিয়ে ক্ষান্ত ছিল না; এই কারণে মনে হয়, বিমানবাহী একটি-দুটি জাহাজকে হয়ত রওনাও করিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বিমানবাহী জাহাজের বৃত্তান্তটা মিঃ সুধীর ঘোষ এইভাবেই পেয়েছেন বলে মনে হয়। পূর্বের জায়গা থেকে ভারতীয় সমুদ্র-এলাকায় গিয়ে পৌঁছতে একটা মারকিন বিমানবাহী জাহাজের কতটা সময় লাগতে পারে, দুর্ভাগ্যের বিষয় তার একটা মোটামুটি হিসেব তিনি কষে দেখেননি। মিঃ লালবাহাদুর শাস্ত্রীর কথাটা তাই নির্ভুল যে, মারকিন বিমানবাহী কোনও জাহাজ কলকাতার ধারেকাছেও ছিল না। মিঃ নেহরু যেহেতু বিমানবাহী জাহাজ পাঠাতে বলেননি, শুধু বিমান-প্রতিরক্ষায় সাহায্য চেয়েছিলেন, সুতরাং মিঃ নেহরু কর্তৃক বিমানবাহী জাহাজ প্রার্থনার কথা অস্বীকার করে মিঃ শাস্ত্রী যা বলেছেন তাও নির্ভুল। বিমান-স্কোয়াড্রনগুলি কীভাবে ভারতে পৌঁছবে, সে-সিদ্ধান্ত করবার কথা আমেরিকানদেরই।

মিঃ নেহরুর অনুরোধের যে সাড়া মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পাওয়া যায়, চীনাদের উপরে তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও মিঃ সুধীর ঘোষের বক্তব্য প্রায় নির্ভুল। ১৫ই মার্চ তারিখে রাজ্যসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বৃহৎ শক্তিরা জানে, অন্য এক বৃহৎ শক্তিকে কীভাবে হুঁশিয়ার করে দিতে হয়; এবং অনেকেরই এটা জানা নেই যে, এক পক্ষ থেকে অন্য পক্ষকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যদি আর এক পা-ও এগোয়, তাহলে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট্‌কে তারা ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য করবে।" মিঃ ঘোষ যে 'হুঁশিয়ারি'র কথা বলেছিলেন, প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ওয়াশিংটন থেকে সরাসরি সেটা পিকিং-য়ে যায়নি; গিয়েছিল আর-একটি বৃহৎ শক্তির মাধ্যমে। অনেকের বিশ্বাস, সোভিয়েট সরকারই সেই মাধ্যম। স্মরণ করা যেতে পারে যে, মিঃ নেহরু কর্তৃক মিঃ কেনেডির কাছে বার্তা প্রেরণ এবং চীনাদের 'একপক্ষীয়ভাবে' যুদ্ধবিরতি ঘোষণা—এর মধ্যে ব্যবধান মাত্র দিন-দুয়েকের।

রাজ্যসভায় ১৫ই মার্চ তারিখে মিঃ সুধীর ঘোষ যে বিস্ফোরক উক্তি করেন, কেন্দ্রীয় সরকার যে তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তাতে সন্দেহ নেই। ১৯৬২ সনের ১৯শে নভেম্বর তারিখে মিঃ নেহরু মিঃ কেনেডিকে যে বার্তা পাঠান, সেই মূল বার্তাটি রয়েছে ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র-দপ্তরের সেরেস্তায়। নয়াদিল্লিতে মারকিন দূতাবাসে তার কোনও অনুলিপি নেই, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে যদি তার কোনও ফাইল-কপি আদৌ থেকে থাকে, তবে মিঃ লালবাহাদুর শাস্ত্রী তা দেখেননি। পররাষ্ট্র দপ্তরও এর অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন বলে মনে হয়।

এমন সম্ভব যে, মিঃ শাস্ত্রী প্রথমেই মিঃ সুধীর ঘোষের উক্তির উপরে গুরুত্ব আরোপ করেননি। পরে হয়ত অবস্থাটাকে পরিষ্কারভাবে বিবৃত করবার জন্য সংসদের কয়েকজন সদস্য (তাঁর নিজের দলের কয়েকজন সদস্যও সম্ভবত তার মধ্যে ছিলেন) তাঁর উপরে চাপ দেন। ফলে শুরু হয় মিঃ নেহরুর বার্তাটির খোঁজ। আমেরিকানরা স্বভাবতই নিজের থেকে এমন কিছু বলতে রাজী ছিলেন না, ভারত সরকার যাতে বিব্রত হতে পারেন। মারকিন দূতাবাস থেকে পরে হয়ত পররাষ্ট্র-মন্ত্রককে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, যে-দলিল সম্পর্কে কথা উঠেছে, তা সত্যিই আছে।

সংসদে উত্তর দিতে প্রধানমন্ত্রীর যে পুরো এক সপ্তাহ সময় লাগল, এর জন্য তাই তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না।

কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় এখন ভাবা দরকার, মিঃ সুধীর ঘোষ যা বলেছিলেন, তা নিয়ে এতটা উত্তেজিত হবার কারণ কী। কারণটা কি এই যে, ১৯৬২ সনের নভেমবরের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতবর্ষ যে সংকটের দ্বারা কবলিত হয়েছিল, গত তিরিশ মাসে তার কথা আমরা বিস্মৃত হয়েছি? নাকি কারণটা এই যে, উপস্থিত-বিপদটা কেটে যাবার পর আবার আমাদের পক্ষে তাত্ত্বিক গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার অপাপবিদ্ধ পবিত্রতায় মগ্ন হওয়া সম্ভব? পররাষ্ট্র-নীতির পণ্ডিতরা যে 'বিমান-প্রতিরক্ষা' শব্দটার প্রকৃত সংজ্ঞার চুলচেরা বিচারের সেই পুরনো খেলাতেই প্রবৃত্ত হয়েছেন, এটা একটা বিস্ময়কর—বস্তুত স্তম্ভিত হবার মতো—ঘটনা। আসামের সমতলভূমি যখন চীনা আগ্রাসনের সম্মুখে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, ১৯৬২ সনের নভেমবর মাসের সেই ভয়াবহ দিনগুলির কথা স্মরণ করলে এই ভদ্রলোকদের উপকার হবে; স্মরণ করলে ভাল হবে যে, গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার যাবতীয় পবিত্র বচন সত্ত্বেও আত্মরক্ষাই তখন ছিল দেশের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

যাই হোক, জাতির বিপদের মুহূর্তে মিঃ নেহরু যদি—যে কোনও মহল থেকেই হোক—প্রভূত সাহায্য চেয়ে থাকেন, তাহলে ঠিক কাজই তিনি করেছিলেন। একটি বন্ধু-রাষ্ট্রের কাছে যে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে, তার সঙ্গে সেই 'নীতি'র সামঞ্জস্য নেই, নিতান্ত এই কারণে স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী যদি দেশকে ডুবে যেতে দিতেন, তবে নিশ্চয় গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতার বীর সমর্থকরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাতেন না। মিঃ নেহরুর কৃতিত্ব এই যে, যে সাহায্য তিনি চেয়েছিলেন ও পেয়েছিলেন, সেই সাহায্য সত্ত্বেও ভারতবর্ষকে তিনি মার্কিন গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত করেননি। আমাদের মধ্যেকার উত্তেজিত কিছু-কিছু রাজনীতিকের পক্ষে বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হওয়া দরকার। মিঃ সুধীর ঘোষের বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্টতই কয়েকটি তথ্যগত ভুল ছিল। কিন্তু সেইজন্যই তাঁর বক্তব্য যে এক নিরর্থক বিতর্কের তলায় চাপা পড়ে গেল, এটা দুর্ভাগ্যের বিষয়।

রাজ্যসভায় তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার এই দুটি বাক্য পুনরুচ্চারিত হবার দাবি রাখে। 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তিকে কাজে না-লাগিয়ে কমিউনিস্ট চীনের সামরিক শক্তি থেকে ভারতকে রক্ষা করবার যে প্রস্তাব, তা যে শেষ বিচারে একটা বাস্তব প্রস্তাব নয়, আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মতন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষও আমাদের সেই বিপদ-কালে সে-কথা বুঝতে পেরেছিলেন। এইটেই হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর সেই বিখ্যাত উক্তির পটভূমিকা; তিনি বলেছিলেন, চীন যেখানে জড়িত, গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার নীতি সেখানে প্রযুক্ত হবে না।' কমিউনিস্ট পার্টির সুরে সুর না মিলিয়ে স্বর্গত প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র-নীতির সমর্থকরা বরং এই কথাগুলি একটু সযত্নে ভেবে দেখুন। স্বর্গত প্রেসিডেন্ট কেনেডি যেভাবে সাড়া দিয়েছিলেন, সেইভাবে সাড়া দিয়ে ১৯৬২ সনের নভেমবর মাসে সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি অনুরূপভাবে সামরিক সাহায্য পাঠাত, কমিউনিস্ট পার্টির মহান নেতারা তাহলে নিশ্চয় বিন্দুমাত্র আপত্তি তুলতেন না।"

শ্রীনেহরুর মতন এত ভাল একজন মানুষ কী করে আমেরিকার কাছে বিমান-প্রতিরক্ষা প্রার্থনার মতন এত নোংরা একটা কাজ করতে পারেন?—সংসদে ও সংসদের বাইরে কমিউনিস্টরা, কংগ্রেসের ভিতরকার সহযাত্রীরা, এবং কমিউনিস্ট-

দের সঙ্গে যাঁদের যোগ নেই এমন কিছু মানুষও রুদ্ধকণ্ঠে এই প্রশ্ন তুলেছিলেন।

কমিউনিস্ট চীনের আক্রমণে ভারতবর্ষ যখন বিপন্ন, চীনারা যখন তাওয়াংয়ের ঘাঁটি এবং দুর্ভেদ্য-বলে-পরিচিত সে লা ও বমডি লা ভেদ করে আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অবধি এগিয়ে এসেছে, সেই সংকটকালে দায়িত্বশীল একজন রাষ্ট্রনেতা যা করতে পারতেন কিংবা যা তখন তাঁর করা উচিত হত, ঠিক তা-ই করেছিলেন শ্রীনেহরু। ভারতবর্ষকে তিনি যতখানি ভালবাসতেন, ততখানি ভাল আর-কিছুকেই তিনি বাসতেন না। সেই ভারতবর্ষের যখন সংকট উপস্থিত, তখন তাকে রক্ষা করবার জন্য বাকী আর সবকিছুকেই, এমন কী, তাঁর গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার নীতিকেও তিনি পরিহার করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর কাজে প্রমাণিত হয় যে, সর্বোপরি তিনি ছিলেন মহান দেশপ্রেমিক। আমি যা বলেছিলাম, তা সত্য; এবং শ্রীনেহরুর দেশপ্রেম ও রাষ্ট্রনৈতিক বিচক্ষণতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যই কথাটা আমি বলেছিলাম। তার ফলে যে উত্তাল আলোড়নের সৃষ্টি হল, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দুই দিক থেকেই তা একটি তাৎপর্যময় রাজনৈতিক ব্যাপার।

আমার বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বিবৃতি দেবার জন্য যে চাপ দেওয়া হচ্ছিল, প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজী চারদিন ধরে তা ঠেকিয়ে রাখলেন; তারপর ১৯শে মার্চ তারিখে তিনি ডেকে পাঠালেন আমাকে। সংসদ-ভবনে তাঁর দপ্তরে ঢুকে আমি দেখলাম যে, শ্রীনন্দ ও পররাষ্ট্র-সচিব দুজনেই সেখানে আগে থাকতে বসে আছেন। প্রধানমন্ত্রী আমাকে বললেন, মার্কিন বিমান-প্রতিরক্ষার জন্য শ্রীনেহরু প্রেসিডেন্ট কেনেডির কাছে বিশেষ অনুরোধ পাঠিয়েছিলেন, আমার এই উক্তিতে তিনি বিস্মিত হয়েছেন। তিনি জানেন যে, দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে কিছু বলবার মত মানুষ আমি নই; অথচ পররাষ্ট্র-সচিব তাঁকে জানিয়েছেন যে, এমন কোনও কাগজপত্র নেই যাতে মনে হতে পারে যে, পণ্ডিতজী এ-কাজ করেছিলেন। শাস্ত্রীজী বললেন, তিনি ও শ্রীনন্দ, দুজনেই সেইসময়ে শ্রীনেহরুর ক্যাবিনেটে মন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু তাঁরাও কেউ এ-বিষয়ে কিছু জানতেন না। আমি কি তাহলে ভুল করেছি? সকল বন্ধু-রাষ্ট্রেরই প্রধানের কাছে, সাহায্য প্রার্থনা করে, ১৯৬২ সনের ২০শে অকটোবর তারিখে শ্রীনেহরু সাধারণভাবে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, আমি কি তারই কথা বলতে চেয়েছি?

উত্তরে আমি বললাম যে, এটা একেবারেই আলাদা একটা ব্যাপার। এটা একটা বিশেষ বার্তা; ১৯৬২ সনের ১৯শে নভেমবর তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে এটি পাঠানো হয়েছিল। ১৯৬৩ সনের মার্চ মাসে আমি প্রেসিডেন্ট কেনেডির সঙ্গে দেখা করি; তখন তাঁরই কাছে এই বার্তার কথা আমি শুনেছি। যা শুনেছি, তা শ্রীনেহরুকেও আমি জানাই। প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজী সত্যিই এ-বিষয়ে কিছুই জানতেন না। তিনি তাই বিস্মিত হয়ে গেলেন। আমি তাঁকে বললুম, প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে এ-বিষয়ে কোনও বিবৃতি দেওয়া তাঁর ঠিক হবে না। প্রকৃত তথ্য কী, মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে পররাষ্ট্র-সচিব তা অনায়াসেই জেনে নিতে পারেন। তদন্ত করে তিনি যদি আমাকে বলেন যে, আমার উক্তি ভুল, তাহলে সেই ভুলের জন্য আমি সংসদ ও দেশের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করব।

তদন্তের জন্য তিনি অতএব আরও তিন দিন অপেক্ষা করলেন। দেখা গেল, দলিলটিকে শ্রীনেহরু পররাষ্ট্র-দপ্তরে যেতে দেননি, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরেই তিনি

সেটি রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর উপরে এতই প্রবলভাবে চাপ পড়তে লাগল যে, তাঁর মনে হল, তাঁকে একটি বিবৃতি দিতেই হবে। সংসদে তিনি বললেন যে, শ্রীনেহরু মার্কিন বিমানবাহী জাহাজ চাননি (কথাটা সত্য; তার কারণ, চাওয়া হয়েছিল বিমান-প্রতিরক্ষা), এবং সেই সময়ে কোনও মার্কিন বিমানবাহী জাহাজ বঙ্গোপসাগরে ছিল না (এও সত্যি কথা; কেননা বঙ্গোপসাগরের দিকে তা যাত্রা করেছিল মাত্র)।

কোন ব্যাপারেই যাতে কোনও ভ্রান্তির অবকাশ না থাকে, তার জন্য ১৯৬৫ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে আমি প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি লিখি। চিঠিখানি এই :

৯৫ সাউথ অ্যাভেনিউ,
নয়াদিল্লি,
২৬শে মার্চ, ১৯৬৫

"প্রিয় শাস্ত্রীজী,

গত শুক্রবার (১৯শে মার্চ) আপনি সংসদ-ভবনে আপনার দপ্তরে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমার উক্তি সম্পর্কে কোনও বিবৃতি দেবার আগে আপনি যে আমার সঙ্গে কথা বলে নিলেন, এতে আপনার স্বভাবসিদ্ধ অনুগ্রহেরই পরিচয় পাওয়া গেল। আপনার সৌজন্য ও সদয় ব্যবহারে আমি খুবই অভিভূত হয়েছি। আপনি আমাকে বলেন যে, ১৯৬২ সনে চীনা আক্রমণের পর পণ্ডিতজী মার্কিন সরকারের কাছে বিমান-প্রতিরক্ষার জন্য কোনও বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছিলেন বলে আপনি কিংবা নন্দজী (আলোচনার সময়ে তিনিও উপস্থিত ছিলেন) জানেন না, এবং আপনার ঘনিষ্ঠ মহলের লোকেরা আপনাকে বলেছেন যে, আমার উক্তিটা ভুল। তাতে আমি বলি যে, রাষ্ট্রদূত বোলসের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে যদি আপনি নিঃসংশয় হন যে, সেই সংকটকালে সকল রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে সাধারণভাবে শ্রীনেহরু যে-চিঠি লিখেছিলেন, তা ছাড়া বিমান-প্রতিরক্ষার জন্য তিনি প্রেসিডেন্ট কেনেডির কাছে আলাদা কোনও বিশেষ অনুরোধ জানাননি, তাহলে আমি প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইব। নন্দজী আমার এই প্রস্তাব সমর্থন করেন যে, বিমান-প্রতিরক্ষার জন্য পণ্ডিতজীর অনুরোধ-সংবলিত কোনও সরকারী দলিল মার্কিন সরকারের কাছে আছে কিনা, মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে শ্রী সি. এস. ঝার (তিনি উপস্থিত ছিলেন) তা জেনে নেওয়া উচিত। ঠিক ছিল, আপনি শুক্রবারেই বিবৃতি দেবেন; কিন্তু সেটা আপনি সোমবার ২২শে মার্চ পর্যন্ত মুলতুবী রাখবার সিদ্ধান্ত করলেন। এও ঠিক হল যে, শ্রী সি. এস. ঝা ইতিমধ্যে ব্যাপারটার সন্ধান নেবেন।

২১শে মার্চ রবিবার সন্ধ্যায় আমি শ্রী সি. এস. ঝার সঙ্গে দেখা করি, এবং জিজ্ঞেস করি রাষ্ট্রদূত বোলসের কাছ থেকে কী তিনি জানতে পেরেছেন। তার কারণ, আমি কথা দিয়েছিলাম যে, ভুলটা যদি আমারই হয়ে থাকে, তাহলে পরদিন সকালে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করব। তিনি বললেন, মিঃ বোলসের সঙ্গে তিনি দেখা করেননি, তবে "আমেরিকানদের" সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। স্পষ্টই বোঝা গেল যে, তিনি যা জানতে পেরেছেন, খোলাখুলি তা তিনি আমাকে বলতে চান না। সুতরাং

আমি রাষ্ট্রদূত বোলসের সঙ্গে যোগাযোগ করলুম। তিনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি রিচার্ড সেলেস্টের মারফতে আমাকে জানালেন যে, দূতাবাসের উপদেষ্টা মিঃ ডগলাস হেককে তিনি শনিবার দিন শ্রী সি. এস. ঝার কাছে পাঠিয়েছিলেন। শ্রীঝা তাঁকে একটি স্পষ্ট প্রশ্ন করেন, এবং মিঃ হেক্ তার একটি স্পষ্ট উত্তর দেন। তিনি বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে দলিলটি (বিমান-প্রতিরক্ষার জন্য প্রেসিডেন্ট কেনেডির কাছে পণ্ডিতজীর আবেদন) আছে। সেটি ওয়াশিংটনে রয়েছে, এবং ভারত সরকার যদি চান তো সেটিকে দাখিল করা যেতে পারে। এই অবস্থায় আপনি আমাকে কী করতে বলেন, সেটা জানবার জন্যে সোমবার সকালে আমি আপনার দপ্তরে গিয়েছিলাম; কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে দেখা করলেন না। সর্দার স্বরণ সিং ও শ্রী সি. এস. ঝা সেইসময় আপনার কক্ষে ছিলেন। আপনি আমার সঙ্গে দেখা না করায়, আপনার বিবৃতি দানের সময়ে সংসদে অনুপস্থিত থাকা ছাড়া আমার গত্যন্তর রইল না। তার কারণ, আমার নেতা যা বলছেন, তার বিপরীত কিছু বলা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সংসদে আপনি যে বিবৃতি দিয়েছেন, তা আক্ষরিক অর্থে [টেকনিক্যালি] নির্ভুল; পণ্ডিতজী বিমানবাহী জাহাজ চাননি (আমাকে বলা হয়েছিল যে, তিনি বিমান-প্রতিরক্ষা চেয়েছিলেন,—বিমানবাহী জাহাজের চাইতে যা আরও বৃহৎ ব্যাপার; মিঃ কেনেডির কাছে আবেদন জানিয়ে তিনি যে চিঠি লেখেন, তাতে—সম্ভবত মার্কিন চালকসহ—ষোলো স্কোয়াড্রন জঙ্গী বিমান চাওয়া হয়েছিল)। বঙ্গোপসাগরে সেই সময়ে কোনও বিমানবাহী জাহাজ ছিল না, আপনার এ-উক্তিও নির্ভুল (মিঃ বোল্‌স বলছেন, বিমানবাহী জাহাজটিকে ভারত মহাসাগর থেকে বঙ্গোপসাগরে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, এবং সেটি রওনা হয়েছিল)। কিন্তু আমার উক্তির যা সারকথা, এতে তার ব্যত্যয় হচ্ছে না।

পিছনে তাকিয়ে এখন আমার মনে হচ্ছে যে, বিচারে আমার ভুল হয়েছিল। চীন সম্পর্কে গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ যে বাতুলতা, বিমানবাহী জাহাজ সংক্রান্ত ব্যাপারটার উল্লেখ না করেও তা আমি বোঝাতে পারতুম। আমার বক্তৃতার যা মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, বিমানবাহী জাহাজের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। কমিউনিস্ট চীনের শক্তি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে সংকট সৃষ্টি করেছে, সে সম্পর্কে ও রাষ্ট্রপুঞ্জের সংকট সম্পর্কে আমি ক্ষুদ্র একটি বক্তৃতা দিই, এবং এই দুই গুরুতর পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের নীতির অপ্রতুলতার উল্লেখ করি। রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে আমরা যে গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করছি তা নির্ভুল ও বিচক্ষণ; কিন্তু—আমেরিকানরা যতই অনিপুণ ও স্থূল হোক—আমি বিশ্বাস করি যে, চীন ও আমেরিকার মধ্যে আমরা যে গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করছি, তা বিপজ্জনক। এতে করে আমরা নিজেদেরই অজ্ঞাতসারে ভারত ও চীনের কমিউনিস্ট-দেরই সুবিধে করে দিচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি যে, এই ব্যাপারটির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি দেশের উপকার করেছি।

আমার বক্তৃতার সারকথা ছিল এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তিকে কাজে না-লাগিয়ে কমিউনিস্ট চীনের সামরিক শক্তি থেকে ভারতকে রক্ষা করবার যে প্রস্তাব, তা শেষ বিচারে একটা বাস্তব প্রস্তাব নয়। এমন কী, গোষ্ঠীনিরপেক্ষ নীতির যিনি উদ্গাতা, সেই পণ্ডিতজীও ১৯৬২ সনে আমাদের সংকটকালে এ-কথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং আমেরিকার কাছে বিমান-হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

ঈশ্বর না করুন, আবার যদি আমরা আক্রান্ত হই, তাহলে সেই একই আমেরিকানদের কাছে একই সাহায্যের অনুরোধ আমাদের জানাতে হবে। দায়িত্বশীল যে-কোনও রাষ্ট্রনেতা যা করতেন, পণ্ডিতজী ঠিক তা-ই করেছিলেন; এতে শুধু এই কথারই প্রমাণ মেলে যে, তিনি ছিলেন মহান দেশপ্রেমিক। এই সহজ সত্যটা বিবৃত করে আমি একজন মহান মানুষের ভাবমূর্তিকে [ইমেজ] ক্ষতিগ্রস্ত করেছি অথবা ভারতবর্ষের সুনামে কলঙ্ক ছিটিয়েছি, যে-কোনও লোকের পক্ষেই এমন কথা বলা নেহাত বোকামি মাত্র।

পণ্ডিতজী সত্যই বিমান-প্রতিরক্ষার জন্য বিশেষ আবেদন জানিয়েছিলেন; এবং রাষ্ট্রদূত বি. কে. নেহরু ১৯৬২ সনের ১৯শে নভেমবর রাত্রে প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে সেই বার্তাটি পেণছে দেন। সরকারের এটা কোনও মস্ত বড় গোপন তথ্য নয়। এ-কথা অনেকেই জানে। এ সম্পর্কে লেখালিখিও হয়েছে। (দ্রষ্টব্য: ওয়াশিংটন পোস্ট, ২২ ফেবরুয়ারি, ১৯৬৩। এই বিষয়ে সেলিগ হ্যারিসনের প্রবন্ধ।) হ্যারিসন আমাকে বলেছেন যে, খবরটা তিনি সরাসরি রাষ্ট্রদূত গলব্রেথের কাছে পেয়েছিলেন; এবং নয়াদিল্লিতে আরও বেশ-কিছু মানুষকে গলব্রেথ এ-কথা বলেছেন। ব্যক্তিগত-ভাবে আপনি তখন এ-বিষয়ে কিছু জানতেন না। তবে রাষ্ট্রদূত বি. কে. নেহরু এখন নয়াদিল্লিতেই রয়েছেন। আপনাকে অনুরোধ করছি, প্রকৃত তথ্য কী, সত্যের খাতিরে সেটা আপনি তাঁর কাছ থেকে জেনে নিন। এ-ব্যাপারে আপনার কাছে আমি প্রকৃত তথ্য জানতে চাই। তার কারণ, দল ও দেশের কাছে আমার ক্ষমা প্রার্থনা করবার দরকার আছে কিনা, সে-বিষয়ে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

শ্রদ্ধাসহ

আন্তরিকভাবে আপনার
সুধীর ঘোষ"

শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রী,
প্রধানমন্ত্রী।

১৯৬৫ সনের ৩১শে মার্চ তারিখে প্রধানমন্ত্রী এ-চিঠির জবাব দেন। তাতে তিনি বলেন যে, সংসদে তিনি ব্যাপারটাকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন মাত্র, এবং এখানেই এর উপরে যবনিকা পড়া উচিত। সুতরাং আমি আর মুখ খুললাম না।

আন্তর্জাতিক কূটনীতির এই কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার সবচাইতে বিচিত্র অংশ এই যে, মারকিন পররাষ্ট্র দপ্তর সরকারীভাবে একটি বিবৃতি প্রচার করে জানালেন, প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী নির্ভুল কথাই বলেছেন; মিঃ নেহরু মারকিন বিমানবাহী জাহাজ চাননি এবং বঙ্গোপসাগরে সেইসময় কোনও মারকিন বিমানবাহী জাহাজ ছিল না। ১৯৬৬ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে, ১৯৬৬ সনের বৈদেশিক সাহায্য বিলের (পৃ ৬৮) প্রকাশ্য শুনানি-কালে-সেক্রেটারি রাস্ক ও সেনেটর মানড্‌ট্‌-এর মধ্যে যে বাক্য-বিনিময় হয়, এই বিবৃতির পটভূমিকায় তা কৌতূহলজনক :

১৯৬২ সনে ভারতবর্ষের জন্য সামরিক সাহায্য

সেনেটর মানড্ট্ : লাল চীনারা যখন ভারতবর্ষের সীমান্তে আক্রমণ চালাচ্ছিল, তখন ভারতবর্ষ খুবই অসুবিধায় পড়েছিল বলে আমার মনে আছে। সেই সময়ে, ১৯৬২ সনে, কী ঘটেছিল, তা নিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই। সেই সময়ে আমরা সরাসরি কিছু সাহায্য দিয়েছিলাম, তাই না?

সেক্রেটারি রাস্ক : হ্যাঁ, ব্রিটেন ও আমরা যুক্তভাবে তখন ভারতবর্ষকে সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করি।

সেনেটর মান্ড্ট : নেহরু তখন নেতা ছিলেন; তাই না?
সেক্রেটারি রাস্ক : ঠিক কথা।

সেনেটর মানড্ট্ : প্রেসিডেন্ট কেনেডির কাছে প্রেরিত একটি আবেদনের মাধ্যমে নেহরু কি তখন বিমান-প্রতিরক্ষার জন্য মারকিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুরোধ করেছিলেন?

সেক্রেটারি রাস্ক্ : সেই সময়ে এই ব্যাপারে কিছু আলোচনা হয়েছিল।
সেনেটর মানড্ট্ : এটা নেহাতই এড়িয়ে-যাওয়া কথা, মিঃ সেক্রেটারি।
সেক্রেটারি রাস্ক : কী বললেন?

সেনেটর মানড্ট্ : এটা এড়িয়ে-যাওয়া কথা। হয় নেহরু বিমান-প্রতিরক্ষার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন, অথবা জানাননি।

সেক্রেটারি রাস্ক : সেনেটর, এটা প্রকাশ্য অধিবেশন; আমি রুদ্ধদ্বার অধিবেশনে আলোচনা করতে পারি। এই রকমের একটা বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সরকারের প্রধানদের সঙ্গে যে-সব বার্তা বিনিময় হয়, তা নিয়ে প্রকাশ্য অধিবেশনে কিছু বলা আমার উচিত নয়।

সেনেটর অতঃপর পররাষ্ট্র-সচিবকে যে-জেরা করেন, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ভারতবর্ষ সত্যই বিমান-প্রতিরক্ষার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল, এবং মারকিন যুক্তরাষ্ট্র সত্যই তাতে সাড়া দিয়েছিল। পররাষ্ট্র-সচিব যখন বলেন যে, দুই সরকারের প্রধানদের মধ্যে গোপনীয় যে-সব বার্তা বিনিময় হয়ে থাকে, তা প্রকাশ করা তাঁর উচিত নয়, তখন তাঁর অসুবিধার কথাটা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু, ভারতবর্ষের একটা আভ্যন্তর বিতর্কে—সংসদে ভারতীয় কংগ্রেস দলের নেতা ও সেই দলেরই একজন সদস্যের মতের পার্থক্যে—মাথা গলাতে তাঁর ঔচিত্যবোধ তাঁকে বাধা দেয়নি বলে মনে হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে একটা বিভ্রান্তিসৃষ্টিকারী অর্ধসত্য যাতে ব্যক্ত হয়েছে, এমন একটা বিবৃতি প্রচার তিনি অনুমোদন করেছেন; নিশ্চয় তিনি ভেবে থাকবেন যে, এটাই তাঁর পক্ষে উচিত-কাজ।

এই তুমুল বিতর্কের ঝড় যখন বইছে, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীরাজগোপালাচারীর কাছ থেকে আমি একটি চিঠি পাই। বহু বৎসর তাঁর সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ ছিল না। চিঠিতে তিনি লেখেন :

৬০ বাজলুল্লা রোড,
ত্যাগরাজনগর,
মাদ্রাজ ১৭,
৩১শে মার্চ, ১৯৬৫

"প্রিয় সুধীর ঘোষ,

১৫ই মার্চ তারিখে রাজ্যসভায় তুমি যে বক্তৃতা দিয়েছিলে, জনৈক বন্ধু তার অনেকটা অংশই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই বক্তৃতার জন্য আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাই। শ্রীনেহরু সম্পর্কে তোমার উক্তির বিরুদ্ধে এত সোরগোলের অর্থ আমি বুঝতে পারি না; বস্তুত তোমার উক্তিতে তাঁর প্রশংসাই করা হয়েছে, এটা তাঁর পক্ষে অবমাননাকর নয়। দেখে কৌতুক বোধ করছি যে, তোমার প্রশংসা সম্পর্কেই এমনভাবে কথা বলা হচ্ছে যেন একটা নিন্দাসূচক।

আন্তরিকভাবে তোমাদের
সি. রাজগোপালাচারী"

চিঠি পেয়ে রাজাজীকে আমি জানালাম যে, এ-ব্যাপারে মারকিন বন্ধুদের আচরণ তিক্ততাজনক। জ্ঞানী মানুষ রাজাজী তাঁর উত্তরে লিখলেন :

৬০ বাজলুল্লা রোড,
ত্যাগরাজনগর,
মাদ্রাজ ১৭,
৯ই এপ্রিল, ৬৫

"প্রিয় সুধীর ঘোষ,

তোমার ৬ই এপ্রিল তারিখের চিঠি ও তার সঙ্গে প্রেরিত কাগজপত্র পেয়েছি। মারকিন বন্ধুদের আচরণে বিচলিত হোয়ো না, তোমার প্রতি এই আমার পরামর্শ। তাদের আচরণে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়নি। জনসাধারণ মোটামুটিভাবে তোমাকেই সমর্থন করে ও করবে।

শুভেচ্ছা জানাই।

আন্তরিকভাবে তোমাদের
সি. রাজগোপালাচারী"

প্রবীণ এই রাজনীতিজ্ঞের কাছ থেকে চিঠি দুখানি পেয়ে আমার খুবই ভাল লেগেছিল। গান্ধী-যুগের নেতাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই আজও আমাদের মধ্যে আছেন। কয়েকটি মাত্র কথা; কিন্তু তারই মধ্যে যে মনের পরিচয় পাওয়া গেল, তার মধ্যে কোথায় যেন গান্ধীজীর সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। আমার নিঃসঙ্গতার কথা যে তিনি বুঝতে পেরেছেন, এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমাকে চিঠি লিখেছেন, —এ-কথা ভেবে আমার চোখে জল এল। মনে পড়ল শুকিয়ে-যাওয়া একটি ফলের

কথা। গত কুড়ি বছরে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছি আমি। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, রাশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, জাপান, —নানান জায়গায় আমি গিয়েছি। আর এই কুড়ি বছর—যেখানেই যাই না কেন—শুকিয়ে-যাওয়া সেই ফলটি সারাক্ষণই আমার পকেটে থেকেছে। আমার জীবনের সেটি পরমতম সম্পদ। সারাক্ষণ তাকে আমি সঙ্গে রাখি।

গান্ধীজীর পরিহাসপ্রিয়তা ছিল অসামান্য। তাঁর সেই নিঃসঙ্গ দিনগুলিতেও তিনি মুখের হাসিটিতে নিভে যেতে দিতেন না। ১৯৪৬ সনে তিনি যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সন্ত্রস্ত নরনারীদের আশা আর অভয় দেবার জন্য নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন মাঝে-মাঝেই তাঁর কাছে যেতে হত আমায়। একবার গিয়ে দেখি, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় তিনি এক গ্রাম্য রজকের কুটিরে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গীদের তিনি অন্যান্য গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। শীতের সন্ধ্যায় সেদিন সেই পর্ণকুটিরের মধ্যে গান্ধীজীকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, তিনি যেন নিঃসঙ্গতারই প্রতিমূর্তি।

সেখান থেকে যেদিন আমি দিল্লি রওনা হই, কুটির থেকে গান্ধীজী সেদিন আমাকে কিছুটা পথ পদব্রজে এগিয়ে দিলেন। পথের ধারে একটি গাছের তলায় তিনি থেমে দাঁড়ালেন। হরীতকী গাছ। মাটির উপরে অসংখ্য হরীতকী ছড়িয়ে পড়ে আছে। সেই গাছতলায় দাঁড়িয়ে কী জানি কেন হঠাৎ আমার মনে হল যে, এই হয়ত তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। নিচু হয়ে যখন তাঁকে প্রণাম করছি, তখন আমার চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল তাঁর পায়ের উপরে গড়িয়ে পড়ল। হাত ধরে গান্ধীজী আমাকে ওঠালেন।। হেসে বললেন, "চোখের জল ফেলবার হুকুম নেই তা ত জান।" তারপর মাটি থেকে একটি হরীতকী ফল কুড়িয়ে নিলেন তিনি; সেটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "এই রইল আমার চিহ্ন। এটিকে পকেটে রেখে দৌড় দাও।" বলে আমার পিঠে চাপড় মেরে সামনের দিকে আঙুল তুলে ধরলেন। সেই চাপড়ের গতিবেগের জোরেই কুড়ি বছর ধরে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। দূত হিসেবে আমার ভূমিকা আজও ফুরোয়নি। সফল হয়েছি, এমন কথা বলতে পারিনে। তবে সাফল্য আর ব্যর্থতার প্রশ্ন অবান্তর। চেষ্টাটাই বড় কথা। আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। মাঝে-মাঝে যখন দুর্বল হয়ে পড়ি, যখন ভাবি এত চেষ্টা করে লাভ কী হল, শুকিয়ে-যাওয়া সেই হরীতকী ফলটিকে স্পর্শ করে তখন আবার প্রেরণা ফিরে পাই আমি, সামনে-এগিয়ে-দেওয়া সেই চাপড়টির কথা তখন মনে পড়ে। সেই প্রেরণাতেই আজও আমি সামনে এগিয়ে চলেছি। আর যখন নিঃসঙ্গ বোধ করি, শ্রীঅরবিন্দের কথাগুলিকে স্মরণ করে তখন সান্ত্বনা পাই। তিনি বলেছিলেন, "আদেশ যখন পেয়েছ, তখন শুধু তাকে পালন করবারই চেষ্টা কর। বাকীটা ত ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের বিধান। মানুষ তাকেই বলে ভাগ্য, অদৃষ্ট, নিয়তি।"